রামকথার বিকাশের ধারা

প্রথম পর্ব

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৫৯

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

ভূর্জপত্র-পক্ষে শ্রীমতী শর্মিলা পাল -কর্তৃক প্রকাশিত
প্রিণ্টেক-পক্ষে শ্রীশিবনাথ পাল -কর্তৃক ২ গণেন্দ্র
মিত্র লেন; কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত

সারা বিশ্বে যাঁরা রামায়ণকে ভালোবাসেন

তাঁদের উদ্দেশে

নিবেদিত হল

তৃতীয় পর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষার রামায়ণ-বিষয়ক আলোচনার মধ্যে থাকছে নিম্নলিখিত দেশগুলির রামায়ণী-সাহিত্য : সিংহল, তিব্বত, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, জাপান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, খোটান ও থাইল্যাণ্ড। এ ছাড়া এই পর্বে থাকবে বিভিন্ন প্রত্ন-উপাদান অবলম্বনে রামকথা বিচার, রামকথা সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য বৃত্তান্ত এবং রামায়ণের কয়েকটি সুনির্বাচিত আখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন রামায়ণের তুলনামূলক বিচারসূত্রে বাল্মীকি-রামায়ণের অসামান্য গৌরব ও অনন্য উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা।

বর্তমান গ্রন্থে প্রথম পর্বের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যের রামকথা দিয়ে। অন্যান্য রামকথাগুলি পূর্বোল্লিখিত ক্রম-অনুসারে পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে।

শ্রীপ্রসাদকুমার মাইতি

বিষয়সূচী

প্রাক্‌কথন [৭]

১ সংস্কৃত সাহিত্যে রামকথা ১

২ বৌদ্ধ রামকথা ২৬৪

৩ জৈন রামকথা ২৭৪

প্রথম পর্ব

১. সংস্কৃত সাহিত্যে রামকথা

ক. মহাভারত (পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ)

মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে রামকথা কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে, কোথাও বা বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাংশগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করছি।

(অ) আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ যে ষোলো জন রাজার আখ্যান বলেছিলেন তা শান্তিপর্বে বিবৃত আছে। পুরাকালে এই ষোলো জন রাজা অশেষ গুণ-সম্পন্ন হয়েও মৃত্যু এড়াতে পারেনি। এই গল্পগুলি প্রথমে জানিয়েছিলেন মুনি নারদ রাজা সৃঞ্জয়কে। এখানে কৃষ্ণ নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদ যুধিষ্ঠিরকে শোনাচ্ছেন। এই ষোলো জন রাজার মধ্যে রামের কথাও বর্ণিত আছে। রামরাজ্যে প্রজাগণ সুখে বাস করত, অকালমৃত্যু, রোগ, শোক ছিল না, প্রজাগণ সবাই ধার্মিক, সন্তুষ্টচিত্ত ও নির্ভীক ছিল। সেই মহাতপা রাম চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করেছিলেন ও দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি দশ হাজার আর দশ শো বৎসর ধরে অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন। "তোমার চেয়ে চার গুণ বেশি ভালো ও তোমার পুত্রের চেয়ে বেশি পুণ্যবান, তিনিহ যদি মারা যান তবে পুত্রের জন্য তোমার শোক করা অনুচিত।"

> "স চতুর্দশ বর্ষাণি বনে প্রোষ্য মহাতপাঃ
> দশাশ্বমেধান্ জারুথ্যান আজহার নিরর্গলান। ৫৭
> ... ...
> দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানি চ।
> অযোধ্যাপতির্ ভূত্বা রামো রাজ্যম অকারয়ৎ ॥ ৫৯
> সচেৎ মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ ত্বয়া।
> পুত্রাৎ পুণ্যতরম্চৈব মা পুত্রম অনুতপ্যথাঃ ॥ ৬০

—মহাভারত, শান্তিপর্ব, অধ্যায় ২৯

(আ) অভিমন্যু বধের পর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বেদব্যাস দ্রোণ-পর্বে রামের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। এই উপাখ্যান পূর্বে নারদ পুত্রবধে কাতর

রাজা সৃঞ্জয়ের নিকট বর্ণনা করেছিলেন। কাহিনীটি তেইশটি শ্লোকে বর্ণিত। এখানে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস, সীতাহরণ, রাবণ বধ—এইসব কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর রামের রাজ্যশাসন ও রামরাজত্বে প্রজাদের সুখের কথার বর্ণনাও আছে। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, মহাত্মা রাম দুই পুত্রকে এবং ভ্রাতৃত্রয়ের ছয় পুত্রকে আট রাজ্যে অভিষিক্ত করে স্বর্গে গমন করেন। রামকাহিনী এইভাবে বর্ণনা করে নারদ মহারাজ সৃঞ্জয়কে বলেছেন—'হে মহারাজ সৃঞ্জয়, তোমাপেক্ষা যোগ, বেদপাঠ, দান ও তপস্যায় প্রধান এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা পুণ্যবান্ সেই রামচন্দ্র যদি মৃত্যু বরণ করেন তবে অযজ্ঞকারী ও দক্ষিণাদাতা পুত্রকে লক্ষ্য করে আপনি অনুতাপ করতে পারেন না।'

হে চেন্মমার সৃঞ্জয় ! চতুর্ভদ্রতর স্বয়া।
পুত্রাৎপুণ্যতরস্তভ্যং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥
অযজ্ঞানমদাক্ষিণ্যমভি শ্বৈত্যেত্যুহরৎ ॥ ২৪

—দ্রোণ পর্ব, অধ্যায় ৫২, শ্লোক ২৪

(ই) বনপর্বে রামকথার বর্ণনা তিন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুই জায়গায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত, কিন্তু তৃতীয় রামকথা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম রামকথাটি লোমশ মুনি-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ভৃগুতীর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। লোমশ মুনি ভৃগুরাম বা পরশুরাম ও রামের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ভগবান বিষ্ণু রাবণ বধের জন্য ধরাতলে দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছেন এই কথা শুনে পরশুরাম নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে রামকে দেখতে অযোধ্যায় আসেন। পরশুরাম তাঁর রাজ্যে এসেছেন শুনে মহারাজ দশরথ রামকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। রাম পরশুরামের সম্মুখীন হলে পরশুরাম রামকে একটি ধনুক দিয়ে তাতে জ্যারোপণ করতে বললেন। রাম ধনুতে জ্যারোপণ করলে পরশুরাম রামকে একটা শর দিয়ে, শরটিকে কর্ণদেশ পর্যন্ত আকর্ষণ করতে বললেন। রাম তখন পরশুরামকে বললেন, 'হে ভার্গব ! তুমি অতিশয় দর্পপূর্ণ। তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি, তুমি আমার প্রকৃত রূপ দেখ।' রামের মধ্যে পরশুরামের বিশ্বরূপ দর্শন হল, যেভাবে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছিল। তারপর রাম পরশুরাম-প্রদত্ত বাণ পরিত্যাগ করলেন। রাম পরিত্যক্ত বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করে তাঁর তেজ হরণ করে জ্বলতে জ্বলতে পুনরায় রাম-সমীপে সমাগত হল। পরশুরাম তখন রামচরণে প্রণিপাত করলেন এবং রামের আদেশানুসারে ভয় ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে মহেন্দ্র

পর্বতে বাস করতে লাগলেন। পরশুরাম এই ভৃগুতীর্থে স্নান করে তাঁর পূর্বতেজ ফিরে পেয়েছিলেন।

রাম-পরশুরামের বৃত্তান্ত বাল্মীকির রামায়ণের বৃত্তান্ত থেকে অনেকাংশে তফাত দেখতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে পরশুরামের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হয়েছিল রামের মিথিলা থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে। কিন্তু এখানে দু-জনের সাক্ষাৎ হয় অযোধ্যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে রাম-কর্তৃক পরশুরামের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা নেই, কিন্তু এখানে আছে। তারপর রাম-কর্তৃক পরশুরামের তেজহরণ, পরশুরামের মহেন্দ্র পর্বতে যাত্রা ও ভৃগুতীর্থে স্নান করে পূর্বতেজ ফিরে পাওয়া—বাল্মীকি-রামায়ণে এইসব ঘটনার উল্লেখ নেই।

বনপর্বে দ্বিতীয় রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায়, ভীম-হনুমান সংবাদে। দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীম পদ্ম আনতে গিয়ে দেখেন এক ভীষণ দর্শন হনুমান লাঙ্গুল দিয়ে তার পথরোধ করে আছে। ভীম চেষ্টা করেও যখন হনুমানের লাঙ্গুল সরাতে পারলেন না তখন হনুমানের শরণাপন্ন হয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হনুমান নিজের পরিচয় দিয়ে কিভাবে সীতাহরণ হয়েছিল, কিভাবে সুগ্রীব-রাম মৈত্রী হয়েছিল, কিভাবে হনুমান লঙ্কা দহন করেছিল, কিভাবে রাবণ রাম-দ্বারা নিহত হয়েছিল—এইসব কাহিনী ভীমকে বলে পরিশেষে রামের দশ সহস্র ও দশ শতবর্ষ রাজ্য শাসন ও পরে রামের স্বর্গারোহণ-কথা ভীমকে জানায়।

বনপর্বে রামোপাখ্যান প্রসঙ্গে তৃতীয় রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয়-যুধিষ্ঠির সংবাদে। জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদী অপহৃত হলে পাণ্ডবেরা জয়দ্রথকে পরাজিত করে দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। এই ঘটনায় যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—'দ্রৌপদী কোনও পাপ ও নিন্দিত কর্ম করেনি তথাপি সে অপহৃত হল কেন? এইজন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। আমার মতো হতভাগ্য আর কে আছে?' মার্কণ্ডেয় তখন রামকাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন যে, রাম সেই ব্যক্তি যাঁর পত্নী বিনা দোষে অপহৃতা হয়েছিলেন। এই রাম কাহিনী (২৭৫-৯২) আঠারো অধ্যায়ে বর্ণিত।

প্রথম অধ্যায়ে রাম-রাবণ জন্মবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ তপস্যা, রাবণাদির বর লাভ ও রাবণের প্রতি কুবেরের শাপ; তৃতীয় অধ্যায়ে রাবণ-বধার্থ দেবগণের মর্ত্যে জন্ম ও বানরাদির উৎপত্তি; চতুর্থ অধ্যায়ে রামের বনগমন, দণ্ডকারণ্যে বাস ও শূর্পণখার নাসিকাকর্তন; পঞ্চম অধ্যায়ে মারীচের স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ ও সীতাহরণ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রামলক্ষ্মণ-কর্তৃক কবন্ধ বধ ও রামের প্রতি শাপমুক্ত বিশ্বাবসুর উপদেশ; সপ্তম অধ্যায়ে বালীবধ, অশোকবনে সীতার বাস ও

ত্রিজটার সীতাকে সান্ত্বনা দান, অষ্টম অধ্যায়ে সীতা-রাবণ সংবাদ। নবম অধ্যায়ে সীতার সন্ধানে হনুমানের লঙ্কাগমন ও সীতার অভিজ্ঞান সহ প্রত্যাগমন, দশম অধ্যায়ে সেতু বন্ধন, একাদশ অধ্যায়ে রামের লঙ্কা প্রবেশ, দ্বাদশ অধ্যায়ে রাম-রাবণ যুদ্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, চতুর্দশ অধ্যায়ে কুম্ভকর্ণ বধ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা। ষোড়শ অধ্যায়ে ইন্দ্রজিৎ বধ। সপ্তদশ অধ্যায়ে রাবণ বধ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে রামের রাজ্যাভিষেক। রাম-কাহিনী শেষ করে মার্কণ্ডেয় বললেন—'মহাবাহু যুধিষ্ঠির, এইরূপ অমিততেজা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও পুরাকালে বনবাসকষ্ট ও সীতাহরণজনিত মহাসংকট প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দুঃখ কোরো না।'

মার্কণ্ডেয় উবাচ—'এবমেতন্মহাবাহো রামেনামিততেজসা প্রাপ্তং
ব্যসন মত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা।
মা শুচ পুরুষ ব্যাঘ্রক্ষত্রিয়োঽপি পরন্তপ॥

—অধ্যায় ২৯২। ১

বনপর্বে বর্ণিত রামকাহিনীর রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন :

১. পুত্রলাভের জন্য দশরথের যজ্ঞের কোনো উল্লেখ নেই। সীতা জনকের কন্যা, লঙ্কেশ্বর কুবের পিতা বিশ্রবার পরিচর্যার জন্য তিন জন রাক্ষসীকে পাঠিয়েছিলেন। সেই রাক্ষসীদের গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সন্তান হয়—পুষ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর গর্ভে বিভীষণ।

২. রাবণ তপস্যায় বরলাভ করে কুবেরকে পরাস্ত করে, লঙ্কা থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয় এবং তার কাছ থেকে পুষ্পক রথ কেড়ে নেয়। রাবণ স্বয়ং লঙ্কার অধীশ্বর হয়। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে চলে যায়। ধর্মাত্মা বিভীষণও তার অনুসরণ করে, কুবের তাকে যক্ষ ও রাক্ষসদের সেনাপতি করে। কুবের রাবণকে শাপ দেয়—যে পুষ্পক রথ সে কেড়ে নিয়েছে সেই পুষ্পক রথ রাবণকে বহন করবে না। যিনি সমরে তাকে বধ করবেন রথ সেই মহাবীরকে বহন করবে।

৩. রাবণের উৎপীড়নে কাতর হয়ে ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ অগ্নিকে অগ্রবর্তী করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা বললেন যে, রাবণ নিধনের জন্য বিষ্ণু ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মার উপদেশে ইন্দ্রাদি দেবগণ বানরীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দুন্দুভি নামে এক গন্ধর্বী মন্থরা নামে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করলেন।

৪. কৈকেয়ী দশরথের নিকট দুটি নয়, একটি বর চেয়েছিলেন। দশরথের নিকট বর প্রার্থনার সময় কৈকেয়ী ক্রোধাগারেও যাননি বা তাঁর মুক্তাহার এবং অন্যান্য অলংকার খুলে ফেলেননি। বরং সমস্ত অলংকার-পরিহিত অবস্থায় দশরথের সঙ্গে গোপনে দেখা করে হাসতে হাসতে মিষ্টি কথায় বর চেয়েছিলেন।

৫. কবন্ধ বধের পর এক তেজস্বী দিব্যদর্শন গন্ধর্ব বিশ্বাবসু তার দেহ থেকে নির্গত হয়। বিশ্বাবসু ব্রাহ্মণের শাপে রাক্ষস হয়েছিল। সীতা উদ্ধারের জন্য সে রামকে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে বলে।

৬. ইন্দ্রজিতের শরাঘাতে রাম লক্ষ্মণ দু-জনেই মূর্ছা গিয়েছিলেন। সুষেণ দিব্যমন্ত্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যা দ্বারা তাঁদের সুস্থ করে।

৭. সীতার অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ নেই।

কাহিনীগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কোনো কাহিনীতেই রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের বর্ণনা নেই।

মহাভারতের যে-কয়টি স্থলে রামকথা পাওয়া যায় তার মধ্যে শান্তিপর্বে এবং দ্রোণপর্বে যুধিষ্ঠিরকে অভিমন্যু বধের পর সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং বনপর্বের এক স্থলে জয়দ্রথ-কর্তৃক দ্রৌপদী হরণের জন্য শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রামকথা বিবৃত হয়েছে। বনপর্বে অপর দুটি স্থানে যে রামকথা বিবৃত হয়েছে সেখানে কেবল রামের ঈশ্বরীয় মহিমা প্রচারের জন্য। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে মহাভারতে উল্লিখিত রামকথা বিশেষ কারণে বর্ণিত হয়েছে। তাই আমরা এখানে রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাই না, রামায়ণের ঘটনাবলীর বিন্যাসও এখানে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

খ. হরিবংশ[১] —হরিবংশকে মহাভারতের খিল পর্ব বলে অভিহিত করা হয়। যেমন রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাক্ষস ও বানরের বংশাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন হরিবংশ ও বিভিন্ন উপকথা, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিবরণ দিয়ে মহাভারতের বিষয়বস্তুর জন্য অতি প্রয়োজনীয় তথ্য দান করে।

হরিবংশের তিন জায়গায় রামকথার বিবরণ অতি সংক্ষেপে পাওয়া যায়। প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হরিবংশ পর্বে ৪১ অধ্যায়ে জনমেজয় দ্বারা দশাবতার বর্ণনায়। "রাম বনে চতুর্দশ বৎসর তপস্যা করে জনস্থানে থেকে দেবতাদের দৈব কার্য করেছিলেন। বিভু রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে ভীমপরাক্রম শাপগ্রস্ত রাক্ষস ও গন্ধর্ব বিরাধ ও কবন্ধকে নিহত করেন। সুগ্রীবের জন্য তিনি

১ পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

মহাবলশালী বালীকে যুদ্ধে নিহত এবং সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন। সমস্ত দেব, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব ও নাগদের অবধ্য, যুদ্ধে দুর্জয় রাক্ষসরাজ রাবণকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করে বধ করেছিলেন।"

"চতুর্দশ তপস্ তপস্বা বনে বর্ষাণি রাঘবঃ
জনস্থানে বসন্ কার্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ। ১৩০
সীতায়াঃ পদসন্ধিচ্ছন্ লক্ষ্মণানুচরো বিভুঃ।
বিরাধং চ কবন্ধং চ রাক্ষসৌ ভীমবিক্রমৌ।
জঘান পুরুষব্যাঘ্রৌ গন্ধর্বৌশাপবীক্ষিতৌ॥ ১৩১
সুগ্রীবস্য কৃতে যেন বানরেন্দ্র মহাবলঃ।
বালী বিনিহতো যুদ্ধে সুগ্রীবশ্চাভিষেচিতঃ॥ ১৩৩
দেবাসুরগণানাং হি-যক্ষচান্ধর্বভাগিনাম্।
অবধ্যং রাক্ষাসেন্দ্রং তং রাবণং যুধিদুর্জনম্॥" ১৩৪

—হরিবংশপর্ব, ১৪১, ১৩০-১৩১, ১৩৩-১৩৪

এই রামকথায় বাল্মীকি-রামায়ণের মতো তাড়কার উল্লেখ নেই। সীতার বিবাহের এবং রাবণ-কর্তৃক সীতা হরণেরও উল্লেখ নেই। হরিবংশে দ্বিতীয় রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায় নারদের মথুরা নগরীর উৎপত্তি বর্ণনায়। এখানের বাল্মীকি-রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত লবণ বধের কাহিনী পাওয়া যায়। নারদ মধুবনের অধিপতি লবণের কাহিনী বর্ণনায় বলছেন যে, রামের অযোধ্যায় রাজ্যশাসনকালে লবণ রামের নিকট রাবণ বধের জন্য কটূক্তি করে এক দূত পাঠায়। লবণ বলে পাঠায় যে, রাম বনে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করছিলেন, তাঁর পক্ষে রাবণ বধ করা একটি ঘৃণ্য কাজ এবং তাও আবার একটি নারীর জন্য। রাম এর উত্তরে বলেন যে, এর যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর শত্রুঘ্ন দেবেন। এরপর শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ কাহিনী এবং ঐ যুদ্ধে লবণের মৃত্যুর কথা বর্ণিত আছে।

বাল্মীকি-রামায়ণেও লবণ বধের কথা বর্ণিত আছে কিন্তু লবণের দূত প্রেরণ বা সংবাদ প্রেরণের প্রসঙ্গ নেই।

হরিবংশে তৃতীয় রামকথা বর্ণিত আছে 'বিষ্ণুপর্ব' অধ্যায়ে। বিখ্যাত নট ভদ্রনাম বাসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে দ্বারকায় যায়। তাঁকে দেখে দ্বারকাবাসীরা উৎফুল্ল হয়, সেখানে ভদ্রনামের পরিচালনায় রামায়ণের বালকাণ্ডের ঘটনা মঞ্চস্থ করা হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, লোমপাদ-শান্তার ঘটনা এবং রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের বাল্যকালের ঘটনা এই নাটকের বিষয়বস্তু ছিল।

"ততঃ স ননৃতে তত্র বরদত্তো নটস্তথা।
স্বপুরে পুরবাসীনাং পরং হর্ষং সমাদবৎ ॥ ৫
রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্।
জন্ম বিষ্ণো রমেয়স্য রাক্ষৎসন্দ্র বধেপ্সয়া ॥ ৬
নলোমপাদো দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গং মহামুণিম্।
শান্তামপ্যানয়ামাস গণিকাভিঃ সহানঘ ॥
রামলক্ষ্মণ শত্রুঘ্না ভরতশ্চৈব ভারত।
ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ শান্তা চ তথারূপৈর্নটৈঃ কৃতাঃ ॥" ৮

—বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৯৩, শ্লোক ৫-৮

এই নাটকের কথা শুনে বজ্রপুরের রাজা বজ্রনাভ এই নটকে তাঁর রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেন। নট বজ্রপুরে গিয়ে রাবণ ও রম্ভার ঘটনা নিয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিষয়বস্তু হ'ল— "রম্ভা যখন একবার নলকুবের কাছে অভিসারে যাচ্ছিলেন, পথে রাবণ রম্ভাকে বলপূর্বক বাধা দিয়ে তাঁর প্রতি অশোভন আচরণ করেন। রাবণের এই আচরণের জন্য রম্ভা রাবণকে অভিশাপ দেয়।" বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডেও আমরা এই ঘটনা দেখতে পাই।

"রম্ভা ভি সারং কৈবেরং নাটকং ননৃতুস্ততঃ।
শূরো রাবণরূপেণ রম্ভাবেষং মনোবতী ॥ ২৮
নলকুবরস্তু প্রদ্যুম্নঃ শাম্বস্তস্য বিদূষকঃ।
কৈলাসো কৃপিতশ্চাপি মায়য়া যদুনন্দনৈঃ ॥ ২৯
শাপশ্চ দত্তঃ ক্রুদ্ধেন রাবণ্যস্য দুরাত্মনঃ।
নলকুবেরেণ চ যথা রম্ভা চাপ্যথ সান্ত্বিতা ॥" ৩০

—বিষ্ণুপর্ব, অধ্যায় ৯৩, শ্লোক ২৮-৩০

গ. পুরাণ

(অ) ব্রহ্মপুরাণ (পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) ব্রহ্মপুরাণে অন্ততপক্ষে পাঁচ জায়গায় রামকথার বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম, ২১৩ অধ্যায়ে দশাবতার বর্ণনে রাম অবতার কথা পাওয়া যায়। রাম এখানে বিষ্ণুর অবতার। মাত্র কয়েকটি শ্লোকে রামকথা বর্ণিত এবং শেষে বলা হয়েছে— 'সেই বিভু, বিষ্ণু, ইক্ষাকুকুলনন্দন রামরূপে রাবণকে সদলবলে হনন্ করে স্বর্গারোহণ করেন'—

এবমেব মহাবাহুরিক্ষাকুকুলনন্দনঃ।
রাবণাং সগণংহত্বা দিবমাচক্রমে বিভুঃ ॥ ১৫৮

দ্বিতীয়, ১৭৬ অধ্যায়ে অনন্ত বাসুদেব নিরূপণ প্রসঙ্গে রামচরিত বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহিনী অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাত্র ১৫টি শ্লোকে (৩৭-৫১) রামকথা বর্ণিত। মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা রামকথা বর্ণনা করছেন। সেই ক্রূর রাক্ষস রাবণ দেব, গন্ধর্ব, কিন্নর, লোকপাল সকলকে সমরে জয় করে তাঁদের অঙ্গনা সমুদয় অপহরণ করে। তারপর সে সীতার রূপে মোহিত হয়ে মৃগ ছলনায় সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে আসে। তাতে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে সৌমিত্রীসহ রাবণ-বধার্থে গিয়ে প্রথমে বালীকে বধ করেন। পরে সুগ্রীবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে বানরসেনাসহ সমুদ্র পার হন। অনন্তর রাম ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, প্রভৃতি রাক্ষস-দের বধ করে শেষে রাবণকে বধ করেন। পরে বৈদেহীকে অগ্নিতে শুদ্ধ করে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করেন। তারপর পুষ্পকরথে চড়ে মিত্র ও বৈদেহী-সহ অযোধ্যায় আসেন। "সেই রাঘব, সেখানে স্নেহভরে ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়ে সেই পুরাতনী নিজ বাসুদেব মূর্ত্তির আরাধনা করে দশসহস্র বৎসর মেদিনী ভোগান্তে রাজ্যবাসী জনগণসহ পরম দুর্লভ বৈষ্ণবপদে প্রবেশ করেন।"

"কনিষ্ঠং ভরতং স্নেহাচ্ছত্রুঘ্নাং ভক্তবৎসলঃ।
অভিষিচ্য তদা রামঃ সর্ব্বরাজ্যেঽধিরাজবৎ ॥ ৪৮
পুরাতনীং স্বমূর্ত্তিঞ্চ সমারাধ্য ততোহরিঃ ॥
দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষশতানিচ ॥ ৪৯
ভুক্তা সাগর পর্য্যন্তং মেদিনীং সতু রাঘবঃ।
রাজ্যমাদায় স্বগতিং বৈষ্ণবং পদমাবিশৎ ॥" ৫০

তৃতীয়, ১২৩ অধ্যায়ে রামতীর্থ বর্ণনায় রামকথা বিবৃত আছে। রাজা দশরথ দেবদৈত্য যুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করেন। এই যুদ্ধে কৈকেয়ী রাজাকে সাহায্য করায় রাজা তাঁকে তিনটি বর প্রদান করেন। কৈকেয়ী বরগুলি আপাতত না নিয়ে রাজার নিকট গচ্ছিত রাখেন। শ্রবণ নামে চক্ষুকর্ণহীন বৃদ্ধ তাঁর বালক পুত্রকে জল আনতে পাঠান। রাজা হস্তী জলপান করছে মনে করে তাকে শরবিদ্ধ করেন। রাজা অভিশপ্ত হন। পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তখন আকাশবাণী হয় রাজার শরীর পূত হয়েছে, তাঁর পুত্র জন্মিবে। রাজার চার পুত্র জন্ম নিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামের রাজ্যাভিষেকের সময় কৈকেয়ী

বর চাইলেন। রাম বনে গেলেন। মৃত দশরথ নরকে পতিত হল। রাম গৌতমী নদীর তীরে গিয়ে শ্রাদ্ধ করলেন। রাজা নরক হতে উদ্ধার প্রাপ্ত হলেন। সেই স্থানের নাম হল রামতীর্থ।

এখানে রামায়ণ-বহির্ভূত তিনটি বিশেষত্ব দেখতে পাই। প্রথম, কৈকেয়ী দুটি নয়, তিনটি বর পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়, রাজা অন্ধমুনির পুত্র বধ করেন নি, শ্রবণ মুনিব পুত্র বধ করেছিলেন। তৃতীয়, রাম এখানে মানুষ নয় বিষ্ণুর অবতার।

চতুর্থ, ৯৭ অধ্যায়ে পৌলস্ত্যতীর্থবর্ণনে রাবণের বংশ-পরিচয় ও রাবণ-কুবেরের যুদ্ধের বিবরণ আছে। রাবণের বংশ-পরিচয় ও কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধ বাল্মীকি-রামায়ণের মতো। এর পরের ঘটনার বিবরণ রামায়ণ-বহির্ভূত। রাবণ কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর পুষ্পক বিমান ও লঙ্কা রাজ্য জয় করে এবং ঘোষণা করে, "যে আমার ভ্রাতাকে আশ্রয় দেবে সে আমার বধ্য হবে। ধনদ এইরূপে রাবণ-কর্তৃক বিদূরিত হয়ে কুত্রাপি আশ্রয় পেলেন না। তখন তিনি পিতামহ পুলস্ত্যের সমীপে গিয়ে নমস্কার পূর্বক বললেন, আমাব দুর্বৃত্ত ভ্রাতা-কর্তৃক আমি বিতাড়িত হয়েছি। এখন কি করি বলুন? আমার যা আশ্রয় হতে পাবে এমন দৈব বা তীর্থ কি আছে?"

"রাবণো ঘোষয়ামাস ত্রিলোক্য সচারচবে।
যো দস্থাদাশ্রয়ং ভ্রাতুঃ সচ বধ্যো ভবেন্মম্॥
ভ্রাতা নিরস্তো বৈশ্রবনো নৈব প্রাপাশ্রয়ং কচিৎ।
পিতামহং পুলস্ত্যঃ তংগত্বা নত্বা ব্রবীদ্বচঃ॥ ১৩

ধনদ উবাচ
ভ্রাতা নিরস্তো দৃষ্টেন কিং করোমি বদস্বমে।
আশ্রয় শরণং যৎ স্যাদ্দৈবং বা তীর্থ মে বচ॥" ১৪

পুলস্ত্য তাকে গৌতম গঙ্গায় গিয়ে মহাদেবীর তপস্যা করতে বললেন। কুবের সেখানে তপস্যা করে দিক্‌পালত্ব, ধনপতিত্ব ও অপার দানশীলত্ব প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে এই তীর্থ পৌলস্ত্য তীর্থ নামে খ্যাত হ'ল।

পঞ্চম, ১৫৪ অধ্যায়ে সহস্রকুণ্ড মাহাত্ম্য বর্ণনায় সীতার প্রতি দোষারোপ ও শুদ্ধির বর্ণনা আছে। এই কুণ্ডের মাহাত্ম্য এই যে এই কুণ্ডের স্মরণ মাত্রই নর সুখী হতে পারে। এখানে রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের বর্ণনা আছে। অগ্নিপরীক্ষার পর রাম সীতাকে বললেন, 'বৈদেহী, এখন তুমি শুদ্ধা! অতএব মদীয় অঙ্গে আরোহণ কর।'

এহি বৈদেহী শুদ্ধাসি অঙ্কমারোঢ়ুমর্হসি' ॥ ৪

অঙ্গদ ও হনুমান তখন আপত্তি করে বলে, "না বৈদেহী, সুহৃজ্জন সহ অযোধ্যায় গিয়ে ভ্রাতা, মাতা ও অন্যান্য জনগণের সাক্ষাতে পুনরায় শুদ্ধি লাভান্তে শুদ্ধা রাজকন্যা আপনি সুপুণ্য দিনে পতির অঙ্গে আরোহণ করবেন।"

"নেত্যু বাচতদা শ্রীমানঙ্গদো হনুমাংস্ত বা ৫
অযোধ্যায়ান্ত বৈদেহি, সার্দ্ধং যামঃ সহৃজ্জনৈঃ।
অত্রশুদ্ধিমবাপ্যাথ পুনর্ভ্রাতৃষুমাতৃষু ॥ ৬
লৌকিকেষ্বপি পশ্যাৎসু ততঃ শুদ্ধা নৃপাত্মজা।
অযোধ্যায়াং সুপুণ্যেঽহ্নি অঙ্কামারোঢ়মর্হসি ॥" ৭

তখন লক্ষ্মণ, বিভীষণ প্রভৃতির কথায় এবং দেবতাদের 'স্বস্তি' শব্দ উচ্চারণে সীতা রামচন্দ্রের অঙ্গে আরোহণ করে পুষ্পক রথে চড়ে অযোধ্যায় আসেন। এরপর সীতার লোকাপবাদ ও সীতার বনবাস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে লবকুশের জন্ম হয়। রাজসভায় লবকুশের রামায়ণ গান শুনে রাম নিজের পুত্রদের চিনতে পেরে তাদের গ্রহণ করেন। তাদের রাজ্যাভিষেকের সময় সীতাকে দেখতে না পেয়ে অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে 'সীতা কোথায়?' দ্বারপাল এর উত্তরে বলে যে রামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করেছেন। সবাই তখন গৌতমী নদীতটে গিয়ে সীতাকে বারবার স্মরণ করতে থাকে। রামও তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন। রাম তখন সহস্রপরিজন পরিবৃত হয়ে সেই গৌতমীতে শিবের আরাধনা করতে থাকেন। এবং তারা সর্ব পরিতাপ পরিহার করেন। এই ঘটনা যে স্থানে ঘটেছিল তা 'সহস্রকুণ্ড' নামে খ্যাত হয়।

২. পদ্মপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা ১৩১০-১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)

(অ) পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে যে রামকাহিনী পাওয়া যায় তার আরম্ভ রাবণ বধের পর রামের লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তন ও রামের রাজ্যাভিষেকের পর। অগস্ত্যমুনির সঙ্গে কথোপকথনে অগস্ত্য রামকে বলছেন, 'হে মহারাজ আপনি সেই ভগবান বিষ্ণু, দেবাদিদেব নারায়ণ। দেবতাদের দুঃখ দূর করার জন্যে মূর্তিমান হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।'

"যো হসৌ বিষ্ণুর্মহাদেবো দেবানাং দুঃখনাশন।
সত্যমেব মহারাজ ভগবানকৃত বিগ্রহঃ॥" ৭৪

রাম-অগস্ত্য কথপোকথনে অগস্ত্য রাবণের বংশ-পরিচয় বর্ণনা করেন। এখানে বিশ্রবের মন্দাকিনী ও কৈকেসী নামে দুই পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দাকিনীর কুবের নামে এক পুত্র ও কৈকেসীর রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্রের উল্লেখ আছে। এর পর কুবের-রাবণদ্বন্দ্ব ও রাবণ-কর্তৃক কুবেরের পুষ্পক বিমান ও লঙ্কা রাজ্যলাভ বাল্মীকি-রামায়ণের মতোই বর্ণিত।

এরপর অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা। রাবণ বধের জন্য রাম কাতর হলে এবং এই পাপ মোচনের জন্য উপায় অগস্ত্যের কাছে জানতে চাইলে, অগস্ত্য রামকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করা স্থির হলে, অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হয় এবং যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার ভার শত্রুঘ্ন ও ভরতের পুত্র পুষ্কলকে দেওয়া হয়। আবার এদের রক্ষার ভার রাম হনুমান ও জাম্ববানকে দেন।

৩৩ অধ্যায়ে রাবণ মিত্র বিদ্যুন্মালী দ্বারা যজ্ঞের অশ্ব ধরে পাতালে নিয়ে যাবার কথা আছে, এবং ৩৪ অধ্যায়ে শত্রুঘ্ন-কর্তৃক যজ্ঞ অশ্ব উদ্ধারের কথা বর্ণিত আছে।

৫৪ অধ্যায়ে যজ্ঞ অশ্ব বাল্মীকি আশ্রমের নিকটে গেলে লব-কর্তৃক যজ্ঞ অশ্ব ধরার কথা বর্ণিত আছে। এখানে সীতার বনগমনের কারণ এবং বাল্মীকি আশ্রমে সীতার লব কুশ নামে দুইটি পুত্রের জন্মের কথা আছে। সীতাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে রামের নিন্দা রাম এক রজকের কাছে শোনেন। এই সীতা অপবাদের কথা রাম প্রথমে ভরতকে বলেন এবং এই অপবাদের জন্য রাম সীতাকে নির্বাসিত করেন।

৫৭ অধ্যায়ে সীতার বনবাসে এক অভিনব কারণ বর্ণিত আছে যা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। জনকের গৃহে সীতা একবার এক শুক দম্পতির মুখে রামের কথা শুনে পরিচারিকাকে তাঁর কাছে ঐ দম্পতিকে নিয়ে আসতে বলেন। শুক দম্পতি সীতার কাছে এসে তাঁকে রাম কাহিনী শোনায়। এরপর স্ত্রী শুকের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সীতা তাকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। স্ত্রী শুকটি ঐ সময়ে গর্ভবতী ছিল। স্ত্রী শুক তখন দুঃখে, ক্রোধে মারা যায়, এবং মারা যাবার আগে সীতাকে অভিশাপ দিয়ে যায় যে তিনিও গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী-পরিত্যক্তা হবেন। পুরুষ শুকটি নদীতে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। সেই পুরুষ শুকটি পরজন্মে অযোধ্যায় রজক হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এদিকে যজ্ঞ অশ্ব নিয়ে লবের সঙ্গে শত্রুঘ্নর যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে লব মূর্ছা যায়।

এই সময়ে কুশ উপস্থিত ছিল না। সে অন্যত্র শিব পূজার জন্য গিয়েছিল। কুশ ফিরে এসে শত্রুঘ্নর সঙ্গে যুদ্ধ করে। এবারে কিন্তু যুদ্ধে শত্রুঘ্ন মূর্ছা যায়। সীতা তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ অশ্ব মুক্ত করে দেন (অধ্যায় ৬৪)।

যজ্ঞ অশ্ব নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে অশ্বরক্ষকরা রামকে বাল্মীকি আশ্রমে সীতার আবাস ও তাঁর দুই পুত্রের কথা জানান। এদিকে লবকুশ রামায়ণ গান শোনাতে বরুণের আবাসে উপস্থিত হয়েছে। বরুণ বাল্মীকির মাধ্যমে রামের নিকট সংবাদ পাঠান তিনি যেন সীতা এবং তাঁর দুই পুত্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন (অধ্যায় ৬৬)।

রাম তখন লক্ষ্মণকে সীতা ও তাঁর দুই পুত্রকে ফিরিয়ে আনতে পাঠান। বাল্মীকি ও সীতা ঠিক করেন তাঁরা লবকুশকে অযোধ্যায় রামায়ণ গান শোনাতে পাঠাবেন। রামায়ণ গান শুনে রাম পুনরায় সীতাকে ফিরিয়ে আনতে লক্ষ্মণকে পাঠান। সীতা অযোধ্যায় ফিরে যান এবং মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর ১০০ অধ্যায়ে নূতন করে রামকাহিনী সূত বাষিদের শোনান।

একদিন শিব ব্রাহ্মণের বেশে পার্বতীসহ অযোধ্যায় গিয়ে সরযূর তীরে থাকেন রামকে দেখার জন্য। বশিষ্ঠ এই কথা রামকে বললে, রাম তাঁদের প্রাসাদে নিয়ে আসেন। রাম শিবের কাছে লিঙ্গপূজাবিধি এবং ধর্মের অন্যান্য অনুশাসনগুলি জানতে চান। শিব যখন আলোচনা শুরু কবতে যান এমন সময় এক দূত এক চিঠি নিয়ে রামের কাছে আসেন। চিঠিতে বিভীষণ জানাচ্ছে যে কতকগুলি অনার্য রামেশ্বরে রাম-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ সহ্য করতে পারছে না। বিভীষণ তার প্রতিকার করতে গিয়ে তাদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আলোচনা শেষে শিব রামকে বললেন, 'চিন্তা নেই, বিভীষণ শীঘ্রই মুক্তি পাবে।' রাম বিভীষণের মুক্তির জন্য যান। কতকগুলি ব্রাহ্মণের কাছে রাম জানতে পারেন যে বিভীষণ অজ্ঞাতে তপস্যারত এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছে। সেই পাপে সে পাতালে একস্থানে বন্দী হয়ে আছে। রাম বিভীষণকে মুক্ত কবেন এবং বিভীষণ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ নেই।

১১২ অধ্যায়ে দশরথের পুত্রলাভের কথা বিবৃত আছে। রাম একদিন গৌতমী নদীতটে বানর অনুচরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে জাম্ববানের নিকটে সে যেভাবে নারদের কাছে রামকাহিনী শুনেছে তার বিবরণ দিতে বলেন। জাম্ববান বিবরণ দিতে গিয়ে বলে যে, রাজা দশরথ একবার রাজা সাধ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করতে গিয়ে রাজার একটি পুত্রকে দেখে অভিভূত হন এবং মনে মনে ঐরূপ পুত্রের কামনা করেন। সাধ্য তা জানতে পেরে রাজাকে শিব ও বিষ্ণুর পূজা করতে বলেন এবং

একাদশী ব্রত পালন করতে বলেন। রাজা অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে অন্যান্য ব্রতের সঙ্গে পুত্রেষ্টি যজ্ঞও করেন। তার ফলে রাজার চার পুত্র জন্মে। এখানে দশরথের চার রানী, চারপুত্রের কথা উল্লেখ আছে। কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা ও সুবেষার যথাক্রমে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে পুত্র জন্মে। এই কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত।

রাম-সীতার বিবাহের বর্ণনাও এখানে বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে ভিন্ন। রাজা বিদেহ তাঁর কন্যা বৈদেহীকে যজ্ঞাগ্নি থেকে লাভ করেন এবং মনে মনে রামের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার কথা চিন্তা করেন। রাজা বিদেহ শিব পূজা করার সময়ে শিব রাজার কাছে এসে তাঁর ধনু রাজাকে প্রদান করে বলেন, এই ধনুতে ছিলা পরাতে কেবলমাত্র রাম সফলকাম হবে। সেই রামের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে শিব রাজাকে উপদেশ দিয়ে যান। দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাক্ষসেরা এবং বিভিন্ন রাজন্যবর্গ সীতার স্বয়ম্বর সভায় এসে ধনুতে ছিলা পরাতে অসমর্থ হল। এমন-কি বিশ্বামিত্রও ধনুতে ছিলা পরাতে এসে সফলকাম হননি। রাম কেবলমাত্র সফল-কাম হলে রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়।

এরপর রামের বনগমন, সীতাহরণ, রাবণ এবং তার অনুচরদের বধ করে সীতা উদ্ধার এবং পরিশেষে অযোধ্যায় ফিরে এসে রামের রাজ্যাভিষেক বাল্মীকি-রামায়ণের মতোই বিবৃত। এখানে বাল্মীকির সঙ্গে অমিলের মধ্যে দেখি, বিভীষণ রামকে রাবণের শরীরের একটি বিশেষ অংশকে চিহ্নিত করে দিয়ে বলেছিল কেবল ঐ অংশে শর নিক্ষেপ করলে রাবণ বধ হবে। রাম সেইভাবেই রাবণ নিধন করেছিলেন। এখানে রাবণ বধের পর কুম্ভকর্ণ নিধনের কথা বর্ণিত আছে।

(আ) পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে বিস্তৃত রামকথা পাওয়া যায় না। কয়েকটি প্রসঙ্গ আছে মাত্র। ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে পুষ্কর তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনায় রাম-কর্তৃক পুষ্করে দশরথের শ্রাদ্ধ করার কথা বর্ণিত আছে। রাম যখন শ্রাদ্ধ করতে আরম্ভ করেন সেই সময় সহসা সীতা অন্তর্হিতা হন। রাম সীতাকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হন। কিছুক্ষণ পরে সীতা এলে রাম সীতাকে তাঁর অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সীতা উত্তর দেন যে তিনি রাজা দশরথকে দেখতে পেয়েছেন। বল্কল-পরিহিতা হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর লজ্জা হল, সেই কারণে তিনি অন্তর্হিতা হয়েছিলেন।

৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে রাম যখন লক্ষ্মণ ও সীতা সহ মার্কণ্ডেয় আশ্রমে বাস করছেন সেই সময়ে একদিন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। লক্ষ্মণ রামকে বলেন যে তিনি আর রামের দাসত্ব করতে চান না। রামের যাবতীয় কার্য সীতা করুক।

সে বরং এখান থেকে অযোধ্যায় ফিরে যাবে। রাম তখন লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁরা ইন্দ্রমার্গা নাম্নী নদীতটে উপস্থিত হন। হঠাৎ রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন, 'লক্ষ্মণ আমার ধনু অর্পণ কর।' সীতা রামকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করছেন?' রাম তখন বললেন "আমি কখনই স্বপ্নেও লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করব না। এই ক্ষেত্রের ফল কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। এক্ষেত্রে জনগণ স্বার্থপর। তাই তারা পরস্পরকে দেখে না, স্বীয় হিতকথা শোনে না। পুত্রগণ পিতার কথায় কর্ণপাত করে না। শিষ্য গুরুর বাক্য এবং গুরু শিষ্যের বাক্য শোনেন না। এস্থলে প্রীতি কেবল অর্থানুবন্ধী।"

"রাঘবস্ত্বব্রবীৎ সীতাং নাহং ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণম্।
ন কদাচিদপি স্বপ্নেলক্ষ্মণস্য মতং প্রিয়ে ॥
শ্রুতপূর্ব্বঞ্চ সুশ্রোণি ক্ষেত্রস্যাস্য বিচেষ্টিতম ॥ ১৭৯
অত্র ক্ষেত্রে জনাঃ সতং সর্ব্বেহি স্বার্থতৎপরাঃ।
পরস্পরং ন পশ্যন্তি সাত্মনশ্চ হিতং বচঃ ॥ ১৮০
নশৃন্বান্তি পিতুঃ পুত্রাঃ পুত্রাণাংপিতরস্তথা
ন শিষ্যাহি গুরোর্বাক্যং শিষ্যস্যাপি তথা গুরুঃ
অর্থানুবন্ধিনী প্রীতির্ন কশ্চিৎ কস্যাচিৎ প্রিয় ॥" ১৮১

এর পর ৩৫ অধ্যায়ে শম্বুক বধ কথা এবং ৩৬-৩৮ অধ্যায়ে রাম-অগস্ত্য সংবাদে রাম ভরতকে নিয়ে যে কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কায় গিয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। ৩৯ অধ্যায়ে রামের বিভীষণকে ধর্মোপদেশ ও রাম-কর্তৃক কান্যকুব্জে বিভীষণ-প্রদত্ত বামন প্রতিষ্ঠা ও ৫১ অধ্যায়ে অহল্যা উদ্ধার কথা বিবৃত আছে।

(ই) উত্তর কাণ্ডে ১০৫ অধ্যায়ে বৃন্দা শাপের কথা পাওয়া যায়। বৃন্দা বিষ্ণুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে শাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর রামাবতারে বিষ্ণুর দুই দ্বারপাল রাক্ষস হয়ে জন্মাবে এবং তারা রামের পত্নীকে হরণ করবে এবং তার ফলে রামকে অসীম দুঃখ ভোগ করতে হবে।

২৩০ অধ্যায়ে অযোধ্যায় এক ব্রাহ্মণ বালকের মৃত্যু এবং তার ফলে শম্বুকবধের কথা বিবৃত আছে।

২৬৯ থেকে ২৭১ অধ্যায়ে রামচরিতের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রারম্ভে রামাবতার কারণ বর্ণন। স্বয়ম্ভূ মনুর তপস্যা; যার ফল স্বরূপ বিষ্ণুর রাম রূপে অবতীর্ণ প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে সাত কাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনাগুলির মধ্যে আছে: ১. রাম আপন মাতাকে

বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ; ২. রাম ও সীতা, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর অবতার ; লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনন্ত, সুদর্শন ও পাঞ্চজন্যর অংশাবতার ; ৩. রাম শূর্পণখাকে বিরূপ করেছিলেন, লক্ষ্মণ নয় ; ৪. সীতার পাতাল প্রবেশের বিবরণে বলা হয়েছে যে সীতা গরুড়ে চড়ে গমন করেছিলেন।

৩. অগ্নিপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

অগ্নিপুরাণে অন্যান্য পুরাণের মতো রামের অবতারত্ব বর্ণিত হয়েছে। 'তুমি বিষ্ণু, তুমি রাক্ষসকুল ধ্বংসের জন্য দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছ।'

'ব্রহ্মণা দশরথেন ত্বং বিষ্ণু রাক্ষসমর্দ্দনঃ'

– দশম অধ্যায়, ২৮

এখানে রামকাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। রামের জন্ম, রামের বনবাস, চিত্রকূট পর্বতে ভরতের পাদুকা গ্রহণ, শূর্পণখার নাসিকা ছেদ, মারীচ বধ, সীতা হরণ, রাম-সুগ্রীব সখ্য, রাবণ বধ ও রামের রাজ্যাভিষেকের বিবরণ পাওয়া যায়। বালী ও গুহকের কোনো উল্লেখ নেই। রামের রাজ্যাভিষেকের পরের ঘটনাবলী অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। সীতাকে লোকাপবাদের ভয়ে নির্বাসন, লবকুশের জন্ম, তাদের মুখে রামনাম শুনে তাদের এনে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা ও পরে মানবদেহ পরিহার করে রামের বৈকুণ্ঠে গমন বর্ণিত হয়েছে।

এখানে রামকাহিনী বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসারে বর্ণিত হলেও রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন :

১. মন্থরার সঙ্গে রামের শত্রুতার কথা এখানে পাওয়া যায়। একবার রাম মন্থরার পা ধরে টেনে দিয়েছিলেন—'পাদৌ গৃহীত্বা রামেন কর্ষিতাঃ সাপরাধতঃ (৬-৮)।' সেই কারণে মন্থরা রামের শত্রু হয়েছিল।

২. বিশ্রবার দুই স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রীর নাম পুষ্পোৎকটা এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম কৈকেসী। কুবের প্রথম স্ত্রীর পুত্র এবং রাবণ দ্বিতীয় স্ত্রীর পুত্র।

৩. যুদ্ধের সময় রাম লক্ষ্মণকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এবং এর ফলে লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিৎ বধের সাহায্য হয়েছিল।

৪. রাম মাল্যবান পর্বতে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করেছিলেন।

৪. ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ

(জীবানন্দ বিদ্যাসাগর -সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৮৮)

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ে বেদবতীর উপাখ্যানে রামকথা আরম্ভ। "ধ্যানরত বেদবতীকে রাবণ বলপূর্বক বিহারে সমুদ্যত হলে, বেদবতী কোপ প্রভাবে তাকে স্তম্ভিত করে শাপ প্রদান করেন 'দুরাত্মা তুই আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হবি।'

"মূর্চ্ছমবাপ কৃপনঃ কামবাণ প্রপীড়িতঃ
তাং করেণ সমাকৃষ্য শৃঙ্গারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৫
সা সতী কোপ দৃষ্টা চ স্তম্ভিতং তঞ্চকারহ
শশাপ চ মদর্থেত্বং বিলক্ষ্যাসি সবান্ধবঃ ॥" ১৬

'সেই সাধ্বী বেদবতী কালান্তরে জনকাত্মজাসীতারূপে সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন এবং তার জন্য রাবণ সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।'

"সা চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা।
সীতা দেবীতি বিখ্যাতা সদর্থে রাবণো হতঃ ॥" ২১

এরপর রামকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত আছে। রাম-সীতার বিবাহ, তাঁদের বনগমন বর্ণিত আছে। 'বনে অগ্নিদেব উপস্থিত হয়ে যোগবলে তুল্যরূপ গুণ সম্পন্ন মায়াসীতা নির্মাণ করে রামচন্দ্রকে প্রদান করেন।'

"বহ্নি যোগেন সীতায়া মায়া সীতাঞ্চ কারহ।
তত্তুল্য গুণ সর্ব্বাংশাং দদৌ রামায় নারদ ॥" ২৮

এই মায়াসীতার উল্লেখ শ্রীমদ্ দেবীভাগবতে পাওয়া যায়। রাবণ সেই মায়া-সীতাকে হরণ করে। অতঃপর সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও রাবণ বধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, আসল সীতা লাভ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত আছে।

৬২ অধ্যায়ে কৃষ্ণজন্ম খণ্ডে অহল্যা উদ্ধার বর্ণন প্রসঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত রামকথা পাওয়া যায়। এখানে শূর্পণখার কুব্জারূপ প্রাপ্তির ঘটনা বিবৃত আছে। শূর্পণখা রাম-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলে শূর্পণখা রামকে অভিশাপ প্রদান করে যে রাম স্ত্রী-বিরহ প্রাপ্ত হবেন। এর পর শূর্পণখা তার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পুষ্করে যায় এবং সেখানে কুব্জারূপ প্রাপ্ত হয়। এছাড়া এই খণ্ডে হনুমানকে রুদ্রের অংশাবতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই খণ্ডের ৫৬ অধ্যায়ে জয়-বিজয়ের তিন জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। জয় ও বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী ছিল। সনক ঋষির শাপে জয়

ও বিজয় হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করে। জয় মারীচ রূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে জয় ও বিজয়কে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করার কথা পাওয়া যায়।

এই পুরাণে রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। এখানে বালী বধ, সেতুবন্ধ ও উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নেই। এখানে রামের অবতারত্ব প্রচারিত হয়েছে। নূতন সংযোজনের মধ্যে মায়াসীতার কথা, সীতাকে জনক-আত্মজা বলে উল্লেখের কথা, শূর্পণখার কুব্জারূপ প্রাপ্তির কথা, হনুমানের রুদ্রের বংশানুরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে।

৫. বিষ্ণুপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ)

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ৪০-৪৫ শ্লোকে রামকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত আছে।

ভগবান পদ্মনাভ ভূমণ্ডল রক্ষার নিমিত্ত নিজ অংশ দ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন রূপে বিভক্ত হয়ে দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেন।

"রাম বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য গিয়ে তাড়কা নামে এক রাক্ষসীকে বিনাশ করে। যজ্ঞস্থলে মারীচ উপস্থিত হলে রাম তাকে শরাঘাতে আহত করে দূরে নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া তিনি সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন। তাঁর দৃষ্টিপাত মাত্র অহল্যার পাপক্ষয় হয়। তারপর তিনি জনক গৃহে উপস্থিত হয়ে অনায়াসে শংকর-শরাসন ভঙ্গ করেন : তাতে তিনি অযোনীসম্ভূতা জনকনন্দিনীকে বীরত্ব রূপ শুল্কদ্বারা লাভ করেন। তিনি সকল ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস-কারী হৈহয় কুলধূমকেতু স্বরূপ পরশুরামের দর্পচূর্ণ করেন। তারপর তিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্যাভিলায পরিত্যাগ করে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সঙ্গে বনগমন করেন। অনন্তর তিনি বিরাধ, খর, দূষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে এবং কবন্ধ ও বালীকে বিনাশ করেছিলেন। পরে তিনি সমুদ্রবন্ধন করে রাক্ষসকুল ধ্বংস করে দশানন কর্তৃক অপহৃতা জানকীকে উদ্ধার করেন। রাম সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা করে গ্রহণ করেন। সীতা অগ্নিতে প্রবেশের ফলে শুদ্ধা হলে দেবগণ তাঁর স্তব করেন। অনন্তর রাম সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন।"

"শ্রীভগবানব্জনাভোজগৎ স্থিতার্থমাত্মাংশেন
রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন রূপিণাচতুর্দ্ধাপুত্রত্বমযাসীৎ ॥ ৪০

রামোঽপি বালএব বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষাণায় গচ্ছন্ তাড়কাংজঘান ॥ ৪১
যজ্ঞেচ মারীচমিষুপাতাহতং দূরং চিক্ষেপ, সুবাহু প্রমুখাংশ্চ
ক্ষয়মনয়ৎ। সন্দর্শন মাত্রেণ এব অহল্যাম পাপাং চকার।
জনক গৃহে চ মহেশ্বরং চাপ মনায়া সেনৈব বভঞ্জ সীতাঞ্চা
যোনিজ্যাং জনকরাজতনয়াং বীর্যশুল্কাং লেভে ॥ ৪২
সকল ক্ষত্র ক্ষয়কারিণম শেষ হৈহয় কুলকেতু, ভূতঞ্চ
পরশুরামমপাস্ত বীর্য্যবলা বলেপং চকার ॥ ৪৩
পিতৃর্বচানাচ্চাগণিতরজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃ
ভার্য্যা সমন্বিতো বনং বিবেশ ॥ ৪৪
বিরাধ খর দূষণাদীন্ কবন্ধবালিনৌ চ জঘান।
বদ্ধাচাম্ভোনিধিম্ অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা
দশাননাপহৃতাং তদ্বধাপহত কলংকামপ্যনল প্রবেশ
শুদ্ধামশেষ দেবেশ সংস্তূয় মানাং সীতাং
জনকরাজতনয়াম যোধ্যামানিন্যে ॥" ৪৫

রামকাহিনী এই পুরাণে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। এখানে রাম বাল্মীকির রামায়ণের মতো মানুষ নন, বিষ্ণুর অবতার। এখানে অপর বৈশিষ্ট্য হল বানরদের উল্লেখ নেই, উত্তরকাণ্ডের বর্ণনা নেই।

৬. ভাগবতপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ)

ভাগবতপুরাণে নবমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ে রামকাহিনীর বর্ণনা আছে। উপাখ্যান অংশে খুবই কম। রামের ভগবৎ সত্তা প্রচারের জন্য রামকাহিনীর অবতারণা, দেবগণের প্রার্থনায় ভগবান হরি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার নামে চার অংশে বিভক্ত হয়ে দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন।

তস্যাপি ভগবানেষ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মোময়ো হরিঃ।
অশাংশেন চতুর্ধাগাৎ পুত্রত্বং প্রার্থিত সুরৈঃ।
রাম-লক্ষণ – ভরত-শত্রুঘ্ন ইতি সংজ্ঞয়াঃ ॥" ৯।১০।২

উত্তরকাণ্ডের মধ্যে আছে- সীতা নির্বাসিতা হয়ে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে লব-

কুশের জন্ম দেন। "আশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত করে পুত্রদ্বয়কে মুনিহস্তে সমর্পণ করে সীতা রামচন্দ্রের চরণদ্বয় চিন্তা করতে করতে পাতালে প্রবেশ করেন।"

"মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্ত্রা বিবাসিতা বয়ন্তী রামচরণো বিবরং প্রবিবেশ"
—৯।১০।১৫

এই পুরাণের রামায়ণ-বহির্ভূত বিশেষত্ব আছে। শূর্পণখার অঙ্গবিকৃতি করেছিলেন রাম, রজকের কারণে সীতা ত্যাগ হয়েছিল; রাম সীতার সঙ্গে অশোকবনে মিলিত হয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই সকলে অযোধ্যায় চলে গিয়েছিলেন; সীতা বাল্মীকির আশ্রমে সন্তান প্রসব করে তাদের ভার মুনিকে দিয়ে পাতাল প্রবেশ করেন।

৭. কূর্মপুরাণ

(আনন্দস্বরূপ গুপ্ত -সম্পাদিত, অল ইণ্ডিয়া কাশীরাজ ট্রাস্ট রামনগর, ১৯৭১)

কূর্ম পুরাণের উত্তর ভাগে ৩০-৩৪ অধ্যায়ে মায়াসীতার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সীতার প্রার্থনায় অগ্নি মায়াসীতার সৃষ্টি করেছিলেন। রাবণ এই মায়াসীতাকে হরণ করেছিল। এই মায়াসীতার কথা রামও জানতেন না। রাবণ বধের পর রামের সন্দেহে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং আসল সীতা বেরিয়ে আসে।

এই পুরাণের পূর্ব ভাগে ২১ অধ্যায়ে সূর্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনাকালে রামকথার বর্ণনা অতি সংক্ষেপে পাওয়া যায়। ঋষিগণের প্রশ্নে সূত অতি সংক্ষেপে রামকাহিনী বর্ণনা করেন। কিন্তু এখানে মারীচ বধ, তাড়কা বধ, বালী বধ, গুহ সংবাদ এবং উত্তরকাণ্ডের বর্ণনা নেই। বিশেষত্বের মধ্যে আছে "সীতা জনকের কন্যা। তিনি রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন।"

"তপতাতোষিতা দেবী জনকেন গিরীন্দ্রজা।
প্রাযচ্ছজ্জানকীং সীতাং রাম সেবাশ্রিতাং পতিম্॥ ২১

অপর বিশেষত্বের মধ্যে আছে যে "রাম সেতু মধ্যে কৃত্তিবাস প্রভু ঈশানের লিঙ্গ স্থাপন করে স্বয়ং তাঁর পূজা করেছিলেন।"

'সেতু মধ্যে মহাদেবমীশানং কৃত্তিবাসসম্।
স্থাপয়মাস লিঙ্গস্থং পূজয়ামাস রাঘবঃ॥ ৪৮

৮. লিঙ্গপুরাণ

(জীবানন্দ বিদ্যাসাগর -সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৮৫

লিঙ্গপুরাণে উপবিভাগে ১৪২-১৪৯ শ্লোকে রাজা অম্বরীষ চরিত বর্ণনাকালে রাম অবতারের বর্ণনা আছে। রাজা অম্বরীষের শ্রীমতী নামে এক কন্যা ছিল। নারদ ও পর্বতমুনি দুজনেই কন্যাকে কামনা করলে অম্বরীষ বলেন, কন্যা যাকে মনোনীত করবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন। কন্যা কিন্তু পূর্বেই নারায়ণকে বরণ করবেন কামনা করেছিলেন তাই স্বয়ংবরের সময় নারায়ণ দুই মুনির মাঝখানে অবতীর্ণ হয়ে কন্যাকে গ্রহণ করেন। নারদ এক বার অম্বরীষের মনে করে তাকে অভিশাপ দেন যে তাকে যেন অন্ধকার রাশি আচ্ছন্ন করে। তখন নারায়ণ ভক্ত অম্বরীষকে রক্ষা করার জন্য তমোরাশিকে আহ্বান করে বলেন অম্বরীষ রাজাকে রক্ষা করার জন্য আমি বরদান করিয়াছি। অতএব তুমি পলায়ন কর। আমি অম্বরীষের প্রপৌত্র দশরথের রাম নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র হব। আমার দক্ষিণ হস্ত ভরত নামে রাজার দ্বিতীয় পুত্র হবে। আমার বাম বাহু শত্রুঘ্ন নামে তৃতীয় পুত্র হবে এবং আমার শয্যাভূত অনন্তদেব লক্ষ্মণ নামে চতুর্থ পুত্র হবে

কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় না বরং অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে এই পুরাণের কাহিনীগত মিল আছে। এখানেও রাম অবতার। সুতরাং বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এর অমিল আছে।

৯. বায়ুপুরাণ

(হরিনারায়ণ আপ্তে -প্রকাশিত, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পুনা, ১৯০৫)

বায়ু পুরাণে রাম-রাবণের কাহিনী দেবতা, অসুর, রাক্ষস, ঋষি, সূর্য এবং চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কাহিনী বর্ণনাকালে বর্ণিত হয়েছে। ৭০ ৩২ অধ্যায়ে রাবণের বংশাবলী বর্ণিত। বিশ্রবার তিন পত্নীর কথা উল্লেখ আছে। তারা হল পুষ্পোৎকটা, রাকা ও কৈকেসী। প্রথম দুজন মাল্যবানের কন্যা এবং তৃতীয় মালিনের কন্যা। কুবের বিশ্রবনের পূর্বভার্যার পুত্র। কৈকেসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পণখা ও বিভীষণের জন্ম। পুষ্পোৎকটার গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, খর ও কুম্ভীনসীর জন্ম এবং রাকার গর্ভে ত্রিশিরা, দূষণ, বিদ্যুৎজিহ্ব এবং অসলিকার জন্ম।

রাবণের অঙ্গের বিবরণে বিশেষত্ব আছে। সাধারণত আমরা রাবণের ১০ মাথা এবং ২০টি হাতের কথা জানি। কালিদাস তাঁর রঘুবংশে বলেছেন যে রাবণের দুই উরু ও দুই বাহুর অধিক ছিল (ভূজ মূর্ব—উরু বাহুল্যাদ একোঽপি ধনদানুজঃ—XII ৮৮) বায়ু পুরাণে (৭০ ৪২) বলা হয়েছে যে রাবণের ১০ মাথা ও ২০ বাহু ছাড়া ৪ পা ছিল এবং কুবেরের ৩ পা ছিল।

৮৮ অধ্যায়ে রাম এবং তাঁর ভ্রাতাদের এবং তাদের পুত্রদের পরিচয় পাওয়া যায়। রাম ও রামরাজ্যের পরিচয় মহাভারতের মতো এই পুরাণে পাওয়া যায়।

১০. গরুড়পুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

এই পুরাণের ১৪২ অধ্যায়ে পূর্বখণ্ডে রামকথা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত আছে। বিভিন্ন বংশের পরিচয় প্রসঙ্গে বিভিন্ন অবতার বর্ণনায় রামকথা প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ৭০ শ্লোকে রামকথার পরিচয় মেলে। এখানে সীতার সতীত্ব এবং এই প্রসঙ্গে আনিমাণ্ডব্য কাহিনী বর্ণিত। পরবর্তী ১৪৩ অধ্যায়ে উত্তরকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে

বিশেষত্বের মধ্যে আছে রাম শম্বুককে নিক্ষেপিত করেছিলেন এবং রাম অযোধ্যায় ফিরে এসে পিণ্ডদান করবার জন্য গয়াতে গিয়েছিলেন।

১১. শিবপুরাণ

পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ কলিকাতা ১৩১৪ বঙ্গাব্দ

শিবপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে রাম অবতারের উচ্চনৈতিক আদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং শিব ও বিষ্ণুর নির্দিষ্ট কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিব ও সতী একদিন ভ্রমণ করতে করতে দণ্ডকারণ্যে এসে রাম ও লক্ষ্মণকে শোকে মুহ্যমান অবস্থায় দেখেন। শিব রামকে চিনতে পারেন এবং বুঝতে পারেন

যে সীতা বিহনে তাঁদের এই অবস্থা হয়েছে এবং তাঁরা সীতার খোঁজে ব্যস্ত আছেন। শিব রামের কাছে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করতে সতী আশ্চর্য হয়ে শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে যখন সমস্ত দেবতা শিবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তবে শিব কেন রামকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন? শিব তখন সতীকে বললেন যে রাম লক্ষ্মণ প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু ও শেষের অবতার। সতী এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হতে শিব তখন রামকে পরীক্ষা করতে বললেন। সতী তখন সীতার ছদ্মবেশ ধারণ করে রামের কাছে আসেন। রাম তা বুঝতে পেরে সতীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁকে শিবের কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন যে কেন তিনি একা এসেছেন? সতী তখন শিবের কথা বুঝতে পারেন এবং রামের মহত্ত্ব তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। এবং সতী রামকে বলেন যে শিব তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান।

পরবর্তী ২৫ অধ্যায়ে রাম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মের কথা বলেন এবং বলেন যে শিবের আজ্ঞা মতে রাম-লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্ন অবতীর্ণ হয়েছেন পৃথিবীকে রক্ষা করতে। রাম তারপর সতীকে তাঁর বনবাসে আসার কারণ, সীতা হরণ প্রভৃতি বর্ণনা করে বলেন যে তাঁরা এখন সীতার খোঁজে এখানে এসেছেন। রাম অতঃপর সতীর কাছে প্রার্থনা জানান যে তাঁর আশীর্বাদে সে যেন সীতার উদ্ধার ও রাক্ষসকুল নিধন করতে পারেন। এই কথা নিবেদন করে রাম সতীর উদ্দেশে প্রণাম জানান।

১২. নারদীয়পুরাণ

(ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস দ্বারা প্রকাশিত, বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বম্বে, ১৯২৩)

নারদীয় পুরাণে ৭৫ অধ্যায়ে লক্ষ্মণ মাহাত্ম্য বর্ণনায় রামকথা বর্ণিত আছে। এখানে রামকথার বিশেষত্ব এই যে এখানে বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে চার ভ্রাতার অবতারের কথা দিয়ে। নারায়ণ—রাম, প্রদ্যুম্ন—ভরত, শত্রুঘ্ন—অনিরুদ্ধ এবং লক্ষ্মণ—সংকর্ষণ বা শিব।

> "চতুর্ব্যূহাবতারে যো দেবঃ সংকর্ষণঃ স্বয়ম্।
> দেবো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ রামো ব্রহ্মাদিবন্দিতঃ॥
> প্রদ্যুম্নো ভরতো ভদ্রে শত্রুঘ্নো হ্যানিরুদ্ধকঃ।
> লক্ষ্মণস্তু মহাভাগো স্বয়ং সংকর্ষণঃ শিবঃ॥" (৩-৫)

১৩. বরাহপুরাণ

(আনন্দ স্বরূপগুপ্ত সম্পাদিত, অল ইণ্ডিয়া কাশীরাজ ট্রাস্ট, রামনগর, ১৯৬৭)

বরাহ পুরাণে রামায়ণের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা পাওয়া যায় মথুরা মাহাত্ম্য বর্ণনায়। ১৬৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে বরাহ মূর্তি ইন্দ্রের নিকটে ছিল। রাবণ যখন ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন সে বরাহকে প্রার্থনা জানায় এবং অনুরোধ করে তাঁকে লঙ্কায় আসার জন্য। কিন্তু বরাহ রাবণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন কারণ রাবণ বৈষ্ণব ছিল না। কিন্তু রাবণ তার প্রতিবাদ করে জানায় যে সেও বৈষ্ণব। তখন বরাহ লঙ্কায় যান। রাম লঙ্কা জয় করে বরাহ মূর্তি অযোধ্যায় নিয়ে আসেন এবং মথুরায় লবণ বধের পর পুরস্কারস্বরূপ মূর্তিটি রাম শত্রুঘ্নকে দান করেন। শত্রুঘ্ন মূর্তিটি মথুরায় স্থাপন করেন।

১৪. নৃসিংহপুরাণ

(উদ্ধবাচার্য -সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, বম্বে ১৯১৯)

এখানে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনে ছয়টি অধ্যায়ে (৪৭-৫২) রামায়ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে ঠিক রামায়ণের মতো তাড়কা নিধন, সীতার স্বয়ংবর, স্বয়ংবর সভায় অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে রামের যুদ্ধে জনকের রামকে সাহায্য দান, রাম-সীতার বিবাহ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, সীতা হরণ, রাবণ বধ, সীতা ত্যাগের নির্দেশ প্রভৃতি বর্ণিত হয় নাই। রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি ঘটনার বিশেষত্ব এইরূপ :

১. রাম শূর্পণখার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, শূর্পণখা রামকে একটি চিঠি দিতে বলেন যাতে লক্ষ্মণ তাকে বিবাহ করেন। রাম লক্ষ্মণকে একটি চিঠি দেন। এই চিঠিতে নির্দেশ ছিল যে লক্ষ্মণ যেন শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করেন। লক্ষ্মণ সে নির্দেশ পালন করেন।

২. এখানে সীতাহরণের ঘটনা অন্যরূপে বর্ণিত। রাবণ ছদ্মবেশে সীতার নিকটে এসে বলে যে ভরত অযোধ্যা থেকে এসেছেন এবং রামের সঙ্গে কথা বলেছেন। হরিণ ধরা পড়েছে। সবাই মিলে অযোধ্যায় যাওয়ার জন্য রথ এসেছে। এই কথা শুনে সীতা রথে ওঠেন। এইভাবে সীতা হরণ হয়।

৩. রামায়ণের অপ্সরা এখানে সুপ্রভা নামে পরিচিত। সুপ্রভা এখানে

বানবদেব বলেন যে তিনি রামকাহিনী ও সীতা হরণ বৃত্তান্ত জানেন। তিনি বানবদেব মহেন্দ্র পর্বতে সম্পাতির নিকট যেতে বলেন এবং হনুমানকে আশীর্বাদ করেন যে সে যেন সীতার খোঁজ পায়।

৪ এই পুরাণে বিভীষণ দ্বারা বিরূপাক্ষ বধের কথা আছে। রামায়ণে সুগ্রীব দ্বারা বিরূপাক্ষ বধ হয়।

৫ রামায়ণে আছে সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর দেবতারা ও ব্রহ্মা সমবেত হয়ে রামের প্রশংসায় একটি স্তোত্র উচ্চারণ করেন। এই পুরাণে আছে দেবতারা ও ব্রহ্মা খুশী হন এবং ব্রহ্মা রাম প্রশংসায় একটি স্তোত্র উচ্চারণ করেন। স্তোত্রটির নাম এখানে অমোঘ স্তোত্র –

'অমোঘং বলবীর্যং অমঘস্তে পরাক্রমঃ।
অমোঘং দর্শনং রাম ন চ মোঘঃ স্তব স্তব॥ ৫২।১১৩

যারা আপনার প্রতি ভক্তিবান তারা অমোঘ, বীর্যবান ও পরাক্রান্ত, হে রামচন্দ্র আপনার দর্শন, আপনার স্তব কখনও ব্যর্থ হয় না।'

৫. বহ্নিপুরাণ

এই পুরাণে বিস্তৃত রামকথা পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণের বালকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ডের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রারম্ভে রামাবতার ও সীতাহরণের কারণ বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভৃগু ও পৃথ্বীর শাপ বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে বধ করলে ভৃগু বিষ্ণুকে অভিশাপ দেন যে তাঁকেও স্ত্রী বিরহে কষ্ট পেতে হবে। একবার ব্রহ্মা ও পৃথ্বীদেবী বিষ্ণুলোকে যান। সেই সময় লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর পার্শ্বে শায়িত ছিলেন। সেই কারণে তিনি ব্রহ্মা ও পৃথ্বীদেবীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারেননি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পৃথ্বীদেবী লক্ষ্মীদেবীকে অভিশাপ দেন যে তাঁকে স্বামী বিরহে অনেক দিন কাল কাটাতে হবে। এর পর রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনায় মধুকৈটভ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাষাণভূতা অহল্যার উদ্ধার ও হনুমানের মূষিক রূপে লঙ্কা প্রবেশের কথাও উল্লিখিত আছে।

১৬. সৌরপুরাণ

। পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ।

এই পুরাণে শৈব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিব ও সূর্যকে এক করে দেখানো হয়েছে। এই পুরাণের ৩০ অধ্যায়ে ৪৮-৬৯ শ্লোকে রামকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দশরথের চার পুত্র, হরধনু ভঙ্গ, রাম-সীতার বিবাহ, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী, সেতুবন্ধ, রাবণ নিধন প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত।

'সংক্ষেপিতঃ প্রোক্তং রামস্যচরিতং ময়া।
ইদং বিস্তরতো বিপ্রাঃ প্রোক্তং বাল্মীকি না পুনঃ॥' ৩০।৬৭

এখানে রামায়ণ-বহির্ভূত বিশেষত্বের মধ্যে আছে কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে রামকে লক্ষ্মণের সঙ্গে বনে পাঠান, জনক গৌরীকে সন্তুষ্ট করে সীতাকে কন্যারূপে পেয়েছিলেন।

১৭. কল্কিপুরাণ

এই পুরাণের তৃতীয় অংশে ২৪-৫৭ শ্লোকে রামকাহিনী বর্ণিত আছে। এই পুরাণের বিশেষত্ব এই যে এখানে রাম-সীতার পূর্বানুরাগ বর্ণিত হয়েছে। অন্য একস্থলে সীতার অশোকবনে রুক্মিনী ব্রত পালন করার কথা আছে, যার ফলস্বরূপ সীতার সঙ্গে রামের মিলন সাধিত হতে পেরেছিল। উত্তরকাণ্ডের মধ্যে আছে যে রাম নিজেই সীতাকে পুনর্বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সীতার পাতাল প্রবেশের উল্লেখ নেই।

১৮. বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ

এই পুরাণে রামায়ণের কিছু কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথম খণ্ডে ১৭৮-২০০ অধ্যায়ে রাক্ষসদের বংশাবলী, রাবণের জন্ম ও মথুরায় লবণের জন্ম এবং শত্রুঘ্ন দ্বারা লবণ বধের কথা পাওয়া যায়।

২০১-১১ অধ্যায়ে গন্ধর্বদের বিরুদ্ধে ভরতের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

২১২ অধ্যায়ে নারদীয় পুরাণের মতো রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন যথাক্রমে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের অবতারের কথা আছে।

২১৮-২৩ অধ্যায়ে পাতালের রাক্ষসদের এবং লঙ্কার রাক্ষসদের বংশাবলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। রাবণ ও তার চার ভ্রাতার জন্ম, কুবের ও পুষ্পক রথের কথা এবং রাবণের যুদ্ধ যাত্রার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

২২১-২৪ অধ্যায়ে রাবণের দিগ্বিজয়ের পথে তার শাপগ্রস্ত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। ইক্ষাকুবংশের রাজা অনরণ্য রাবণ দ্বারা নিহত হলে, রাজা রাবণকে শাপ দিয়ে যান যে তাঁর বংশের কোনো সন্তান দ্বারা সে নিহত হবে। তারপর তপস্যারত কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী শাপের কথা বর্ণিত আছে।

কাহিনী শেষে সীতার পৃথীদেবীকে তাঁর অঙ্কে স্থান দেবার জন্য প্রার্থনা এবং রাম ও রামরাজ্যের গুণাবলীর বর্ণনা বাল্মীকি-রামায়ণের মতোই বর্ণিত আছে।

১৯. আদিপুরাণ

(ভেংকটেশ্বর প্রেস, বম্বে, ১৯০৮)

এই পুরাণে 'নন্দ দৃষ্ট স্বপ্ন বর্ণনা' নামক ১৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণ স্বপ্নে নন্দকে রামকাহিনী বর্ণনা করেন। এই কাহিনীর দুটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম, রাবণ মারীচকে বলে যে, সে জানে রাম বিষ্ণুর অবতার। তিনি পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সে কিছুতেই তার মনকে সংযত করতে পারছে না। দ্বিতীয়, স্বর্ণমৃগ যে রাক্ষসের ছলনা সে কথা রাম সীতাকে বলেছিলেন, কিন্তু সীতা স্বর্ণমৃগের লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

২০. দেবীভাগবতপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ)

জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ কিভাবে রাম দেবী ব্রত পালন করেছিলেন এবং কিভাবে রাম তাঁর রাজ্য এবং ভার্যাকে ফিরে পেয়েছিলেন' তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২৮-৩০ অধ্যায় ব্যাস এই পুরাণে দিয়েছেন। এই পুরাণে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

১. এখানে সীতা লক্ষ্মীর অবতার।

২. এখানে বেদবতীর উপাখ্যান আছে তবে বেদবতীর নাম নেই। তাঁকে ঋষি কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. রাবণ সীতার নিকটে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর স্বয়ংবরসভায় সে লক্ষ্যভেদ করতে পারত, কিন্তু শিব ধনুক বলে সে স্পর্শ করতে পারেনি।

৪. ছায়া-সীতার কথা এখানেও বর্ণিত আছে।

৫. সীতা হরণের পর সীতাহারা রাম লক্ষ্মণ যখন শোকে মুহ্যমান সেই সময় নারদ তাঁদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি দেখে এসেছেন, রাবণ অশোক বনে সীতাকে রেখেছেন। নারদ তাঁদের আরো খবর দেন যে বন্দীদশায় সীতার জীবনরক্ষার জন্য ইন্দ্র সীতাকে কামধেনুর দুগ্ধ পান করতে দিয়েছেন। তারপর নারদ রামকে উপবাস করে নবরাত্রি ব্রত করতে বললেন। রাম তাই করলেন। দেবী তখন আবির্ভূতা হয়ে রামকে আশীর্বাদ দান করেন।

৬. এখানে বানরদের দেবতার অংশে জন্ম এবং লক্ষ্মণ শেষের অবতার এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

২১. মহাভাগবতপুরাণ

(গুজরাট প্রিন্টিং প্রেস দ্বারা প্রকাশিত, বম্বে, ১৯১৩)

এই পুরাণে রামোপাখ্যান ৩৭-৪৯ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে এই কাহিনী খুব ভিন্ন না হলেও রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি বিশেষত্ব এখানে পাওয়া যায়। যেমন—

১. বিভীষণ ধর্মদেবের অবতার।

২. দেবতারা রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুর নিকটে ধরণীতে তাঁর অবতার রূপে অবতীর্ণ হওয়ার প্রার্থনা জানালেন। বিষ্ণু তাঁদের বলেন যে লঙ্কায় এক দেবী বাস করেন। যতক্ষণ দেবী সেখানে আছেন রাবণকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তখন দেবতারা সবাই মিলে কৈলাসে দেবীর সঙ্গে দেখা করেন। দেবী তাঁদের বলেন যে, সীতা হরণের জন্য তিনি লঙ্কা ছেড়ে আসবেন এবং শিব হনুমানের রূপ ধারণ করে রামকে সহায়তা করবেন। যুদ্ধের সময়ে রামকে অনেক-

বার দেবীকে প্রার্থনা করতে দেখা যায়। শেষে রাম দেবীর নিকট থেকে অমোঘ অস্ত্র পেয়ে রাবণ নিধনে সমর্থ হন।

৩ সীতা মন্দোদরীর কন্যা বলে উল্লিখিত।

৪ মায়াসীতার কথা এবং নারদের শাপের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২২. কালিকাপুরাণ

(পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা ১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

এই পুরাণের ৩০ অধ্যায়ে নরকের জন্মকাহিনী বিবরণে পৃথ্বী-কর্তৃক জনককে সীতা প্রদানের কাহিনী বিবৃত আছে। ঋষি জনক শুনেছিলেন যে পুত্রহীন রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা যজ্ঞ করে চারটি সন্তান লাভ করেছিলেন। নিঃসন্তান ঋষি জনক যজ্ঞ করার মনস্থ করেন। যখন তিনি যজ্ঞভূমি তৈরি করছেন সেই সময় পৃথ্বী তাঁকে সীতা প্রদান করেন এবং তাকে বলেন যে সীতার জন্যই রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা বিনষ্ট হবে।

৬২ অধ্যায়ে দুর্গা-মহোৎসব বর্ণনায় ব্রহ্মা দেবীকে বলেছিলেন রামকে সাহায্য করতে, যাতে রাবণ বধ ত্বরান্বিত হয়। দেবী লঙ্কায় আসেন এবং অদৃশ্য থেকে রাম-রাবণের যুদ্ধকে সাতদিন স্থায়ী করেন। নবমীর দিন তিনি রাবণের পতন ঘটান। সমস্ত দেবতা ঐ সাতদিন দেবীর পূজা করেন এবং নবমীর দিন ব্রহ্মা নিজে পূজা করেন। যদিও রাম-রাবণের যুদ্ধ ত্রেতা যুগে হয়েছিল। তথাপি প্রতি কল্পে রাম-রাবণ আসেন, দেবী তাদের যুদ্ধে লিপ্ত করেন এবং রামের জয় এবং রাবণের পরাজয় ঘটে। এইভাবে দেবীর পূজা প্রতিকল্পে হয়-

"নৃণাং ত্রেতা যুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া।
পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা॥
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবো দৈত্যানাং নাশনায় বৈ।
প্রতিকল্পং ভবেদ্‌ রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ॥
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ।
এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ॥
ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে।" (৩৮-৪১)

২৩. বৃহদ্ধর্মপুরাণ

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৮৯৭)

এই পুরাণের ৬৮ অধ্যায়ে দেবী কর্তৃক শাবদনবরাত্র উৎসব বর্ণনা প্রসঙ্গে রামকথার বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভাগবতের কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর খুব বেশি অমিল নেই।

দেবী-বর্ণিত রামকথা এইরূপ। ব্রহ্মাসহ সব দেবতারা বি ব নিকটে আসেন। সবার মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া রাবণ বধ সম্ভব হবে না কারণ রাবণ শিব-ভক্ত এবং দেবী রাবণকে রক্ষা করার জন্য লঙ্কায় থাকেন। দেবী বললেন যে রাবণ সীতা হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এলে তিনি লঙ্কা ত্যাগ করবেন। আরো ঠিক হয় যে রাবণ বধের জন্য শিব হনুমান হয়ে, ব্রহ্মা জাম্ববান হয়ে এবং ধর্ম বিভীষণ হয়ে অবতীর্ণ হবেন।

যখন রাবণ সীতাকে হরণ করে অশোক কাননে নিয়ে আসেন ব্রহ্মার নির্দেশে ইন্দ্র সীতাকে স্বর্গীয় খাদ্য প্রদান করেন।

হনুমান অশোকবনে সীতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর দেবী চণ্ডিকার সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁকে অনুরোধ করেন লঙ্কা ছেড়ে যেতে যাতে রাবণ বধ ত্বরান্বিত হয়।

যুদ্ধ আরম্ভের সময়ে এই পুরাণে যুদ্ধের প্রতি ঘটনার তিথি উল্লিখিত আছে। রাম মহালয়ায় দেবীপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ করে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ব্রহ্মা ও দেবতারা দেবীকে বিল্ববৃক্ষের নীচে দেখে তাঁকে প্রার্থনা জানায়। দেবী তাঁদের বলেন যে আশ্বিন নবমীর বৈকালে রাবণ নিধন হবে। প্রতি রাক্ষসের নিধনের দিন এখানে উল্লিখিত আছে। বিজয়া দশমীর সকালে রাম-সীতার মিলন হবে—একথাও উল্লিখিত হয়েছে।

রামেশ্বরের সেতুবন্ধের সময় সেতুতে রামকর্তৃক শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথার উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে ২৫-৩০ অধ্যায়ে বাল্মীকি ও তাঁর রামায়ণ রচনার কথার উল্লেখ আছে। বাল্মীকি কিভাবে সরস্বতীর আশীর্বাদে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪. স্কন্দপুরাণ

(সোমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস -প্রকাশিত, ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বম্বে, ১৯১০)

পুরাণগুলির মধ্যে স্কন্দপুরাণ সুবৃহৎ। এই পুরাণের মোট শ্লোক সংখ্যা ৮১,০০০। এই পুরাণে 'মহেশ্বর খণ্ডের' অন্তর্গত কেদার খণ্ডে রামকাহিনী বিবৃত আছে। রাবণ তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে মুনিঋষিদের অত্যাচার করলে দেবগণ তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুসকাশে গমন করেন। বিষ্ণু তাঁদের রক্ষা করার জন্য এবং রাবণকে দমন করার জন্য ধরাধামে রাম নামে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুকে সাহায্য করার জন্য নন্দী হনুমানের রূপ ধরে অবতীর্ণ হন। বিষ্ণুর দুই বাহু ভরত ও শত্রুঘ্ন হন। শেষাবতার লক্ষ্মণ পরম শক্তি সমন্বিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মবিদ্যা সীতা নামে জনকের গৃহে অবতীর্ণ হন। রাজা জনক সীতাকে রামের করে সম্প্রদান করেন।

'অনন্তর পরম মঙ্গলময় রাজীবলোচন বিষ্ণু রামনামে বিখ্যাত হয়ে রাবণকে জয় করার অভিপ্রায়ে দেবকার্য সিদ্ধির জন্য অরণ্যে বাস করেন। অতঃপর রাম পরম তপোবলে অন্বিত হয়ে দেবগণের সহায়তায় ক্রমাগত ছয়মাস চেষ্টার দ্বারা রাবণকে বধ করেন। রাবণ বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়ে শিবসারূপ্য লাভ করেন।

"রাবণং জেতু কামো বৈ রামো রাজীব লোচনঃ।
অরণ্যবাসমকরোদ্দেবানাং কার্য্য সিদ্ধয়ে॥ ১১০
ততোঽসৌ তপসাযুক্তঃ সার্দ্ধং তৈ দেবতাগণৈঃ।
সগনং রাবণং রামঃ ষড়্ভির্ণাং সৈরজীহনৎ
বিষ্ণু নাঘাতিতঃ শস্ত্রৈঃ শিবসারূপ্যমাপ্তবান্॥" ১১৩

(২০-২৪ অধ্যায়)

এই পুরাণের বৈষ্ণব খণ্ডে কার্তিক মাস মাহাত্ম্য বর্ণনায় দশরথ ও রামের পূর্ব-জন্মকথার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। পরম ধার্মিক ধর্মদত্ত ও কলহা পরজন্মে দশরথ ও কৈকেয়ী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুকে বৃন্দার শাপের ফলে রামের জন্মের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দৈত্য জলন্ধর পত্নী বৃন্দার সতীত্বের জন্য অজেয় ছিল। বিষ্ণু জয় ও বিজয়ের সহায়তায় বৃন্দার সতীত্ব নষ্ট করেন। বৃন্দা জয় ও বিজয়কে শাপ দেন যে তারা রাক্ষস হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং বিষ্ণুকে শাপ দেন যে তিনি মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর পত্নীকে রাক্ষস হরণ করবে।

বৈষ্ণব খণ্ডের অন্তর্গত বৈশাখ মাস মাহাত্ম্য বর্ণনায় বাল্মীকির জন্ম কথা বর্ণিত আছে। স্কন্দ পুরাণে চার জায়গায় বাল্মীকির জন্ম কথার উল্লেখ পাওয়া যায় :

(ক) বৈষ্ণব খণ্ডের অন্তর্গত বৈশাখ মাস মাহাত্ম্য বর্ণনায় (২১ অধ্যায়ে) এক ব্যাধের উপাখ্যান পাওয়া যায়। এই ব্যাধের কিন্তু নাম পাওয়া যায় না। এই ব্যাধ রামনাম জপ ক'রে বর লাভ করে। যার ফলে সে পরজন্মে বল্মীক নামে ঋষি বংশে জন্ম গ্রহণ করে এবং বাল্মীকি নামে যশস্বী হয়। কৃণু নামে এক তপস্বীর তপস্যা করার সময় তাঁর চারিধারে বল্মীকের স্তূপ সৃষ্টি হয়। সেই কারণে সেই তপস্বীর নাম হয় বল্মীক। ব্যাধ এই বল্মীকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বাল্মীকি নাম ধারণ করে রামকথা রচনা করতে সমর্থ হয়।

(খ) 'অবন্তী খণ্ডে' ২৪ অধ্যায়ে আবন্ত ক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণনায় অগ্নিশর্মার কথা বর্ণিত আছে। এই অগ্নিশর্মা পূর্বে ডাকাত ছিল। একদিন অগ্নিশর্মার সঙ্গে সাত ঋষির সাক্ষাৎ ঘটে। অগ্নিশর্মা তাঁদের মারতে চাইলে তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে যে পাপ করছে তার ফল কে ভোগ করবে? অগ্নিশর্মা উত্তর দেয় যে তার পরিবারবর্গ তার পাপের ভাগ গ্রহণ করবে। ঋষিগণ তাকে তার পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করে আসতে বলেন। অগ্নিশর্মা তার পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করতে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলে যে তার পরিবারবর্গ তার পাপের ফল-ভোগ করতে অস্বীকার করেছে। অগ্নিশর্মা তখন ঋষিদের কাছে তার পাপ মুক্তির উপায় জানতে চায়। ঋষিগণ তাকে ধ্যান ও মন্ত্র জপ করতে পরামর্শ দিয়ে চলে যান। ১৩ বৎসর পরে ফিরে এসে ঋষিরা দেখেন যে অগ্নিশর্মা তখনও মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে এবং তার চারিধারে বল্মীকের স্তূপ সৃষ্টি হয়েছে। ঋষিরা তখন বল্মীক স্তূপ থেকে অগ্নিশর্মাকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং তার নাম বাল্মীকি দেন এবং তাকে রামায়ণ লিখতে আদেশ দেন। এই বাল্মীকির জন্মকথার বিশেষত্ব এই যে এখানে লোকপ্রসিদ্ধ বাল্মীকির জন্মকথার মতো এখানে রাম নাম জপের উল্লেখ নেই।

(গ) স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডের ১২৪ অধ্যায়ে বাল্মীকির জন্মকথা বিবৃত আছে। এখানে লোহজঙ্ঘ নামে এক ব্রাহ্মণের কাহিনী উল্লিখিত আছে। এই ব্রাহ্মণ পিতৃমাতৃপরায়ণ ছিল। দেশে অকাল উপস্থিত হলে পিতা মাতা ও সংসারের অন্যান্যদের ভরণপোষণের জন্য সে চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করে। একবার সপ্তর্ষিদের দেখে তাঁদের প্রহারের উদ্যত হলে, সপ্তর্ষিরা তাকে তার পাপকার্যের ফল কে ভোগ করবে জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁদের বলে যে তার পাপ-কার্যের ফল তার সংসারের অন্যান্যরা ভোগ করবে। সপ্তর্ষিরা তার বাড়ির পরিজনদের জিজ্ঞাসা করতে আসতে বলে সেখানে অপেক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ ফিরে এসে বলে তার পরিজনেরা কেউ পাপের ভাগ নিতে রাজী নয়। তখন সে

রাজর্ষিদের কাছে তার কাজের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং তার পাপ থেকে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে। সপ্তর্ষিরা তাকে 'জাট ঘোট' মন্ত্র জপ করতে বলে চলে যায়। বহুদিন পরে সপ্তর্ষিরা ঐ স্থানে এসে দেখেন যে ব্রাহ্মণ তখনও সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে এবং তার শরীর বল্মীক স্তূপে আবৃত হয়ে গেছে। সপ্তর্ষিরা তাকে সেই বল্মীক স্তূপ থেকে উদ্ধার করেন এবং তার নাম দেন বাল্মীকি।

(ঘ) স্কন্দ পুরাণের 'প্রভাস খণ্ডের' ২৯৮ অধ্যায়ে প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্য বর্ণনায় ২৭৮ অধ্যায়ে বাল্মীকির জন্মকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। শমীমুখ নামে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের বৈশাখ নামে এক পুত্র ছিল। বৈশাখ চৌর্যবৃত্তি দ্বারা পরিবার পালন করত। একবার তার সপ্তর্ষিদের সঙ্গে দেখা হয়। সপ্তর্ষিদের প্রহার করতে উদ্যত হলে তাঁরা তার পাপের জন্য কে দায়ী হবে তাকে জিজ্ঞাসা করেন। পরিবারের অন্যান্যদের জিজ্ঞসা করে সে জানতে পারে, তার পাপের জন্য সে ছাড়া অন্য কেউ দায়ী হবে না। তখন সে সপ্তর্ষীদের মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করলে 'জাট ঘোট' মন্ত্র জপ করতে বলেন। বহুদিন পরে সপ্তর্ষিরা সেখানে সেই স্থানে এসে দেখে যে সেই ব্রাহ্মণের শরীর বল্মীক-সমাবৃত হয়ে গেছে। তাঁরা তখন তাকে বল্মীক স্তূপ থেকে উদ্ধার করে বললেন 'তুমি একাগ্রতা সহকারে এই মন্ত্র জপ করে বল্মীকময় হয়েছ বলে তুমি বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হবে। স্বচ্ছন্দা ভারতী তোমার জিহ্বাগ্রে বাস করবেন। তুমি রামায়ণ কাব্য রচনা করে মুক্তি প্রাপ্ত হবে।"

"যস্মাত্ত্বং মন্ত্রমেকাগ্রো ধ্যায়ন বল্মীকমাশ্রিতঃ।
তস্মাদ্বাল্মীকি নামাত্বং ভবিষ্যসি মহীতলো॥ ৫৭
স্বচ্ছন্দা ভারতীদেবী জিহ্বাগ্রে ভবিষ্যতি।
কৃত্বা রামায়ণং কাব্যং ততো মোক্ষং গমিষ্যসি॥" ৫৮

২৭৮ (৫৭-৫৮)

বৈষ্ণব খণ্ডের অন্তর্গত ৬ অধ্যায়ে শিবের শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুর নিকট মনুষ্যজন্ম ধারণ করার প্রার্থনা এবং তদনুসারে বিষ্ণুর অযোধ্যায় রাম নামে অবতীর্ণ করার প্রতিশ্রুতি বর্ণিত আছে। তাছাড়া রামের অনুগামী সহ সরযূর জলে অন্তর্ধানের কথার উল্লেখ আছে। ৭ম অধ্যায়ে ক্ষীরোদ কুণ্ড বর্ণনাকালে অগ্নি যে স্থানে দশরথকে তাঁর পত্নীদের বণ্টন করার জন্য পায়স প্রদান করেছিলেন, সেই স্থানের উল্লেখ আছে।

এই পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে ২য় অধ্যায়ে সেতু মাহাত্ম্য বর্ণনাকালে রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। রাম পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য বনে আসেন এবং সীতা হরণের পর সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। তারপর বালীবধ ও বিভীষণের

সঙ্গে সখ্যের বিবরণ। তারপর সেতুবন্ধের উদ্যোগ চিত্রতীর্থে রামের সঙ্গে বিভীষণের সাক্ষাৎ হয়। রাম চিন্তা করেন কেমন করে তিনি সমুদ্র পার হবেন। বানরেরা রামকে নৌকা দ্বারা সমুদ্র পার হওয়ার কথার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের কথা মহাভারতের রামোপাখ্যানে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত বাল্মীকির রামায়ণের মতো নলের দ্বারা সেতুবন্ধের কথা পাওয়া যায়। সেতুবন্ধ ও রাবণ বধের পর ৩০ অধ্যায়ে বিভীষণ রামের নিকট প্রার্থনা জানায় যে সেতুর আর প্রয়োজন নেই, সেতু থাকলে বলগর্বিত রাজারা লঙ্কাপুরী আক্রমণ করতে পারে। অতএব রাম যেন সেতুভঙ্গের নির্দেশ দেন। বিভীষণের এই প্রার্থনায় রাম ধনুষ্কোটির দ্বারা সেতু ভঙ্গ করেন। 'যে ব্যক্তি রামধনুর কোটির দ্বারা কৃত রেখা অবলোকন করে; তাকে আর গর্ভবাস করতে হয় না।"

"শ্রী রামধনুষঃ কোট্যা যে রেখাং পশ্যতি কৃতাম্।
অনেক ক্লেশ সংযুক্তং গর্ভবাসং ন পশ্যতি॥" ৭৭

সেতুবন্ধের অন্তর্গত ৪৪ অধ্যায়ে রামচন্দ্র মুনিগণকে বলেন "রাবণকে বধ করে যে পাপ হয়েছে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় বলুন? মুনিগণ বললেন, 'সর্ব-লোকের উপকারের জন্য আপনি শিবার্চনা করুন। আপনি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করুন।"

"রাবণস্য বধাদ্বিপ্রা যৎ পাপং মমবর্ত্ততে।
তস্য মে নিষ্কৃতিং ব্রত পৌলস্ত্যং বধজস্যহি
যৎকৃত্বা তেন পাপেন মুচ্যেঽহং মুনি পুঙ্গবাঃ॥ ৮৬
মুনয় উচুঃ
সর্ব্বলোক উপকারার্থং কুরু রাম শিবার্চ্চনম্॥ ৮৮
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাং ত্বং লোক সংগ্রহম্যয়া,
কুরুরাম দশগ্রীব বধ দোষাপনুত্তয়ে॥" ৮৯

রাম তখন রামেশ্বরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হনুমানকে কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ আনতে আদেশ করেন। হনুমানের ফিরতে দেরি দেখে রাম বালির শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজা সমাপ্ত করেন। তারপর ৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে এদিকে হনুমান শিব প্রদত্ত শিবলিঙ্গ নিয়ে ফিরে দেখে যে বালির শিব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। হনুমান খুবই দুঃখিত হয়। হনুমানের দুঃখ দেখে রাম হনুমানকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন এবং হনুমান আনিত শিবলিঙ্গ হনুমানের নামেই অভিহিত হবে বলেন। কিন্তু তাতেও হনুমান সন্তুষ্ট না হতে রাম হনুমানকে বালির শিবলিঙ্গকে

ভেঙে দিতে বলেন। হনুমান বালির শিবলিঙ্গকে ভঙ্গ করতে যেতে তার রক্ত বমন আরম্ভ হয় এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন রাম হনুমানকে কোলে নিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন এবং তার বিভিন্ন বিস্ময়কর কার্যাবলীর প্রশংসা করে তাকে সান্ত্বনা দেন।

ব্রহ্মকাণ্ডের অন্তর্গত ধর্মারণ্য খণ্ডে ৩০-৩৬ অধ্যায়ে রামকথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। কাহিনীর আরম্ভ রাম লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়ে তাড়কা বধের পর থেকে। কিন্তু এখানে সীতাত্যাগ ও সীতার পাতাল প্রবেশের কোনো উল্লেখ নেই। কাহিনীর বিশেষত্ব হল এই যে এখানে বিভিন্ন ঘটনার তিথির বর্ণনা আছে। যেমন রাবণ, মাঘ মাসের শুক্লা পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে বৃন্দ নামক মুহূর্তে সীতাহরণ করেছিল। ‘পদ্মপুরাণে’র পাতাল খণ্ডের ৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত রামকথার সঙ্গে এই কাহিনীর মিল দেখতে পাওয়া যায়।

এই পুরাণের অন্তর্গত ‘নাগর খণ্ডে’র ২০ অধ্যায়ে লক্ষ্মণের বিদ্রোহ ও তপস্যার বিবরণ পাওয়া যায়। বনবাসকালে রামচন্দ্র একদিন স্বপ্নে তাঁর পিতাকে হৃষ্ট চিত্তে আলাপ করতে দেখেন। মুনিদের এই কথা বললে তাঁরা রামচন্দ্রকে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে পরামর্শ দেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করতে মনস্থ করে লক্ষ্মণকে শ্রাদ্ধার্থ শাক, মূল, ফলাদি আহরণ করে আনতে বললেন এবং সীতাকে সেগুলি পাক করতে বললেন। সীতা সেগুলি পাক করে পিণ্ডের জন্য প্রস্তুত করে দিয়ে শ্রাদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে অন্তর্হিতা হলেন। শ্রাদ্ধান্তে সীতা উপস্থিত হলে রাম তাঁকে তার অন্তর্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সীতা উত্তর দেন যে ‘রাজা দশরথ পিণ্ড গ্রহণ করতে উপস্থিত হলে তিনি বল্কল পরিহিতা অবস্থা তাঁর কাছে কি করে আসবেন?’ সীতা আরো বলেন যে যে-রাজা দশরথ নানা উপাদেয় খাদ্য গ্রহণ করতে অভ্যস্ত তাঁকে এখানে প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করতে কি করে তিনি দেখবেন? সীতার এই বাক্য শুনে সবাই তাঁকে সাধুবাদ জানালেন। তারপর রাম লক্ষ্মণকে শয্যা প্রস্তুত করতে এবং পদশৌচাদির জন্য নির্মল জল আনতে বললেন। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্মণ কুপিত হয়ে বললেন যে তিনি শয্যা প্রস্তুত করতে পারবেন না। পদশৌচের জন্য জল আনয়ন করতে পারবেন না। এতে যদি তাঁকে রাম দ্বারা প্রহৃত হয়ে পরিত্যক্ত হতে হয় তবে তার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন। লক্ষ্মণের এরূপ বাক্যে উপস্থিত সকলে হতচকিত হলেন। এরপর লক্ষ্মণ তার এই আচরণের জন্য অনুতপ্ত হন, রামের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাঁর কৃত আচরণের জন্য রামকে তাঁকে নিগ্রহ করতে বলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি কিভাবে করবেন তাও জিজ্ঞাসা করেন। উপস্থিত মুনিরা লক্ষ্মণকে

তপস্যা করতে বলেন। মার্কণ্ডেয় লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন 'তোমার দোষ নেই। এই ক্ষেত্র মাহাত্ম্য এই যে এই ক্ষেত্র সৌভ্রাত্র বর্জিত।'

"শৃণু মে বাকং নাস্তি দোষান্তরা নঘ। ৭১
ঈদৃক ক্ষেত্র প্রভাবোঽয়ং সৌভ্রাত্রেণ বিবর্জ্জিতঃ।" ৭২

নাগর খণ্ডের ৯৬ অধ্যায়ে দশরথের শনির বরপ্রাপ্তির উল্লেখ আছে। দশরথের শাসনকালে একদিন দৈবজ্ঞগণ দশরথকে বললেন যে শনি সত্বর রোহিণী ভেদ করবেন এবং শনি রোহিণী শকট ভেদ করলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ অনাবৃষ্টি হবে। এই কথা শুনে দশরথ শনির সম্মুখীন হয়ে, তাঁকে রোহিণী পথ পরিত্যাগ করতে বললেন অন্যথা তিনি তাঁকে যমালয়ে প্রেরণ করবেন। শনি আশ্চর্য হয়ে তাঁকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং তাঁর পথ রোধের কারণ জিজ্ঞসা করলেন। দশরথ নিজের পরিচয় দিলেন। দৈবজ্ঞদের নির্দেশে প্রজাদের দুঃখদুর্দশার কথা ভেবে এই কার্য করেছেন, একথাও বলবেন। শনি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, সেই সাহস মানব, দানব এবং দেবতাদের অসাধ্য। শনি আরো বললেন যে দশরথ যে প্রজাদের দুঃখের কথা ভেবে এই কার্য করেছেন এই সাধু কার্য দর্শনে তিনি প্রীত হয়েছেন। শনি বললেন যে, তিনি শত যুগান্তরেও রোহিণী ভেদ করবেন না এবং তিনি দশরথকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। তখন দশরথ শনির কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, এক বৎসর কাল যে ব্যক্তি প্রতি শনিবার যথাশক্তি তিল ও লৌহ দান করবে শনি যেন তাকে রক্ষা করেন। শনি দশরথ-এর এই প্রার্থনা পূরণ করবেন বলে চলে গেলেন।

নাগর খণ্ডের ৯৯ অধ্যায়ে বাল্মীকি-রামায়ণের মতো দুর্বাসার আগমন ও লক্ষ্মণ বর্জন বর্ণিত হয়েছে।

এই খণ্ডের ১০১ অধ্যায়ে রামের বিভীষণকে উপদেশ, সেতুভঙ্গ এবং পরিশেষে সকলের স্বর্গারোহণ বিবৃত আছে।

বিভিন্ন অধ্যায়ে এই পুরাণে যে রামকথার উল্লেখ আছে তা রাম কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। তার কারণ আছে। এখানে মূল উদ্দেশ্য রামের অবতারত্ব প্রচার করা এবং রাম নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ করা। বিভিন্ন পুরাণে রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্ন বর্ণিত ঘটনাবলী পাওয়া যায়। যেমন—

১. স্কন্দ পুরাণে নাগর খণ্ডে বর্ণিত আছে যে শনির সঙ্গে যুদ্ধের পর ইন্দ্র দশরথকে বলেন যে অপুত্রকের পরমগতি লাভ হয় না। এর পর দশরথ ১০০ বর্ষ কার্তিকেয়পুরে তপস্যা করেন। তখন জনার্দন আবির্ভূত হয়ে দশরথকে বলেন

যে তিনি চাররূপ ধারণ করে দশরথের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। এরপর দশরথের চারপুত্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে (অধ্যায় ৯৩-৯৮)।

২. বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে যে (অধ্যায় ৪৫) দশরথ বশিষ্ঠের পরামর্শ অনুসারে রামদ্বাদশী ব্রত পালন করেন। যার ফলে দশরথের পুত্র সন্তান হয়।

৩. বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (পূর্ব খণ্ড, অধ্যায় ১৮) অনুসারে বিষ্ণু দেবতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি দশরথের পুত্র রামরূপ অবতার গ্রহণ করবেন। এরপর শিব বলেন যে তিনি হনুমানরূপে রামকে সহায়তা করবেন।

৪. ব্রহ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে দশরথ শ্রবণকুমার বধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বশিষ্ঠের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই সময় এক আকাশবাণী হয় যে রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামের জন্য পাপমুক্ত হবেন (অধ্যায় ১২৩)।

৫. পদ্মপুরাণে গৌড়ীয় পাতাল খণ্ডে (অধ্যায় ১৪) শান্তা পিতা দশরথের কাছে এসে তার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গের শক্তি বর্ণনা করে। এই কথা শুনে দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে দিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার সংকল্প করেন।

৬. পদ্মপুরাণে (উত্তর খণ্ড, অধ্যায় ২৬৯) চৈত্র শুক্লা নবমী তিথিতে রামের জন্মের কথা বিবৃত আছে। এখানে আরো উল্লিখিত আছে যে রাম কৌশল্যাকে আপন বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন করেছিলেন।

৭. কূর্ম পুরাণে (পূর্ব ভাগ, অধ্যায়, ২১, ১৮) উল্লিখিত আছে যে সীতা জনকের কন্যা।

৮. ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (৩০, ৬৪ স), বিষ্ণু পুরাণে (৪.৫ : ৩০) এবং বিষ্ণুপুরাণে (৮ : ৯ : ১২) বিবৃত আছে যে জনকের এক পুত্র ছিল, তার নাম ভানুবান।

৯. কালিকাপুরাণে (অধ্যায় ১৮) নিঃসন্তান জনককে নারদ বলেন যে দশরথ যজ্ঞ করে চারটি পুত্র প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব আপনিও যজ্ঞ করুন। আপনার সন্তান লাভ হবে। সেই কথা শুনে জনক যজ্ঞভূমি নির্মাণ করার সময় এক পুত্র ও এক কন্যা পান।

১০. পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ১২২ অধ্যায়ে সীতা-স্বয়ংবরে রাবণ ও বাণাসুরের উপস্থিতির কথা পাওয়া যায়।

১১. নৃসিংহ পুরাণে (অধ্যায় ৪৭), পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে (অধ্যায় ১১২) সীতা-স্বয়ংবরে পরাজিত রাজাদের আক্রমণের কথা এবং রাম-কর্তৃক তাঁদের পরাজিত করার কথা উল্লিখিত আছে।

১২. কল্কিপুরাণে (৩ : ৩ : ২৯) রাম-সীতার পূর্বানুরাগের কথা পাওয়া

যায়। এখানে বিবৃত আছে যে রাম সীতার অপাঙ্গদৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে ধনুর্ভঙ্গ করেন।

১৩. ব্রহ্মপুরাণ (অধ্যায় ১২৩) অনুসারে দশরথ আপন নির্বাসিত পুত্রকে দর্শন দিয়ে ব্রহ্মহত্যার জন্য তাঁর নরকভোগের কথা বলেন এবং বলেন যে রাম যেন গৌতমী তটে পিণ্ডদান করে। রাম তাই করেন, ফলে দশরথ নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

স্কন্দপুরাণ (অধ্যায় ১১১), পদ্মপুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড অধ্যায় ২৮। ৪৮-৬০) এবং গরুড় পুরাণেও (অধ্যায় ১৪৩) দশরথের স্বপ্নে রামকে দর্শন দেওয়া এবং পিণ্ডদান করতে বলার কথা আছে।

১৪ পদ্মপুরাণে (উত্তর কাণ্ড ২৭২ : ১৬৬ : ১৬৭) উল্লিখিত আছে যে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিপত্নীরা রামকে দেখে কামাতুর হলে রাম তাঁদের আশ্বাস দেন যে কৃষ্ণ অবতারে তাঁরা গোপিনী হবেন এবং তখন তিনি তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন।

১৫. স্কন্দপুরাণে (নাগর খণ্ড ২০.৪৫) লক্ষ্মণের বিদ্রোহের কথা উল্লিখিত আছে। বনবাসকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পিতৃকুপিতা তীর্থে পৌঁছালে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করার ইচ্ছায় লক্ষ্মণকে শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ আনতে আদেশ করেন। কিন্তু লক্ষ্মণ ক্রোধভরে সেই আদেশ অমান্য করেন। এরপর লক্ষ্মণ দুর থেকে রামসীতাকে দেখেন এবং তাঁর মনে রামকে বধ করে সীতা লাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু রাম গোকর্ণে পেঁৗছালে লক্ষ্মণের মনে অনুশোচনা জাগে এবং তিনি রামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডে (অধ্যায় ২৮, ১২৬-৯০) লক্ষ্মণের বিদ্রোহের কথা আছে। কিন্তু সীতার প্রতি আসক্তির উল্লেখ নেই।

১৬. নৃসিংহপুরাণে (অধ্যায় ৪৯) লক্ষ্মণকে দেওয়ার জন্য রাম-কর্তৃক শূর্পণখাকে এক পত্র দেওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু রাম সেই পত্রে শূর্পণখার নাসিকা কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং সেই নির্দেশ অনুসারে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা কেটে দেন।

১৭. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (কৃষ্ণজন্মখণ্ড, অধ্যায় ৬২) শূর্পণখার পরের জন্মের কথা পাওয়া যায়। শূর্পণখা বিরূপিত হওয়ার পর, তার অবস্থার কথা রাবণকে জানিয়ে সে পুষ্করে তপস্যা করতে যায়। তপস্যার ফলস্বরূপ ব্রহ্মা তাকে বর দান করেন যে সে পর জন্মে রামকে পতিরূপে পাবে। এরপর সে নিজের শরীর দগ্ধ করে কুব্জারূপে অবতার গ্রহণ করে।

১৮. পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড গৌড়ীয় পাঠ, অধ্যায় ১২) দশরথ-জটায়ুর মিত্রতার কথা এ ভাবে পাওয়া যায়—একবার অযোধ্যায় অনাবৃষ্টি হলে নারদ জানায় যে এই অনাবৃষ্টির কারণ শনির রোহিণী নক্ষত্রের উপর দৃষ্টিপাত। এই কথা শুনে দশরথ শনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান। কিন্তু শনির দৃষ্টিতে দশরথের রথ ভগ্ন হয় কিন্তু জটায়ু সেই ভগ্ন রথ আগের মতোই করে দেয়, ফলে দশরথ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এর পর দশরথ-জটায়ু অগ্নিসাক্ষী করে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

স্কন্দপুরাণে (নাগর খণ্ড ৯৬) এবং পদ্মপুরাণে (উত্তরকাণ্ড, অধ্যায় ৩৪) শনির দশরথকে বরদানের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু জটায়ুর উল্লেখ নেই।

১৯. মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাবণের সীতাহরণের কথা পদ্মপুরাণে (৬.৬৯ ২৫), শিবপুরাণে (অধ্যায় ১৩) এবং স্কন্দপুরাণে (মহেশ্বর খণ্ড, অধ্যায় ১৩৩) উল্লিখিত আছে।

২০. ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (কৃষ্ণজন্মখণ্ড, অধ্যায় ৬২) অনুসারে শূর্পণখা যখন জানতে পারে যে রাম তাকে ঠকিয়েছে, তখন সে রামকে শাপ দেয় যে তাঁর পত্নী হরণ হবে।

২১. মায়া সীতার কথা কূর্ম পুরাণে (উপরিভাগ, অধ্যায় ৩৪), ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে (প্রকৃতিখণ্ড, অধ্যায় ১৪) এবং দেবীভাগবতপুরাণে (স্কন্দ ৬ অধ্যায় ১৬) পাওয়া যায়।

২২. নৃসিংহপুরাণে (৫০,২১-২৭) উল্লিখিত আছে যে তারা সুগ্রীবের পত্নী ছিল, বালী তাকে ছিনিয়ে নেয়।

২৩. নৃসিংহপুরাণে (৫২ · ২২) অঙ্গদের রাবণের সভায় গিয়ে রাবণকে প্রহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২৪. পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, ১১২.২২০) ইন্দ্রজিৎ বধের পর বিভীষণের রামের শরণ নেওয়ার কথা আছে।

২৫. পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, অধ্যায় ১১২) রাম সমুদ্রতটে বসে সমুদ্র-পারের জন্য শিবের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। প্রসন্ন হয়ে শিব রামকে 'অজগর' ধনুক দিয়েছিলেন। রাম সে ধনু সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন এবং তাব উপর দিয়ে সমস্ত রামসেনা সমুদ্র পার হয়ে যায়।

২৬. ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত আছে সমুদ্রের সাক্ষাতের জন্য রাম তিনদিন উপবাসের পর সমুদ্রের দেখা না পেয়ে তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং সমুদ্র রামের সেই ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সামনে আসেন (৯.১০.১৩)।

২৭. মন্দোদরীর কেশ গ্রহণ দ্বারা রাবণের যজ্ঞভঙ্গের কথা পদ্মপুরাণের (উত্তর খণ্ড, অধ্যায় ২৬৯) উল্লিখিত আছে।

২৮. পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, অধ্যায় ৫৭) সীতা ত্যাগের একটি পরোক্ষ কারণ পাওয়া যায়। একদিন কুমারী সীতা উদ্যানে এক জোড়া শুক শারীর রামগান শোনেন। রামকথা আরো ভালো করে শোনার জন্য সীতা সেই শুক-দম্পতিকে ধরে নিয়ে আসেন। কিছুদিন রামকথা শোনার পর সেই পক্ষী দম্পতি তাদের ছেড়ে দিতে বললে সীতা কেবল শুককে ছেড়ে দেন। সেই সময় শারী গর্ভবতী ছিল। সে দুঃখে মারা যায়। শুক দুঃখে সীতাকে শাঁপ দেয় যে সেও গর্ভবতী অবস্থায় পরিত্যক্ত হবে।

২৯ পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, অধ্যায় ৬০-৬৪) বর্ণিত আছে যে লব-কুশের সঙ্গে রামসেনার যুদ্ধ হয়েছিল। রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত যুদ্ধ করতে আসেন নি। যুদ্ধে সেনারা সব নিহত হলে সীতা সতীত্বের শপথ নিয়ে রামসেনাদের পুনর্জীবিত করেন।

৩০. ব্রহ্মপুরাণ (অধ্যায় ১৫৪) অনুসারে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর অঙ্গদ ও হনুমান অযোধ্যায় এসে সীতা ত্যাগের কথা শুনে গোদাবরীর তীর থেকে প্রস্থান করে। রাম সীতাকে স্মরণ করার জন্য অযোধ্যাবাসীদের নিয়ে গোদাবরীর তীরে তপস্যা করেন।

বিভিন্ন পুরাণে রামায়ণ বহির্ভূত ঘটনাগুলির বিবরণ দিয়ে সেগুলি যুক্তিসংগত-ভাবে উপস্থিত হয়েছে কিনা তা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে হয় না। কারণ পুরাণগুলিতে রামকাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং কাহিনী বিন্যাস উপস্থাপিত হয়নি। এখানে পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ পাওয়া যায় না। যে রামকাহিনীগুলি এখানে পাওয়া যায় তা কেবল রামের ঐশ্বরিক মহিমা প্রচারের জন্য উপস্থাপিত, রামকাহিনীর যুক্তিসংগত বিন্যাসের জন্য নয়।

(ঘ) রামতাপনীয় উপনিষৎ – (নিরপেক্ষ ধর্ম সঞ্চারিণী সভা হইতে শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত, শকাব্দ ১৯১০, আশ্বিন)

অথর্ববেদীয় রামতাপনীয় উপনিষদে রামের স্বরূপ ও রামকাহিনীর উল্লেখ আছে। এই উপনিষদের দুটি ভাগ – পূর্ব ও উত্তর। পূর্ব ভাগে ১০০টি খণ্ডে শ্লোক সংখ্যা ৯৪ এবং উত্তর ভাগে ৭টি খণ্ডে শ্লোক সংখ্যা ১০০। উত্তর ভাগে রামনাম মন্ত্র জপের বিবরণ ও রামনাম মাহাত্ম্য এবং পূর্ব ভাগে রামকাহিনী ৪র্থ খণ্ডের ১০টি শ্লোকে এবং ৫ম খণ্ডের ১০টি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত আছে। রাম খরাদি রাক্ষসগণকে বিনাশ করলে রাবণ রামপত্নীকে হরণ করে। এইখানে

কাহিনীর আরম্ভ। রাম সুগ্রীবের সঙ্গে মিতালী করে বালী বধ করেন। পরে সুগ্রীবের সহায়তায় রাবণ বধ করে রাম অযোধ্যায় রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বিভিন্ন শ্লোকে রাম যে ব্রহ্মস্বরূপ, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তা প্রকাশিত। "তিনি স্ব ভূ অর্থাৎ তাঁর উৎপত্তি অন্য-নিরপেক্ষ, জ্যোতির্ময় ও অনন্তরূপী। তিনি স্বয়ং প্রকাশ, অপর কেহ তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। তিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন। যেমন বট বীজের মধ্যে প্রকৃত মহাবৃক্ষ বিদ্যমান আছে সেইরূপ এই চরাচরজগৎ রামবীজের মধ্যবর্তী জানিবে। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্তি ত্রয় রামের শক্তিত্রয়স্বরূপ। এই শক্তিত্রয় থেকেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হচ্ছে।"

"স্বভূর্জ্যোতির্ময়োঽনন্ত রূপী স্বেনৈব ভাসতে।
জীবত্বেনেদমো যস্য সৃষ্টি স্থিতি লয়স্য চ ॥ ৪
কারণত্বেন বিচ্ছিক্ত্যা রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।
যথৈব বট বীজস্থঃ প্রকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ৫
তথৈব রামবীজস্থং জগতে তচ্চরাচরম্।
রেফারূঢ়া মূর্তয়ঃ স্যুঃ শক্তয়স্তিস্র এব চেতি ॥" ৬

পূর্ণভাগ — ২।২।৪-৬

"জগতের প্রাণ অর্থাৎ আত্মস্বরূপ রামচন্দ্রকে নমস্কার করবে। অনন্তর ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মের সঙ্গে এই নমস্য দেবতা রামের ঐক্য জ্ঞান করবে। শ্রীরাম ব্রহ্মস্বরূপ, এরূপ ভক্তগণ ভাবনা করে তাহাতে নিয়ত থাকবে।"

"জগৎ প্রাণায়াত্মণেঽস্মৈ নমঃ।
স্যান্নমস্তৈক্যং প্রবদেৎ প্রাগ্‌গুণেন ইতি ॥" ৮ পূর্ণভাগ — ২।২।৮

বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে এই উপনিষদের কাহিনীগত এবং ভাবগত মিল নেই। এখানে মূলতঃ ভক্তিরস প্রচারের জন্য এবং রামের ব্রহ্মত্ব স্থাপনের জন্য এই উপনিষদ লিখিত।

(ঙ) মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষায় যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, তত্ত্ব সংগ্রহ রামায়ণ, ভুশুণ্ডী রামায়ণ প্রভৃতি যে রামায়ণগুলি রচিত হয় সেগুলির মূল উদ্দেশ্য ভক্তিধর্ম প্রচার করা। গ্রন্থগুলির মধ্যে আদি গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (রচনাকাল ১১০০ – ১২৫০ খৃঃ) এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণের মূল উদ্দেশ্য বেদান্ত দর্শনের আধারে রামভক্তি।

ক. যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ :—(পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, প্রকাশিত ১৮২০ শকাব্দ)

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়, যদিও পুরাণের সমস্ত বিশেষত্ব এর মধ্যে নেই। সমস্ত রামায়ণের আলোচ্য বিষয় শংকরের অদ্বৈত বেদান্তের অনুগামী। সমস্ত রামায়ণ কবিতায় রচিত এবং ২৩৭৩৪টি শ্লোকের সমষ্টি। এর দার্শনিক মতবাদ শংকর ও বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধের অনুগামী হওয়ায় রামায়ণটি শংকরের পরবর্তীকালে রচিত বলে মনে করা হয়।৮

একটি কাহিনী দিয়ে রামায়ণের আরম্ভ। সুতীক্ষ্ণ নামে একজন ব্রাহ্মণ ঋষি অগস্ত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মোক্ষের কারণ কি? জ্ঞান না কর্ম্ম?' অগস্ত্য উত্তর দিলেন, 'যেমন একটি পাখি দুটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম দুই দিয়েই মোক্ষ লাভ করা যায়'। এই তত্ত্ব ভালোভাবে বোঝানোর জন্য ঋষি একটি কাহিনী বিবৃত করলেন। অগ্নিবেশ্যর পুত্র কারুণ্য গুরুগৃহ থেকে বিদ্যাভ্যাস শেষ করে ফিরে সম্পূর্ণ মৌনী হয়ে সর্ব্বকর্ম বিমুখ হলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে কারুণ্য পিতাকে উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রবিহিত কর্ম না সম্পূর্ণ কর্ম-বিমুখতা পরমার্থ লাভের সহায়ক? এই প্রশ্নের মীমাংসা না করতে পেরে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি।" এই কথা শুনে পিতা অগ্নিবেশ্য বললেন, 'এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে একটি কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। কাহিনী শুনে তুমি বিবেচনা করবে কোন্ পথ শ্রেয়?'" অপ্সরা সুরুচি একদিন হিমালয়ের শৃঙ্গে বসে দেখলেন দেবরাজ ইন্দ্রের এক দূত আকাশপথে চলেছেন। সুরুচি দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' দূত উত্তর দিলেন, 'রাজা অরিষ্টনেমি তাঁর রাজ্য-ভার পুত্রহস্তে দিয়ে তপস্যায় রত আছেন। তিনি তাঁর কাছে কর্তব্য সম্পাদনে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর কাছ থেকে ফিরছেন।' অপ্সরা তখন দূতকে রাজার সঙ্গে যা আলোচনা হয়েছে সব বিবৃত করতে বললেন। দূত বললেন, 'দেবরাজের কাছ থেকে আদেশ পেয়ে তিনি একটি সুসজ্জিত রথে করে রাজাকে স্বর্গে আনতে গিয়েছিলেন।' তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য শুনে রাজা বললেন, 'তুমি স্বর্গের সুখ, সুবিধার কথা বলো। তোমার কথা শুনে আমি ঠিক করব স্বর্গে যাব কিনা?' দূত বললেন, 'স্বর্গে মানুষ তাঁর ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য তিন রকম সুখ উপভোগ করে—উত্তম, মধ্যম ও অধম সুখ উপভোগের পর আবার তারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ভিন্ন মানুষের ভিন্ন সুখ ভোগের জন্য ঈর্ষাপরায়ণ হয়।' রাজা এই কথা শুনে স্বর্গে যেতে অস্বীকার করেন। দূত এই বার্তা ইন্দ্রসকাশে নিবেদন করলে ইন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং দূতকে বাল্মীকির তপোবনে রাজাকে নিয়ে যেতে বলেন এবং

ঋষিকে দেবরাজের অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, ঋষি যেন রাজাকে এমন উপদেশ দেন যাতে রাজা প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভ করেন। রাজা ঋষির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'মোক্ষলাভের উপায় কি?' বাল্মীকি তখন রাজাকে বশিষ্ঠ ও রামের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা বলেন। বাল্মীকি এই রামকাহিনী ভরদ্বাজকেও বলেন। ভরদ্বাজ তখন সেই কাহিনী ব্রহ্মাসকাশে নিবেদন করলে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলেন। ভরদ্বাজ বর না নিয়ে ব্রহ্মাকে এমন উপায় নির্দেশ করতে বললেন যা পালন করে মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে। ব্রহ্মা তখন ভরদ্বাজকে নিয়ে বাল্মীকির কাছে গিয়ে বললেন, 'রামকাহিনী সম্পূর্ণ না করে আপনি লেখা বন্ধ করবেন না। এই কাহিনী শুনে সমস্ত মানুষ পার্থিব দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে।' ব্রহ্মা এ কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। ভরদ্বাজ তখন বাল্মীকিকে রাম সীতা এবং তাঁর অনুগামীদের জীবনকাহিনী বর্ণনা করতে বললেন। কেমন করে তাঁরা এই দুঃখপূর্ণ জগতে লীলাখেলা করেছিলেন? কেমন করে তাঁরা এই দুঃখের সংসারে শান্তির রসাস্বাদন করেছিলেন?

বাল্মীকি তখন রামকাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন। রাম পড়াশোনা শেষ করে, বিভিন্ন তীর্থপরিক্রমা করে বিভিন্ন ঋষির তপোবন পরিদর্শন করে রাজ্যে ফিরে এলেন। ফিরে এসে রাম অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দিন কাটাতে থাকেন কিন্তু কাউকে দুঃখের কারণ বললেন না। রাজা দশরথ রামের দুঃখের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বশিষ্ঠকে রামের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করতে বলেন। ঠিক এই সময় বিশ্বামিত্র মুনি অযোধ্যায় রামকে রাক্ষসবধের নিমন্ত্রণ জানাতে আসেন। তিনি রামের দুঃখের কথা জানতে পেরে রামকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাম তখন মুনিকে বলেন, 'আমি একটি নতুন সত্যের সন্ধান পেয়েছি। যার ফলে সমস্ত পার্থিব সুখ আমার কাছে বিস্বাদ লাগছে। এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ নেই। পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করার জন্য। এই পৃথিবীর সব-কিছুই নশ্বর। পার্থিব বস্তুর মধ্যে কোথাও অবিচ্ছিন্নতা নেই—আছে পরম্পর পৃথক অস্তিত্ব। প্রত্যেকটি ক্ষণের দ্বারা বস্তুর অস্তিত্ব পৃথক্‌কৃত। ক্ষণের দ্রুত পরম্পরার সঙ্গে চলেছে বস্তুর অস্তিত্বের দ্রুত পরম্পরা। তাই বস্তুর অবিচ্ছিন্নতা কল্পিত। পার্থিব সুখ মনের কল্পনা এবং সেই মন ও বাস্তব সত্য নয়। বস্তু মরীচিকা মাত্র।' এই কথা শুনে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নির্দেশে এই অবাস্তব জগতের প্রকৃতি বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনাই এই রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়। যখন বাল্মীকি রাম ও বশিষ্ঠের কথোপকথন বর্ণনা করলেন, রাজা অরিষ্টনেমি জ্ঞানদীপ্ত হলেন, অপ্সরা খুশি হয়ে দূতকে বিদায় দিলেন। কারুণ্য পিতা অগ্নিবেশ্যর নিকট থেকে সব কথা

শুনে দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন। যখন অগস্ত্য তাঁর কাহিনী শেষ করলেন ব্রাহ্মণ সুতীক্ষ্ণ খুশি হলেন।

এই রামায়ণে ছয়টি প্রকরণ আছে। যথা—বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, ব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ।

বৈরাগ্য প্রকরণে বলা হয়েছে যে এই পৃথিবীতে প্রকৃত সুখ নেই। এই পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তু অস্থির ও আপদের মূল। লক্ষ্মী কুহকিনী। লক্ষ্মী মানুষের গুণাবলী বিনাশ ক'রে বিবিধ দুঃখ প্রদান করে। অহংকার মানুষের চিরদিনের পরম শত্রু। এই অহংকারের মূল অজ্ঞান। মানুষ এই অজ্ঞানবশে নানা দুঃখ ভোগ করে। মানুষের মন বিষয়ানুসন্ধানী এবং সেই কারণে মন সর্বদাই বিক্ষুব্ধ, ক্ষণকালের জন্যও মন স্থির থাকে না। কামনা বাসনা জড়িত মন কখনোই শান্তি লাভ করে না। মানুষের তৃষ্ণা অমঙ্গলকারী। তৃষ্ণা যতদিন না নিবৃত্ত হয় ততদিন মানুষ বিষয়ে আসক্ত থাকে এবং ততদিন মানুষ দুঃখ ভোগ করে। ভয়ংকর যৌবন মত্ততা মানুষকে সদাচার বিস্মরণ করিয়ে দেয়। 'তরুলতাও জীবন ধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে, কিন্তু তিনিই প্রকৃত জীবিত যিনি মননের দ্বারা জীবিত থাকেন।'

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥"

—বৈরাগ্যপ্রকরণ ১৫

মুমুক্ষু প্রকরণে পুরুষার্থ প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। এই সংসারে যথাযোগ্য রূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করলে সকলেই সকল বিষয় সর্বদা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। পৌরুষ হতেই জ্ঞান প্রাপ্তি হয় এবং জ্ঞান প্রাপ্তি হলে জীবন্মুক্তি সুখ লাভ হয়। দৈব মন্দমতি মূঢ়লোকের কল্পনা মাত্র। সাধুব্যক্তির উপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য ও শরীরকে চালনা করাই প্রকৃত পুরুষকার। যে ব্যক্তি যে বস্তু কামনা করে তার জন্য সে যদি শাস্ত্রোক্তপ্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহলে সে অবশ্যই তা পেয়ে থাকে (৫ম সর্গ)। ২০ সর্গে মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বলা হয়েছে যে মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমেই সাধুসঙ্গ ও সদাচার শিক্ষা দ্বারা প্রজ্ঞাবৃদ্ধি করবে। অনন্তর মহাপুরুষের লক্ষণানুসারে স্বীয় মহাপুরুষত্ব সম্পাদন করবে। সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত এই মহাপুরুষত্ব সিদ্ধ হয় না। জ্ঞান হতে শমদমাদির বৃদ্ধি এবং শমদমাদি থেকে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। সদাচার থেকে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং জ্ঞান থেকে সদাচার বৃদ্ধি হয়। শম, দম, প্রজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা মুমুক্ষু মহাপুরুষাচার অভ্যাস

করবে। কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ ও বিষয় কামনা বর্জন করলে জ্ঞান ও সদাচার যুগপৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "প্রকৃত সাধন প্রভাবে মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে পরমপদে প্রবিষ্ট হয়।"

বিদেত বেদ্যমিদং হি মুনোবির্বশমেব
হি যাতি পরং পদম্। ১৫

—মুমুক্ষু প্রকরণ, ২০ সর্গ ১৫ শ্লোক

উৎপত্তি প্রকরণে আদি সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকরণে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মাই একমাত্র আদি পুরুষ ছিলেন। চিৎ-স্বরূপ ও বোধ-স্বরূপ নির্বাচণ পুরুষ সমুদয় সংসারী জীবের আদি প্রতি স্পন্দ; তা থেকেই প্রথম অহং ভাবের উদয় হয়ে থাকে। যেমন সূক্ষ্ম অনিল থেকে সূক্ষ্মতর প্রতি স্পন্দ উৎপন্ন, তেমন সেই প্রাচীন বা প্রথম প্রতিস্পন্দ অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে এই সমস্ত প্রজা বিস্তৃত হয়েছে।'

'নির্বাণ মাত্রং পুরুষর পরবোধঃ স এব চ।
চিত্তমাত্রং তদেবান্তে নায়াতি বস্তুধাদিতাম॥ ৩।৩।১৩
সর্বেষাং ভূতজাতানাং সংসার ব্যবহারিণাম্।
প্রথমঽসৌ প্রতিস্পন্দশ্চিত্ত দেহঃ স্বতোদয়ঃ॥ ৩।৩।১৪
অস্মাৎ পূর্ব্বাৎ প্রতিস্পন্দাদনন্যৈতৎ স্বরূপিনী।
ইয়ং প্রবিসৃতা সৃষ্টিঃ স্পন্দ সৃষ্টিরিবানিলাৎ॥ ৩।৩।১৫

"যিনি সাংখ্যের পুরুষ তিনিই বেদান্তবাদীর ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবাদীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, শূন্যবাদীর শূন্য। যিনি সূর্যচন্দ্রাদির তেজোময় প্রকাশ, যিনি শরীরে অবস্থান করতঃ বক্তা, অনুমন্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা ও কর্তা হয়ে প্রকাশিত, যিনি নিত্য হয়েও এই অনিত্য জগতে অবস্থিত হয়েছেন—তিনিই ব্রহ্ম।"

যঃ পুমান সাংখ্য দৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্।
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞান-বিদামেকান্ত নির্ম্মলম্॥ ৩।৫।৬
যঃ শূন্যবাদিনাং শূন্যোভাসকো যোঽর্ক তেজসাম্।
বক্তা মন্তা ঋতং ভোক্তা দ্রষ্টা কর্ত্তা সদৈব সঃ॥ ৩।৫।৭
সন্নপ্যসদয়ো জগতি যোদেহস্থোপি দূরগঃ।
চিৎ প্রকাশোহ্যয়ংযস্মাদালোক ইব ভাস্বতঃ॥ ৩।৫।৮

"ব্রহ্মছাড়া অন্যকিছু সত্য নয়। পুরোভাগে এই যে ভৌতিক আকাশ প্রভৃতি,

অন্তরে অহং প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে তা ব্যবহার দশায় জগৎ কিন্তু পরমার্থ দশায় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত বাস্তব পক্ষে জগৎ পদবাচ্য আর কিছুই নেই। যে কিছু দৃশ্য দেখা যায় সমস্তই অজর অব্যয়, ব্রহ্ম, অন্য কিছু নয়। পূর্ণে পূর্ণের প্রকাশ, শান্তে শান্তের অবস্থান। বস্তুতঃ দৃশ্য দ্রষ্টা ও দর্শন নাই। ইহা শূন্যও নয়, জড়ও নয়, কেবল শান্তময় বা ব্রহ্মময়।"

অময়কাশ ভূতাদি রূপোঽহ্মেতি বা ব্রহ্মময়।
জগচ্ছব্দস্য নামার্থোণনু নাস্ত্যেব কশ্চন॥ ৩।৪।৬৭
যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্দৃশ্য জাতং পুরোগতম্।
পরব্রহ্মৈবতৎ সর্বমজরামঃমব্যয়ম্॥ ৩।৪।৬৮
পূর্ণে পূর্ণং প্রসরতি শান্তে শান্তং ব্যবস্থিতম্।
ব্যোম্‌ন্যে বোদিতং ব্যোম ব্রহ্মানি ব্রহ্মতিষ্ঠতি॥ ৩।৪।৬৯
ন দৃশ্যমস্তি সদ্রূপং ন দৃষ্টা ন চ দর্শনম্।
ন শূন্যং ন জড়ং নো চিৎ শান্তমেবেদমাততম্॥ ৩।৪।৭০

এই দৃশ্য জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখময় জগতের মিথ্যাত্বের উপলব্ধিই মুক্তি। "দৃশ্য যদি থাকে তাহলে কদাচ দৃশ্য দুঃখের শান্তি হয় না। আবার দৃশ্য দুঃখের শান্তি না হলে দ্রষ্টার কেবল উপলব্ধি হয় না। দৃশ্যদর্শন নাহলে বোদ্ধবোধ্যভাব বিনাশপ্রাপ্ত হয়; বোদ্ধবোধ্যভাব অভাবগ্রস্ত হলে দ্রষ্টা তখন এক হয়। দৃশ্য থাকে থাকুক তাতে তত ক্ষতি নেই, পরন্তু তার জ্ঞানের উপশম আদরণীয়। কেননা দৃশ্য জ্ঞানের উপশম হওয়াই মোক্ষ।"

'সচ্চেন্ন শাম্যতি কদাচন দৃশ্য দুঃখং।
দৃশ্যেত্ব শাম্যতি ণ বোদ্ধরি কেবলত্বম॥
দৃশ্যেত্ব সম্ভবতি বোদ্ধরি বোদ্ধভাবঃ।
শাম্যেৎ স্থিতোপি হিতদস্য বিমোক্ষমাহুঃ॥ ৩।৩।৪০

স্থিতি প্রকরণে দেখি দৃশ্যমান জগৎকে স্বপ্নের মতো মিথ্যা বলা হয়েছে। 'জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় দশায় ভেদ—স্থির ও অস্থির ঘটিত। পরিষ্কার কথা এই যে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান দীর্ঘস্বপ্ন ও জগৎ এবং অপরিস্ফুট প্রতীয়মান ক্ষণিক জগৎ ও স্বপ্ন এক বলে গণ্য।'

"জাগ্রৎ স্বপ্নদশা ভেদোন স্থিরাস্থিরতে বিনা।
সমঃ সদৈব সর্ব্বত্র সমস্তোহনু ভর্বোনয়োঃ॥ ৪।১৯।১১

স্বপ্নোঽপি স্বপ্নসময়ে স্থৈর্য্যাজ্জাগ্রত্বমৃচ্ছতি।
অস্থৈর্য্যাজ্জাগ্রদেবাস্তে স্বপ্নস্তাদৃশবোধতঃ ॥" ৪।১৯।১২

'উপশমপ্রকরণে' মুক্তিকামীকে মন বা প্রাণ সংযত করার কথা বলা হয়েছে। মনের বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় না। কিন্তু মনের বন্ধন থেকে কেমন করে মুক্তিলাভ করা যাবে ? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে প্রথমে শাস্ত্রোপদেশ, পরম বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্তের পবিত্রতা সাধন করতে হবে এবং তারপর প্রকৃত জ্ঞানবান গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হলে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আত্মাতেই উপলব্ধি করা যায়। আত্মার অবিনশ্বরত্ব যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করে, তারপক্ষে সংসারের দুরপনেয় মোহ দূর করা সম্ভব হয়। আত্মার প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞানই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ। আত্মাতে দেহের অধ্যাস বিদূরিত হলে সকল প্রকার কল্পিত দুঃখ নিবৃত্ত হবে। আত্মা বিশুদ্ধ স্বভাব ও জ্ঞান স্বরূপ। দেহের বিকারে আত্মার কোনো বিকার হয় না। জ্ঞান ব্যতিরেকে এই দুঃসহ সংসার শান্ত হয় না। (৫ম সর্গ)

৯১ সর্গে বলা হয়েছে যে পঞ্চভৌতিক দেহই সংসার লতার বীজ। দেহে কর্মরূপ অঙ্কুর বিদ্যমান থাকে। আশাপথানুসারী চিত্ত শরীরের বীজ। যখন প্রাণ-বায়ু স্পন্দিত হয়, তখন জ্ঞানময় চিত্তের উৎপত্তি হয়। প্রাণস্পন্দনশূন্য চিত্তের যে নিষ্ক্রিয়তা তার নাম মোক্ষ। প্রাণায়ামাদির অভ্যাসে প্রাণস্পন্দনের নিরোধ হয়। সংবিদের সঙ্গে প্রাণস্পন্দন ও বাসনার সম্বন্ধ না থাকলে মুক্তিপথে আরোহণ করা যায়। প্রাণস্পন্দন অথবা বাসনা এই দুইটি চিত্তের কারণ। এদের মধ্যে একটি ধ্বংস হলে, দুইটিই বিনষ্ট হয়। বাসনার প্রকাশে সংবিদের প্রকাশ। সেই সংবিদই প্রাণস্পন্দনকে বিকসিত করে এবং তাতেই চিত্তের জন্ম হয়।

"ত্রিভুবন এই বিশুদ্ধ সংবিদের রূপ, সংবেদ্য বলে অপর কিছুই নাই। অন্তরের এই দৃষ্টি নিশ্চয়কে পণ্ডিতেরা সম্যক জ্ঞান বলে। সুতরাং এই সংবিদের যা পূর্বদৃষ্ট এবং যা পূর্ব আকৃষ্ট সে সমুদয় জ্ঞানী ব্যক্তি দূর করবে। কারণ এই সব দূর করলে বিশাল সংসারের সঙ্গে আত্মার সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকে এবং এই সব দূরী-করণ মোক্ষরূপে অনুভূত হয়।"

শুদ্ধৈব সংবিৎ ত্রিজগৎ সাংবেদ্যংনান্যদস্ত্যলম্।
ইত্যন্তনিশ্চয়ো রূঢ়ঃ সম্যগ্‌ জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৭৪
পূর্ব্বদৃষ্টমদৃষ্টং বা যদস্যঃ প্রতিভাসতে।
সংবিদস্তং প্রযত্নেন মার্জ্জনীয়ন্তং বিজানতা ॥ ৭৫

তদমামার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসার সঙ্গতম্।
তৎ প্রমার্জ্জন মাত্রস্তু মোক্ষ ইত্যনুভূয়তে॥ ৭৬
উপসমপ্রকরণ, ৯১ সর্গ। ৭৫-৭৬

'নির্ব্বাণ প্রকরণে' মোক্ষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নির্ব্বাণ প্রকরণে পূর্বভাগে ১২০ অধ্যায়ে মোক্ষ বা নির্বাণের বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমে সৎ সংসর্গে থেকে শাস্ত্রচর্চা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিষ্কার করতে হবে। এই হল যোগী বা মুমুক্ষুর যোগের প্রথম ভূমিকা। তারপর 'বিচরণা' নাম্নী দ্বিতীয় ভূমিকা। তারপর অসঙ্গ আত্মার যে ভাবনা তা তৃতীয় ভূমিকা। তৎপরে বাসনা বিলয় দ্বারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করে অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চের যে বাধ তাই চতুর্থী ভূমিকা। তারপরে বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দরূপা যে অবস্থা তাহম হল পঞ্চমী ভূমিকা। এই অবস্থায় যোগী অর্ধসুপ্ত অর্ধ প্রবুদ্ধের ন্যায় জীবন্মুক্তরূপে অবস্থান করে। তারপরে সহজেই ব্রহ্মাকারের অনুভব হলে তাদৃশ্য অনুভববৃত্তি ষষ্ঠী ভূমিকা। তারপর তাদৃশ বৃত্তি ও ক্ষণ চলে গিয়ে একমাত্র ব্রহ্মই পূর্ণস্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকেন; তখন জীবিত অবস্থায় যে অবস্থিতি তাই সপ্তমী ভূমিকা। এই সপ্তমী ভূমিকাকেই তুরীয় অবস্থা বলা হয়।

নির্বাণ প্রকরণে পূর্ব্বভাগে ১২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইচ্ছাই সব অনর্থের মূল। বাহ্য বিষয়ে স্মৃতিরহিত করলে ইচ্ছাবিনষ্ট হয়।

"সংকল্প পরমবন্ধন সংকল্প শূন্যতাই মোক্ষ। অতএব তুমি সমস্তই শান্ত, অজ, অনন্ত, ধ্রুব, অব্যয়, চিদ্রূপ জ্ঞান করে শান্তভাবে সুখে অবস্থান কর। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাদৃশ ভেদ বিস্মৃতিকে জীবব্রহ্মের একতারূপ যোগ বলে জানে। অতএব বাসনা শূন্য হয়ে (এরূপ) যোগ অবলম্বন করে কর্ম করতে থাকে। যদি সমাধিস্থ হও তবে কর্ম করিও না। বুধগণ বাহ্যবস্তুর নিস্কৃতিপূর্বক যথার্থ চিত্তক্ষয়কেই যোগ বলে জানেন।"

'সংকল্পনং পরো বন্ধস্তদভাবো বিমুক্ততা॥ ৯৭
সর্ব্বমেবমজং শান্তমনন্তং ধ্রুবমব্যয়ম।
পশ্যন্ ভূতার্থ চিদ্রূপং শান্তমাসস্ব যথা সুখম॥ ৯৮
আবেদনং বিদুর্যোগং শান্তমাসিতমক্ষয়ম্।
যোগস্থঃ কুরু কর্মানি নির্ব্বাসনোঽথ মাকুরু॥ ৯৯
অবেদনং বিদুর্যোগং চিত্তক্ষয়ম্ কৃত্রিমম্। ১০০

যোগবাশিষ্ঠে নির্বাণের সাতটি স্তর পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রজ্ঞার সাতস্তরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে অধ্যাত্মতত্ত্বের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই তত্ত্ব কর্ম-ত্যাগের কথা বলে না। কী প্রকারে অজ্ঞানান্ধ বদ্ধ জীব জ্ঞানে অধিষ্ঠিত থেকে কর্মদ্বারা মোক্ষ লাভ করতে পারে, এই রামায়ণে তারই উপদেশ দেখা যায়। যোগ-যুক্ত হয়ে ভোগ এবং জ্ঞানযুক্ত হয়ে কর্মসাধনাই যোগবাশিষ্ঠের মুখ্য উপদেশ। 'জ্ঞান কর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্'—এই হল মর্মকথা। ইহা বেদান্ত ও যোগ শাস্ত্রের জ্ঞান ও কর্মের যুক্তবেণী।

এখানে যোগবাশিষ্ঠ মতের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধের মতের মিল দেখি শঙ্করের সঙ্গে নয়। শঙ্কর দৃশ্যমান জগতের ব্যবহারিক সত্য স্বীকার করেছেন কিন্তু যোগ-বাশিষ্ট বা বিজ্ঞানবাদী বুদ্ধরা জগতের কোনো সত্যতা স্বীকার করেননি। এই প্রসঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের 'দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ' মতবাদ মনে পড়ে। জীবের দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টির মূল এবং জীবের বিষয় দর্শন মিথ্যা।

স্পষ্টই বোঝা যায়, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য রামকথা প্রচার নয়। জগৎ সংসারের মিথ্যাত্ব এবং জগৎ সংসারের পশ্চাতে এক অবিনশ্বর তত্ত্ব প্রচার করা এই গ্রন্থের মূলকথা। সুতরাং বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এই রামায়ণের কাহিনীগত ও ভাবগত অমিল আছে।

খ. অধ্যাত্ম রামায়ণ—

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত। হর-পার্বতী সংবাদে এই রামায়ণের উদ্ভব। রামের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব প্রচার করা এই গ্রন্থের মুখ্য-উদ্দেশ্য। তাই দেখি আদিকাণ্ডে মহাদেব পার্বতীর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন—

> "রাম পরাত্মাপ্রকৃতেরনাদিরানন্দ একঃ পুরুষোত্তমো হি। ১৭
> স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা ন ভো বদন্তর্ব্বহিরাস্থিতোয়ঃ।
> সর্ব্বান্তরস্থোহি নিগূঢ় অত্মোস্বমায়য়া সৃষ্ট্বা মিদং বিচষ্টে॥ ১৮
> জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি যৎসন্নিধৌ চুম্বক লৌহবদ্ধি।
> এতন্ন জানন্তি বিমূঢ় চিত্তাঃ স্বা বিদ্যয়া সংবৃত মানসা যে॥" ১৯
>
> (আদিকাণ্ড— ১।১৭-১৯)

"শ্রীরামপরমাত্মা। তিনি প্রকৃতির পর অনাদি, এক, অদ্বিতীয়, আনন্দ-স্বরূপ, পুরুষোত্তম পর ব্রহ্ম। যিনি স্বীয় প্রভাবে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহ্যে স্বপ্রকাশ, স্বর্ব্বান্তর্যামী নিগূঢ়, আত্মারূপে অবস্থিত রয়েছেন। এই বিশ্ব সংসার চুম্বক সন্নিধানে লৌহের ন্যায় যাঁর চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে। যাদের অন্তঃকরণ অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা একথা জানতে পারে না।"

অধ্যাত্ম রামায়ণে যদিও রামায়ণের মতো সাতটি কাণ্ড আছে, তথাপি রামকাহিনী এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। তার কারণ এই গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য রামের পূর্ণ ব্রহ্মত্ব উপস্থাপন করা। সেজন্য যতটুকু কাহিনী দরকার ততটুকু আমরা এখানে পাই। যে ঘটনা বা উপাখ্যান রামের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠার অনুকূল নয় তা এখানে উপেক্ষিত বা অনুল্লিখিত। তাই প্রতি অধ্যায়ে দেখি বিভিন্ন মুনিঋষির দ্বারা বা রামের নিজের দ্বারা রামের স্বরূপ প্রকাশিত। তাই শুনি ঋষি বশিষ্ঠের মুখে :

'রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৩
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।
স এব জাতো ভবনে কৌসল্যায়াং তবানঘ ॥' ১৪

—আদিকাণ্ড, ৪।১৩-১৪

"রাম মানুষ নয়। পরমাত্মা সনাতন। ভূভার হরণার্থ পূর্বে ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে এক্ষণে তোমার গৃহে কৌশল্যার গর্ভে রামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

তাই রামের মনুষ্যোচিত আচরণ আমরা এই রামায়ণে পাই না। রামের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের কাহিনী এখানে নেই। "কিন্তু রামায়ণে যে পারিবারিক আদর্শ আছে তাহার আর তুলনা হয় না। সত্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, পত্নীপ্রেম, সৌভ্রাত্র, প্রভুভক্তি, আশ্রিত রক্ষা প্রভৃতি যে সকল গুণে সমাজে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সুখ সহজলভ্য হয়, যে সকল গুণে মানুষ দেবতার পদে উন্নীত হইতে পারে, নিখিল চিত্তমথনকারী মনোহর উপাখ্যানের মাধ্যমে অদ্ভুত সুন্দরভাবে সকলকে প্রীত ও বিস্মিত করে সে সকল গুণ ও আদর্শ রামায়ণে প্রতিফলিত হয়ে আছে। রামের চরিত্রে গৌরব, লক্ষ্মণ ও ভরতের কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভ্রাতৃভক্তি, সীতার চরিত্রের বিপুল মাধুর্য ও মহিমা, হনুমানের ভক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা —এই সমস্ত আমাদের হৃদয়ের বস্তু। ইঁহাদের চরিত্র বাল্মীকির মহাকাব্যে মানবিকতার আধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবত্বের পদে উন্নীত হইয়াছে। অথচ তাঁহাদের চরিত্রের মানবিকগুণেই তাঁহারা আমাদের কাছে এত প্রিয়, এত আপনার হইয়া রহিয়াছেন।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সাংস্কৃতিকী'তে 'রামায়ণ' প্রবন্ধ)।

বাল্মীকি-রামায়ণে একটি আকর্ষণীয় প্রতিবেদন আছে যা অধ্যাত্ম রামায়ণে নেই। রামের দুঃখের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বাল্মীকি মনে হয় আমাদের একটু সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকৃতির রূপের বর্ণনা করেছেন। তাঁর সেই অপরূপ বর্ণনায় বিমোহিত হয়ে সত্যই যেন সাময়িকভাবে আমরা দুঃখ ভুলে যাই। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এরূপ প্রকৃতির বর্ণনা নেই।

রামায়ণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনায় দুই রামায়ণ-কবির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উপস্থাপিত দেখি। প্রথম ঘটনা রামের বনগমন। বাল্মীকি যেভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন তা পাঠ করলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বাল্মীকি অতি বিশদভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত। রাম যেন অতি সহজেই অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মতো ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন। আবার দেখি রাম যখন ঘটনাটি লক্ষ্মণ ও কৌশল্যাকে বললেন, লক্ষ্মণ তখন ক্রোধে উন্মত্ত, কৌশল্যা শোকে মুহ্যমান। রাম তাঁদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে যা বললেন তা সম্পূর্ণ বেদান্ত দর্শনের কথা। রাম লক্ষ্মণকে বললেন, "এ সংসার অনিত্য, ক্রোধ শত্রু অতএব তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর।" এই পরিবেশে এই সংলাপ নিতান্তই বিসদৃশ মনে হয়। যখন আমরা শোকে মুহ্যমান এবং কৈকেয়ীর আচরণে নিন্দায় পঞ্চমুখ তখন এই বেদান্তর তত্ত্বজ্ঞান আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে কি? ভরত যখন রামকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রকূটে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে কৈকেয়ীও ছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে ঠিক এই পরিবেশে রাম ও কৈকেয়ীর মধ্যে কোনও সংলাপ দেখি না। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এখানে রাম ও কৈকেয়ীর মধ্যে দীর্ঘ সংলাপ দেখি। কৈকেয়ী বললেন—

'ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ৫৯
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্ম্মাচরমন্দিরম্।
অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ॥ ৬০
পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নাথ নামোঽস্তুতে।

* * *

কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ।
যদাহ মাং মহাভাগে নানৃত্যং সত্যমেব তৎ
ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা॥ ৬৩
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তবা।
গচ্ছত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্॥ ৬৪
সর্বত্র বিগতস্নেহামদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেঽচিরাৎ। ৬৫
ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া।
প্রণম্য শতশো ভূমৌযযৌ গেহং মুদান্বিতা॥ ৬৮

—অযোধ্যাকাণ্ড, ৯।৫৭-৬০।৬৩-৬৫।৬৮

"কৈকেয়ী বললেন, 'তুমিই দেবকার্য করবার জন্য আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছিলে বলে

আমি পাপ মনে পাপকার্য করেছি। তুমি দেবগণের অগোচর, হে বিশ্বেশ্বর, হে অনন্ত, হে জগন্নাথ আমাকে পরিত্রাণ কর।' কৈকেয়ীর কথা শুনে রাম ঈষৎ হেসে বললেন, 'তুমি যা বলেছ তা মিথ্যা নয়। সত্য, দেবকার্য সিদ্ধির জন্য আমার প্রবর্তিত কথাই তোমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে। এতে তোমার দোষ কি? যাও তুমি প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে মনে মনে ভাবনা কর। আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি বশতঃ সর্বত্র স্নেহ শূন্য হয়ে অচিরে মুক্তি লাভ করবে।' কৈকেয়ী তখন আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে রামকে শতশতবার ভূতলে প্রণাম করে গৃহে প্রত্যাগত হলেন।" রাম ও কৈকেয়ীর এরূপ আচরণ আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল সীতাহরণ। রামের দুঃখ এখানে আরও গভীর, আরও মর্মস্পর্শী। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতাহরণের ঘটনা অন্যরূপে বর্ণিত। রাম নির্জনে সীতাকে বললেন,

"শৃণু জানকি মে বচঃ— ১
রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্।
ত্বন্তচ্ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ॥ ২
অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া।
রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ববৎ প্রাপ্স্যসে শুভে॥ ৩
শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাপি তত্র তথাকরোৎ।
মায়াসীতাং বহিঃস্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেঽনলে॥ ৪

—অরণ্যকাণ্ড, ৭।১-৪

"জানকি। আমার কথা শুন। রাবণ ভিক্ষুরূপে তোমার নিকট আসবে। তুমি তোমার সদৃশ কৃতি ছায়া কুটীরে স্থাপন করে অগ্নিতে প্রবেশ কর। এবং আমার আজ্ঞাক্রমে তথায় এক বৎসরকাল অদৃশ্যভাবে অবস্থান কর। রাবণ-বধের পর, পূর্ববৎ আমাকে প্রাপ্ত হবে।' জানকি রামবাক্য শুনে তাই করলেন। মায়াসীতা বাইরে রেখে আপনি অনলে অন্তর্হিতা হলেন।"

মায়া সীতার জন্য এই রামায়ণে রামের দুঃখের গভীরতা নেই। কেবল কর্তব্যের জন্য রাবণ বধ করা।

বালীবধ রামের জীবনে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে যেহেতু রাম পরম ব্রহ্ম, সেই হেতু তিনি কখনও কোনও পাপ করতে পারেন না। এই দুই রামায়ণে বালীবধ ঘটনার কারণ বর্ণনা সম্পূর্ণ পৃথক। বাল্মীকি-রামায়ণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালীর ভর্ৎসনার উত্তরে রাম যা বলেছিলেন সেগুলি

অসার যুক্তি প্রতিভাত হলেও "তোমাকে ক্রোধ ভারে আম বধ করিনি, তোমাকে বধ করেও আমার মনস্তাপ হয়নি" রামের এই কথায় রাম চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে রামের যুক্তি :—

মহান্তো বিচরন্তি যৎ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্ নাতিভাষয়েৎ ॥ ৬৩
—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২য় অধ্যায়—৬৩

'মহৎ ব্যক্তিরা নিরাপদ সঞ্চারে জগৎ পবিত্র করে সঞ্চরণ করেন। অতএব তাঁদের কার্যের নিন্দা করতে নেই।'

এই কি সারবান যুক্তি? কিংবা

"তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্।
বালী প্রণম্য রভসাদ্রামং বচনং ব্রবীৎ— ৬৪
রাম রাম মহাভাগ জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্ ॥
অজানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষান্তমর্হসি ॥" ৬৫
—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২।৬৪-৬৫

'বালী একথা শোনামাত্র শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জেনে ভীত হল। অনন্তর প্রণাম করে পরমানন্দে রামকে বলল 'রাম, রাম, হে মহাভাগ এক্ষণে আপনাকে পরমেশ্বর বলে জানলাম। ইতিপূর্বে অজ্ঞানবশতঃ যা কিছু বলেছি তার জন্য ক্ষমা করুন।'

বালীর এই উক্তি ও আচরণ স্বাভাবিক কি? বাল্মীকি-রামায়ণে তারার শোকের উত্তরে রাম বলেছিলেন, 'এ বিধির বিধান' একে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অধ্যাত্ম রামায়ণে তারার শোকের উত্তরে রাম বললেন—

"কিং ভীরু শোচসি ব্যর্থং শোকস্যাবিষয়ং পতিম্।
পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ—১৩
পঞ্চাত্মকো জড়ো দেহস্তঙ্মাংসরুধিরাস্থিমান্।
কালকর্মগুণোৎপন্নঃ সোঽপ্যাস্তেঽদ্যাপি তে পুরঃ ॥ ১৪
মন্যসে জীবমাত্মানং জীবস্তর্হি নিরাময়ঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ॥ ১৫
ন স্ত্রী পুমান্ বা ষণ্ডো বা জীবঃ সর্বগতোঽব্যয়ঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽয়মাকাশ শব্দলেপকঃ।
নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমর্হতি ॥" ১৬

তারোবাচ

দেহোঽচিৎকাষ্ঠবদ্রাম জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ।
সুখদুঃখ্যাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্যাদ্রাম মে বদ ॥ ১৭

শ্রীরাম উবাচ

অহংকারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ১৮

—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩।১৩-১৮

"শ্রীরাম বললেন, 'হে ভীরু। তুমি পতির জন্য বৃথা শোক করছ কেন? যথার্থ বল দেখি রণভূমিতে শায়িত দেহ কিংবা জীব উভয়ের মধ্যে কাকে পতি বলে স্থির করেছ? যদি দেহকে পতি বল তাহলে শোকের বিষয় কিছু নাই, যেহেতু তা ত্বক, মাংস, রুধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত। পঞ্চভূতাত্মক, কাল অদৃষ্ট ও সত্ত্বাদি গুণ যোগে উৎপন্ন জড় দেহ অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আছে। যদি জীবাত্মাকে পতি বলে স্থির করে থাক, তাহলে শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু জীব নিরাময়, তার জন্ম, মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই। জীব স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়, ক্লীব নয়। তিনি সর্বত্রগ, অব্যয়, একমাত্র অদ্বিতীয় এবং আকাশবৎ নির্লেপ, তিনি নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়; তাঁর নিমিত্ত শোক কেন?'

তারা উত্তর দিল 'হে রাম যদি এই দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় নিত্য পদার্থ, তবে সুখদুঃখাদি ভোগ কার হয়?'

রাম উত্তর দিলেন, 'যাবৎ অবিবেক বশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অহংকার সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ পর্যন্ত জীবাত্মার সুখদুঃখাদির ভোগ হয়।'"

পতিশোকবিহ্বলা রমণীর কাছে এই যুক্তি যেমন অসার, তেমনি শোকসন্তপ্তা নারীর পক্ষে এরূপ জিজ্ঞাসা অস্বাভাবিকও বটে। এর ঠিক পরেই সীতার বিরহে কাতর রামের পক্ষে লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে পূজার নিয়ম বিধি আলোচনা নিতান্তই অশোভন।

অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকি-রামায়ণের মতো বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বৃত্তান্ত নেই, কিন্তু কেমন করে জনৈক চোর বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তার বৃত্তান্ত আছে। পুরাকালে এক ব্রাহ্মণ কিরাতদের মধ্যে বাস করতেন। পরিবার পালনে অসমর্থ হয়ে তিনি চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেন। একবার তিনি সপ্তর্ষির সম্মুখীন হতে তাঁদের বধ করতে উদ্যত হন। ঋষিগণ তাঁকে বলেন, 'তোমার পাপের ভাগী কে হবে, গৃহে গিয়ে জেনে এস।' পরিবারের কেউ তাঁর পাপের ভাগ নিতে সম্মত হল না। তখন তিনি করুণ কণ্ঠে ঋষিদের নিকট তাঁর পাপ থেকে উদ্ধার হওয়ার

পথ জিজ্ঞাসা করেন। ঋষিগণ দেখলেন যদিও 'রামনাম' জপ করাই মোক্ষের উপায়, কিন্তু এই নরাধমের সে সামর্থ্য নেই। তাই তাঁরা বললেন 'একাগ্রমনসাঽত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা'—'একাগ্রমনে 'মরা' শব্দ সর্বক্ষণ জপ কর।' ঋষিদের নির্দেশে তিনি তাই করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর দেহের উপর বল্মীকস্তূপ হল। পরে ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হতে তাঁকে বল্মীকস্তূপ থেকে বেরিয়ে আসতে বললেন। বল্মীক থেকে পুনর্জন্ম হল বলে তাঁর নাম হল বাল্মীকি।

রাবণের অভিচার হোম করার চেষ্টা অধ্যাত্ম রামায়ণে একটি নূতন সংযোজন যা আমরা বাল্মীকি-রামায়ণে পাই না। শুক্রাচার্যের পরামর্শে যুদ্ধে যাওয়ার আগে রাবণ হোম করার মনস্থ করে। যদি হোমে বিঘ্ন না হয় তবে রাবণ অজেয় হবে। তাই রাবণ হোমদ্রব্য সংগ্রহ করে নির্জন গুহায় মৌনী হয়ে হোম আরম্ভ করে। বিভীষণ হোমাগ্নি দেখে ভীত হয়ে রামকে হোমে বিঘ্ন ঘটাতে বলেন। বানর সেনা অগ্রসর হল। বিভীষণ-ভার্যা সরমা গুহাদ্বার দেখিয়ে দেয়। বানরেরা গুহায় প্রবেশ করে হোমদ্রব্য ছড়িয়ে দিয়ে রাবণকে প্রহার করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মৌনী রাবণ ধ্যান ত্যাগ করে না। তখন অঙ্গদ রাবণের অন্তঃপুরে গিয়ে মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করে হোমস্থলে নিয়ে আসে। মন্দোদরী করুণস্বরে রোদন করতে থাকলে রাবণ 'মন্দোদরীকে ত্যাগ কর' বলে খড়্গ ধারণ করে। এতে রাবণের হোমের বিঘ্ন ঘটে এবং ফলে সে ঈপ্সিত সিদ্ধিলাভে বঞ্চিত হয়।

—লঙ্কাকাণ্ড—১০ অধ্যায়

কাহিনীতে নূতনত্ব আছে সন্দেহ নেই কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আমরা কেমন করে কল্পনা করব যে রাবণের মতো দিগ্বিজয়ী রাজার অন্তঃপুর থেকে তার রাণীকে এক বানর কেশাকর্ষণ করে নিয়ে আসবে অথচ কেউ বাধা দেবে না—এটা কি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করা যায়?

রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃতের কল্পনা অধ্যাত্ম রামায়ণে আর একটি অদ্ভুত কাহিনী যা আমরা বাল্মীকি রামায়ণে পাই না। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাম যতবার রাবণের মুণ্ডচ্ছেদন করেন ততবার তা উদ্ভূত হয়। তখন বিভীষণ বললেন যে রাবণের নাভিদেশে কুণ্ডলাকার অমৃত আছে। আগ্নেয়াস্ত্রে তা শোষণ না করলে রাবণের মৃত্যু হবে না। রাম তখন আগ্নেয়াস্ত্রে রাবণের নাভিস্থিত অমৃত শোষণ করে ব্রহ্মাস্ত্রে তাকে বধ করেন। —লঙ্কাকাণ্ড—১১ অধ্যায়

কোন্ শক্তিবলে লক্ষ্মণ দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার আশ্চর্য কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নয় কিন্তু :—

যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ ৬৩
তেনৈব মৃত্যু নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্যদুরাত্মনঃ ॥ ৬৪ —লঙ্কাকাণ্ড, ৮

'ব্রহ্মা স্থির করে দিয়েছিলেন যে যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ আহার নিদ্রা বর্জিত, তাঁর হস্তে এই দুরাত্মার মৃত্যু হবে।' রামের সঙ্গে বনবাসে এসে পাছে রামচন্দ্রের সেবার ত্রুটি হয় এই ভয়ে লক্ষ্মণ দ্বাদশ বর্ষ আহার নিদ্রা বর্জন করেছিলেন। তাই তিনি ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও আমরা চরম অস্বাভাবিকতা দেখি যা আমাদের মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। আমরা কল্পনা করতে পারি না কেমন করে একজন ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বেঁচে থাকতে পারে।

উত্তরকাণ্ডের মধ্যে দেখি রামায়ণের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত। তত্ত্বজ্ঞান বিশেষভাবে বর্ণিত। পঞ্চম অধ্যায়ে রাম-গীতা ও সপ্তম অধ্যায়ে কৌশল্যা ও রামের কথোপকথনে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের আলোচনা দেখা যায়। এখানে দেখি কৌশল্যা রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জেনে ভক্তিভরে প্রণাম করে তত্ত্বকথার আলোচনা আরম্ভ করছেন। কৌশল্যার এই আচরণ নিশ্চয়ই আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের পরিপন্থী।

সন্দেহ নেই অধ্যাত্মরামায়ণের মূল উদ্দেশ্য রাম-কাহিনীর মাধ্যমে ভক্তিবাদ প্রচার করা। কিন্তু কাহিনী ও তত্ত্বকথার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সংগতি রক্ষা ঠিক ভাবে করা হয় নি। কোথাও নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ভাবে কোথাও বা নিতান্তই অশোভন ভাবে, অযৌক্তিক ভাবে এই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে রাম-কাহিনী সঠিক ভাবে বর্ণিত হয় নি, ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভক্তিবাদও পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হয়নি।

গ. অ দ্ভু ত রা মা য় ণ—(শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ দ্বারা অনূদিত—
ভবানীচরণ দ্বারা প্রকাশিত – কলিকাতা ১৩১১, বঙ্গাব্দ)

এই রামায়ণকে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পরিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়। এই রামায়ণের বর্ণিত বিষয় বাস্তবিক অদ্ভুত। রামায়ণটি শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তি-পূজ্য নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী। এখানে সীতার অদ্ভুত জন্ম বিবরণ, বিষ্ণু-ভক্ত রাজা অম্বরীষের উপাখ্যান, নারদ ও পর্বতমুনির অপূর্ব বৃত্তান্ত, জনক নন্দিনীর মাহাত্ম্য এবং অসিতারূপিণী সীতার হস্তে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ অদ্ভুত ভাবে বিবৃত আছে। প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের নিগূঢ় আত্মতত্ত্বকথা উপদিষ্ট হয়েছে।

রাজা অম্বরীষের কাহিনী দিয়ে রামায়ণের আরম্ভ। বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষের শ্রীমতী নামে এক কন্যা ছিল। একদিন নারদ ও পর্বতমুনি দুজনেই কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখে বলেন যে কন্যা যাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে, তাঁকেই তিনি কন্যাদান করবেন। দুজনেই নারায়ণের কাছে গিয়ে বলেন যে অপরের মূর্তি যেন বানরের মতো হয় এবং রাজকন্যা ছাড়া অপর কেউ যেন সেই মূর্তি দেখতে না পায়। কন্যা দুটি নরবানরের মূর্তি দেখে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এমন সময় রাজকন্যা দুই মূর্তির মাঝখানে এই সুন্দর যুবা পুরুষকে দেখতে পেলেন এবং তাঁকেই মাল্যদান করলেন। দুজনেই তখন নারায়ণের কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে এই কাজ নারায়ণের। তখন তাঁরা নারায়ণকে অভিশাপ দিলেন যে যে মূর্তি ধরে তিনি কন্যাকে হরণ করেছেন সেই মূর্তিতে তাঁকে অম্বরীষের বংশে জন্ম গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর ভার্যাকে রাক্ষস হরণ করবে। মুনিদ্বয় এই কথা বলে শোকসন্তপ্ত মনে স্থির করলেন যে দেহান্ত পর্যন্ত তাঁরা আর দার গ্রহণ করবেন না।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ দেবতার বরে বলীয়ান হয়ে ভীষণ অত্যাচারী হয়ে উঠল এবং ত্রিলোক জয় করল। মুনিদের নিকটে গিয়ে বলপূর্বক শরাগ্র দ্বারা তাঁদের দেহ থেকে শোণিত নিষ্কাশন করে এক কলসের মধ্যে স্থাপন করল। সেখানে গৃৎসমদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর শত পুত্র ছিল কিন্তু কোনও কন্যা ছিল না। তাঁর স্ত্রী কন্যা কামনা করলে ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে পাওয়ার জন্য প্রতিদিন মন্ত্র উচ্চারণ করে কুশাগ্র দিয়ে একটু দুধ একটি কলসে সঞ্চয় করতেন। রাবণ সেই কলসীতে মুনিদের শোণিত স্থাপন করল। সেই রক্তপূর্ণ কলসী গৃহে নিয়ে গিয়ে মন্দোদরীর হাতে তা দিয়ে রাবণ বলল যে এতে মুনিদের রক্ত আছে। এই রক্ত বিষ অপেক্ষা বীর্যসম্পন্ন। সুতরাং সে যেন এই রক্ত কাউকে না দেয় বা নিজে যেন পান না করে। পতিবিরহে কাতর হয়ে মরণ বাসনায় মন্দোদরী একদিন সেই শোণিত পান করে। তাতে তার গর্ভ সঞ্চার হয়। কিন্তু সাধ্বী রমণী হয়ে অহেতুক গর্ভ ধারণ করে কি করে স্বামীসকাশে যাবে এই চিন্তা করে মন্দোদরী তীর্থ দর্শনের ছলে কুরুক্ষেত্রে এসে গর্ভ নিষ্কাশন করল এবং গর্ভের সন্তানকে ভূতলে প্রোথিত করে সরস্বতীর জলে স্নান করে গৃহে ফিরল। কিছু কাল পরে কুরুক্ষেত্রে হল-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হলের সীতা থেকে একটি কন্যা উত্থিত হল। কন্যা বয়োপ্রাপ্ত হলে রাম সীতার পাণি গ্রহণ করলেন। অতঃপর রামচন্দ্র একটি বিশেষ কারণে সীতা লক্ষ্মণ সহ বনগমন করে দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর রাবণ সীতাকে হরণ করল। কুটিরে ফিরে এসে রাম সীতাকে

না দেখতে পেয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। রামের নয়নগলিত অশ্রু থেকে বৈতরণী নদীর উৎপত্তি হল।

অনন্তর রাম হনুমানকে বনে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেন। হনুমানের জিজ্ঞাসায় রাম তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন :—

"আত্মাযঃ কেবলঃ স্বচ্ছঃ শান্তঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ।
অস্তি সর্ব্বান্তরঃ সাক্ষাশ্চিন্মাত্রস্তমসঃ পরঃ॥ ৫
সোঽন্তর্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ।
স কালাগ্নিস্তদ ব্যক্তং সদ্যো বেদয়তি শ্রুতিঃ॥ ৬
অস্মাদ্বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে।
মায়াবী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনঃ॥ ৭

—একাদশ সর্গ—৫।৬।৭

"আত্মা কেবল-স্বচ্ছ, শান্ত, সূক্ষ্ম এবং সনাতন। তিনি সকলের অন্তরে চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত। তমোগুণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনিই অন্তর্যামী পুরুষ প্রাণ ও মহেশ্বর। তিনি কাল ও অগ্নি। শ্রুতি তাকে অব্যক্ত রূপে ব্যক্ত করেছে। তা থেকেই বিশ্বের উদ্ভব ও বিলয় হচ্ছে। তিনি মায়াবী, মায়ায় বদ্ধ হয়ে তিনি বিবিধ মূর্তি পরিগ্রহ করে থাকেন।"

'এষ আত্মা ব্যয়োঽব্যক্তো মায়াবী পরমেশ্বরঃ।
কীর্তিতঃ সর্ব্ববেদেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ॥' ৪৭

—একাদশ সর্গ

"আমি সেই আত্মা, সর্ববেদে আমিই সেই অব্যক্ত মায়াবী সর্বতোমুখ সর্বাত্মা পরমেশ্বর বলে কীর্তিত হয়েছি।"

অনন্তর হনুমান রামকে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়ে সমুদ্র পারের নিমিত্ত সমুদ্রধারে এল। লক্ষ্মণ যখন সমুদ্রকে বললেন যে যাতে বানরগণ তোমার উপর দিয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা কর। সমুদ্র সে কথায় কর্ণপাত করলে না। তখন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে সমুদ্রে পতিত হলেন। লক্ষ্মণের দেহাগ্নি শিখায় সমুদ্রের জল শুকিয়ে গেল। রাম তখন সীতাবিরহজাত অশ্রুজলে জলধিকে পূর্ণ করলেন। অতঃপর সেতুবন্ধন হল। এবং রাবণ বংশ ধ্বংস হল। সীতাসহ রাম অযোধ্যায় ফিরলেন। অতঃপর মুনিঋষিরা রাবণ নিধন কিরূপে হল জিজ্ঞাসা করলে সীতা বললেন, 'নিকষার গর্ভে দুজন রাবণ জন্ম গ্রহণ করে। একজন সহস্রবদন এবং আর একজন দশবদন। দশবদন থাকে লঙ্কায় এবং সহস্রবদন থাকে পুষ্করে।'

সসৈন্যে রাম পুষ্করদ্বীপে গমন করেন। রাম সৈন্যে ও রাক্ষস সৈন্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। রাবণ কর্তৃক রাম সৈন্য ধ্বংস ও রাবণ শরে রামের মূর্ছা হয়। তখন সীতা-কর্তৃক সহস্রবদন রাবণ বধ হয়। রাম সীতার সহস্র নাম উচ্চারণ করে স্তব করেন।

এই রামায়ণের রচয়িতার নাম বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত নেই। এই রামায়ণের কাহিনী অদ্ভুতভাবে বর্ণিত বলে এই রামায়ণ অদ্ভুত রামায়ণ নামে খ্যাত। কিন্তু এর অস্বাভাবিকতার সঙ্গে বোধ হয় আর কারও তুলনা হয় না। যে রাম-কাহিনীর সঙ্গে ভারতের আবালবৃদ্ধ বণিতার অন্তরের যোগ আছে তা যে এমন বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে তা আমাদের কল্পনাতীত; এই রামায়ণের যা-কিছু মূল্য আছে তা শুধু এর তত্ত্বকথার। আবার এই তত্ত্বকথার সঙ্গে এর কাহিনী অতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সংশ্লিষ্ট। বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে এই রামায়ণের কোনও অংশের মিল দেখতে পাওয়া যায় না। যদি এই রামায়ণের মূল উদ্দেশ্য হয় তত্ত্বকথা প্রচার করা তবে বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে এর মূলগত প্রভেদ আছে। কারণ বাল্মীকি-রামায়ণ মূলতঃ ভক্তিরসের কাব্য নয়।

ঘ. আনন্দরামায়ণ—(প্রকাশক—পণ্ডিত পুস্তকালয়, বারাণসী, ১৯৭৭)

এই রামায়ণে ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিকতত্ত্ব এবং রামের কার্যাবলীর বর্ণনা আছে। রামায়ণটি ১৫ শতাব্দীতে রচিত হয়। হর-পার্বতীর সংবাদে রামায়ণটি রচিত। এখানে মোট শ্লোক সংখ্যা আছে ১২২৫২টি। আনন্দ রামায়ণের উপাদান অধ্যাত্ম, অদ্ভুত এবং বাল্মীকির-রামায়ণ থেকে গৃহীত। এখানে মোট নয়টি কাণ্ড আছে, যেমন—সার কাণ্ড, যাত্রা কাণ্ড, যাগ কাণ্ড, বিলাস কাণ্ড, জন্ম কাণ্ড, বিবাহ কাণ্ড, রাজ্য কাণ্ড, মনোহর কাণ্ড এবং পূর্ণ কাণ্ড। ১০৯টি সর্গে রামায়ণটি রচিত। বর্ণনাশৈলী বেদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এবং বর্ণনা ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ। পরমাত্মারাম, রামমন্ত্র, রামের সহস্রনাম স্তোত্র, রামপূজা, রামনাম জপ এবং রামের বহু নূতন কাহিনী এখানে দেখা যায়। ১৫টি শ্লোকে রামচন্দ্র সীতাকে বেদান্তের সারাংশ বর্ণনা করেন এবং রামায়ণকে দেহ রামায়ণ অর্থাৎ দেহের অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করেছেন।

বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব এখানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলেও রামায়ণ-বহির্ভূত বৈশিষ্ট্য অনেক আছে: (ক) এখানে এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যা বাল্মীকি-রামায়ণ বা অন্য রামায়ণে উল্লিখিত নেই। যেমন:—

১) দশরথের মহিষীদের মধ্যে পায়স বণ্টনের সময় এক শকুনি কৈকেয়ীর পায়স ছিনিয়ে নিয়ে অঞ্জনী পর্বতে ফেলে দেয়। এরপর অন্য রানীরা তাঁদের অংশ থেকে কিছু অংশ কৈকেয়ীকে দিয়েছিলেন। (১:১)

২) সীতার স্বয়ংবরে রামের সঙ্গে রাবণের উপস্থিতি অনেক রামায়ণে উল্লিখিত আছে। কিন্তু ধনুক ওঠাতে গিয়ে রাবণের যে বিপর্যয় হয়েছিল তা কেবল আনন্দ রামায়ণে আছে। রাবণ ধনুক ওঠাতে গেলে ধনুক উল্টে গিয়ে রাবণের উপরে পড়ে। রাবণ ধনুকের নীচে গিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। এই দেখে বিশ্বামিত্র রামকে ধনুক উঠিয়ে রাবণকে রক্ষা করতে বলেন এবং রাম তাই করেন (১ : ৩ : ৭৭-৮৫)। এই ঘটনা পরিবর্তিত আকারে 'তোরবেও রামায়ণে' এবং 'পাঞ্জাবী সম্পূরণ রামায়ণে' আছে।

৩) রাম-সীতার বিবাহের পর অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার পথে স্বয়ংবরে পরাজিত রাজারা তাঁদের আক্রমণ করে। রাম তাঁর ভ্রাতাদের সহায়তায় রাজাদের পরাজিত করেন। (১ : ৪)

৪) রাম-সীতার বিবাহের আগে পূর্বানুরাগের কথা অনেক রামায়ণে উল্লেখ আছে। কিন্তু আনন্দ রামায়ণে পূর্বানুরাগের বর্ণনা অন্যান্য রামায়ণ থেকে ভিন্ন। এখানে উল্লিখিত আছে যে স্বয়ংবর সভায় রামকে দেখে সীতা প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর সখীকে বলেন যে, রাম ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে তিনি বাঁচবেন না। তিনি তখন দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা জানান যে স্বয়ংবরে প্রদত্ত ধনু যেন পুষ্পের মতো হয়ে যায় এবং আরও প্রার্থনা করেন যে রাম যদি সফল হন তবে তিনি ১৪ বৎসর বনবাসে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করবেন। রামের বনবাসের সময় রামের সঙ্গে বনগমন করার তিনি এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে "রামকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই ১৪ বৎসর বনে যাওয়ার ব্রত করেছিলেন।"

> সর্ব্বৈরেতন্মহচ্চাপং করণীয়ং তু পুষ্পবৎ।
> প্রবেশনীয়ং যুষ্মাভিঃ শ্রীরামভুজদণ্ডয়োঃ॥ ১১৯
> চতুর্দশ-বৎসরাণি মুনিবৃত্ত্যাঽনুবর্তিনী।
> বিচরামি বনে চাহং ধনুঃ সজ্জং করোত্বয়ম্॥ ১২০

—সারকাণ্ড, সর্গ ৩, ১১৯।১২০, পৃ. ১৭

৫) এই রামায়ণে একপত্নীত্ব ব্রতের উল্লেখ আছে। রাম বলেছিলেন যে "সীতা ছাড়া অন্য নারীদের তিনি কৌশল্যার মতো দেখেন—"

> অন্যৎ সীতাং বিনাঽন্যা স্ত্রী কৌশল্যাসদৃশী মম।
> ন ক্রিয়তে পরা পত্নী মনসাঽপি ন চিন্তয়ে॥ ১৩

—বিলাসকাণ্ড, সর্গ ৭।১৩

৬) অন্ধমুনির পুত্রের নাম এখানে অবণ (সারকাণ্ড, সর্গ ১, ৯২)

৭) সীতাহরণের তিন কারণ : (১) চন্দ্রনখা বা শূর্পণখা-পুত্র শম্বুক বধ, (২) শূর্পণখার বিরূপীকরণ, (৩) রাবণের সীতাকে পত্নীস্বরূপ প্রার্থনা ও সীতার প্রত্যাখ্যান।

৮) মায়াসীতার একটি পরিবর্তিত রূপ এই রামায়ণে পাওয়া যায়। খরাদি বধের পর রাম "সীতাকে তিন রূপে বিভক্ত হওয়ার আদেশ দেন। রজো রূপে তিনি অগ্নিতে বাস করবেন, সত্ত্ব রূপে তিনি রামের অঙ্গে থাকবেন এবং তমোরূপে তিনি বনে বাস করবেন—"

> সীতে ত্বং ত্রিবিধা ভূত্বা রজোরূপা বসানলে ॥ ৬৭
> বামাঙ্গে মে সত্ত্বরূপা বস ছায়া তমোময়ী।
> পঞ্চবট্যাং দশাস্যস্য মোহনার্থং বসাত্র বৈ ॥ ৬৮

—সারকাণ্ড, সর্গ ৭

রাবণ কেবল তমোময়ী সীতাকে হরণ করেছিল।

৯) রামের বলপরীক্ষা কাহিনীর একটি নূতন রূপ এখানে পাওয়া যায়। বালী কোনও এক গুহার মধ্যে বহু তাল ফল রেখেছিল। তার মধ্যে সাতটি ফল কেউ একজন নিয়ে যায়। গুহার মধ্যে একটি সাপ দেখে বালী তাকে চোর মনে করে শাপ দেয় যে তার শরীরের উপরে সাতটি তাল বৃক্ষ জন্মাবে। সাপও বালীকে প্রতিশাপ দিয়ে বলে, যে ব্যক্তি ঐ সাতটি তাল বৃক্ষ কাটতে পারবে সেই তোমাকে বধ করবে। রামচন্দ্র চক্রাকারে সাপের শরীরের উপর সাতটি তাল বৃক্ষ দেখেন এবং লক্ষ্মণের সাহায্যে সাপটিকে সোজা করে দিয়ে এক বাণে সাতটি তাল বৃক্ষ কেটে ফেলেন। এ দেখেও সুগ্রীবের রামের শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হল না। সুগ্রীব তখন রামকে বালীর মালার কথা বলে। কশ্যপ কঠোর তপস্যা করে এই মালা শিবের কাছে পান এবং পরে পুত্র ইন্দ্রকে ঐ মালা দান করেন। ইন্দ্র আবার ঐ মালা বালীকে দেন। এই মালার বিশেষত্ব এই যে কোনও শত্রু যদি এই মালা দেখে তবে সে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। বালী সব সময় এই মালা পরে থাকে। রাম তখন সেই সাপকে, যে সপ্ততালবৃক্ষ কাটার ফলে শাপমুক্ত হয়েছিল, আদেশ দিলেন যে সে যেন কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে বালীর শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে বালী যখন শয়ন করতে যাবে সেই সময় মালা নিয়ে আসে। সাপ সেই মালা নিয়ে এসে ইন্দ্রকে দিয়ে দেয়। এরপর সুগ্রীব বালীকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে (১ : ৮ : ৩৫-৪৬)।

১০) আহত বালীকে রাম বলেছিলেন যে "তুমি দ্বাপরে ভীল হয়ে পূর্ব

শত্রুতার জন্য আমার পা বাণবিদ্ধ করবে। আর এখন তুমি আমার হাতে মরার জন্য মুক্তি প্রাপ্ত হবে।"

যদ্যপি ত্বং দুরাচারো নিহতোঽসি রণে ময়া।
তথাপি ভিল্লরূপেণ দ্বাপরান্তেঽঙ্ঘ্রিং মম ॥ ৬৬
ভিত্বা প্রভাসে বাণেণ পূর্ববৈরেণ বানর।
ততো মদ্ধস্তমরণস্যাস্য কারণগৌরবাৎ ॥ ৬৭
মুক্তিং গচ্ছসি ত্বং বালিন্ শুভাং জন্মান্তরেণ হি,।

—১ : ৮ : ৬৬-৬৮, পৃ. ৭৫

১১) 'রাম হনুমানকে সীতাকে দেওয়ার জন্য নিজের আংটি ছাড়াও মন্ত্র দিয়েছিলেন এবং পূর্বে যে রাম সীতার কপালে মনঃশিলারসে তিলক এঁকে দিয়েছিলেন এবং কপোলে পত্রাবলী রচনা করেছিলেন সেই বৃত্তান্ত হনুমানকে শুনিয়েছিলেন।'

"ততো রামো মুদ্রিকাং স্বাং দদৌ মারুতিসৎকরে।
মন্নামাক্ষরযুক্তেয়ং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ। ১৩
ততো রামো নিজং মন্ত্রং দদৌ তস্মৈ হনূমতে।
... ...
... ...
সদ্বৃত্তং রাঘবঃ প্রাহ চিত্রকূটে পুরা কৃতম্।
মনঃশিলায়াস্তিলকং সীতাভালে বিনির্মিতম্ ॥ ৯৬
গণ্ডয়োঃ পত্রবল্ল্যাদি সীতায়ৈ কথ্যতাং রহঃ।
ততস্তে প্রস্থিতাং সর্ব্বে পশ্চিমাদিষু দিক্ষু চ ॥" ৯৭

—১ : ৮ ৯৩-৯৭, পৃ. ৭৭

১২) হনুমান ছোট বালকের রূপ ধরে লঙ্কায় প্রবেশ করেছিল। (৮ : ৭ : ২৯)

১৩) ত্রিজটা বিভীষণের পত্নী ছিল। (১.৯.১০১)

১৪) অশোকবনে হনুমানের ফল ভক্ষণ :—হনুমান সীতার কাছে অশোকবনে ফল খাওয়ার অনুমতি চাইলে সীতা নিজের হাতের কঙ্কণ খুলে দিয়ে হনুমানকে বললেন যে, সে যেন এই দিয়ে লঙ্কায় দোকান থেকে ফল কিনে খায়। হনুমান সেই কঙ্কণ সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে যে অন্য ব্যক্তির পাড়া ফল সে খায় না। এই বলে হনুমান যখন চলে যাচ্ছে তখন সীতা তাকে বলেন যে যে ফল মাটিতে পড়ে আছে সেই ফল সে খেতে পারে। এই কথা শুনে হনুমান লেজ দিয়ে বনের সমস্ত গাছে ঝাঁকানি দেয়। তাতে সব গাছের সব ফল মাটিতে পড়ে

যায়। সব ফল খেয়ে, যাওয়ার সময় হনুমান সমস্ত গাছ ভেঙে দিয়ে যায়। (১ : ৯ : ১২৩-৩৬)

১৫) লঙ্কা থেকে ফেরার পথে ব্রহ্মা হনুমানকে একটি পত্র দেন। সেই পত্রে লঙ্কায় হনুমানের চরিত্রের বর্ণনা ছিল। সেই পত্র হনুমান রামের হাতে দেয়। (১ : ৯ : ২৮০-২৮১)

১৬) নল একবার এক ব্রাহ্মণের শালগ্রাম শিলা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণ নলকে শাপ দেন যে নলের স্পর্শে পাথর জলে ভাসবে। 'পাষাণাদি তরিষ্যতি ত্বদ্ধস্তাৎ' (১.১০.৬৭)

১৭) নলের গর্ব নিবারণ : — নলের গর্বের কথা রাম জানতেন। সেইজন্য রামের নির্দেশে সমুদ্রতরঙ্গ নলের রাখা পাথরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তখন নল গর্ব ত্যাগ করে রামের শরণাপন্ন হয়। রাম তখন নলকে বলেন যে পাথরসমূহে রাম নাম লিখে দিয়ে ফেললে তারা আর বিচ্ছিন্ন হবে না। (১ : ১০ : ১৯৬-২০০)

১৮) রামের কৃত্রিম শির :—ব্রহ্মা আগেই সীতাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে রাবণ রামের কৃত্রিম ছিন্ন শির দেখাবে। রাবণ ময়দানবকে দিয়ে এই কৃত্রিম শির তৈরি করিয়েছিল এবং এই ঘটনা ঘটে মেঘনাদ বধের পরে।(১ : ১০ : ২২১)

১৯) হনুমান ওষধি আনতে গিয়েছিল হিমালয়ে বানর সেনা নিয়ে। (১ : ১১ : ১০-১৮)

২০) রাবণ যে মায়াসীতা বধ করে সেই মায়াসীতার কথা ব্রহ্মা পূর্বেই রামকে বলেছিলেন।

২১) লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করে তার "ডান হাত কেটে তার বাড়িতে ছুঁড়ে দেন, বাম হাত কেটে রাবণের কাছে পাঠিয়ে দেন, তারপর তার দেহ থেকে মাথা আলাদা করে দেন। দেহকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন এবং হনুমান তার শির নিয়ে রামকে দেখাতে যায়।"

> "সশরং দক্ষিণভুজং পাতয়ামাস তদগৃহে।···১৯০
> মেঘনাদস্য সৌমিত্রিশ্ছিত্বা রাবণসন্নিধৌ।
> পাতয়ামাস লঙ্কায়াং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৯২
> ... ...
> প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস তচ্ছিরঃ।···১৯৫
> ... ...

ততস্তন্মেঘনাদস্য শিরঃ সংগৃহ্য মারুতিঃ।
রাঘবায় দর্শয়িতুং ত্বরায়মাস লক্ষ্মণম্ ॥" ১৯৮

—১ : ১১ : ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৮ ; পৃ. ১২৭

২২) 'ইন্দ্রজিৎ-পত্নী সুলোচনা স্বামীর কাটা হাত দেখে বিলাপ করতে থাকে। তখন সেই কাটা হাত বাণ দিয়ে আপন রক্তে লিখে দেয়, 'শেষের হাতে মৃত্যু হয়ে আমি মুক্তি পেয়েছি। তুমি রামের কাছে গিয়ে আমার শির চেয়ে নিয়ে এসে অগ্নিতে প্রবেশ করে আমার পাশে চলে এসো।' সুলোচনা তখন রামের কাছে গিয়ে স্বামীর শির ভিক্ষা করে। রাম তাকে বলেন যে সে যদি চায় তবে তিনি তার স্বামীকে জীবিত করে দিতে পারেন। রাম তাকে আরও বলেন যে সে যেন অগ্নিতে প্রবেশ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করে। সুলোচনা লক্ষ্মণের হাতে মোক্ষপ্রদ মৃত্যু দুর্লভ মনে করে রামের প্রস্তাব অস্বীকার করে। সুলোচনা রামের কাছ থেকে পতির শির নিয়ে লঙ্কায় ফিরে এসে পতির হাত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করে নিকুম্ভিলায় এসে অগ্নিতে প্রবেশ করে। অনন্তর দিব্যদেহ ধারণ করে পতির সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।'

"ভুজোঽপি সান্ত্বয়ন্ তাং স লেখ্য ভূম্যাং শরেণ হি।
স্বলোহিতাক্ষরৈঃ প্রাহ মা খেদং ভজ ভামিনি ॥ ২০৭
সাক্ষাচ্ছেষশরাঘাতৈর্হতোঽহং মুক্তিমাগতঃ।
ত্বং চাপি গত্বা শ্রীরামং নত্বা যাচস্ব মচ্ছিরঃ ॥ ২০৮
... ...
কৃপয়া তব ভর্তারং করোম্যদ্য সজীবিতম্।
মা বিশস্বাদ্য বহ্নিং ত্বং রোচতে চেদ্বদস্ব মাম্ ॥ ২১৪
... ...
লঙ্কায়াস্তৌ সমানীয় ভুজৌ গত্বা নিকুম্ভিলাম্।
ভর্তৃদেহেন সংযোজ্য বিবেশাগ্নিং যথাবিধি ॥" ২১৭

—১ : ১১ : ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২১৭ ; পৃ. ১২৮

২৩) রাবণ বধের বহুকাল পরে প্রতিদিন রাত্রে অযোধ্যায় একটি শব্দ শোনা যেত। এই শব্দের কারণ বর্ণনা করে বশিষ্ঠ বলেন যে "যে শরীর দিয়ে রাবণ বার বার ব্রহ্মহত্যা করেছে সেই শরীর আজও জ্বলছে। হনুমান সেই চিতায় প্রতিদিন একশো বোঝা কাঠ দিচ্ছে। এই শব্দের অন্য এক কারণ হল এই যে রাবণ রামের কাছে একটি বর চেয়েছিল যাতে লোকে তাকে চিরকাল স্মরণ

রাখে। রাম তার উত্তরে রাবণকে বলেছিলেন যে তোমার চিতার আগুনে যে শব্দ হবে তা সপ্তদ্বীপের লোক শুনতে পাবে।"

"যদাস্মাভির্নিশায়াং হি সর্ব্বৈর্নিদ্রা বিধীয়তে।
তদা সংশ্রূয়তে কর্ণে ভস্ত্রবৎকস্য বৈ ধ্বনিঃ ॥ ৩
... ...
লবস্যেতি বচঃ শ্রুত্বা বশিষ্ঠস্তমথাব্রবীৎ ॥ ৪
বহ্ব্যশ্চ ব্রহ্মহত্যাশ্চ রাবণেণ কৃতাঃ পুরা।
যেন দেহেন সোঽদ্যাপি লঙ্কায়াং জ্বলতে লব ॥ ৫
... ...
চিতায়াংষস্য চাদ্যাপি বায়ুপুত্রেণ প্রত্যহম্।
কাষ্ঠভারশতং নীত্বা লঙ্কায়াং ক্ষিপ্যতে মুহুঃ ॥ ১২
... ...
অন্যত্তে কারণং বচ্মি তচ্ছৃণুষ শিশো লব ॥ ১৩
দেহান্তে রাবণেনাপি রামায় যাচিতো বরঃ।
বরেণ যেন লোকানাং স্মরণং মে ভবিষ্যতি ॥ ১৪
স ত্বয়া মে বরো দেয়স্তচ্ছ্রুত্বা রাঘবোঽব্রবীৎ।
ত্বদ্দেহজ্বলিনি জ্বালাশব্দঃ সর্ব্বে জনা ভুবি ॥ ১৫
শ্রোষ্যন্তি সপ্তদ্বীপেষু তেন তে স্মরণং সদা।" ১৬

—রাজকাণ্ড, সর্গ ২০ : ৩-১৬, পৃ. ৫১৮

২৪) অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পথে সীতার সঙ্গে ত্রিজটা ও সরমা গিয়েছিল।

২৫) ঐরাবণ মৈরাবণ কথা :—অশ্বিনীকুমারদ্বয় শাপগ্রস্ত হয়ে ঐরাবণ ও মৈরাবণ রূপে জন্মগ্রহণ করে। দুজনেই রাবণের বন্ধু ছিল। দুজনে আকাশপথে গিয়ে হনুমানের লেজ দ্বারা বেষ্টিত দুর্গম পরিধিতে ঘুমন্ত রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে আসে। হনুমান আপন পুত্র মকরধ্বজের কাছে জানতে পারে যে রাম-লক্ষ্মণ কামাক্ষ্যাদেবীর মন্দিরে আছে। তখন সে সূক্ষ্মরূপ ধারণ ক'রে মন্দিরে প্রবেশ করে এবং দেবীর বাণী অনুকরণ করে রাম-লক্ষ্মণকে জীবিত অবস্থায় তার সামনে উপস্থিত করতে আদেশ করে। এই ভাবে মুক্তি পেয়ে রাম-লক্ষ্মণ ঐরাবণ ও মৈরাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু যতবার রাম-লক্ষ্মণ তাদের মেরে ফেলেন ততবারই তারা আবার বেঁচে ওঠে। এরপর হনুমান ঐরাবণের উপপত্নীর কাছে তাদের মৃত্যুর রহস্য জানতে চায়। ঐরাবণের উপপত্নী তাদের মৃত্যুর উপায় বলে দিতে রাজী হয় এক শর্তে। শর্তটা হল রামকে

ঐ উপপত্নীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। হনুমান বললে যে সে এই প্রস্তাব মেনে নিতে পারে যদি না রামের শরীরের ভারে তার পালঙ্ক ভেঙে পড়ে। ঐরাবণের উপপত্নী তখন বলে যে ঐরাবণ-মৈরাবণের শয়নাগারে যে-সব ভ্রমর থাকে তারা বার বার অমৃত নিয়ে এসে ঐরাবণ ও মৈরাবণকে বাঁচিয়ে তোলে। হনুমান একটি বাদে সব-কটি ভ্রমরকে মেরে ফেললে। যে ভ্রমরটি বেঁচে ছিল সে হনুমানের আদেশে ঐরাবণের উপপত্নীর পালঙ্কের কাঠের ভিতর একটি ফোকর সৃষ্টি করে দিল। রাম পালঙ্কে বসতেই পালঙ্ক ভেঙে গেল। এরপর রাম ঐরাবণ-মৈরাবণকে বধ করে ঐরাবণের উপপত্নীকে আশ্বাস দেন যে সে পরের জন্মে কন্যাকুমারী রূপে জন্ম গ্রহণ করবে এবং তৃতীয় জন্মে দ্বাপর যুগে সে তাঁর পত্নী হবে। তারপর হনুমান রামকে এবং মকরধ্বজ লক্ষ্মণকে লঙ্কায় পৌঁছে দেয়। (১ : ১১ : ৭৩-১৩০)

২৬) শম্বুক বধ :—এক পঞ্চম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালকের মাতাপিতাকে রাম আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি যদি তাঁদের পুত্রকে বাঁচাতে না পারেন তবে তিনি লব-কুশকে তাঁদের হাতে দিয়ে দেবেন। এরপর রাম পুষ্পক রথে চড়ে রাজ্যে অধর্মের সন্ধান নিতে বেরিয়ে পড়েন। শৃঙ্গবেরপুর থেকে এক ব্রাহ্মণ বিধবা তাঁর স্বামীর শব নিয়ে উপস্থিত হন। রাম তাঁকে বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্মণীকে তাঁর স্বামীর মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করে তপস্যারত এক শূদ্রের কাছে যান। রাম শূদ্রকে উদ্ধার প্রাপ্তির বরদান করেন। শূদ্র নিজের উদ্ধার ছাড়া তার জাতির উদ্ধারের উপায় জানতে চাইলে রাম তাকে বলেন যে, রামনাম জপ করলে সবাই উদ্ধার পাবে। শূদ্র তখন রামকে বলে যে, কলিকালে মূর্খ শূদ্রেরা কর্মব্যস্ত থাকবে, ফলে রামনাম জপ করার সময় পাবে না। রাম তখন বললেন যে পরস্পর সাক্ষাৎকারের সময় 'রাম' 'রাম' বললে সবাই উদ্ধার প্রাপ্ত হবে। অতঃপর রাম শূদ্রকে বললেন, 'আজ আমার হাতে মরে তুমি বৈকুণ্ঠে যাও।' এরপর আরও পাঁচটি শব অযোধ্যায় এল—একটি ক্ষত্রিয়ের এবং অন্যগুলি বৈশ্য, তেলী, কামারের পুত্রবধূ এবং কামারের মেয়ের। রাম শূদ্রকে বধ করে সবার প্রাণদান করলেন। (৭ : ১০ : ৫০-১২২)

২৭) শতশীর্ষ রাবণ বধ :—শতশীর্ষ রাবণ শ্রোণ নদীর তীরে মায়াপুরীতে বাস করত। নিকুম্ভের পুত্র পৌণ্ড্রক শতশীর্ষ রাবণের সহায়তায় বিভীষণকে পরাস্ত করে লঙ্কায় রাজত্ব করতে থাকে। বিভীষণ সাহায্যের জন্য রামের কাছে আসেন। রাম সীতাকে নিয়ে বিভীষণের কাছে লঙ্কায় আসেন। যুদ্ধে রাম পরাস্ত হন। কিন্তু সীতা শতশীর্ষ রাবণ ও পৌণ্ড্রক দুজনকেই বধ করেন। —রাজ্যকাণ্ড, সর্গ ৪ : ৮০-৮৫

২৮) মূলকাসুর বধ :—শতশীর্ষ রাবণ বধের কিছুকাল পরে বিভীষণ আবার

রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য অযোধ্যায় আসেন। কুম্ভকর্ণের পুত্র মূলকাসুর পাতাল-পুরীর রাক্ষসদের সাহায্যে ছ'মাস যুদ্ধের পর বিভীষণকে লঙ্কা থেকে বিতাড়িত করে। রাম সুগ্রীবের সেনা নিয়ে লঙ্কায় আসেন। লঙ্কায় মূলকাসুরের সঙ্গে সাতদিন যুদ্ধ হয়। হনুমান যুদ্ধে নিহত বানর সেনাদের দ্রোণাচল দিয়ে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর ব্রহ্মা এসে রামকে বলেন যে তাঁর বরের ফলে মূলকাসুর কোনও বীরের হাতে মরবে না। তবে এক ঋষি মূলকাসুরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সীতার হাতে তার মৃত্যু হবে। রাম এই কথা শুনে গরুড়কে সীতাকে আনার জন্য আদেশ দেন। সীতা এসে চণ্ডীরূপ ধারণ করে সাতদিন যুদ্ধের পর মূলকাসুরকে বধ করেন। (৭ : সর্গ-৪-৬)

২৯) রাবণের তিন ভাই তিন বোন :—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ক্রোচী, শূর্পণখা, কুম্ভনসী, বিভীষণ। (১ : ১৩ : ২৪)

৩০) রাবণ-মন্দোদরী বিবাহ :—রাবণ গান গেয়ে শিবকে সন্তুষ্ট করে দুটি বর পায়। আপন মাতা কৈকেসীর জন্য শিবলিঙ্গ এবং নিজের জন্য পার্বতী। শিব রাবণকে সাবধান করে দেয় যে শিবলিঙ্গ মাটিতে রাখলে তা অটল হয়ে যাবে। রাবণ শিবলিঙ্গ ও পার্বতীকে নিয়ে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদিকে পার্বতী নিজের বিপদে বিষ্ণুকে স্মরণ করেন। বিষ্ণু নিজের অঙ্গের চন্দন থেকে সুন্দরী মন্দোদরীকে সৃষ্টি করে ময়দানবের বাড়িতে রেখে দিয়ে ব্রাহ্মণ বেশে রাবণের কাছে এসে বলেন যে শিব তাকে প্রবঞ্চনা করে আসল পার্বতীকে পাতালে ময়ের বাড়িতে রেখে দিয়েছে। এই কথা শুনে রাবণ শিবের কাছে গিয়ে প্রকৃত পার্বতীকে তাঁর কাছে রেখে দিয়ে পাতালে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়। রাস্তায় প্রস্রাব ত্যাগের ইচ্ছা হলে রাবণ ব্রাহ্মণের হাতে শিবলিঙ্গ দিয়ে চলে যায়। রাবণের ফিরতে দেরি দেখে বিষ্ণু গোকর্ণভূমিতে শিবলিঙ্গ রেখে অন্তর্হিত হন। রাবণ ফিরে এসে শিব-লিঙ্গকে ওঠাতে অসমর্থ হয়। তারপর সে ময়দানবের বাড়িতে গিয়ে বিষ্ণু-নির্মিত মন্দোদরীকে লাভ করে। (১ : ৯ : ৩৩-৫৭)

৩১) সীতা ত্যাগ :—আনন্দ-রামায়ণ অনুসারে কৈকেয়ী সীতাকে রাবণ চিত্র আঁকতে অনুরোধ করেন। তার উত্তরে সীতা বলেন যে তিনি কেবল রাবণের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখেছে। এই বলে সীতা দেওয়ালে বৃদ্ধাঙ্গুলির চিত্র আঁকেন। কৈকেয়ী পরে ঐ দেওয়ালে রাবণের সম্পূর্ণচিত্র এঁকে রামকে ডেকে বলেন—

> "যত্র যত্র মনো লগ্নং স্মর্যতে হৃদি তৎসদা।
> স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং কো বেত্তি শিবাদ্যা মোহিতাঃ স্ত্রিয়া॥" ৪৬
>
> —জন্মকাণ্ড, সর্গ ৩

কৈকেয়ীর কথায় রাম বিশ্বাস করে লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন, সীতাকে বনে দিয়ে আসতে এবং আরও বললেন যে-যেহাত দিয়ে সীতা রাবণ চিত্র এঁকেছে সেই হাত যেন লক্ষ্মণ কেটে নিয়ে আসে। সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের নিকটের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসেন। কিন্তু সীতার হাত কাটতে পারেননি। সীতার হাত কাটতে না পারায় লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করলেন। সেই কারণে তিনি আত্মহত্যা করবেন কিনা চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় সেখানে বিশ্বকর্মা উপস্থিত হলেন। বিশ্বকর্মা লক্ষ্মণের কাছে সব কথা শুনে একটি সীতার হাত তৈরি করে দিলেন।

৩২) সীতা ত্যাগের অন্য এক কারণ :—গর্ভবতী সীতার সীমন্তোন্নয়নের জন্য জনক এবং তাঁর পত্নী সুমেধা অযোধ্যায় আসেন। কিছুদিন পরে রাম তাঁদের ডেকে বলেন যে "সীতাকে না দেখলে তাঁর বিরহে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। আবার এ সময়ে কামপীড়িত হয়ে তাঁর কাছে থাকা উচিত নয়।"

"আত্মানং বিহ্বলং দৃষ্ট্বা সীতাসান্নিধ্যমাশ্রয়ে॥ ৩৫
অধুনা জানকীং দৃষ্ট্বা কামো মেঽতীব বাধতে।
পঞ্চমাসোর্ধ্বতঃ সঙ্গং গর্হয়ন্তি মুনীশ্চরাঃ" ॥ ৩৬

—জন্মকাণ্ড, ২ : ৩৫-৩৬

রাম আরও বললেন যে যদি তিনি সীতাকে মিথিলায় পাঠান তাহলে তিনিও সেখানে অবশ্যই যাবেন। সুতরাং একমাত্র উপায় হ'ল লোকাপবাদ, রজক-কথা প্রভৃতি কারণে সীতাকে বাল্মীকি-আশ্রমে পরিত্যাগ করা। আপনারাও সীতার সঙ্গে সেখানে যান।

এরপর মিথিলায় এক মন্ত্রীকে নিযুক্ত করে জনক নিজপত্নী ও অন্য একজন পরিজন সহ বাল্মীকির আশ্রমে গেলেন। রাম সীতাকে ডেকে বললেন, 'তুমি পাঁচ বৎসর কাল বাল্মীকির আশ্রমে থাকবে। তোমার দুটি পুত্র হবে। অবশেষে তুমি এখানে এসে জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শপথ করবে এবং পৃথীদেবীর নিকট থেকে সতীত্বের প্রমাণ গ্রহণ করবে। তোমার হরণকালের মতো সত্ত্বগুণে তুমি আমার কাছে থাকবে এবং অপর দুই গুণসমন্বিত হয়ে তুমি চলে যাবে।'

(৫ সর্গ ২-৩)

৩৩) লবকুশের সঙ্গে রামের মিলন :—বাল্মীকি-আশ্রমে পুত্রদের সঙ্গে থাকার সময় সীতা একবার 'সংযোগকরণব্রত' করতে চাইলেন। এই ব্রতর জন্য অযোধ্যার সরোবর থেকে স্বর্ণকমল আনার প্রয়োজন ছিল। পঞ্চমবর্ষীয় বালক লব প্রতিদিন ঐ স্বর্ণকমল এনে দিত। অষ্টম দিনে লব ১৪ জন প্রহরীকে পরাস্ত করে তাদের বলে যে বাল্মীকির আদেশক্রমে সে এই কমল নিয়ে যাচ্ছে। নবম দিনে লব

১০০০ রক্ষীকে পরাস্ত করে কমল নিয়ে যায় এবং সীতা তাঁর ব্রত সমাপ্ত করেন। এরপর বাল্মীকি তাঁর দুই বীর শিষ্যকে সঙ্গে করে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যান। বাল্মীকি, সীতা ও লব কুশকে নিয়ে যজ্ঞভূমির দুই ক্রোশ দূরে অবস্থান করেন। এখানে যজ্ঞাশ্ব এলে লব সেই অশ্বকে বেঁধে রেখে সমস্ত রামসেনাকে পরাজিত করে। এরপর লক্ষ্মণ এসে লবকে পরাজিত করে, তাকে বেঁধে নিয়ে যায়। লবকে মুক্ত করতে গিয়ে কুশের সঙ্গে লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কুশ লক্ষ্মণকে পরাজিত করে। এরপর রাম আসেন এবং রামের সঙ্গে কুশের যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে কারও জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হয় না। রাম তখন বাল্মীকিকে বালক-দুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বাল্মীকি বলেন যে পরের দিন এঁদের পরিচয় জানাবেন। পরের দিন লব কুশ রামায়ণ গান গেয়ে নিজেদের পরিচয় দেয়। রাম তখন সীতাকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা নিয়ে কুশলবের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। —জন্মকাণ্ড, সর্গ ৬-৮

৩৪) সীতার পাতাল-প্রবেশ ও রামাদির স্বর্গারোহণ :—আনন্দ-রামায়ণের জন্মকাণ্ডে (৮ : ৬১-৭৩) সীতার পাতাল-প্রবেশের বৃত্তান্ত বাল্মীকির উত্তরকাণ্ডের বৃত্তান্ত থেকে পৃথক রূপে পাওয়া যায়। যখন পৃথ্বীদেবী সীতাকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করছেন সেই সময় রাম সীতাকে না নিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথ্বীদেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। কিন্তু পৃথ্বীদেবী রামের প্রার্থনা পূরণ না করতে রাম ধনুকে বাণ সংযোগ করে সৃষ্টি ধ্বংস করতে উদ্যত হন। এই দেখে ভীতা হয়ে পৃথ্বীদেবী সীতাকে ত্যাগ করে চলে যান।

পূর্ণকাণ্ডের ৬ সর্গে রামাদির স্বর্গারোহণের বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। সোমবংশীয় রাজাদের আক্রমণ ও তাদের সঙ্গে সন্ধির পর ব্রহ্মা হস্তিনাপুরে এসে রামকে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা বলেন। রাম উত্তর দেন যে সীতা, আত্মীয় পরিজন ও ভায়েদের সঙ্গে তিনি কালই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন। রাম কুশকে এক বিশাল সেনা নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু মন্থরা ও রজকের স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি মিলল না। এদের দুজনকে রাম কুশের সঙ্গে চলে যেতে বললেন। বিভীষণ, জাম্ববান এবং হনুমানের পৃথিবীতে থাকার আদেশ মিলল। দ্বিতীয় দিন রাম বিষ্ণু ভগবানরূপে পরিণত হলেন, সীতা লক্ষ্মীরূপে, লক্ষ্মণ শেষরূপে, ভরত ও শত্রুঘ্ন, শঙ্খ ও চক্ররূপে পরিণত হলেন। বানরকুল দেবতাদের শরীরে প্রবেশ করলে এবং অযোধ্যাবাসীরা আপন শরীর ত্যাগ করে দিব্যদেহধারী হয়ে স্বর্গগামী বিমানে চলে গেল।

৩৫) এই রামায়ণে উল্লেখ আছে যে রাম অযোধ্যায় ফিরে ভরতকে আলিঙ্গন করেন এবং তারপর বহুরূপ ধারণ করে সবার সঙ্গে মিলিত হন।

৩৬) রামের একই সঙ্গে দুইস্থানে উপস্থিতি :—রাজ্যকাণ্ডে ২১ সর্গে উল্লেখ আছে যে একবার বাল্মীকি ও বিশ্বামিত্র দুজনেই একই সময়ে দূত পাঠিয়ে তাঁদের নিজ নিজ যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য রামকে আমন্ত্রণ জানান। রাম দুজনেরই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে পড়েন। পথে যেতে যেতে সেখান থেকে বাল্মীকির যজ্ঞস্থান এবং বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থান আলাদা হচ্ছে সেখান থেকে দুই রূপ ধারণ করে একই সময়ে দুই মুনির যজ্ঞস্থানে উপস্থিত থাকেন।

৩৭) রাজ্যকাণ্ডের ২৪ সর্গে উল্লেখ আছে যে "সুমন্ত্র তাঁর আয়ুর ৯ দিন অবশিষ্ট থাকতে মারা যান। যমদূত সুমন্ত্রকে নিয়ে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে রামের দেখা হয়। রাম যমদূতকে পরাজিত করে সুমন্ত্রকে মুক্ত করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন।"

"একবিংশদ্দিনাশ্চাতিক্রান্তাঃ শেষা দিনা নব। ৫
তাবন্মার্গে সুমন্ত্রং তং পাশবদ্ধং যমানুগঃ।
গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্টা তান্ সর্বাংস্তাড়য়ন্ মুহুঃ ॥ ৯
সুমন্ত্রং মোচয়ামাস লিঙ্গরূপধরং প্রভুঃ॥" ১০

—রাজকাণ্ড, ২৪।৫, ৯, ১০। পৃ. ৫৪২

৩৮) আনন্দ-রামায়ণে রাজ্যকাণ্ডে ১৪ অধ্যায়ে বাল্মীকির জন্মবৃত্তান্তের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বাল্মীকির তিন জন্মের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম জন্মে তিনি স্তম্ভ নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন; দ্বিতীয় জন্মে তিনি ব্যাধ ছিলেন এবং তৃতীয় জন্মে তিনি কৃণুর পুত্র ছিলেন এবং তপস্যা করে বাল্মীকি হন। এই বৃত্তান্তের অধিকাংশ সামগ্রী অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং স্কন্দপুরাণের বৈষ্ণব খণ্ডে পাওয়া যায়। আনন্দ রামায়ণের বৃত্তান্তের সারাংশ এইরূপ :— শাকাল নগরে শ্রীবৎসগোত্রে স্তম্ভ নামে এক মহাপাপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গণিকা আসক্ত হয়ে তাঁর নিত্যকর্ম ছেড়ে শূদ্রের মতো আচরণ করতে থাকেন। কিন্তু একদিন তিনি এক ব্রাহ্মণকে আতিথ্য সৎকার করেন, ফলে তাঁর উদ্ধার প্রাপ্তি সম্ভব হয়। স্তম্ভ তাঁর মৃত্যুশয্যায় ঐ গণিকাকে স্মরণ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর ফলে তিনি পরজন্মে ব্যাধ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ঐ গণিকা ভিল্লিনী রূপে জন্মে তাঁর পত্নী হয়। কিছুদিন পরে ঐ ব্যাধ শঙ্খ নামে এক ব্রাহ্মণের সর্বস্ব লুট করে। এরপর সেই ব্রাহ্মণের খালি পায়ে পাথুরে রাস্তায় চলতে কষ্ট দেখে ব্যাধ ব্রাহ্মণকে তাঁর জুতা ফেরৎ দেয়। ব্রাহ্মণ ব্যাধকে আশীর্বাদ করে বলেন যে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণকে আতিথ্য

সংকারের পুণ্যফলে, এ জন্মে তোমার ব্রাহ্মণকে জুতা ফেরৎ দেওয়ার সৎ বুদ্ধি হয়েছে। এরপর ব্রাহ্মণ ব্যাধের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বর্ণনা করে বলেন, 'কৃণু নামক ঋষি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর নেত্র থেকে রেতঃপাত হয়। এক সর্পিণী সেই রেতঃ খেয়ে গর্ভবতী হয়। সেই সর্পিণী থেকে তোমার জন্ম হয়েছে। কিরাতরা তোমাকে পালন করেছে এবং তুমিও কিরাত হয়ে গেছ। তুমি যে আজ আমার জুতা ফেরৎ দিয়েছ সেই পুণ্যফলে তোমার সপ্তর্ষির সঙ্গে দেখা হবে এবং তাঁদের আশীর্বাদে তুমি বাল্মীকি হয়ে রামকথা লিখবে।'

(খ) আনন্দ-রামায়ণে আবার এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যা অন্য রামায়ণে উল্লিখিত আছে, কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। যেমন :

১) দশরথ-কৌশল্যা বিবাহ :—ব্রহ্মা একদিন রাবণের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে শীঘ্রই দশরথ ও কোশল রাজের কন্যা কৌশল্যার বিবাহ হচ্ছে। এদের যে পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, সেই তোমাকে বধ করবে। এই কথা শুনে রাবণ সরযূ তীরে গিয়ে দশরথের নৌকা ধ্বংস করে তাঁকে পরাজিত করে। দশরথ এবং সুমন্ত্র অন্য একটি নৌকায় করে সমুদ্র অভিমুখে চলে যান। এরপর রাবণ কৌশল্যাকে হরণ করে, তাকে একটি পেটিকায় বন্ধ করে তিমিংগল নামক এক মৎস্যকে এই পেটিকার রক্ষার ভার দিয়ে চলে যায়। তিমিংগল ঐ পেটিকাটিকে এক দ্বীপে রেখে অন্য মৎস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে যায়। দশরথ এবং সুমন্ত্র ঐ দ্বীপে পৌঁছে ঐ পেটিকাটিকে দেখতে পান। তাঁরা পেটিকাটি খুলে কৌশল্যাকে দেখতে পেলেন। তারপর কৌশল্যা ও দশরথের গন্ধর্ব মতে বিবাহ হয়। বিবাহান্তে তাঁরা তিনজনই ঐ পেটিকাটিতে আশ্রয় নেন। এদিকে রাবণ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন যে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হবে না। ব্রহ্মা রাবণকে বললেন যে দশরথ ও কৌশল্যার বিবাহ হয়ে গেছে। ব্রহ্মার কাছে এই কথা শুনে রাবণ সেই পেটিকাটির খোঁজ করতে থাকে। তারপর সেই পেটিকাটি পেয়ে সেটিকে খুলে তিনজনকে দেখতে পায়। তিনজনকে রাবণ মারতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা তাকে বাধা দেন। (১ : ১ : ৩২-৭৪) এই ঘটনাটি ভাবার্থ রামায়ণে (৬, ৯), স্বয়ংভূ-কৃত রামায়ণে এবং রামচরিতমানসের কোনো কোনো সংস্করণে উল্লিখিত আছে।

২) ভরত ও শত্রুঘ্ন সহোদর ভাই। (১ : ২ : ১০) এই কথা সংঘদাসের বসুদেব হিণ্ডি, গুণভদ্রের উত্তর পুরাণ, সাঁওতালী রামকথা ও ভাবার্থ রামায়ণে পাওয়া যায়।

৩) শান্তা দশরথ-কন্যা (১ : ১ : ১৬-১৭)—এই কথার উল্লেখ বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, অসমীয়া বালকাণ্ড, ভাবার্থ রামায়ণ, সারলাদাসের মহাভারত ও বলরামদাসের রামায়ণে পাওয়া যায়।

৪) রাম ও পরশুরামের সংঘর্ষের কারণ :—আনন্দ-রামায়ণে এবং অধ্যাত্ম-রামায়ণে এই সংঘর্ষের যে কারণ পাওয়া যায় তা বাল্মীকি-রামায়ণে ও নৃসিংহ-পুরাণে উল্লিখিত কারণের মিলিত রূপ। বাল্মীকি-রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে পরশুরাম একজন সুযোগ্য ক্ষত্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়েছিলেন, এবং রামই সেই সুযোগ্য ক্ষত্রিয় মনে করে তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। নৃসিংহপুরাণে উল্লিখিত আছে পরশুরাম রামকে বলেছিলেন, 'হয় তুমি রাম নাম ছেড়ে দাও নতুবা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।' আনন্দ-রামায়ণে এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে পরশুরাম বলছেন :—

"ত্বং রাম ইতি নাম্না মে চরসি ক্ষত্রিয়াধম।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রযচ্ছাশু যদিত্বং ক্ষত্রিয়োঽসি বৈ॥"

—অধ্যাত্ম ১।৭।১০ ; আনন্দ ১।৩।৩৫০

'ওহে ক্ষত্রিয়াধম, তুমি আমার রাম নামে পরিচিত হচ্ছ' এখনই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হও যদি ক্ষত্রিয় হও।'

৫) বৃন্দাশাপের ফলে রামাবতার :—দৈত্য জলন্ধর তার পত্নী বৃন্দার সতীত্বের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে অজেয় থাকে। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে জয় ও বিজয়ের সহায়তায় বৃন্দার সতীত্ব হরণ করেন। বৃন্দা জয় ও বিজয়কে শাপ দেয় যে তারা রাক্ষস হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং বিষ্ণুকে শাপ দেয় যে তিনি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পত্নীকে রাক্ষস হরণ করবে। (১।৪।৮৯—১১২) এই কাহিনী যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, পদ্ম ও স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়।

৬) রাম কৌশল্যাকে নিজের বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছিলেন। (১।২।৪)। অধ্যাত্ম-রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, রামচরিতমানস, ভবার্থ রামায়ণ ও তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণেও এই কথা পাওয়া যায়।

৭) বিশ্বামিত্রের আগমনের আগেই রামের বিভিন্ন তীর্থযাত্রার উল্লেখ আনন্দ-রামায়ণ (১।২।২৯), যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ ও ভাবার্থ-রামায়ণে পাওয়া যায়।

৮) অগ্নিজা সীতা —কঠোর তপস্যা করে রাজা পদ্মাক্ষ লক্ষ্মীকে কন্যা রূপে পেয়েছিলেন এবং তার নাম রাখেন পদ্মা। তার স্বয়ংবরের সময় যুদ্ধ হলে রাজা পদ্মাক্ষ মারা যান। এই দেখে পদ্মা অগ্নিপ্রবেশ করে। একদিন অগ্নিকুণ্ড থেকে বেরনোর সময় রাবণ তাকে দেখতে পায়। রাবণকে দেখে সে তাড়াতাড়ি অগ্নিতে প্রবেশ করে। রাবণ এসে আগুন নিভিয়ে দেয় এবং সেই আগুনের ছাইয়ে পাঁচটি দিব্য রত্ন দেখে, সেগুলিকে একটি পেটিকায় ভরে লঙ্কায় নিয়ে যায়। লঙ্কায় সে পেটিকাকে ওঠানোর শক্তি কারও ছিল না। একদিন সেই পেটিকাটি খুললে তার মধ্যে একটি কন্যা দেখা যায়। মন্দোদরীর পরামর্শক্রমে সেই পেটিকাটি

মিথিলায় পুঁতে দেওয়া হয়। এক ব্রাহ্মণের ক্ষেতে কাজ করার সময় এক শূদ্র সেই পেটিকাটি পায়। শূদ্র সেটি ব্রাহ্মণকে দেয়। ব্রাহ্মণ আবার সেটি জনককে দান করেন। জনক সেই পেটিকাটি খুলে একটি কন্যা পান এবং সেই কন্যাটিকে নিজের কন্যার মতো লালন পালন করেন। (সারকাণ্ড—৩ সর্গ, ১৮৮-২৭৬)

৯) বাল্মীকি-রামায়ণে শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মেরেছিলেন কিন্তু আনন্দ ও অধ্যাত্ম-রামায়ণে ভরত এই কাজ করেছিলেন।

১০) দশরথকে পিণ্ডদান :—আনন্দ-রামায়ণ ও গরুড় পুরাণে সীতার দশরথকে পিণ্ডদান করার কাহিনী আছে। অভিষেকের পর রাম সীতা সহ বহু তীর্থ পরিক্রমা করে শেষে গয়ায় আসেন। সীতা ফল্গুতে স্নান করে মহেশ্বরীকে পূজা করার উদ্দেশ্যে ১০৮টি বালুপিণ্ড তৈরি করেন। এরপর দশরথের হাত সেখানে প্রকট হয়ে এক এক করে ১০৮টি পিণ্ড গ্রহণ করে। সীতা ভয়ে ভীত হয়ে এই ঘটনা কারও কাছে প্রকাশ করেন নি। এরপর রাম পিণ্ড দিতে যান। কিন্তু দশরথের হাত প্রকট হয়ে পিণ্ড গ্রহণ না করতে সবাই আশ্চর্য হয়। তখন সীতা বলেন যে দশরথ তাঁর কাছে থেকে আগেই পিণ্ড গ্রহণ করেছেন। রাম সাক্ষী চাইলেন। সীতা এক এক করে আমবৃক্ষ, ফল্গুনদী, ব্রাহ্মণ, বিড়াল, গাভী, অশ্বত্থবৃক্ষকে সাক্ষী মানলেন কিন্তু কেউ তাঁর হয়ে সাক্ষী দিল না। তখন সীতা তাদের শাপ দিলেন। সীতার শাপে আমবৃক্ষ ফলহীন, ফল্গু অন্তঃসলিলা, বিড়ালের লেজ অস্পৃশ্য, গাভীর মুখ অপবিত্র, অশ্বত্থবৃক্ষের পাতা অচল হ'ল। সীতা ব্রাহ্মণকে বললেন,

"যুষ্মাকং নাত্র সংতৃপ্তিঃ কদা দ্রব্যৈর্ভবিষ্যতি ॥ ১০৩
দ্রব্যার্থং সকলান্ দেশান্ ভ্রমধ্বং দীনরূপিণঃ।" ১০৪

—যাত্রাকাণ্ড, সর্গ ৬, ১০৩।১০৪

শেষে সূর্য সীতার হয়ে সাক্ষী দিলেন। এবং দশরথ বিমানে সেখানে এসে রামকে বললেন,

"প্রাহ ত্বয়া তারিতোঽহং নরকাদতিদুস্তরাৎ।
মৈথিল্যাঃ পিণ্ডদানেন জাতা মে তৃপ্তিরুত্তমা ॥"

—যাত্রাকাণ্ড, সর্গ ৬, ১১১

১১) কাক বৃত্তান্ত :—একদিন রামচন্দ্র সীতার ক্রোড়ে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছেন, এমন সময় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকরূপে এসে চঞ্চুপুট দিয়ে সীতার চরণাঙ্গুষ্ঠ রক্তাক্ত করে দেয়। রাম জেগে উঠে এক গাছি তৃণ মন্ত্রপূত করে তার দিকে ছুঁড়ে দেন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে শেষে জয়ন্ত রামের পাদমূলে পতিত হয়। তখন রাম তাকে একটি চক্ষু দণ্ডস্বরূপ প্রদান করে সেই স্থান পরিত্যাগ করতে বলেন (১।৬।৮৬)। এই বৃত্তান্ত অধ্যাত্ম-রামায়ণ ও রামচরিতমানসে পাওয়া যায়।

১২) রামের রাজ্যাভিষেকের সময় নারদ এসে রামকে রাজ্য গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর অবতারের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়ে দেন (১ : ৬)। এই কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণ, কাশ্মীরী রামায়ণ, তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ ও রামচরিতমানসে আছে। নারদের বচন—

"নিহত্য রাবণং যুদ্ধে ততো রাজ্যং কুরুষ্ব হি।
অঙ্গীকৃত্য রঘুশ্রেষ্ঠস্তং মুনিং চ ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৩
অথ রামোঽব্রবীৎ সীতাং মম রাজ্যাভিষেচনম্।
কর্তুকামোঽস্তি তত্রাহং বিঘ্নমুৎপাদ্য দণ্ডকম্ ॥" ৪

১ : ৬ : ৩-৪, পৃ. ৫৩

১৩) কৈকেয়ীর দোষ নিবারণ :—সরস্বতী কৈকেয়ী ও মন্থরা দুজনকেই মোহিত করে তাদের দ্বারা রামের বনগমন সম্ভব করেছিলেন (৮ : ২ : ৫৬)। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও রামচরিতমানসে অনুরূপ ঘটনা পাওয়া যায়।

"তোমার অপরাধ নেই। সরস্বতী আমার ইচ্ছায় তোমার মুখ দিয়ে বর চেয়েছিলেন।"

"ন ত্বয়া মেঽপরাদ্ধং হি মচ্ছন্দাচ্চ সরস্বতী।
স্থিত্বা তরাস্যে সা প্রাহ বরয়াচ্ঞাদি যৎপুরা ॥" ৫৬

—৮।২।৫৬, পৃ. ৫৬৪

১৪) আনন্দ-রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, তারয়ে রামায়ণ এবং রামচরিতমানসে উল্লেখ আছে যে "চিত্রকূটে গিয়ে কৈকেয়ী তাঁর কাজের জন্য অনুতাপ ও রামের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।"

"সংপ্রার্থয়ৎ কৈকেয়ী সা রামচন্দ্রং পুনঃ পুনঃ ॥ ১১২
ময়াঽপরাধিতং রাম তৎ ক্ষন্তব্যং রঘূত্তম।
তামাহ রামচন্দ্রোঽপি ন ত্বয়া মেঽপোরাধিতম্ ॥ ১১৩
মচ্ছন্দান্মন্থরাবাক্যাত্ত্বং বাণ্যা মোহিতা তদা।" ১১৪

—১।৬।১১২-১৪ পৃ. ৬০

১৫) লক্ষ্মণের সংযম :—বিভীষণ রামকে বলেছিলেন, যে বারো বৎসরকাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করবে সে ব্রহ্মার বরে ইন্দ্রজিৎকে বধ করতে সমর্থ হবে (১ : ১১ : ১৭৬)। অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভাবার্থ, তারয়ে, কম্ব রামায়ণেও এই কথার উল্লেখ পাই।

১৬) রঘুবংশ (১২ : ৪৫) ও আনন্দ-রামায়ণে (১ : ৭ : ৬২) উল্লেখ আছে যে খর সেনাকে পরাজিত করতে রাম রাক্ষসরূপ ধারণ করেছিলেন।

১৭) সতী সীতার রূপ ধারণ করে বিরহী রামকে পরীক্ষা করেছিলেন। ঘটনাটি শিব মহাপুরাণ, আনন্দ-রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে।

"ত্বং গতাঽসি সমীপং শ্রীরাঘবস্য তদা বনে।
সীতারূপেণ তং রামং ত্বয়া প্রোক্তং শুভং বচঃ॥ ১৪৩
রাম রাজীবপত্রাক্ষ মামগ্রে পশ্য জানকীম্।
ক্রীড়স্বাত্র ময়া সার্ধমেহি শীঘ্রং সুখী ভব॥" ১৪৪

—১।৭।১৪৩-৪৪। পৃ. ৭০

১৮) মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাবণ সীতাহরণ করেছিল :—কথাটি আনন্দ-রামায়ণ (১।১১।২৪৪), অধ্যাত্ম রামায়ণ, রামতাপনীয় উপনিষদ, ভাবার্থ রামায়ণ ও রামচরিতমানসে আছে।

১৯) মায়ামৃগ যখন রামের স্বর নকল করে সাহায্য প্রার্থনা করে লক্ষ্মণ সেটা রাক্ষসের ছলনা বুঝলেও সীতা সেকথা বুঝতে চাননি। সীতার তিরস্কারে লক্ষ্মণ যেতে বাধ্য হয়। যাওয়ার আগে সীতাকে রক্ষা করার জন্য লক্ষ্মণ কুটীরের চারদিকে ধনুক দিয়ে চারটি রেখা এঁকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সীতাকে সেই রেখার বাইরে যেতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। এই কাহিনী আনন্দ (১.৭ ৯৮), ভাবার্থ, কৃত্তিবাসী, খোটানী রামায়ণে ও সেরী রামে আছে।

২০) সীতা হরণের পর ব্রহ্মা ইন্দ্রকে সীতাকে আহার্য দিতে আদেশ করেন। ইন্দ্র নিদ্রাকে নিয়ে লঙ্কায় যান। নিদ্রা রাক্ষসীদের মোহিত করেন এবং ইন্দ্র সীতাকে রামের আগমনের আশ্বাস দেন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-হরণকারী পায়স দেন। ঘটনাটি আনন্দ-রামায়ণ (১ : ৭) কৃত্তিবাস, কাশ্মীরী রামায়ণ, দেবী ভাগবৎ ও ও বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে।

"তদেন্দ্রো ব্রহ্মবাক্যেন পায়সং বর্বতুষ্টিদম্॥ ১১৭
দদৌ রহসি সীতায়ৈ তেন তুষ্টা বভূব সা।"

—১।৭।১১৭, পৃ ৬৮

২১) স্বয়ংপ্রভার উপাখ্যান :—বিশ্বকর্মা-কন্যা হেমা নৃত্যে শিবকে প্রসন্ন করে একটি দিব্যনগর পেয়েছিলেন। ব্রহ্মলোকে যাওয়ার সময় হেমা আপন সখী দিব্য গন্ধর্ব কন্যা স্বয়ংপ্রভাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন এই স্থানে তপস্যা করে এবং ত্রেতাযুগে রামের সহচরেরা এলে তাঁদের আতিথ্য করে। সেই কথামত

স্বয়ংপ্রভা তাই করে এবং গুহা থেকে বেরিয়ে রামের কাছে আসে এবং রামের স্তুতি করে। তারপর রামের আদেশে বদরীবনে চলে যায় এবং সেখানে নিজের শরীর ত্যাগ করে পরম পদ প্রাপ্ত হয় (১ : ৮ : ১০৩-১০৯)। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রামচরিতমানসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

২২) শুক-কাহিনী :—এই কাহিনী আনন্দ-রামায়ণে (১ : ১ : ২৯৫-৯৬) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে (৬ : ৫ : ৫-২৪) আছে।

শুক নামে এক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের হিত করতে থাকায় রাক্ষসদের শত্রু হয়। একদিন অগস্ত্য মুনির অনুপস্থিতিতে বজ্রদংষ্ট্র নামে এক রাক্ষস অগস্ত্যের রূপ ধারণ করে শুকের নিকট আমিষ ভোজন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তারপর বজ্রদংষ্ট্র শুকের পত্নীকে মূর্ছিত করে নিজে তার রূপ ধারণ করে অগস্ত্যের জন্য নর-মাংস প্রস্তুত করে অন্তর্হিত হয়। এরপর অগস্ত্য আহারে বসে নরমাংস দেখে শুককে শাপ দেন যে যেহেতু সে অভক্ষ্য নরমাংস খেতে দিয়েছে, সেকারণে সে নরভক্ষ রাক্ষস হবে। তারপর কিন্তু অগস্ত্য বুঝতে পারলেন যে এ কাজ রাক্ষসের। কিন্তু শাপ ব্যর্থ হওয়ার নয়। অগস্ত্য শুককে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তুমি রাক্ষসরূপে রাবণের সহায়তা করবে। রামের আগমনের পর তুমি রাবণের দূত হয়ে রামের দেখা পাবে এবং শাপমুক্ত হবে। তারপর তুমি রাবণের কাছে গিয়ে তত্ত্বজ্ঞান দান করবে এবং পরমপদ লাভ করবে।' তদনুসারে লঙ্কা যুদ্ধের সময় শুক রাবণের দূত হয়ে রামের দেখা পেল এবং রাবণের কাছে গিয়ে সদুপদেশ দিয়ে শাপমুক্ত হয়ে আবার ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত হয়ে বনে চলে গেল।

২৩) রাম সুবেল পর্বতে আসীন থেকে লঙ্কার রাজভবন এবং পাত্রমিত্র সহ রাবণকে দেখেন এবং সেখান থেকে বাণ মেরে রাবণের শ্বেত ছত্র এবং মুকুট কেটে দেন। রাবণ এতে লজ্জিত হয়ে মহলের ভিতরে চলে যান (১।১০।২৪৬)—ঘটনাটি অধ্যাত্ম, তারয়ে, ভাবার্থ, রঙ্গনাথ, বলরামদাস রামায়ণ ও রামচরিতমানসে আছে।

২৪) অনেক রামায়ণে, যেমন বলরামদাসের রামায়ণে, তুলসীদাসের রাম-চরিতমানসে এবং কাশ্মীরী রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হয়ে ভূমিতে পড়লে হনুমান যখন তাঁর জন্য ওষধি পর্বত নিয়ে যায় ভরত তাকে বাণ মেরে নিচে নামায়। আনন্দ-রামায়ণে আছে (১।১১।৬২—৭০) ভরতের বাণে হনুমানের হাত থেকে পর্বত পড়ে যায়। হনুমান প্রথমে ভরতকে রাম ভেবেছিল। তারপর ভরত যখন আবার তাকে বাণ মারতে উদ্যত হন তখন হনুমান নিজের ভুল বুঝতে পারে। হনুমান তখন নিজের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভরতকে যুদ্ধের খবর দেয়। লক্ষ্মণের খবর শুনে ভরত আবার বাণ মেরে পর্বতকে হনুমানের

হাতে তুলে দেন। হনুমানের আনীত ওষধির প্রভাবে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠলে হনুমান ওষধি পর্বত যথাস্থানে রেখে আসার সময় লক্ষ্মণের খবর ভরতকে শুনিয়ে আসে।

২৫) কুম্ভকর্ণ চরিত .—কুম্ভকর্ণ রাবণকে বলেছিলে যে সে সেনাদের কাছে রাম যে বিষ্ণুর অবতার একথা শুনেছে এবং সেই কারণে তার রামের সঙ্গে সন্ধি করা উচিত। উত্তরে রাবণ বলেছিলে যে সে বিষ্ণুর হাতে মরে পরমপদ প্রাপ্তি চায়। কুম্ভকর্ণ রণভূমিতে বিভীষণের সঙ্গে দেখা করে রামের শরণ নেওয়ার জন্য তার প্রশংসা করেছিল (১ : ১২ : ১৪২)। এই তথ্য আমরা অধ্যাত্ম, রঙ্গনাথ ও ভাবার্থ রামায়ণ এবং রামচরিতমানসেও পাই।

২৬) মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ ও রাবণ যজ্ঞ ভঙ্গ :—আনন্দ-রামায়ণ (১ : ১১ : ১২৯) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে উল্লেখ আছে যে রামের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে রাবণ যজ্ঞ আরম্ভ করে। বিভীষণের পরামর্শে এবং রামের আদেশে বানর সৈন্যরা রাবণের যজ্ঞ পণ্ড করতে যায়। কোন রকমে রাবণকে যজ্ঞ করা থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে তারা মন্দোদরীর কেশাকর্ষণ করে যজ্ঞ ভূমিতে নিয়ে আসে। মন্দোদরী ক্রন্দন করতে থাকে এবং তাকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করতে থাকে। তখন রাবণ যজ্ঞ ভূমি থেকে উঠে মন্দোদরীকে উদ্ধার করে। মন্দোদরী উদ্ধার পেল, কিন্তু রাবণের যজ্ঞ পণ্ড হল।

২৭) রাবণকে যুদ্ধে কিছুতেই পরাজিত বা বধ করতে সমর্থ না হয়ে রাম হতাশ হয়ে বিভীষণের পরামর্শ চাইলেন। বিভীষণ বললেন যে রাবণের নাভি প্রদেশে অমৃত কুণ্ডল আছে। আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে এই অমৃত শুকিয়ে না দিলে রাবণকে মারা যাবে না। রাম তাই করলেন এবং রাবণ বধ হল (১ : ১১ : ২৭৮)। এই কাহিনী আনন্দ রামায়ণ ছাড়া অধ্যাত্ম রামায়ণ, রঙ্গনাথ রামায়ণ, রামচরিত মানস, ভাবার্থ রামায়ণ ও ধর্মখণ্ডে আছে।

২৮) রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যায় ফেরার সময় সেতু ভঙ্গের উল্লেখ আছে আনন্দ-রামায়ণ (১ : ১২ : ৪৮), রঙ্গনাথ রামায়ণ, তোরয়ে রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও তত্বসংগ্রহ রামায়ণে।

২৯) ১৪ বৎসর পরেও রাম ফিরলেন না দেখে ভরত রামকে মৃত মনে করে আত্মহত্যায় উদ্যত হন। হনুমান এসে তাঁকে বাধা দেন। ঘটনাটি আনন্দ-রামায়ণ (১ : ১২ : ৬৪) কম্ব রামায়ণ, রঙ্গনাথ রামায়ণ ও ভাবার্থ রামায়ণে আছে।

৩০) সীতার লোকাপবাদের খবর সে গুপ্তচর দিয়েছিল বাল্মীকির রামায়ণে তার নাম ভদ্র, আনন্দ-রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণে তার নাম বিজয়।

এই রামায়ণের অস্বাভাবিক কাহিনী আমাদের অদ্ভুত রামায়ণকে স্মরণ করিয়ে

দেয়। বাল্মীকি-রামায়ণে প্রভাব এই রামায়ণে থাকলেও বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে এই রামায়ণ কাহিনী যে কত তফাৎ তা আমরা দেখিয়েছি। এই রামায়ণের যা কিছু মূল্য, তা এর তত্ত্বের দিক দিয়ে। রাম এখানে পূর্ণ ব্রহ্ম, চরম তত্ব। এদিক দিয়েও বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে এই রামায়ণের অমিল দেখতে পাই।

আনন্দ-রামায়ণের বিবরণের শেষে এই রামায়ণে প্রাপ্ত বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনাগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) সীতা, স্বয়ংবর সভায় রামকে দেখে প্রেমে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান যেন স্বয়ংবরে প্রদত্ত ধনু পুষ্পের মতো কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। সীতা আরও প্রার্থনা করেন যে, রাম যদি সফল হন তবে তিনি ১৪ বৎসর বনগমনের ব্রত গ্রহণ করবেন।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে সীতার প্রার্থনার প্রথম অংশ স্বাভাবিকরূপে বর্ণিত। যে-কোনও নারীর পক্ষে তাঁর প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। কিন্তু সীতার প্রার্থনার শেষ অংশটি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। সীতা ১৪ বৎসরের জন্য বনবাসে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করবেন কেন? তিনি কি আগেই জানতেন যে রামের ১৪ বৎসরের জন্য বনবাস হবে এবং তিনিও বনে স্বামীর অনুগামিনী হবেন? তাছাড়া সীতার বনগমন একবার হয়নি। সীতার দ্বিতীয়বার বনগমন হয়েছিল স্বামীর সঙ্গে নয়, নিঃসঙ্গভাবে সম্পূর্ণ একা। তাহলে সীতা কেবল ১৪ বৎসরের জন্য বনগমনের ব্রত গ্রহণ ব্যাপারটিকে একটি যুক্তিহীন অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না।

(২) এখানে উল্লিখিত আছে যে আহত বালীকে রাম বলেছিলেন 'তুমি দ্বাপরে ভীল হয়ে আমাকে বধ করবে। এখন আমার হাতে মৃত্যুর জন্য মুক্তি প্রাপ্ত হবে।"

বালীবধ রামের কর্মবহুল জীবনে নিন্দনীয় কার্যাবলীর অন্যতম। কিন্তু কোনও রামায়ণে রাম তাঁর এই কার্যকে অন্যায় বলে গণ্য করেননি। বরং রাম তাঁর এই কার্যের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই রামায়ণে রাম যখন আহত বালীকে বলেন যে সে দ্বাপরে ভীল হয়ে তাঁকে বধ করবে, তখন মনে হয় রাম তাঁর কার্যকে অন্যায় কার্য বলে মেনে নিয়েছেন। ইতিহাস এবং পুরাণে দেখেছি যে কোনও অবতার হয়তো তার কার্যের জন্য মুনি, ঋষি বা ব্রাহ্মণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছেন, কিন্তু কোনও অবতারকে বলতে শুনিনি যে তাঁর এই অন্যায়

কার্যের জন্য পরজন্মে তিনি বধদণ্ড প্রাপ্ত হবেন। তাই মনে হয় অবতার রামের এই উক্তি শুধু অবাস্তব নয়, একটি অশাস্ত্রীয় যুক্তিহীন উক্তি।

(৩) এখানে উল্লিখিত আছে যে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করে তার ডান হাত কেটে তার বাড়িতে ছুঁড়েছেন, বাঁ হাত কেটে রাবণের কাছে তা পাঠিয়েছেন এবং তার দেহ থেকে শির আলাদা করেছেন।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে নিহত হওয়া অসম্মানের নয়, সম্মানের। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁর প্রতিপক্ষ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করে, ইন্দ্রজিতের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ করে যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন তা কি কখনও ক্ষত্রিয়সুলভ আচরণ হতে পারে? তাছাড়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করে ছিলেন অন্যায়ভাবে, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। তাই মনে হয়, শেষের অবতার লক্ষ্মণের ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধ যেমন ক্ষাত্রোচিত হয়নি, তেমনি ইন্দ্রজিতের বধের পর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন স্থানে ছুঁড়ে দিয়ে লক্ষ্মণ যে অমানুষিক আচরণ করেছিলেন তাও ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক আচরণ নয়।

(৪) ইন্দ্রজিৎ-পত্নী সুলোচনার ঘটনা কবি স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করেছেন বলে মনে হয় না। কবি প্রথমে বলেছেন যে, ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর যখন সুলোচনা স্বামীর কাটা হাত দেখে বিলাপ করতে থাকে তখন সেই কাটা হাত বাণ দিয়ে রক্তে লিখে দেয়। 'তুমি রামের কাছে শির চেয়ে নিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করে আমার পাশে চলে এসো'—এটি বাস্তব ঘটনা না ইন্দ্রজাল? কবি এরূপ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা কেন বর্ণনা করলেন এবং এর দ্বারা কবির কী উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলো তা কিন্তু সম্যক বোঝা গেল না। কবি আবার বলেছেন যে, সুলোচনা যখন রামের কাছে তার স্বামীর শির চাইতে আসে রাম তার বিলাপে কাতর হয়ে তাকে তার স্বামীর জীবন দান করতে চান। প্রশ্ন করি—এটি রামের কেবল শোকার্তা নারীকে সান্ত্বনা দান, না সত্যিই তিনি ইন্দ্রজিতের জীবন দান করতে চেয়েছিলেন? রাম যে ইচ্ছা করলে কাউকে জীবন দান করতে পারেন, এমন ঘটনা এই রামায়ণে ও অন্য রামায়ণেও উল্লিখিত হয়নি। তা যদি হত, তবে তিনি অন্যায়ভাবে বালীকে বধ করে তারার বিলাপে কাতর হয়ে বালীর জীবন দান করতে পারতেন, পিতৃ-বন্ধু জটায়ুর করুণ বিলাপে অভিভূত হয়ে তারও জীবন দান করতে পারতেন, শতশত বিধবা রাক্ষস-রমণীর করুণ ক্রন্দনে তাদের স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। আমাদের মনে পড়ে ইন্দ্রজিৎ দ্বারা নাগ-পাশে আবদ্ধ হয়ে রামের বিলাপের কথা, শক্তিশেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে তাঁর অধীরতার কথা। তিনি যদি এতই শক্তিমান হবেন, তবে এগুলিকে তিনি সহজেই

নিবারণ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি পারেননি বরং অসহায় সাধারণ মানুষের মত বিলাপ করেছেন। তাই মনে হয়, তিনি যে ইচ্ছা করলে সব-কিছুই করতে পারেন, ইচ্ছা করলেই কাউকে জীবনদান করতে পারেন, এমন শক্তিধর করে অন্ততঃপক্ষে কবি রামচরিত্র রচনা করেননি। সুতরাং রামের জীবনদায়িনী শক্তির কথা কেবলমাত্র কথার কথা, বাস্তব ঘটনা নয়। এটি রামের শুভেচ্ছার প্রকাশ হতে পারে কিন্তু প্রকৃত কার্যক্ষমতার নয়।

(৫) রাবণ বধের পর অযোধ্যায় শ্রুত শব্দের যে কারণ কবি নির্দেশ করেন তা যেমনই অদ্ভুত, তেমনি অবাস্তব। এই শব্দের কারণস্বরূপ প্রথমে বলা হয়েছে যে যে শরীর দিয়ে রাবণ ব্রহ্মহত্যা করেছিল, সেই শরীর আজও জ্বলছে। সেখান থেকেই শব্দ উঠছে। এই দ্বিতীয় কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে রাবণ রামের কাছে বর চেয়েছিল যে তার কথা যেন চিরকাল লোকে মনে রাখে। রামের বরে রবণের চিতার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুটির কোন কারণই যুক্তিযুক্ত নয়। রাবণ ব্রহ্মহত্যা করে যে পাপ করেছিল তার জন্য তার চিতা থেকে শব্দ শোনা যাবে কেন, বোঝা গেল না। দ্বিতীয়তঃ রাম যদি রাবণকে চিরকাল মনে রাখার বর প্রদান করেন তবে তার চিতা থেকে চিরকাল শব্দ শোনা যাবে এমন একটি অদ্ভুত বর দান কোথাও শোনা যায় না। চিরকাল লোকে মনে রাখার জন্য চিতাতে শব্দ শোনা যাওয়ার সম্পর্ক কি থাকতে পারে আমরা তা বুঝতে পারলাম না।

(৬) এক ব্রাহ্মণ পুত্রের অকালমৃত্যুর প্রতিকারের জন্য তপস্যারত শূদ্র শম্বুকের বধের কথা বাল্মীকি-রামায়ণে আছে। এখানে একটু পরিবর্তিত আকারে সেই কথা পাই। বাল্মীকি-রামায়ণে শূদ্র কোনও কথা বলার সুযোগ পায়নি। রাম তার কাছ থেকে সে যে শূদ্রজাতি এই কথা জেনে তৎক্ষণাৎ তাকে বধ করেন। কিন্তু এখানে রাম শুধু শম্বুকের নয়, শম্বুকের কথামত সমস্ত শূদ্র জাতিকে উদ্ধারের উপায় বর্ণনা করেন।

প্রশ্ন হল, শূদ্রের তপস্যার অধিকার নেই এটি কি শাস্ত্রীয় বচন? শূদ্র তপস্যা করলে ব্রাহ্মণ সন্তানের অকালমৃত্যু হতে পারে এমন কথা কোনও শাস্ত্রে আছে? শূদ্রের তপস্যার জন্য যদি ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু ঘটে তবে শূদ্রানী শবরীও তপস্বী ছিলেন, তবে তারজন্য রাজ্যে অকালমৃত্যু ঘটেছিল কি? বরং রাম এই তপস্বীর কাছ থেকে এঁটো ফল তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন এবং তাকে উদ্ধার করেছিলেন। তাহলে শম্বুকের বেলায় এই অনর্থ ঘটলো কেন, তার সন্তোষজনক উত্তর কিন্তু পাওয়া গেল না। তাছাড়া উদ্ধার পাওয়ার যে সহজ এবং সরল উপায় এই রামায়ণে বিবৃত আছে তা অতীব চমৎকার। শম্বুকের কামনার উত্তরে রাম

বলেছিলেন যে শুধু 'রাম' 'রাম' বললে শূদ্র জাতি উদ্ধার প্রাপ্ত হবে। তাই যদি হয় তবে যুগ যুগ ধরে সাধু, ঋষিরা উদ্ধারের আশায় যে সাধন ভজন করে তার সার্থকতা থাকে কি? শূদ্রের বেলায় রাম নাম করলে উদ্ধার প্রাপ্ত হবে, অন্যের বেলায় উদ্ধার প্রাপ্ত হতে গেলে কঠিন সাধন ভজনের পথ গ্রহণ করতে হবে, একথা কি যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যাবে?

(৭) সীতার বনবাসের কারণস্বরূপ এই রামায়ণে বলা হয়েছে যে কৈকেয়ী সীতাকে দিয়ে রাবণের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি আঁকান। পরে নিজে রাবণের সম্পূর্ণ চিত্র এঁকে রামকে বলেন সে সীতা রাবণের চিত্র এঁকেছে। রাম কৈকেয়ীর কথা শুনে সীতাকে বনবাসে দেন।

আমরা আগেই জেনেছি যে এই রামায়ণে আছে কৈকেয়ী সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামকে বনবাসে পাঠিয়ে ছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, কৈকেয়ী সীতার বনবাসের কারণ হলেন কি দেবতাদের নির্দেশে না নিজের ইচ্ছায়? যদি বলি দেবতার ইচ্ছায় কৈকেয়ী সীতাকে বনবাসে দিয়েছিলেন, তবে সে কথা যুক্তিযুক্ত হয়না, কারণ এখানে দেবতাদের সীতাকে বনে পাঠানোর কোনও কারণ নেই। আবার যদি বলি, কৈকেয়ী নিজের ইচ্ছায় সীতাকে বনবাসে দিয়েছিলেন, তবে প্রশ্ন করব, কৈকেয়ীর কোন্ ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি সীতাকে বনবাসে দেবেন? সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নেই। তাই মনে হয়, কৈকেয়ী সীতাকে বনবাসে প্রেরণের কারণ যুক্তিসংগত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কৈকেয়ীর দ্বারা সীতাকে বনবাসে দেওয়ার ঘটনাটি একটি যুক্তিহীন অবাস্তব ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে।

(৮) আর-একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক ঘটনার মুখোমুখি হই যখন দেখি রাম যমদূতকে পরাজিত করে সুমন্ত্রকে মুক্ত করে অযোধ্যায় নিয়ে এসেছেন। সুমন্ত্র তাঁর আয়ুর ৯ দিন অবশিষ্ট থাকতে মারা যান। যমদূত যখন সুমন্ত্রকে নিয়ে যায় রাম তার কাছ থেকে সুমন্ত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন।

প্রশ্ন হল—আয়ু অবশিষ্ট থাকতে কেউ কি মারা যেতে পারে? এটি যেমন একটি অবাস্তব ঘটনা, তেমনই যমদূতের কাছ থেকে একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে মুক্ত করা তেমনই একটি অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি বিকৃত কল্পনা একজন কৃতী কবির লেখনীতে এলো কি করে?

(৯) তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ—(অরিয়েন্টাল ম্যানুস্ক্রিপট লাইব্রেরি, মাদ্রাজ; এম. এস. এস. নং ডি ১৫৭৩৮; টি. এ. কে. ভি. চারিয়ার দ্বারা অনুলিপিকরণ ২১।৫৫।৫৪, নং আর ১২৯৩৭)

রাম ব্রহ্মানন্দ ১৭ শতাব্দীতে তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণে

রামতত্ত্বকথা বর্ণিত আছে। রামের পরমব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা এই রামায়ণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর আরও একটি বিশেষত্ব হ'ল রামের দাস্যভক্তি ছাড়াও অদ্বৈত রাম-উপাসনার বর্ণনা। রচনার নাম 'তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ'। প্রতি কথাটাই তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থের নাম 'রামায়ণ' কারণ এখানে আদি রামায়ণের মতো ৭টি কাণ্ড আছে। 'সংগ্রহ' হিসাবে গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে এখানে রামের মহত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনা সন্নিবিষ্ট আছে। 'তত্ত্ব' হিসাবে গ্রন্থের মূল্য এই যে এখানে রামকে সর্বোচ্চ তত্ত্ব হিসাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে। 'তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণে' বাল্মীকি-রামায়ণ ছাড়া অন্য রামায়ণের প্রভাব দেখা যায়। সে-প্রভাব থাকলেও এখানে এমন কতগুলি বিষয় ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা বাল্মীকি-রামায়ণে পাওয়া যায় না। যেমন :—

(১) রামকে বিষ্ণুর অতিরিক্ত শিব, ব্রহ্মা, হরিহর, ত্রিমূর্তি এবং পরব্রহ্মের অবতার মানা হয়েছে (১ : ৩)।

(২) দশরথ মনুর অবতার (১ : ১৩)।

(৩) ভরত বিষ্ণুর চক্রের, লক্ষ্মণ আদিশেষের এবং শত্রুঘ্ন শঙ্খের অবতার (১ : ১৪)।

(৪) রামের দ্বৈত উপাসনার কথা বর্ণিত। এক, অদ্বৈত উপাসনায় রামের একত্ব প্রতিপাদন এবং দুই, দাস্য ভাবে উপাসনা (১ : ২০)।

(৫) শালগ্রাম শিলায় রাম উপাসনা এবং তুলসী দ্বারা পূজার তাৎপর্য এখানে দেখা যায় (১ : ২১)।

(৬) রাম-সীতার বিবাহোৎসবে শিব, ব্রহ্মা এবং বশিষ্ঠ, বামদেব, সতানন্দ ও গৌতমের উপস্থিতি (১ · ৩১) বর্ণিত আছে।

> 'ব্রহ্মানং শঙ্করং চাথ পুরস্কৃত্য মহর্ষয়ঃ।
> বসিষ্ঠো বামদেবস্য শতানন্দশ্চ গৌতমঃ॥' ১।৩১।১০ পৃ ১২৩

(৭) শিব সীতার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে রামকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁকে স্বীয় ধনুর্ভঙ্গ করতে এবং সীতাকে বিবাহ করতে বলেন (১. ২৯. ৪ এবং ১৬)।

(৮) রামের বনগমনে অযোধ্যাবাসীর দুঃখ দেখে কৈকেয়ী শোকাকুল হন। তিনি রামের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে বনে যেতে নিষেধ করেন। রাম তাঁকে ক্ষমা করে বলেন, 'এ দৈব নির্দেশে সাধিত হয়েছে। তোমার দোষ নেই, তুমি আমার মাতৃসমা। তোমার উপর আমার কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ নেই।

"দেবকৃতে কোঽপরাধঃ
ত্বং মে মাতৃসমা দেবী ত্বয়ি মে নাস্তি দুর্মনঃ।" (২ : ১১)

(৯) রামের বাল্মীকির আশ্রমে গমন এবং শিবের পার্বতীকে বাল্মীকির জীবন-কথা বর্ণন। কেমন করে এক শিকারী বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হয়েছিলেন তার কাহিনী (২ : ২২-৩০)।

(১০) "সুতীক্ষ্ণের আশ্রম থেকে বিদায় নেওয়ার সময় পৃথ্বীদেবী এক জোড়া পাদুকা সীতাদেবীকে দেন, যাতে রামের বনপথে যাওয়ার কষ্ট লাঘব হয়।" (৩ : ৬)

"এতে তে পতেয় দেহি পাদুকে মৎসমর্পিতে।
রত্নভারসমাকীর্ণে দেবানামাপি দুর্লভে ॥
যে ধৃত্বা গচ্ছতঃ পুংসঃ পথি শ্রমবিবর্জনম্।
ক্ষুৎপিপাসে ন ভবতঃ সুখশয্যোপবেশনম্ ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্যৈ রত্নপাদুকয়োর্দ্বয়ম্। ২০

(১১) রামের খর, দূষণ এবং ত্রিশিরার যুদ্ধের সময় রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন যে এই তিন রাক্ষসকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন যে রামাবতারে বিষ্ণুর অবতার রাম দ্বারা তারা নিহত হয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। (৩ : ৯)

(১২) শূর্পণখা রাবণের সভায় রামের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলে কুম্ভকর্ণ রাবণকে সাবধান করে দেয় যে 'রাম অবতীর্ণ হয়েছেন রাবণ নিধনের জন্য।' (৩ : ১১)

"পরং ব্রহ্মস্বরূপোঽয়ং প্রাকৃতো ন হি মানুষঃ।
শিবরূপেণ সংহারং বিষ্ণুরূপেণ পালনম্ ॥ ৫৩
শিববিষ্ণুস্বরূপত্বাৎ পরং ব্রহ্মৈব কেবলম্।
দেবকল্পিতমার্গেণ পিতুরাজ্ঞামিষেণ সঃ ॥ ৫৪
দুষ্টদানবশিক্ষার্থং বনং যাতো মহেশ্বরঃ ॥"

—৩৷১১৷৫০-৫৫, পৃ ৩৫০

(১৩) রাবণ-জটায়ু যুদ্ধের সময় একটি সুন্দর সংলাপ পাওয়া যায়। রাবণ যুদ্ধে জটায়ুকে পরাস্ত করতে না পেরে জটায়ুকে বললে, "আমার প্রাণ-রহস্য পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লুকিয়ে আছে। তোমার প্রাণ-রহস্য কোথায়?" জটায়ু সরল মনে বললে, "আমার প্রাণের মর্মস্থান আমার পাখার অগ্রভাগে।" রাবণ তৎক্ষণাৎ তার পাখার অগ্রভাগ ছিন্ন করে এবং জটায়ু পড়ে যায়।" (৩ : ১৫)

রাবণ : মর্মদেশং প্রবক্ষ্যামি মর্ম তে বক্তুমর্হসি।
পাদাঙ্গুষ্ঠং হি মে মম তব মর্ম প্রপদ্যতাম্ ॥ ৩৮

শ্রুত্বা রক্ষো বচো গৃধ্রো স্বমর্ম প্রাহ সত্যবাক্‌ ।
পক্ষমধ্যে মর্মদেশঃ পক্ষিণং প্রাহ চারিণম্‌ ॥ ৩৯
ততো রক্ষোবচঃ পক্ষী সত্যং মত্বা মহাবলঃ ।
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রহরণং কর্তুং ব্যবসিতুং ভবেৎ ॥ ৪০
ততঃ স খড়্গামুদ্যম্য রাবণো রাক্ষসাধমঃ ।
নূহীনঃ পক্ষিরাজস্য পক্ষমধ্যে রুষান্বিতঃ ।
খড়্গপ্রহারকৃত্তাঙ্গঃ পপাত ভুবি পক্ষিরাট্‌ ॥ ৪২

—৩ : ১৫, ৩৮-৪০ এবং ৪২, পৃ ৩৭০

(১৪) রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় সীতা পাঁচটি বানর দেখে তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু গহনা ও বেশবাস ছুঁড়ে দেন।

কতকগুলি বানর সীতার প্রায় বিবসনা মূর্তি দেখে হাসে। সীতা তাদের অভিশাপ দেন যে তাদের শরীরের উপরিভাগ সব সময় অনাবৃত থাকবে। রাবণ সীতাকে অশোক কাননে রাখে, তাঁকে পূজা করে এবং বিদায় নেয়। ইন্দ্র সীতাকে আহার্যের জন্য স্বর্গীয় পায়স দেন। (৩ · ১৫)

(১৫) সীতাকে খোঁজ করতে করতে গোদাবরী তীরে এসে রাম গোদাবরীকে সীতার সংবাদ দিতে বললেন। গোদাবরীকে নিরুত্তর দেখে রাম তাকে শাপ দেন যে যে-কেউ এই গোদাবরীতে স্নান করবে সে চণ্ডাল হবে। এই শাপের কথা শুনে ব্রহ্মাআদি দেবগণ রামকে অনুরোধ করলেন গোদাবরীর জল পবিত্র করতে। রাম তখন বললেন যে যে পুষ্করিণীতে শবরী নিত্য স্নান করে সেই শবরী-পুষ্করিণীতে যদি গোদাবরী মিলিত হয় তবে তার জল পবিত্র হবে। এই বলে রাম তাঁর ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে গোদাবরীকে শবরী-পুষ্করিণীর সঙ্গে যোগ করে দিলেন। (৩ · ১৭)

(১৬) রাম সুগ্রীবকে আপন বিশ্বরূপ দর্শন করান। (৪ : ৩)

(১৭) পার্বতীকে হনুমানের মাতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (৪ : ১২)

(১৮) "ইন্দ্র খাওয়ার জন্য সীতাকে অশোকবনে স্বর্গীয় পায়স দিয়েছিলেন।"

"অশোকবনিকামধ্যে পূজিতা জনকাত্মজা।
আস্তে মঘবতা দত্ত পায়সালেন জীবতী ॥" শ্লোক-৪৮, পৃ ৩৭০,

(১৯) সীতার চূড়ামণি নিয়ে হনুমান রামের সকাশে গেলে রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করেন এবং তার অনুরোধে বিভূতি-যোগ বর্ণনা করেন। (৫ : ১১)

(২০) বিভীষণের রামের নিকট আগমন বর্ণিত আছে কিন্তু রাবণ দ্বারা বিভীষণের নিগ্রহের কথা নেই। (৬ : ৩)

(২১) রাম সদলবলে যখন সমুদ্রতীরে আসেন সেতুবন্ধনের জন্য, সেই সময় সমুদ্রকন্যা কন্যাকুমারী নারদকে রামের কাছে পাঠান। নারদের কাছে রাম শোনেন যে কন্যাকুমারী রামকে বিবাহ করার জন্য সাধনা করছেন। রাম নারদকে বলেন যে তিনি এখন যুদ্ধে যাবেন। যুদ্ধশেষে তাঁকে বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে এখন সেতুবন্ধনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। (৬ : ৬)

কন্যাকুমারী :—

"মম পাণিগ্রহং রাম কর্ত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
ত্বন্নিমিত্তং বহুতপঃ কৃতং মে ক্লেশকারণম্॥ ২
তস্যাস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রামো বুদ্ধিমতাং বরঃ।
অবোচদ্‌বচনং কন্যাং সস্মিতাক্ষরমুত্তমম্॥ ৩

শ্রীরাম :— রাবণং সমরে হত্বা ত্রিলোকবিজয়ং বলম্।
পুনরাগমনবেলায়াং যদি জানাসি মাং শুভে॥ ৪
তদা বিবাহস্তে ভীরু ভবিষ্যতি ময়া সহ।
ন জানাসি তদা মাং ত্বং নাপরাধোঽস্মি মে যদি।
কল্যাণ যত্নঃ ক্রিয়তাং যাবদাগমনং মম।
একপত্নী ব্রতস্থোঽপি ত্বয়া জ্ঞাতে সমুদ্বহে॥" ৫

—৬ : ৬।২-৫। পৃ ১৬৮-১৬৯, ভলিয়ুম-২

(২২) রাম যুদ্ধ যাত্রার আগে আসল সীতাকে তাঁর মাতা পৃথ্বীদেবীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন এবং বলেছিলেন যে রাবণ বধের পরে মায়া-সীতাকে পৃথ্বীদেবীর কাছে দিয়ে আসল সীতাকে নিয়ে আসবেন। (৬ : ১৪)

"এতস্মিন্ সময়ে রামঃ পরপুঞ্জয়ঃ।
বামভাগস্থিতাং সীতাং মৃদুবচনমব্রবীৎ॥ ২৩
রাবণাসুরসংহারকার্যে মহতি সংস্থিতে।
যুদ্ধদেশে ত্বয়া স্থাতুং ন শক্যং ধরনীসুতে॥ ২৪
ভীরুণাং প্রাহ হরণে শূরাণামপি ভীতিদে।
উপায়ঃ কোঽত্র কর্তব্যঃ সীতে ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ২৫

সীতা— স্বদেবরক্ষণোপায়ং জানামি মম রাঘব।
তথাপি শৃণু মে বাক্যং বক্তব্যং সময়ে সতি॥ ২৬
গত্বা মাতৃগৃহং রাম তাবৎকালং বসাম্যহম্।
যাবদ্রাবণসংহারস্ত্বয়া রাম ভবিষ্যতি॥" ২৮

—৬ : ১৪, ২৩-২৬ এবং ২৮, পৃ ১৯৭-৯৮

(২৩) শতানন রাবণ বধ :—একদিন ঋষিগণ রামের কাছে এসে বললেন যে সপ্তসমুদ্রপারে শতানন নামে এক রাবণ তার সঙ্গী অসুর রক্তবিন্দুকে নিয়ে বাস করে। তাকে বধ করা প্রয়োজন। এই রাক্ষস এক বর পেয়েছিল যে কোনও মানুষ তাকে বধ করতে পারবে না। সীতা এই কথা শুনে সেই রাক্ষসকে বধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাম সীতার ইচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন করে সীতার সঙ্গে হনুমান ও প্রধান প্রধান বানর সেনাপতিদের পুষ্পক রথে পাঠিয়ে দেন। হনুমান নরসিংহ, গরুড় ও অশ্ব -রূপ ধরে এবং সীতা অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্ট দেবীমূর্তি ধারণ করে শতানন রাবণ বধ করেন (৭ : ১-২২)। কিন্তু এখানে অদ্ভুত রামায়ণের মতো রামের সহস্রস্কন্ধ রাবণের হাতে পরাজয়ের কোনও ঘটনা নেই।

(২৪) জনকের পূর্বজন্মকথা .—চিত্রবর্মণ নামে কেকয়ের এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি গর্গ ঋষির শিষ্য ছিলেন। তাঁর বৈজয়ন্ত নামে এক বুদ্ধিমান কিন্তু বধির পুত্র ছিল। এই বধির পুত্রের জন্য রাজার দুঃখের অন্ত ছিল না। পুত্রের এই করুণ অবস্থা নিরসনের জন্য রাজা অনেক যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেছিলেন। একদিন নারদ রাজার নিকট আসেন। নারদ এলে পিতা পুত্র দুজনেই তাঁকে প্রণাম করে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করেন। নারদ রাজার দুঃখ বুঝতে পেরে বললেন যে তাঁর দুঃখের অবসান হবে। রাজা নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, পূর্বজন্মের কোনো কর্মের ফলে তাঁর পুত্রের এই দশা হয়েছে। নারদ তখন বললেন যে তাঁর পুত্র পূর্বজন্মে সূর্য বংশীয় রাজা সুসন্ধির পুত্র প্রসেনজিৎ ছিল। একদিন সে বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়ে দেখে যে একটি সুন্দর শুকপাখি রামনাম গাইছে। প্রসেনজিৎ সেই পাখিটিকে তাকে দিতে অনুরোধ করলে বশিষ্ঠ সেই পাখিটি তাকে দেন। প্রাসাদে ফিরে এসে প্রসেনজিৎ পাখিটিকে রামনাম না বলে অন্য কথা বলতে বাধ্য করে। পাখিটি তখন রামনাম না করে অন্য কথা বলতে থাকে। কিছুদিন পরে প্রসেনজিতের মৃত্যু হলে পাখিটি আবার বশিষ্ঠের আশ্রমে ফিরে যায় এবং আবার রামনাম করতে থাকে। সেই প্রসেনজিৎ তোমার পুত্র বৈজয়ন্ত হয়ে জন্মেছে এবং আগের জন্মে পাখিটিকে রামনাম না করতে বাধ্য করার জন্য, সেই পাপে সে বধির হয়ে জন্মেছে। তুমি তোমার পুত্রকে বশিষ্ঠের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সেই পাখির রামনাম তোমার পুত্রকে শ্রবণ করাও, তাতে সে পাপমুক্ত হবে এবং সে বধিরত্ব থেকে মুক্তি পাবে। রাজা তাই করলেন এবং তাঁর পুত্র বধিরত্ব থেকে মুক্তি পেল।

এই রাজার মৃত্যুর পর বৈজয়ন্ত রাজা হয় এবং তার মৃত্যুর পর সে মিথিলার রাজা জনক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই শুকপাখি ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব হয়ে জন্ম নেয়। (৭ : ৩)

(২৫) সীতা এবং রাম দুজনেই বৈকুণ্ঠে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাম এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাবণের ঘরে সীতা ছিলেন এই অজুহাতে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে পাঠান। সেখানে সীতার দুটি পুত্রসন্তান হয় এবং তাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে রাম সীতা দুজনেই বৈকুণ্ঠে ফিরে যান। (৭ : ৫)

(২৬) রাবণ বধের পর লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফেরার সময় বিভীষণ রামের কাছে সেতুভঙ্গের প্রার্থনা জানায়। কেননা সেতুভঙ্গ না হলে অন্যান্য রাজারা লঙ্কা আক্রমণ করতে পারে। বিভীষণের প্রার্থনায় রাম ধনুর শেষ ভাগ দিয়ে সেতুভঙ্গ করেন। যেই স্থানে রাম সেতুভঙ্গ করেছিলেন সেই স্থানের নাম হয় ধনুষ্কোটি। (৬ : ৩৫)

এই রামায়ণে আবার এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই কিন্তু অন্যান্য রামায়ণে আছে। যেমন :—

(১) বিষ্ণুর দ্বারপাল জয়-বিজয় শাপগ্রস্ত হয়ে প্রথমে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু এবং পরজন্মে রাবণ-কুম্ভকর্ণ হয়ে জন্মেছিলেন (১ : ১১)। এই কাহিনী পদ্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে পাওয়া যায়।

(২) কৌশল্যার সামনে রাম নিজের বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছিলেন (১ : ১৪)। এই ঘটনা আনন্দ রামায়ণ (১ : ২ : ৪), রামচরিতমানস (১ : ১৯ : ১) এবং ভাবার্থ রামায়ণে (১ · ৬) আছে।

> "কৌসল্যাপি সুতং দৃষ্ট্বা রম্যং রাজীবলোচনম্।
> সহস্রার্কপ্রতিকাশং কিরীট কুঞ্চিতাননম্॥
> শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতম্।
> শ্রীবৎসকৌস্তুভং মালাং রক্ষস্যঙ্গে জগত্রয়ম্॥"
>
> —১. ১৪. ১৪-১৫, পৃ ৫৬

(৩) অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা (১ : ২৫) এই রামায়ণ ছাড়া আনন্দ রামায়ণ, রামচরিতমানস, ভাবার্থ রামায়ণ এবং অসমীয়া বালকাণ্ডে আছে ; ইন্দ্র মোরগ ডেকে গৌতমকে মিথ্যা প্রাতঃকালের সময় ঘোষণা করেছিলেন (১ : ২৫) এই কথা রঙ্গনাথ-রামায়ণেও পাই। গৌতমের শাপে যে ইন্দ্র পুরুষত্ব-হীন ও সর্বাঙ্গে যোনিচিহ্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আনন্দ রামায়ণ ও বলরামদাসের রামায়ণে তা বর্ণিত আছে।

(৪) এই রামায়ণের মতো ধর্মখণ্ডেও বর্ণিত আছে যে সীতার স্বয়ংবরে শিব উপস্থিত ছিলেন এবং শিবের আদেশে রাম ধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন। (১ : ২৯)

(৫) রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হলে দেবতাদের নির্দেশে নারদ রামকে দেবতাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং রামকে রাজ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন (২ : ৫)। অধ্যাত্ম রামায়ণ, কাশ্মীরী রামায়ণ ও রামচরিত-মানসে আমরা অনুরূপ ঘটনা পাই।

"উবাচ বচনং রামং ব্রহ্মণা বোধিতোস্ম্যহম্।
রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুনন্দন ॥ ৪৭
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা ত্বামভিষেক্ষ্যতি।
প্রতিজ্ঞা তে কৃতা রাম ভূভারহরণায় বৈ ॥ ৪৮
তৎসত্যং কুরু রাজেন্দ্র সত্যসন্ধোঽসি রাঘব।"

—২ : ৫ ৪৩।৪৭-৪৯, পৃ ১৬৬

(৬) "দেবতাদের নির্দেশে সরস্বতী কৈকেয়ীর জিহ্বাকে বিপথগামী করেন। যার ফলে কৈকেয়ী মন্থরার মন্ত্রণায় রামের বনযাত্রার কামনা করেন (২ ৬)। অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং আনন্দ রামায়ণেও আমরা এই বৃত্তান্ত পাই।"

"এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণীমচোদয়ন্।
রামাভিষেকবিঘ্নায় যতস্বা ব্রহ্মবাক্যতঃ ॥
তথেত্যুক্ত্বা তথাচক্রে প্রবিবেশাথ মন্থরাম্ ॥"

—২ : ৬।৮২, পৃ ১৬৬

(৭) রামের বনবাসের সময় 'ধর্মখণ্ডে'র মতো এখানেও নারদ রামকে বলেন যে বনবাসের মাত্র ১ বৎসর বাকী, কিন্তু রামের আসল কাজ অর্থাৎ রাবণ বধ এখনও সম্পন্ন হয়নি। রাবণ ইতিমধ্যেই সীতা হরণের জন্য যাত্রা করেছেন জেনে রাম মৃত্যুর দ্বারা মায়াসীতা সৃষ্টি করেন যাকে রাবণ হরণ করবে। আসল সীতাকে তিনি নিজের হৃদয়ের মধ্যে রাখেন। (৩ . ১৩)

(৮) সীতা হরণের পর সীতা-বিরহের জন্য রাম বৃন্দার শাপের কথা স্মরণ করেন। ভীষণ অত্যাচারী দৈত্য জলন্ধরকে দেবতারা নিধন করতে অসমর্থ হন। জলন্ধরের শক্তির উৎস ছিল তার স্ত্রী বৃন্দার সতীত্ব। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বৃন্দা বিষ্ণুর ছদ্মবেশের কথা বুঝতে পেরে তাঁকে এই বলে শাপ দেয় যে তাঁকেও পত্নীবিরহে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই কথা বলে বৃন্দা দেহত্যাগ করে। বিষ্ণু বৃন্দার সমাধিতে তিনটি গাছ পোঁতেন – তুলসী, মালতী ও ধাত্রী। এই কারণে গাছগুলি পবিত্র বলে খ্যাত। বিষ্ণু এই শাপ রাম অবতারে ফলবতী হবে বলেন। সেই কারণে রামের পত্নী-বিরহ হয় (২ : ১৬)।

বৃন্দার শাপের কথা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও আনন্দ রামায়ণে পাওয়া যায়।

(৯) অশোকবনে সীতা-রাবণ সংবাদের সময় হনুমান উপস্থিত হয়ে রাবণকে প্রহার করে (৫ : ৪)। এই বিচিত্র কাহিনী ধর্মখণ্ডেও বর্ণিত আছে।

"আবিরাসীদ্রাবণাগ্রে মহাবিগ্রহবান্ প্রভুঃ।
বক্ষশ্চ তাড়য়ামাস দৃঢ়মুষ্টির্মহাবলঃ॥
তাড়িতো রাবণস্তূর্ণং বজ্রতুল্যেন মুষ্টিনা।
শিথিলীকৃতসর্বাঙ্গো মনস্যেবমচিন্তয়ৎ।
মহাবলো মহাবীর্য্যো রিপুর্মে সমুপস্থিতঃ॥" ৫ : ৪ খণ্ড ২, পৃ ৪৪

(১০) অধ্যাত্ম রামায়ণের মতো এখানেও রাবণকে লঙ্কার বিপদ দেখে শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হতে দেখা যায়। শুক্রাচার্যের উপদেশমতোই রাবণ অভিচার হোমে ব্রতী হয়। বিভীষণের উপদেশে রামচন্দ্র হনুমান, অঙ্গদ ইত্যাদি বানরকে হোমে বিঘ্ন উৎপাদন করে হোম পণ্ড করতে পাঠান। বিভীষণ-মহিষী সরমা তাদের হোমের স্থান দেখিয়ে দেয়। কোনও রকমে রাবণকে হোম থেকে নিবৃত্ত করতে না পেরে হনুমান রাবণ-মহিষী মন্দোদরীর চুলের মুঠি ধরে রাবণের কাছে নিয়ে আসে। সাহায্যের জন্য মন্দোদরী চীৎকার করতে থাকে। রাবণ তখন হোমের স্থান থেকে উঠে এসে মন্দোদরীকে রক্ষা করে। রাবণের হোম পণ্ড হয় (৫ : ২৭)।

(১১) রাম-রাবণের যুদ্ধে যখন রাম রাবণকে কিছুতেই বধ করতে পারছেন না তখন বিভীষণ রামকে বলেন যে, রাবণের মৃত্যুর গোপন রহস্য আছে তার নাভি-দেশে অবস্থিত কুণ্ডলাকার অমৃতে। অতএব তিনি যেন রাবণের নাভিদেশে তীর নিক্ষেপ করেন। বিভীষণের কথামতো রাম রাবণের নাভিদেশে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেন এবং রাবণ নিহত হয় (৬ : ২৯-৩০)। এই কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণেও পাই।

(১২) ৬ : ৩১ সর্গে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুকরণে এখানে রাম-গীতা বর্ণিত আছে। এই গীতায় কর্মের চেয়ে জ্ঞানের সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে।

তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণের মতো তত্ত্ব প্রধান। শুষ্কতত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য এই রামায়ণও অধ্যাত্ম রামায়ণের মত জনপ্রিয় নয়। শুধু তাই নয় এখানে কাহিনীবিন্যাসের সঙ্গে তত্ত্বের সামঞ্জস্য ঠিকভাবে সর্বত্র রক্ষা করা হয়নি। তার ফলে কাহিনীও সরস হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া এখানে এমন সব অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত কাহিনী দেখা যায় যে তা অদ্ভুত রামায়ণেও পাই না। এই-সব কারণে এই রামায়ণটি কখনোই জনমানসে জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি।

তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণে যে বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনাগুলি পাওয়া যায়

সেগুলির মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি যুক্তিসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা তা আলোচনা করা যেতে পারে :

১) এই রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে রাম মাতা কৌশল্যাকে আপন বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। আমাদের মনে পড়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন যে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ তিনি এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আসল হোতা তিনি। কিন্তু এই রামায়ণে রামকে এরূপ বলিষ্ঠ মতবাদ প্রচার করতে দেখিনি। আমরা দেখি যে নারদ রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্বে অযোধ্যায় এসে রামকে রাজা হতে নিষেধ করেন। তাঁর অবতার হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণ স্মরণ করিয়ে দেন। ব্রহ্মার আদেশে সরস্বতী মন্থরা এবং কৈকেয়ীকে মোহিত করে রামের বনগমনের পথ প্রশস্ত করেন। বনবাসকালে নারদ আবার রামের সঙ্গে দেখা করে রাম যে রাবণ বধের জন্য এবং রক্ষোকুল ধ্বংস করার জন্য জন্ম নিয়েছেন সে কথা মনে করিয়ে দেন। দেবতাদের এই কার্যাবলী দেখে মনে হয় যেন রাম প্রকৃত অবতার নন। দেবতাদের দ্বারা প্রেরিত একজন দূত মাত্র যাঁকে এক বিশেষ কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তিনি একজন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি তাই বারবার তাঁর কর্তব্য ভুলে যান। তাই তাঁকে বারবার তাঁর কর্তব্যকর্মে ব্রতী হওয়ার জন্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। বাল্মীকি-রামায়ণে রাম নরচন্দ্রমা। তাঁর পক্ষে মানবোচিত বিস্মৃতি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ মূলতঃ ভক্তিভাবের এবং রামচন্দ্রের দিব্যমহিমা প্রতিষ্ঠার কাব্য। সুতরাং এ-কাব্যের নায়কের পক্ষে দেব-ভাব চ্যুতি এবং কর্তব্যবিস্মৃতি অবশ্যই অসংগত।

২) রাবণ-জটায়ু সংঘর্ষের এখানে একটি নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে। রাবণ যখন কিছুতেই জটায়ুকে পরাজিত করতে পারছে না তখন সে নিজের প্রাণের রহস্য জানিয়ে জটায়ুকে তার প্রাণের রহস্য বলতে বলে। জটায়ু সরল মনে তা বললে, এই সরলতার সুযোগ নিয়ে রাবণ জটায়ুকে বধ করে।

রাবণ একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হয়ে সে স্বর্গ মর্ত্য পাতালে অত্যাচার চালাত। তার ভয়ে দেবতা, যক্ষ, কিন্নর মানুষ তটস্থ ছিল। সেই রাবণ জটায়ুর মতো এ পক্ষীকে পরাজিত করতে পারল না। এবং তাকে পরাজিত করার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করল একথা কেমন করে স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। তাই মনে হয় কবি রাবণ-জটায়ু সংঘর্ষের একটি নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেই চেষ্টা যুক্তিসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩) অশোকবনে অপহৃতা সীতা রাবণ-প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করতেন কিনা সে-

কথা কোনও রামায়ণে উল্লিখিত হয়নি। এখানে কবি লক্ষ্মীর অবতার সীতাকে রাবণের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ না করিয়ে ইন্দ্র-প্রদত্ত স্বর্গীয় পায়স গ্রহণ করার কথা বলেছেন। মেনে নেওয়া গেল লক্ষ্মীর অবতার সীতার জন্য স্বর্গীয় পায়স একমাত্র উপযোগী খাদ্য ছিল, কিন্তু অশোকবনে রাক্ষসীরা যখন দিনের পর দিন সীতার প্রতি অত্যাচার চালাত, রাবণ এসে তার কু-অভিপ্রায় সীতাকে জানাত, এগুলিও কি লক্ষ্মীর অবতারের উপযোগী ছিল ? একথা মেনে নেওয়া যায় যে রাবণ বধ এবং রক্ষোকুল নাশের জন্য সীতাহরণের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য সীতার প্রতি অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা কেন ? এর সদুত্তর কিন্তু এই ভক্তিবাদী রামায়ণে নেই। বাল্মীকি-রামায়ণে এই লাঞ্ছনা এবং পীড়ন, নারীর প্রতি অত্যাচার রাবণের পাপের পাত্র পূর্ণ করেছে এবং তার ধ্বংস অনিবার্য করে তুলছে। কিন্তু ভক্তিবাদী রামায়ণের দেবীস্বরূপা নায়িকার পক্ষে এ লাঞ্ছনা অসংগত।

৪) আর-একটি অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় যখন দেখি সীতা-রাবণ সংলাপের সময় হনুমান সেখানে উপস্থিত হয়ে রাবণকে প্রহার করছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাবণ একজন অসামান্য শক্তিধর যোদ্ধা ছিল। তার ভয়ে দেবতা, মানব, দানব ভীত ছিল। সেই রাবণকে একজন সামান্য বানর তারই রাজ্যে প্রহার করবে এবং রাবণ তা সহ্য করবে, প্রতিকার করার চেষ্টা করবে না একথা কি কখনোই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারি ?

৫) এই রামায়ণে সমুদ্রকন্যা—কন্যাকুমারীর ঘটনা সম্পূর্ণ একটি নূতন সংযোজন। রাম যখন সেতুবন্ধন করতে যান সেই সময় কন্যাকুমারী নারদকে রামের কাছে পাঠান এই বার্তা নিয়ে যে কন্যাকুমারী রামকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করছেন। অতএব রাম যেন তাকে বিবাহ করেন। তার উত্তরে রাম নারদকে এই কথা বলে পাঠান যেন তিনি এখন যুদ্ধে যাচ্ছেন, ফিরে এসে তাঁকে বিবাহ করতে পারেন। তবে তাকে সমুদ্রবন্ধনের উপায় করে দিতে হবে।

একমাত্র জৈন-রামায়ণ ছাড়া রামচন্দ্রের একাধিক বিবাহের কোনও উল্লেখ কোনও রামায়ণে নেই। ভক্তিবাদী রামায়ণ হয়েও এই রামায়ণ কেন যে এক পত্নীত্বব্রত রামচন্দ্র কন্যাকুমারীকে বিবাহ করার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাও আবার সেতুবন্ধনের উপায়ের বিনিময়ে, সেটি আমাদের কাছে বোধগম্য হল না। এতে কি রামচন্দ্রের চরিত্র এবং মহত্ব মসীলিপ্ত হ'ল না ?

৬) মায়া-সীতার কথা অন্যান্য ভক্তিবাদী রামায়ণের মতো এখানেও উল্লিখিত আছে। এখানে বর্ণিত আছে যে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের আগে রাম মায়া-সীতা সৃষ্টি করে কুটীরে রাখেন এবং আসল সীতাকে নিজ বক্ষে স্থাপন করেন।

পরে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সীতাকে বক্ষে ধারণ করে যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করে আসল সীতাকে সীতার অনুমতিক্রমে মাতা পৃথ্বীদেবীর কাছে রেখে আসেন।

মায়া-সীতা হরণ করার জন্য রাবণ কেন বধযোগ্য হবে সে-কথার উত্তর অন্যান্য ভক্তিবাদী রামায়ণের মতো এই রামায়ণেও নেই। রাবণ যদি মায়া-সীতা হরণ করে, তবে সীতার জন্য আমাদের চিরকালীন দুঃখ যেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে, এই মায়া-সীতা হরণের জন্য রাবণ বধ হওয়া তেমনই যুক্তিহীন হয়।

৭) সীতার বনবাসের এখানে একটি অভিনব কারণ দেখানো হয়েছে। রাম ও সীতা দুজনেই বৈকুণ্ঠে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সীতা রাবণের ঘরে ছিলেন এই অজুহাতে রাম সীতাকে বনে পাঠান। সেখানে সীতার দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে দুজনেই বৈকুণ্ঠে ফিরে যান।

সীতার বনবাসের সময় সীতার দুঃখে আমরা পুরুষানুক্রমে কেঁদেছি। সীতার বনবাসকে কেন্দ্র করে কত না বিয়োগান্ত কাব্য, নাটক রচিত হয়েছে। সীতার বনবাসের জন্য কোনও কবি রামকে দায়ী করেছেন, আবার কেউ কেউ সীতাকেই দায়ী করেছেন। সেই সীতার বনবাস কেবলমাত্র যদি বৈকুণ্ঠে যাওয়ার ছলনা হয় তবে তার জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ যেমন অনর্থক হয়, রামায়ণের সার্থকতাও বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয় না কি? তাই মনে হয় কবির এই অভিনব কারণ দ্বারা শুধু মাত্র রামায়ণের কাব্যিক সৌন্দর্য হানি হয়নি রামায়ণের প্রভাবও জনমানসে সর্বাংশে ব্যাহত হয়েছে।

(চ) ভূশুণ্ডী রামায়ণ :—ভূশুণ্ডি রামায়ণ, আদি রামায়ণ ও ব্রহ্ম রামায়ণ এই তিন নামে খ্যাত হয়। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' এই ভূশুণ্ডী রামায়ণ দ্বারা প্রভাবান্বিত। তুলসীদাস রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দেখি কাক ভূশুণ্ডী গরুড়ের সঙ্গে রামকথা ও রামভক্তির আলোচনায় নিজের কথা বলছেন। কাক ভূশুণ্ডী পূর্বে এক ঋষি ছিলেন। শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে বারবার প্রশ্ন করে বিরক্তি উৎপন্ন করলে লোমশ মুনির শাপে ঋষি কাকের রূপ প্রাপ্ত হল। এখানে ভূশুণ্ডী রামায়ণ ব্রহ্ম রামায়ণ বলে খ্যাত। কাক ভূশুণ্ডীর জীবনকথা পরিবর্তিত আকারে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পাই (৪ : ১৪-২৬)। শিবের বিশ্বস্ত অনুচর অলম্বুসের বাহন ছিল এক কাক। শিবের অন্যান্য অনুচরদের রাজহংস বাহন ছিল। রাজহংস ও কাকের মিলনের ফলে এই কাক ১১টি কাকের জন্ম দেয়। এই ১১টি কাকের প্রধানের নাম ভূশণ্ড। এই ভূশণ্ড মেরু পর্বতে সাধুর ন্যায় জীবন যাপন করত। তাই ভূশণ্ড

বশিষ্ঠের প্রশ্নের উত্তরে আধ্যাত্মিক জীবন ও সাধনার কথা আলোচনা করেছিল। তামিল রামায়ণে, যোগ ও বেদান্ত দর্শনে কাক ভূশুণ্ডী নামে এক সিদ্ধ পুরুষের উল্লেখ পাই। 'চিত্রকূট মাহাত্ম্য'তে কাকভূশুণ্ডীর উপস্থিতি বর্ণিত আছে। এখানে চিত্রকূটে রামলীলার বর্ণনা আছে এবং অসমীয়া রামায়ণে এই বর্ণনার প্রভাব দেখা যায়। 'চিত্রকূট মাহাত্ম্য'তে কাক ভূশুণ্ডীর সঙ্গে ব্রহ্মা, গরুড়, সুতীক্ষ্ণ ও সাণ্ডিল্য ঋষির কথোপকথন দেখা যায়। অন্য এক পাণ্ডুলিপিতে এই রামায়ণকে ব্রহ্মা-ভূশুণ্ডী সংবাদে বর্ণিত বলে আদি রামায়ণও বলা হয়েছে।

এই রামায়ণের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ আকারে উদয়পুর, জয়পুর, মথুরা, অযোধ্যা, কাশী, কলিকাতা ও লণ্ডনে পাওয়া যায়। এখন ভূশুণ্ডী রামায়ণের পূর্বখণ্ড ডঃ ভগবতীপ্রসাদ সিং-এর সম্পাদনায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন থেকে ১৯৭৫ সালে কাশী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই রামায়ণের রচনাকাল ১৪ শতাব্দী মনে করা হয়। রামায়ণটির পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম এই চারটি খণ্ডে আছে। প্রথম খণ্ডে রামের অবতার, বালচরিত, রামক্রীড়া; দ্বিতীয় খণ্ডে সীতা-স্বয়ংবর; তৃতীয় খণ্ডে রামের বনগমন, রাবণ-বধ এবং রামের অন্যান্যদের সঙ্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং শেষ খণ্ডে রামের শেষজীবনকথা বর্ণিত আছে। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর খণ্ডের পাণ্ডুলিপি বরোদা ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউটে রক্ষিত আছে।

এই রামায়ণে দুটি মুখ্য বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রথম বিশেষত্ব, যেহেতু এই রামায়ণ ভাগবৎ পুরাণের দ্বারা প্রভাবান্বিত সেই কারণে স্থানে স্থানে রাম ও কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর সাদৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, যেহেতু নানা হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে কাহিনী আহরণ করে এই রামায়ণ রচিত, সেইজন্য অনেক সময় এই রামায়ণের কাহিনীগুলির সুষ্ঠু বিন্যাস দেখা যায় না। কখনও দেখা যায় প্রথম খণ্ডেই শেষ খণ্ডের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আবার দেখা যায় প্রায় শেষ খণ্ডে প্রথম খণ্ডের কিছু কাহিনী আছে। সব ঘটনাগুলি পরপর সাজিয়ে এই রামায়ণের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যেতে পারে।

ক) পূর্বখণ্ড—পূর্বখণ্ডের প্রথমেই রামের স্বরূপের কথা। এখানে কেবল রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনাগুলির বর্ণনা করা হচ্ছে :

১) রাম ব্রহ্মরূপ সনাতন। তাঁর চার অংশ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

"অস্য চত্বার এবাংশাঃ ব্রহ্মরূপাঃ সনাতনঃ।
বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ॥" ১৩৮, পৃ ৩৮

২) রাম আদি নারায়ণ, সীতা রামের শক্তি, রাধা, রুক্মিণী সীতার বিভিন্ন রূপ মাত্র। রাম ও সীতা একাত্ম।

এরপর রামের বিভিন্ন ক্রীড়ার কথা উল্লিখিত। যেমন :—

(অ) নারদ রাবণের নিকটে দিয়ে বললেন যে অযোধ্যায় রাম রাবণের নিধনের জন্য জন্ম নিয়েছেন। এই কথা শুনেই রাবণ রামের অনিষ্ট করার জন্য তৎপর হল। দশরথ ভয় পেয়ে সরযূর অপর পারে তাঁর তিন রানী এবং অন্যান্য পুত্রদের পাঠালেন এবং রামকে অন্যান্য রাখাল বালকের মতো শিরস্ত্রাণ পরিয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে পাঠালেন। এই ক্রীড়াভূমিকেও ভাগবতের মতো ব্রজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(আ) রাবণ ভাগবতের কংসের মতো রামের নিধনের জন্য দৈত্য প্রেরণ করেছিল এবং সেই দৈত্যও কৃষ্ণের মতো রামের হাতে মৃত্যু বরণ করেছিল।

(ই) রামচন্দ্র খেলতে খেলতে কৃষ্ণের মতো মাটি খাননি, খেয়েছিলেন বদরী ফল। উভয়েই মায়ের আদেশে মুখব্যাদান করে মাকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।

> "এবমুক্তা ব্যাত্তমুখস্ত রামঃ প্রদর্শয়ামাস মুখে সমস্তম্।
> সজঙ্গম্ স্থবিরমেতদুচ্চৈর্যদ্দৃশ্যজাতং বরিবর্তি লোকে ॥ ২২।১৯।৭৪

(ঈ) কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন ব্রজবাসীকে ইন্দ্রপ্রেরিত ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য। এখানে দশরথের বৈষ্ণব যজ্ঞ যখন ইন্দ্র ঝড়বৃষ্টি দিয়ে পণ্ড করার চেষ্টা করেছিলেন, রাম তখন বিরাট ছাতা ধরে সবাইকে ঝড়বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং যজ্ঞ পণ্ড হতে দেননি।

(উ) ভাগবতের দশম স্কন্ধে আছে, গোপীরা কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য 'কাত্যায়নী ব্রত' পালন করেছিলেন। এখানে দেখি, রামের স্ত্রী সঙ্গীরা প্রমোদবনে রামকে পাওয়ার জন্য দুর্বাসার নিকট থেকে প্রাপ্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল।

(ঊ) দশরথের আদেশে রাম লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে যেতে চাইলে রাখাল বালকদের ব্যথা বেদনার রূপ কৃষ্ণবিরহে রাখাল বালকদের ব্যথা বেদনার কথা মনে করিয়ে দেয়।

(ঋ) প্রমোদবনে রামের স্ত্রী সঙ্গীরা যখন রামের চলে যাওয়ার কথা শুনে বিরহকাতর, তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র যে ভক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন, তা 'রামগীতা' নামে খ্যাত।

(খ) দ্বিতীয় খণ্ড (পশ্চিম খণ্ড)-সীতার স্বয়ংবর :—

(১) সীতার স্বয়ংবরে যাওয়ার আগে বসন্ত উৎসবের সময় সীতার রূপের

কথা শুনে রাম এক পাখিকে দূতস্বরূপ তাঁর বার্তা সীতাকে পাঠিয়েছিলেন। সীতাও ঐ পাখি মারফৎ তাঁর নিজের একটি ছবি রামের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

"মৈথিলি ত্বামহং বন্দে রাঘবেন্দ্রপ্রিয়াসি ভোঃ।
যোঽসৌ চিত্রগতঃ সাক্ষাল্লিখিতো রঙ্গবিদ্যয়া॥ ৪০।২৮৮
অচিরাদেব তে তন্বি পাণিং রামো গৃহীষ্যতি।
তাবজ্জীবাতবে তস্য চিত্রমর্পয় তাবকম্॥" ৪১ —৬৫।৪০-৪১

(২) বিবাহের পূর্বে সীতার সঙ্গে রামের উদ্যানে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল, কৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর।

(৩) সীতার স্বয়ংবর সভায় রাবণ উপস্থিত ছিল।

(৪) রাম—পরশুরামের সাক্ষাতের পূর্বে পরশুরাম জনকের নিকট দূত পাঠিয়ে শিবধনু ভঙ্গে রামের উপর তার ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। পরে অবশ্য তার ক্রোধ স্তিমিত হয়েছিল এবং তিনি রামকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

গ) তৃতীয় খণ্ড (দক্ষিণ খণ্ড)—রামের বনবাস ও রাবণ বধ :—

১) সীতাকে বিবাহ করে রাম অযোধ্যায় ফিরে আসার কিছুদিন পরে দশরথ তাঁর রাজ্য কাকে দেবেন চিন্তা করতে থাকেন। প্রথমে ভাবেন, চারপুত্রকে রাজ্য সমান অংশে ভাগ করে দেবেন। পরে তাঁর বংশের নিয়মানুসারে জ্যৈষ্ঠপুত্রকে রামকেই রাজ্য দেবেন স্থির করেন।

২) রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হচ্ছে এই কথা শুনে ইন্দ্র চিন্তান্বিত হন। কারণ রাম রাজা হলে রাবণ বধ হবে না। তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় সরস্বতী অযোধ্যায় যান। এবং তাঁরই প্রভাবে মন্থরার মন্ত্রণায় কৈকেয়ী দুটিবর চান। এই ঘটনা অধ্যাত্ম রামায়ণেও পাওয়া যায়।

৩) রামের বনযাত্রার পর ভরত যখন চিত্রকূটে গিয়ে রামের পাদুকা আনেন এবং পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করতে থাকেন, সেই সময় রাবণ পাদুকাকে হরণ করার চেষ্টা করে কিন্তু তার চেষ্টা ফলবতী হয় না।

৪) রাম চিত্রকূটে তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে রামলীলা উৎসব পালন করেন।

৫) স্বর্ণমৃগ যে রাক্ষসের ছদ্মবেশে এসেছে রাম তা জানতেন এবং রাবণ যে সীতাহরণ করতে এসেছে তাও তিনি জানতেন। তখন রাম 'সীতাকে' অগ্নির মধ্যে রাখেন এবং অগ্নি থেকে ছায়াসীতা বেরিয়ে আসে। রাবণ যে সীতাহরণ করেছিল সে আসল সীতা নয় ছায়াসীতা।

'জহার রাবণস্তূর্ণ সীতাং ছায়াময়ীং স্ত্রিয়ম্।
সীতাতু গার্হপত্যাগ্নৌ প্রবিষ্টাশ্রীঃ স্বয়ংভবা ॥'

রাবণ মাঘ শুক্লা চতুর্দশীতে সীতাহরণ করে। এই ছায়াসীতা বা মায়াসীতার কথা আমরা অধ্যাত্ম রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ প্রভৃতিতেও পাই।

৬) কবন্ধ কেবল রামকে সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে বলেনি, রাবণ এবং লঙ্কার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিল। সুগ্রীবের সম্বন্ধে কবন্ধ বলেছিলেন যে, সুগ্রীব কেবল বালির সিংহাসন চায়নি, তার স্ত্রী তারাকেও পেতে চায়।

৭) আমরা জানি শবরী রামকে ফলদান করেছিল এবং স্বর্গে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে রাম শবরীকে কৃষ্ণ অবতার পর্যন্ত তপস্যা করতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তখন তিনি তাকে অন্যান্য গোপীদের মতো গ্রহণ করবেন। বনের ঋষিরা শবরীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। অগস্ত্য তখন তাঁর তপঃপ্রভাবে জল নিয়ে আসেন এবং ঋষিদের শবরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করান।

৮) যখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে তার কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দিতে কিষ্কিন্ধ্যায় যান, তখন রাম তাঁর ঐশ্বরিক রূপে লঙ্কায় যান, অশোকবনে সীতার সঙ্গে দেখা করেন এবং সেখানে প্রমোদবনের গোপীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসলীলা অনুষ্ঠান করেন।

৯) হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ফেরার পথে সীতার সঙ্গে দেখা করে আসে নি।

১০) রাম নামে শিলা জলে ভেসেছিল এবং সেতু নির্মিত হয়েছিল। সেতু রচনা করতে চার দিন লেগেছিল। পৌষ কৃষ্ণা দশমীতে সেতু-নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল ত্রয়োদশীতে।

১১) এখানে সুগ্রীব ও রামের মধ্যে একটি সুন্দর কথোপকথন বর্ণিত আছে। সুগ্রীব রামকে জিজ্ঞাসা করে 'আপনি লঙ্কা বিভীষণকে দেবেন বলেছেন'। কিন্তু যদি রাবণ আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তবে আপনি কি করবেন? রাম উত্তর দিয়েছিলেন, 'তাহলে তাকে আমি অযোধ্যা দিয়ে দেব'।

১২) একাদশী বলে রাম-রাবণের যুদ্ধ একদিন বন্ধ ছিল।

১৩) কুবেরের পুষ্পকরথ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে সাহায্য করতে এসেছিল। রাম পুষ্পকে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

১৪) রামের ব্রহ্মাস্ত্র দশভাগ হয়ে রাবণের দশমুণ্ড কেটেছিল।

১৫) রাবণ বধের পর লক্ষ্মণকে পাঠানো হয়েছিল অশোকবন থেকে সীতাকে আনার জন্য, হনুমান বা বিভীষণকে নয়।

১৬) মৃত বানরসেনারা পুনর্জীবিত হয়েছিল ইন্দ্রের অমৃতস্পর্শে নয়, সীতার স্বর্গীয় দৃষ্টিপাতের ফলে।

ঘ. চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (উত্তর খণ্ড)—

১) গর্ভবতী সীতা স্বেচ্ছায় আশ্রমে বসবাস করার জন্য বনে গিয়েছিলেন। পরে এক ঋষি সীতাকে বলেছিলেন যে সীতার রাবণ-গৃহে বসবাসের জন্য প্রজাদের অসন্তোষ হেতু রাম সীতাকে বনে পাঠিয়েছেন।

২) ব্রহ্মার নির্দেশে কাল রামের সঙ্গে দেখা করতে এলে রাম তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর লীলাখেলার শেষ পর্যায় আসন্ন।

৩) একদিন দুর্বাসা রামের সঙ্গে দেখা করতে এলে লক্ষ্মণ রামকে সেই সংবাদ দিতে গিয়ে রামের বিশ্বরূপ দেখেন।

৪) রাম ১৮ সর্গে বিষ্ণু-ভক্তিকথা দুর্বাসার নিকট বর্ণনা করেন।

৫) রাম লক্ষ্মণকে সরযূর তীরে গিয়ে তপস্যায় রত থাকতে বলেন।

৬) তারপর একদিন রাম তাঁর এই লীলাক্ষেত্র ত্যাগ করে স্বস্থানে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন এবং সবাইকে তাঁর অনুসরণ করতে বলেন। সবাই রামকে অনুসরণ করে চলে যায়।

ভূশুণ্ডী রামায়ণে কেবল রামায়ণ-বহির্ভূত কাহিনী পাই না, ভূশুণ্ডী রামায়ণ কিভাবে পরবর্তী রামায়ণগুলিকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তাও আমরা বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যেমন :—

১) অধ্যাত্ম রামায়ণ :—অধ্যাত্ম রামায়ণে 'রামগীতা' একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ভূশুণ্ডী রামায়ণে আমরা দুবার 'রামগীতার' উল্লেখ পাই। একবার গোপীদের নিকট বর্ণিত ; আর-একবার অত্রিপুত্র দুর্বাসার নিকট বর্ণিত। কিন্তু এই দুই রামায়ণের আদর্শগত পার্থক্য দেখা যায়। ভূশুণ্ডী রামায়ণের আদর্শ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের জ্ঞানযোগ, আর অধ্যাত্ম রামায়ণের আদর্শ অদ্বৈত-বেদান্ত। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে ভূশুণ্ডী রামায়ণের মতো রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে যথাক্রমে বিষ্ণু, শেষ ও লক্ষ্মীর অবতার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া অধ্যাত্ম রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডের বাল্যলীলা বর্ণনা, কৌশল্যার রামের নিকট প্রার্থনা, সুন্দর কাণ্ডের রামকে কাল এবং সীতাকে কালী বলে অভিহিত করা—এসবের অনুপ্রেরণা ভূশুণ্ডী রামায়ণ থেকে পাওয়া।

২) আনন্দ রামায়ণ :—আনন্দ রামায়ণ অধ্যাত্ম রামায়ণের পরবর্তী রচনা। এই রামায়ণের বিলাস কাণ্ডের অনেক ঘটনা ভূশুণ্ডীর রামায়ণের প্রেরণায় বর্ণিত। যেমন :—

ক. রাম ও সীতার দৈহিকরূপ বর্ণনা (বিলাসকাণ্ড—২ : ৩৭-৭৪)

খ. রাম ও সীতার লীলাখেলা (৫ : ৫০-৫৬)।

গ. দ্বাপরের কৃষ্ণলীলার অনুকরণে রামের রাসলীলা (৭ : ৪৬-৪৯)

ঘ. রামের একপত্নীত্ব ব্রতের জন্য পরবর্তী অবতারের বহুপত্নী লাভ
(বিলাসকাণ্ড—৭ : ১০-১৭)

ঙ. রাম দর্শনে রমণীরা কামমোহিত হলে, রামের আশীর্বাদ দান
(রাজ্যকাণ্ড—৪ : ২৪-২৭)

চ. ব্রাহ্মণদের চার কন্যাকে বরদান (১১ : ৬৮-৭৩)

ছ রামের রামদাসীকে পরবর্তী অবতারে রাধা হয়ে জন্মগ্রহণ করার আশীর্বাদ
(২১ : ৩৮-৪০)

৩) কৃত্তিবাস রামায়ণ :—বাংলা রামায়ণকার কৃত্তিবাস যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনায় ভৃশুণ্ডী রামায়ণ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। কৃত্তিবাস রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের একটি ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে। গরুড় যখন রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ থেকে উদ্ধার করে, রাম তখন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর নিতে বলেন। গরুড় তখন রামকে কৃষ্ণ যেভাবে ত্রিভঙ্গ মূর্তি ধারণ করে বাঁশি বাজিয়েছিলেন সেই মূর্তি ধারণ করতে বলে। রাম তার আশা পূরণ করে। হনুমান কিন্তু তার প্রভু রামকে তাঁর আকার পরিবর্তনে বাধ্য করার জন্য গরুড়ের উপর ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে বলে, 'কৃষ্ণ অবতারের সময় আমি তোমার উপর এর জন্য প্রতিশোধ নেব'। এই আখ্যানের মূল উৎস ভৃশুণ্ডী রামায়ণের পূর্বকাণ্ডের একটি ঘটনা যেখানে গরুড় হনুমানের কাছে নতি স্বীকার করে গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-এর দর্শন পেয়েছিল।

'দদর্শ রামস্য গুঞ্জা কলাপংময়ূরপিঞ্ছস্ফুরিতাবতংসম্।
বংশীকরং গোপদারৈঃ পরীতং কৃষ্ণং ত্রিভঙ্গীললিতং খগেন্দ্রঃ॥'

—ভৃশুণ্ডী-পূর্ব-১ : ৪৫

এ ছাড়া কৃত্তিবাস ভৃশুণ্ডী রামায়ণের অনুকরণে রাবণ দ্বারা বালক রামকে বধ করার জন্য দৈত্য প্রেরণের কথা বর্ণনা করেছেন।

৪) রামলিঙ্গামৃত :—অদ্বৈত কবি তাঁর 'রামলিঙ্গামৃতে' কৃষ্ণের রামলীলার আদর্শে রামের মাধুর্যলীলা বর্ণনা করেছেন। দুই গোপিকার কথোপকথনে রামায়ণটি রচিত। এই দুই জনের মধ্যে একজন রঘুবংশের গোপিকা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই অযোধ্যার গোপিকার ভাবধারার উৎস ভৃশুণ্ডী রামায়ণ। নিম্ন-বর্ণিত প্রসঙ্গগুলি ভৃশুণ্ডী রামায়ণের অনুকরণে বর্ণিত :

১. রামের বনক্রীড়া (সর্গ—২)

২. জানকীর নিত্যনৈমিত্তিক ক্রীড়াকৌতুক (সর্গ— ৩)

৩. বিভিন্ন আহার্য ও অলংকার বর্ণনার সঙ্গে রাম-সীতা মিলনের বর্ণনা (সর্গ— ১৩)

৪. শ্রীরঙ্গনাথের আবির্ভাব ও রঙ্গমূর্তি পূজার বর্ণনা (সর্গ— ১৬)

৫. সরযূ মাহাত্ম্য (সর্গ—১৭)

৬. রাম-শিব ও রাম-কৃষ্ণের একত্ব বর্ণনা (সর্গ—১৮)।

৫) সত্যোপাখ্যান :—এই রামকথায় রামের বসন্তঋতু উপভোগ, জানকীর সঙ্গে প্রেমলীলা, অশোকবনে বিহারলীলা, শেষাচলে সীতার সখীদের সঙ্গে প্রণয় লীলা, সরযূতে জলবিহার এবং গোপীলীলা ভূশুণ্ডী রামায়ণের প্রভাব সূচিত করে।

৬) বৃহৎকোশল খণ্ড :—এই রামকথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত বলে অভিহিত করা হয়। এখানে অনেক আখ্যায়িকা ভূশুণ্ডী রামায়ণের প্রভাবে রচিত। যেমন, রামলীলায় রামের সঙ্গীদের সীতার রূপ ধরে অংশ গ্রহণ, রামের সঙ্গে গোপীদের, গন্ধর্ব, কিন্নরকন্যাদের, দেবকন্যাদের প্রণয়লীলা প্রভৃতি বর্ণনা ভূশুণ্ডী রামায়ণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৭) মহারামায়ণ :—এই রামায়ণের কেবলমাত্র পাঁচটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে রাম-চরণ-রেখা বর্ণনা, রামপূজার নিয়ম বিধি, সীতার ৩৩টি শক্তির নামাবলী ও তাদের কাজ, রামনামের ব্যুৎপত্তি প্রতিপাদন, ৯৯টি প্রণয় ক্রীড়ার বর্ণনা প্রভৃতি ভূশুণ্ডী রামায়ণে অনুসরণে রচিত।

৮) ওড়িয়া রামায়ণ :—ভূশুণ্ডী রামায়ণের প্রভাব ওড়িয়া রামভক্তি সাহিত্যে বিশেষ করে দেখা যায়। এখানে কৃষ্ণলীলার অনুসরণে অনেক রামায়ণে রাম-লীলার বর্ণনা আছে। সারলাদাসের 'বিলঙ্কা রামায়ণে' রামকৃষ্ণের অভিন্নতা বর্ণনা, বলরামদাসের 'জগমোহন রামায়ণে' সীতার পূর্বরাগ বর্ণনা, কৃষ্ণ অবতারে গোপীদের সঙ্গে রামলীলার আনন্দ উপভোগের জন্য দণ্ডকারণ্যে মুনিদের রামকে আশীর্বাদ দান, বনে রাম দ্বারা সীতার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য ও অলংকার রচনা প্রভৃতি ভূশুণ্ডী রামায়ণের প্রভাব মনে করিয়ে দেয়।

এ ছাড়া ওড়িয়া রামসাহিত্যের কতকগুলি ঘটনা ভূশুণ্ডী রামায়ণের অনুকরণে বর্ণিত। যেমন, ধনুর্ভঙ্গের পর এবং রামসীতার বিবাহের পূর্বে পরশুরামের আগমন, ভরতের আতিথ্যের জন্য ভরদ্বাজ আশ্রমে নানা আনন্দের উপকরণের আয়োজন, চিত্রকূটের রাম দ্বারা সীতার অলংকার সজ্জা ও রমণীদের সৌন্দর্য বর্ণনা :

৯) রামচরিতমানস :—অধ্যাত্মরামায়ণের মতো রামচরিতমানসের উৎস

ভূশুণ্ডী রামায়ণ। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দুই রামায়ণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানো যেতে পারে। যেমন :—

ক. রামের জন্মের শুভ মুহূর্ত বর্ণনায়—

'চৈত্রস্য শুক্লপক্ষে তু নবম্যাং শ্রীপুনর্বসৌ।
অভিজিন্নাম যোগেঽসৌ কৌশল্যানন্দনোঽভবৎ ॥'

—ভূশুণ্ডী রামায়ণ, পূর্ব ১০।২

'নৌমী তিথি মধুমাস পুনীতা।
সুক্ল পচ্ছ অভিজিত হরিপ্রীতা ॥'

—রামচরিতমানস, বাল ১৬১।১

খ. বাল্মীকি রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে পরশুরামের উপস্থিতি ঘটেছিল রামের মিথিলা থেকে অযোধ্যা যাওয়ার পথে। কিন্তু রামচরিতমানস এবং ভূশুণ্ডী রামায়ণে পরশুরামের আগমনের উল্লেখ করেছে রামের ধনুর্ভঙ্গের পর এবং রাম-সীতার বিবাহের আগে। তাছাড়া রাম-পরশুরামের বিরোধে লক্ষ্মণের অংশ গ্রহণের উল্লেখ বাল্মীকি-রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে নেই। কিন্তু রামচরিত-মানস এবং ভূশুণ্ডী রামায়ণে একদিকে রাম লক্ষ্মণ এবং অন্যদিকে পরশুরামের কথোপকথনের উল্লেখ পাই।

রাম :— "কিঞ্চিৎ স্পৃষ্টং ন বা স্পৃষ্টং ধনুস্তৎ পুরবৈরিণঃ।
তদৈ চিরেণ জীর্ণত্বাদভজ্যত করোমি কিম্ ॥"

—ভূশুণ্ডী রামায়ণ, পূর্ব ৭৮।১২

"ছুবতহিঁ টুটপিনাক পুরাণা।
মৈঃ কেহি হেতু করৌ অভিমানা ॥" —রামচরিত, বাল ২৮৩।৮

লক্ষ্মণ :— "ধনুরেকগুণং বীত্তে বলমস্মাকমূর্জিতম্।
উপবীতং নবগুণং বিশিষ্টং ভবতাং বলম্ ॥"

—ভূশুণ্ডী, পূর্ব ৭৮।৮৩

"দেব একগুন ধনুষ হমারে।
নবগুন পরম পুনীত তুমহারে ॥"

—রামচরিত, বাল ২৮২।৭

গ. বিবাহের পূর্বে রাম-সীতার পুষ্পবাটিকায় সাক্ষাৎকার বাল্মীকি-রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে নেই কিন্তু রামচরিতমানসে আছে। সম্ভবতঃ তুলসীদাস এই ঘটনা বর্ণনায় ভূশুণ্ডী রামায়ণ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

"তত্রাগমচ্চ মিথিলেন্দ্রকুমারিকা সা
সীতাস্বয়ং নমিতুমালয়মম্বিকায়াঃ।
তাং বীক্ষ্য ভূয় উদিতস্মরবাণ তাপ-
সংভ্রান্তচিত্ত ইব তৎক্ষণমাস রামঃ ॥"

—ভূশুণ্ডী পূর্ব-৭৫।৪

"তেহি অবসর সীতা তহঁ আঈ।
গিরিজা পূজন জননি পাঠাঈ॥
জাস্থবিলোকি অলৌকিক সোভা।
সহজ পুনীত মোর ছোভা॥"

—রামচরিত, বাল ২২৮।২, ২৬১।৩

ঘ. কৈকেয়ীর দোষ নিবারণ অনেক রামায়ণে পাওয়া যায়। ভূশুণ্ডী রামায়ণে সরস্বতী মন্থরা ও কৈকেয়ীকে মোহিত করে রামের বনবাসের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তুলসীদাস, ভূশুণ্ডী রামায়ণের এই বর্ণনায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঘটনার উপর একটু মনস্তাত্ত্বিক আবরণের প্রলেপ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

"মন্থরা নাম কৈকেয্যা দাসী মন্দতয়া ধিয়া।
তস্যাঃ কণ্ঠে সন্নিবিশ্য ব্রাহ্মীপ্রতি বিধাস্যতি ॥"

—ভূশুণ্ডী, দক্ষিণ, ৬।১০

"নাম মন্থরা মন্দমতিদাসী কেকই কেবি।
অজস পেটারী তাহিকরি গঈ গিরামতি ফেরি ॥"

—রামচরিত, অযোধ্যা ১২

ভূশুণ্ডী রামায়ণ পর্যালোচনা করে প্রথমেই যে কথাটা মনে পড়ে তা হ'ল যে এই রামায়ণের উদ্দেশ্য রামকাহিনী বর্ণনা করা নয়, রামলীলা বর্ণনা করা। তাই আমরা এখানে যত্রতত্র রামের বিভিন্ন লীলার বিবরণ পাই। রাম-কাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাস এখানে পাই না। কখনও দেখি শেষ খণ্ডের কাহিনী প্রথম খণ্ডে আছে। আবার কখনও প্রথম খণ্ডের কাহিনী শেষ খণ্ডে দেখা যায়। বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত যে ঘটনাগুলি এখানে দেখা যায়, সেগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে নূতন কাহিনী সংযোজনের জন্য নয় রামের লীলাখেলা বর্ণনার জন্য। রামলীলা, সীতার পূর্বানুরাগ, মায়া-সীতা কথা প্রভৃতি যে ঘটনাগুলি এখানে বর্ণিত হয়েছে তা কেবল ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য, কাহিনীর নূতনত্ব প্রকাশের জন্য নয়। এই রামায়ণে রামের লীলার যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তার প্রভাব যে অন্য রামায়ণেও পড়েছে

তাও এখানে দেখানো হয়েছে। তাই এই রামায়ণে যদি কিছু মূল্য থাকে তা রামলীলা বর্ণনার জন্য, কাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাসের জন্য নয়।

যেহেতু এই রামায়ণে রামের ঐশ্বরীয় মহিমা প্রচারই মূল উদ্দেশ্য, সে কারণে এখানে রামের কোনও অন্যায় কার্য দেখি না। রামের সঙ্গে সঙ্গে এখানে সীতারও ঐশ্বরীয় মহিমা প্রচারিত হয়েছে দেখি। যেমন, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে সীতার স্বর্গীয় দৃষ্টিপাতের ফলে মৃত বানরসেনারা পুনর্জীবিত হয়েছিল। সীতার বনবাসের জন্য এখানে রামকে দায়ী করা হয়নি। সীতা স্বেচ্ছায় বনে গিয়েছিলেন।

রামদাস গৌড়-কৃত 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে রামকথা[১] :—

এই গ্রন্থে অন্ততঃ ১৯টি বিভিন্ন রামায়ণের উল্লেখ আছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ—

১) মহারামায়ণ :—এই রামায়ণে শঙ্কর-পার্বতী সংবাদ—৩৫০,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। পাঁচটি অধ্যায়ে কনকভবনবিহারী রামের ৯৯টি রামলীলা বর্ণিত হয়েছে। এতে রাম-চরণের ৪৮টি রেখার বর্ণনা এবং এই রেখাগুলিই সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি-স্থলরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। রামকে নিরক্ষরাতীত ব্রহ্ম এবং তাঁকে সখীভাবে উপাসনার উল্লেখও দেখা যায়। সীতাকে শক্তির আধার এবং তাঁর কার্যাবলীর বিবরণ আছে। রামনামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে 'রম্' ধাতু থেকে রামায়ণের উৎপত্তি বর্ণনা ও রামের রাসক্রীড়ার উল্লেখ প্রভৃতি এই রামায়ণের বৈশিষ্ট্য। এই রামায়ণকে ভূশুণ্ডী রামায়ণ থেকে অভিন্ন মনে করা হয়।

২) সংবৃত রামায়ণ :— নারদকৃত এই রামায়ণে ২৪০০০ শ্লোক আছে। এই রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে যে স্বয়ংভূ-শতরূপা তপস্যার ফলে দশরথ-কৌশল্যা-রূপে আবির্ভূত হন। স্বয়ংভূ-শতরূপা নবরূপে জন্ম নিয়ে ভগবানের নিকট পুত্র কামনা করে তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যার বরদান স্বরূপ পরজন্মে তাঁরা দশরথ-কৌশল্যা হয়ে রামকে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন। সমগ্র রামায়ণটিতে মুখ্যত রামচরিত্রের বর্ণনাই আছে।

৩) লোমশ রামায়ণ :—লোমশ ঋষিকৃত এই রামায়ণ ৩২০০০ শ্লোকে রচিত। এই রামায়ণকাহিনী অনুসারে রাজা কুমুদ ও বীরমতী, দশরথ ও কৌশল্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে জলন্ধরঘটিত শাপের ফলস্বরূপ রামাবতার বর্ণনা করা হয়েছে। জানকীজন্মের কারণ, মিথিলার বনে শিকার শেষে যোগমায়া দর্শন,

১ 'হিন্দুত্ব'—প্রকাশক শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত, সেবা উপবন, কাশী, ১৯৩৮

শম্ভুপ্রতিজ্ঞা, কামপ্রেরণ, কামযাত্রা, কামদহন, রতির বরদান, পার্বতীবিবাহ প্রভৃতি আখ্যান এই রামায়ণে বিশেষভাবে বর্ণিত।

৪) অগস্ত্য রামায়ণ :—অগস্ত্য মুনিকৃত এই রামায়ণ ১৬০০০ শ্লোকে বর্ণিত। ভানুপ্রতাপ-অরিমর্দনের কথা এবং রাজাকুন্তল ও সিন্ধুমতীর দশরথ ও কৌশল্যারূপে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা এই রামায়ণের বৈশিষ্ট্য। এই রামায়ণের সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণের মিল আছে। এই রামায়ণে জানকীর জন্ম যজ্ঞভূমিতে হয়েছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে সমুদ্রের উৎপত্তি, রামেশ্বরে শিব স্থাপন কারণ, ঋষ্যমুক পর্বতের স্থিতি, ময়-দুন্দুভির উৎপত্তি, কাল-বিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনাও বিশেষরূপে দেখানো হয়েছে।

৫) মঞ্জুলরামায়ণ :—সুতীক্ষ্ণকৃত ১,২০,০০০ শ্লোকে এই রামায়ণ বর্ণিত। এখানে ভানুপ্রতাপ-অরিমর্দনকথা এবং তাঁদের যজ্ঞ ব্যবস্থার কথা পাওয়া যায়। অশোকবনে সীতা-হনুমান সংবাদ, রামকর্তৃক হনুমানের ভক্তি ব্যাখ্যা, শবরীর প্রতি নবধাভক্তি বর্ণন, ভক্তিলক্ষণ, ভক্তলক্ষণ, রাগানুগা ও বৈধীভক্তি নিরূপণ প্রভৃতি ঘটনা ও প্রসঙ্গ রামায়ণটিতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৬) সৌপদ্ম রামায়ণ :—৬২০০০ শ্লোকে অত্রি ঋষিকৃত এই রামায়ণে বাটিকা প্রসঙ্গ বিশেষভাবে বর্ণিত। এখানে জনকের বাটিকা-নিরূপণ, মালী-রাম সংবাদ, অদ্ভুত নীতি-প্রীতি, ভক্তি রসাশ্রয়ী বাণী বিলাস বর্ণিত আছে। এছাড়াও নগরদর্শন, মৈথিলী নারীদের স্নেহ, বালকপ্রেম, স্নেহবিভাবনা, বিবাহতরঙ্গ, হাস্য-বিলাস বিশেষভাবে বর্ণিত। অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে জনক নন্দিনী বিবাহ, বিবাহ কৌশল, গ্রাম্যবধূদের কান্না, হাসি, রঙ্গরস, জানকী ও রঘুনন্দনের বিলাপ, শবরী চরিত্র, নারদ-মিলন, সুগ্রীব মৈত্রী, সীতার অগ্নিপরীক্ষা এখানে পাওয়া যায়।

৭) রামায়ণ-মহামালা :—শিব-পার্বতী সংবাদে এই রামায়ণ ৫৬০০০ শ্লোকে বর্ণিত। এখানে ভূশুণ্ডী দ্বারা গরুড় বিমোহ নিবারণ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া শংকরের মদন বেশে নীলগিরি পাহাড়ে নিবাস, তাঁর মরাল হওয়ার কারণ, কাকের কথা স্মরণ, গরুড় উপদেশ, গরুড় ব্যামোহ, ভক্তের জ্ঞান হলে মোহভঙ্গ হওয়ার কারণ, শংকরের দেখা পেয়েও তাঁকে না বোঝার কারণ, ভূশুণ্ডীর প্রতি ভজনা, বিভীষণ শরণাগতি, সুগ্রীব শরণাগতি, কৌশল্যার বিশ্বরূপ দর্শন, শংকরের রামেশ্বরে স্থিতির কারণ ও প্রয়োজন প্রভৃতি বিচিত্র আখ্যান ও প্রসঙ্গ রামায়ণটিতে বর্ণিত হয়েছে।

৮) সৌহার্দ্য রামায়ণ :—শরভঙ্গ ঋষিকৃত এই রামায়ণে ৪০,০০০ শ্লোক আছে। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক বানরীভাষা বোঝা এবং সেই ভাষায় কথা বলা এখানে বিবৃত

আছে। এ ছাড়া এখানে দণ্ডকারণ্যের শাপ, দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্রের আগমন হেতু, নারদ ব্যামোহতার কারণ, শীলানিধির চরিত্র, তার স্বয়ংবর, কন্যা সৌন্দর্য, নারদ বিভ্রম, রুদ্রগণের পরিহাস ও তার কারণ, নারদক্রোধ বর্জন, শাপ বর্জন, শাপগ্রহণ কারণ, অনুগ্রহ উদ্ধার, শূর্পণখা আগমন, ছলনাবিধি, নাসিকা-কর্ণ-চ্ছেদন, খর-দূষণ যুদ্ধ, রাবণ-মারীচ সংবাদ, কপট কুরঙ্গ ব্যবহার, এই কুরঙ্গের প্রতি জানকীর লোভ, রামের কুরঙ্গ লাভে যাওয়ার কারণ, লক্ষ্মণকে আহ্বান, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মর্ম-বচন, ধনুরেখা কারণ, ধনুরেখার শক্তি বর্ণন, রাবণের ব্রাহ্মণবেশে আগমন, সীতার রেখার বাইরে আসার কারণ, রাবণ-দ্বারা সীতাহরণ, সীতা বিলাপ, জটায়ু যুদ্ধ, রামের সীতা অন্বেষণ. সমস্ত পশুপক্ষী, বানর, বানরীকে জিজ্ঞাসা ও তাদের ভাষা জানার কথা—এই সব বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা রামায়ণটিতে বর্ণিত।

৯) সৌর্য্য রামায়ণ :—৬২,০০০ শ্লোকে বর্ণিত এই রামায়ণের বিষয়বস্তু মূলতঃ হনুমান-সূর্য সংবাদ। রামায়ণটিতে হনুমান জন্ম, শুকচরিত, শুকের রজক হওয়ার কারণ ও তার দ্বারা জানকীর নির্বাসন দণ্ড বর্ণিত। হনুমানের ফেরার পথে ইন্দ্রালয়ে গমন, অঞ্জনী-হনুমান সংবাদ, হনুমানের প্রতি অঞ্জনীর মাতৃ অধিকার, সীতা-মিলন, মহারাজ সম্মিলন, পুনঃ লক্ষ্মণ মিলন, জাম্ববানের পরাক্রম ও তার আতিথ্য বর্ণন, প্রয়াগ, আগম আদি বর্ণন প্রভৃতি এই রামায়ণকে আকর্ষণীয় করেছে।

১০) চান্দ্র রামায়ণ :—রামায়ণটিতে হনুমান-চন্দ্রমা সংবাদই মুখ্য। এই কাহিনী ৭৫,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। কাহিনীগুলির মধ্যে 'কেওটের পূর্বজন্মকথা' বিশেষভাবে বিবৃত। এ ছাড়া রামায়ণটিতে নারদতপ, ইন্দ্রের কাম প্রেরণ, নারদ-ব্যামোহ, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, জনকনন্দিনীর খোঁজ, এক গহ্বরে গিয়ে একস্ত্রীর (স্বয়ংপ্রভা) সন্ধান লাভ, সম্পাতির চরিত্রবর্ণন, চন্দ্রমাঋষির আগমন কারণ, সম্পাতির প্রতি দয়া, বানরসেনার মিলন, জটায়ুর বিলাপ, গৃধ্রের দূরদৃষ্টি প্রভৃতি কাহিনী বিচিত্ররূপে বর্ণিত হয়েছে।

১১) মৈন্দ-রামায়ণ :—এর প্রধান আখ্যান মৈন্দ-কৈরও সংবাদ। এই রামায়ণের ঘটনাধারা ৫২,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। রামায়ণটিতে জনকনগর বাটিকা প্রসঙ্গ, গুরুসেবা, মালী সংবাদ, অহল্যা উদ্ধার, গঙ্গাবর্ণন, রামেশ্বর মাহাত্ম্য, রাবণমন্ত্র, বিভীষণ মন্ত্র, হনুমানের অশোকবাটিকায় প্রবেশ ও বন্ধন এবং লঙ্কা দহন প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

১২) স্বায়ংভু রামায়ণ :—এর মূল বিষয় ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ। সমগ্র রামায়ণটি ১৮,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। এতে গিরিজা পূজন, সুমন্ত্র বিলাপ, গঙ্গাপূজন, সীতাহরণ,

রাবণকে মুনিদণ্ড, মন্দোদরী গর্ভে-সীতাজন্ম, কৌশল্যা হরণ, দীর্ঘবাহু, দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথাদির পরীক্ষা প্রভৃতি প্রসঙ্গ কথা বর্ণিত হয়েছে।

১৩) সুব্রহ্ম-রামায়ণ :—রামায়ণটি ৩২,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। এতে প্রয়াগ মাহাত্ম্য, ভরদ্বাজ দর্শন, ভরদ্বাজ-ভরত সংবাদ, দেবতা মন্ত্র, তামস-মিলন, চিত্রকূট নিবাস, অনুসূয়া রহস্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

১৪) সবর্চস-রামায়ণ :—এর মূল বিষয় সুগ্রীব-তারা সংবাদ। রামায়ণটি ১৫,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। এতে সুলোচনা কথা, রজক-রজকিনী সংবাদ, রাবণের চিত্রের কারণে শান্তার সীতার প্রতি দোষারোপ, শান্তার প্রতি সীতার অভিশাপ ও শান্তার পক্ষী-যোনি প্রাপ্তি, মহারাবণ বধ প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণন এর আকর্ষণ। এছাড়া রামায়ণটিতে কিষ্কিন্ধ্যার প্রতি লক্ষ্মণের কোপ, সুগ্রীব মিলন, সীতাদর্শনের জন্য তারার উৎকণ্ঠা, বালি-তারা সংবাদ, বালি-রাম সংবাদ, রাবণ দরবার, সভা প্রসঙ্গ, মন্দোদরীর জ্ঞান, লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিবাণ প্রয়োগ, সঞ্জীবনী আনয়ন, গন্ধমাদন পর্বত বর্ণন, সপর্বত ভরতের অযোধ্যায় গমন, ভরত-হনুমান সংবাদ, সীতা নির্বাসন, লবকুশের উৎপত্তি, লবকুশ যুদ্ধ, অযোধ্যাবাসীর পরাজয়, লবণ বধ, রাজ্য বিভাগ, বৈকুণ্ঠগমন প্রভৃতি প্রসঙ্গও রামায়ণটিতে উল্লিখিত হয়েছে।

১৫) দেব রামায়ণ :—ইন্দ্র-জয়ন্ত সংবাদে রচিত এই রামায়ণ ১০,০০০ শ্লোকে বর্ণিত। এতে জয়ন্তর কাকে রূপান্তর, রাম পরীক্ষা ও কোপ, নারদ মিলন ও উপদেশ রামশরণাগতি, রাম বিজয়, ভরত বিজয়, শত্রুঘ্ন বিজয়, হনুমান বিজয়, অঙ্গদ ব্যামোহ, জানকী বিজয়, বিভীষণপুত্রের অযোধ্যায় রক্ষণাবেক্ষণের ভার, জানকী নাটক, সরযূ মহিমা, হনুমত কার্য ও উপাসনাবিধি, ধাম ও পুরী-নিরূপণ, নগর নিরূপণ, গ্রাম নিরূপণ, ভাষাপরিবর্তন বিধি ও শব্দ পরিশিষ্ট প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

১৬) শ্রবণ-রামায়ণ—ইন্দ্র-জনক সংবাদে বর্ণিত এই রামায়ণে ১,২৫,০০০ শ্লোক আছে। এখানে মন্থরার উৎপত্তি, দশরথের মৃগয়া, শ্রবণের মাতৃপিতৃ ভক্তি, শ্রবণ বিবাহ, শ্রবণ বধ, শ্রবণের পিতার দশরথের প্রতি শাপ, চিত্রকূটের রাম-ভরত সংবাদের সময় জনকের আগমন, মিথিলা সমাজ, ভরতের পাদুকা গ্রহণ ও নন্দিগ্রামে নিবাস, পাদুকার দ্বারা রাজ্য শাসন প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

১৭) দুরন্ত রামায়ণ :—এই রামায়ণ বশিষ্ঠ-জনক সংবাদে বর্ণিত। এখানে ৬১,০০০ শ্লোক আছে। এতে ভরত-মহিমা, ভরত-শপথ, ভরত-বিলাপ, কৈকেয়ী ক্ষোভ, ভরতের রামকে ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা, লক্ষ্মণ রোষ. নিষাদ-ভরত সংবাদ, নিষ্পদ-রোষ, চূড়ামণি কথা, কিষ্কিন্ধ্যা বর্ণন, বানর হওয়ার কারণ, রামের বালিবধ

প্রতিজ্ঞা, মধুবন প্রশংসা, মধুবন রক্ষা বিধি, হনুমানের অনন্ত বল প্রাপ্তি, লঙ্কাদহন প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

১৮) রামায়ণ-চম্পূ :—শিব-নারদ সংবাদে বর্ণিত এই রামায়ণে ১৫,০০০ শ্লোক আছে। এখানে শিলানিধি রাজার নিকট দুই রুদ্রগণকের আগমন কারণ, নারদের পরিহাস, নারদের ক্রোধ, রুদ্রগণকের প্রতিশাপ, বীরভদ্রের উৎপত্তি, সতী-দেহ ত্যাগ, দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশ, ত্রিপুর উৎপত্তি, হিমালয়ের কন্যারূপে পার্বতীর উৎপত্তি ও তপস্যা, কাম-প্রেরণ, শম্ভুনয়ন, কাম-দহন, পার্বতী বিবাহ, মুণ্ডমালা ধারণ কারণ, গণেশ উৎপত্তি, কার্তিকেয় উৎপত্তি, কৈলাস স্থিতি, রাম-ভক্তির প্রকারভেদ, রামধ্যান, ইন্দ্ররথ-পোষণ, পাতাল আগমন, অরুণ-গরুড় সংবাদ, কালনেমি ছল, সঞ্জীবনী মহিমা, শক্তির প্রভাবে সূর্য উদয়, মৃত্যুর হেতু, সুষেন বৈদ্যের আগমন প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত আছে।

১৯) রামায়ণ মণিরত্ন :—এই রামায়ণ বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী সংবাদে বর্ণিত। এখানে ৩৬,০০০ শ্লোক আছে। এতে পঞ্চবটী উৎপত্তি ও সংজ্ঞা, গোদাবরী-তট নিবাস কারণ, গোদাবরী উৎপত্তি, চিত্রকূট নিবাসকারণ, চিত্রকূট মাহাত্ম্য, কামদ-শিখর বর্ণনা, কামদ মহত্ত্ব, চিত্রকূটে রাসলীলা, বাল্মীকি নিবাস স্থল, দেবাশ্রম, অনুসূয়ার নারী ধর্ম শিক্ষা, অযোধ্যায় রাসলীলা, প্রমোদবন বিহার, আবন উদ্ধার, বসন্তোৎসব, লঙ্কায় সীতা-রাম মিলনোৎসব, বেদস্তুতি, শম্ভুস্তুতি, ইন্দ্রস্তুতি, গঙ্গাস্তুতি, বর্ণিত আছে এবং শেষে সিংহাসনে আসীন গুরুগীতা, দেবগীতা, ভক্তিগীতা, জ্ঞানগীতা, কর্মগীতা, শিবগীতা, দেবগীতা প্রভৃতি সাতগীতার বর্ণনা পাওয়া যায়।

অন্যধার্মিক রামায়ণ :—

১) জৈমিনীয় অশ্বমেধ[১]—'জৈমিনীয় অশ্বমেধ' জৈমিনী ভারতের অশ্বমেধ পর্ব। ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হতে বলে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা করছেন। এখানে 'কুশ-লব উপাখ্যান' ২৫ থেকে ৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। এখানে সীতা ত্যাগ, কুশ-লব জন্ম, যজ্ঞাশ্বকারণে কুশলব-এর সঙ্গে রামসেনার যুদ্ধ এবং পরিশেষে রামসীতার মিলন প্রভৃতি ঘটনাগুলি বর্ণিত আছে। কথাবস্তুর বিশেষত্ব এইভাবে বর্ণনা করা যায় :—

ক. রাম একদিন গর্ভবতী সীতাকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর কী ভালো লাগে, সীতা তার উত্তরে বলেন যে তাঁর গঙ্গার তীরে বাস করতে ভালো লাগে, (ভাগরথী তীরে গন্তুমিচ্ছামি রাঘব—২৬।৩০) এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাম জানতে পারেন

১ জৈমিনীয় অশ্বমেধ—ভেংকটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই সংস্করণ, ১৯১৩

যে এক রজক তাঁকে বিদ্রূপ করে বলছে যে রাম পরের আবাসে বসবাসকারী স্ত্রীকে ঘরে এনেছেন। একথা শোনার আগে রাম স্বপ্ন দেখেছিলেন যে যেন সীতা গঙ্গার তীরে বাস করছেন এবং রোদন করছেন।

খ. রাম সীতার ঐ অপবাদ শুনে অন্যান্য ভায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে লক্ষ্মণ-কে সীতাকে বনের এক আশ্রমে দিয়ে আসতে বললেন। লক্ষ্মণ সীতাকে আশ্রমে নিয়ে এসে তাঁকে বনবাসের কথা শোনালেন।

গ. বনের আশ্রমে সীতার লব-কুশ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। এদিকে বশিষ্ঠ রামকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বললেন এবং সীতার অভাবে স্বর্ণসীতা নির্মিত হ'ল।

ঘ. কুশ-লব অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের পথ রোধ করল। শত্রুঘ্ন যজ্ঞের অশ্ব মুক্ত করতে এসে বালকদ্বয়ের হাতে পরাজিত হলেন। পরে লক্ষ্মণ ও ভরতের ঐ দশা হ'ল। তারপর রাম বালকদ্বয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে নিজের পুত্র বলে চিনতে পারলেন।

ঙ. শত্রুঘ্নর সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় লবের ধনুক ভঙ্গ হলে লব সূর্যের কাছে ধনুকের জন্য প্রার্থনা জানান, যেভাবে রাম রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় জানিয়েছিলেন। এখানে আট শ্লোকে সূর্য বন্দনা আছে। প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে সূর্য লবকে একটি ধনুক দান করেন।

চ. রাম এবং অন্যান্য ভ্রাতার সঙ্গে লব ও কুশের যুদ্ধের সময় সীতা বাল্মীকির আশ্রমে ছিলেন না। যুদ্ধের শেষ সময়ে সীতা আসেন এবং পুত্রসহ সীতা-রামের মিলন হয়। 'রামের সীতার প্রতি ভালোবাসা পুত্রদের উপর বর্ষিত হয়'—

'রাম সীতাগত স্নেহং বিদধেতদপত্যয়োঃ' —৩৬।৮৩

কিন্তু এখানে সীতার পাতাল প্রবেশের কোনও উল্লেখ নেই।

২) সত্যোপাখ্যান :—(ভেংকটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই):—এই রামায়ণ বাল্মীকি-মার্কেণ্ডেয় সংবাদে বর্ণিত। এখানে পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ নামে দুটি অংশ আছে। পূর্বার্ধে ৫০টি অধ্যায় পাওয়া যায়। এর কথাবস্তু 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' থেকে পৃথক। এখানে রামভক্তির উপর কৃষ্ণলীলার প্রভাব দেখা যায়।

পূর্বার্ধের কথাবস্তু এরূপ :—রাম লক্ষ্মণাদি বিষ্ণু, শেষ, সুদর্শন ও শঙ্খের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে (১-২ অধ্যায়) এরপর মন্থরা-কৈকেয়ী সংবাদে দশরথ-কৈকেয়ীর বিবাহ কথা বর্ণিত হয়েছে (৩-৬ অধ্যায়)। তারপর মন্থরার পূর্বজন্ম কথা। এখানে বলা হয়েছে যে মন্থরা দৈত্য বিরোচনের কন্যা, যাকে বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বধ করেছিলেন। আমাদের সাধারণ ধারণা মন্থরার বহু-

দিন থেকে রামের প্রতি আক্রোশ ছিল। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে, শত্রুঘ্ন তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার সময় মন্থরার কুঁজে আঘাত করেছিল (২০-২৫ অধ্যায়)। এরপর পূর্বার্ধে রামের বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে (১৬-৪৩ অধ্যায়)। এখানে উল্লেখযোগ্য বৃত্তান্তগুলি এরূপ :—

ক. দেবতাদের অযোধ্যায় আগমন এবং দশরথ কর্তৃক তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। রামের বহু প্রকার বাল্যলীলা ও অযোধ্যার মহত্ব বর্ণিত হয়েছে, (১৭-২৩ অধ্যায়)।

খ. কাক-ভূশুণ্ডী দ্বারা রামের খাবার চুরি এবং পরে ভূশুণ্ডীর ক্ষমা প্রার্থনা ও রামের নিকট নিশ্চলা ভক্তি প্রার্থনা এবং শেষে তার দ্বারা গরুড়কে রামতত্ব শেখানোর উল্লেখ আছে (২৬ অধ্যায়ে)।

গ. রত্নালঙ্কা ও তার পতির বৃত্তান্ত। আগের জন্মে তারা, নন্দ ও যশোদা ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (২৭-৩০ অধ্যায়)।

ঘ. নবমী মাহাত্ম্য (৩১-৩৫ অধ্যায়)

ঙ. রামের গুহের নিকটে মৃগয়া শিক্ষা (৪৩ অধ্যায়)।

উত্তরার্ধে নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি পাওয়া যায় :—

১) শিব জনককে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে ধনুভঙ্গ করতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিবাহ দেবে। (অধ্যায় ২)

২) বিশ্বামিত্র শিবের আজ্ঞায় যজ্ঞ রক্ষার জন্য রামকে নিতে এসেছিলেন। (অধ্যায় ৪)

এরপর সীতা-স্বয়ংবর, স্বয়ংবরে প্রহস্তের উপস্থিতি, লক্ষ্মীর সীতা রূপে জন্ম, রাম-সীতা বিবাহ বর্ণিত হয়েছে এবং এরপর জলবিহার, বনবিহার, সীতার মান, লীলা, হোলি উৎসব প্রভৃতি শৃঙ্গার রসাত্মক বর্ণনা আছে।

৩) ধর্ম খণ্ড :—ধর্মখণ্ডের পাণ্ডুলিপি মাদ্রাজ ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে (ধর্ম খণ্ড—পাণ্ডুলিপি নং এম. ডি. ২২৯৯, অনুলিপি করণ—সি. এন. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ১১.৫.৬১)। এই গ্রন্থকে 'স্কন্দপুরাণের' এক অংশ বলে অভিহিত করা হয় এবং 'তত্বসংগ্রহ রামায়ণের' মুখ্য আধার বলে পরিগণিত করা হয়। গ্রন্থের রচনাকাল ১৫।১৬ শতাব্দী বলে মনে করা হয়। এটি একটি শৈব-গ্রন্থ। এই রামকথায় শিবের মহত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি জানা যায় :—

ক. শিব সীতার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে রামকে ধনুর্ভঙ্গ করতে বলেন (অধ্যায় ৯৮)।

খ. রামের বনবাসকালে শিব ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে রামের সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন সে তিনি এবং রাম অভিন্ন।

"শিবং মাং প্রতি জানীহি নাবয়োরন্তরং দ্বিজ" —অধ্যায় ৯৮, পৃ ৩০৬

গ. রামকে বনে পাঠানোর জন্য কৈকেয়ীর অনুতাপ এখানে বিবৃত আছে (অধ্যায় ৯৮)

ঘ. "সীতা হরণের আগে রাম মৃত্যুদেবীকে আহ্বান করেন এবং তাঁকে সীতার রূপ ধারণ করতে বলেন"—

অতো মায়াময়ীং সীতাং কল্পয়ামি বিমোহিনীম্॥ ২৪, পৃ ৩৫৯
ইতিসীতাং সমাভাষ্য সর্বজ্ঞে রাঘবঃ স্বয়ম্।
মৃত্যুদেবীং সমাহূয় বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৯
রাবণং জহি পাপিষ্ঠং গর্বিতং সহ বন্ধুভিঃ।
প্রবিশ্যতৎপুরীং ক্ষিপ্রং দেবদানবদুর্জয়াম্॥ ৩০, পৃ ৩৬০

ঙ. 'মূর্চ্ছিতা সীতাকে স্পর্শ না করে ত্রিশূলাগ্রে রাবণ তাঁকে রথে তুলে স্বরাজ্যে গমন করে।'

"মূর্চ্ছিতা পতিতাং ভূমৌ মুকুলীকৃত লোচনাম্।
ত্রিশূলাগ্রেণ তল্লোষ্টমুদগৃহ্য স্পর্শবর্জিতঃ।
রথমারোপ্য পাপাত্মা তাং সীতাং লোষ্টশায়িনীম্।
আরুহ্য স্বরথং পাপো বৈহায়সপথং গতঃ।" —(অধ্যায় ৯৮, পৃ ৭৩৩)

চ. 'রাবণ জটায়ুর মর্মস্থানে আঘাত হেনে বধ করেছিল'—

"বিদ্ধি পক্ষিন্ রাক্ষসানামঙ্গুষ্ঠং মর্মগং ভবেৎ।
মর্মতাড়নতস্তেষাং ক্ষিপ্রং ভবতি নাশনম্।" —(পৃ ৭৩৪)

ছ. অশোকবনে সীতা-রাবণ সংবাদের সময় হনুমান উপস্থিত হয়ে রাবণকে প্রহার করেছিল (অধ্যায় ১০৫)

জ. তত্ত্বসংগ্রহ-রামায়ণের মত (৬, ২৯) এই রামায়ণে (১৩০ অধ্যায়ে) রাবণের নাভিপ্রদেশে অমৃতের অবস্থানের কথা বিভীষণ রামকে বলেছিল।

৪) বৃহৎকোশল খণ্ড :—রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই রচনার এক পাণ্ডুলিপির (লিপিকাল সংবৎ ১৭১৪) বিবরণ দিয়েছেন। ৩০৭২ শ্লোকে এর বিস্তার। সংবৎ ২০০১ লাহোরের রোশনলাল অগ্রবাল এই রচনার হিন্দি টীকা সহ ১৮০ প্রতিয় প্রকাশিত করেন। এর হিন্দীটীকা 'রসবর্দ্ধিনী' শ্রীরামবল্লভ শরণ মহারাজ রচনা করেন।

বেদব্যাসকৃত 'বৃহৎকোশল খণ্ড' ব্রহ্মরামায়ণের অংশ বলে অভিহিত করা হয়। এর কথাবস্তু ১৫ অধ্যায়ে তিন খণ্ডে বিভক্ত।

১) বিবাহ-পূর্ব রামলীলা (অধ্যায় ১-৫)—

প্রথমেই যজ্ঞোপবীত সংস্কার কথা, তারপর বিদ্যাভ্যাস, এরপর 'সখারাস' বর্ণন। রামের সখা (যিনি রুদ্র বলে অভিহিত) স্ত্রীরূপ ধারণ করে রামের সঙ্গে রামলীলার আয়োজন করছে (অধ্যায় ১)। এরপর গোপীগণ, দেবকন্যাগণ ও রাজকন্যা-গণের সঙ্গে রামলীলার বর্ণনা আছে। কিছুদিন পরে গোপীগণ রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য পার্বতীর পূজা করে। পিতার আদেশ নিয়ে এরপর রাম যমুনাতটে শিকার করার জন্য যান। শিবের আজ্ঞায় রাম নিকুম্ভআঁধি বা ঘন অন্ধকার সৃষ্টি করলেন। যার ফলে সব গোধন এবং তাদের সঙ্গে গোপেরা চলে গেল। এরপর রাম গোপীগণের সঙ্গে বসন্তোৎসব ও রামলীলা করেন। এতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, উমাআদি সবাই ছদ্মবেশে এই লীলায় অংশ গ্রহণ করেন। এরপর রাম গোপীনীদের বিদায় করে এবং সখাদের যোগনিদ্রা থেকে জাগিয়ে অযোধ্যায় চলে যান (অধ্যায় ২)। দশরথ গোপগণের কাছে রামকে কর আদায়ের জন্য প্রেরণ করলে গোপগণ তাদের কন্যাদিগকে সমর্পণ করে। রাম তাদের বিবাহ করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন। এরপর সান্তানিক বনকুঞ্জে দেবকন্যারা রামের সঙ্গে রামলীলা করেন (অধ্যায় ৩)। তারপর দেবতারা অযোধ্যায় গিয়ে রামকে তাঁদের কন্যাদের বিবাহ করতে অনুরোধ করেন। এরপর দশরথ শম্বরাসুর বধের জন্য রামকে প্রেরণ করেন। রাম অসুরের বৈজয়ন্তপুর অবরোধ করে তার পুত্রকে নিধন করেন এবং শম্বরাসুর যে সব রাজকন্যা, গন্ধর্বকন্যা, কিন্নরকন্যা, যক্ষ কন্যাদের হরণ করেছিল তাদের মুক্ত করে অযোধ্যায় এনে তাদের সঙ্গে রাসক্রীড়া করেন (অধ্যায় ৪-৫)।

২) রাম-সীতার বিবাহ (অধ্যায় ৬-৭)—

এক তপস্বিনীর কাছে রামের কাহিনী শুনে অষ্টমবর্ষীয়া সীতা বিরহকাতর হন। মহেশ্বর স্বপ্নে জনককে স্বয়ংবর সভার আয়োজনের পরামর্শ দেন এবং এই পণ করতে বলেন যে, যে ধনুকে গুণ বা ছিলা লাগাতে পারবে সেই সীতার যোগ্য পতি হবে। স্বয়ংবরের আয়োজন হলে দেখা যায় যে অনেক রাজা ধনুকে ছিলা পরাতে অকৃতকার্য হয়ে জনকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরাজিত হয়ে নিজ কন্যাদের সীতার সখী হওয়ার জন্য মিথিলায় প্রেরণ করেন। সীতা রামের রূপ ধারণ করে সখীগণের সঙ্গে রাসলীলা করেন (অধ্যায় ৬)। নারদ রামের কাছে গিয়ে সীতার বিরহের বর্ণনা করেন এবং জনকের স্বয়ংবর সভার বর্ণনা দেন। শিবের

আজ্ঞায় বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে মিথিলায় নিয়ে যান এবং ধনুকে গুণ চড়িয়ে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রঘ্নর বিবাহেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩) বিবাহের পর রামের লীলা (অধ্যায় ৮-১৫)—

বিবাহের পর রাম-সীতা ও অসংখ্য কন্যাদের সঙ্গে বিশ্বকর্মা-নির্মিত প্রাসাদে বাস করেন। সময় সময় রাম বিভিন্ন উৎসবে যোগদান করতেন এবং বনে গিয়ে রাসলীলা করতেন। রাসলীলাগুলি এই প্রকার—গোপকন্যা, রাজকন্যা, যক্ষকন্যা, নাগকন্যা রাস। রামের রাসলীলা ভাগবতের কৃষ্ণের রাসলীলার সুস্পষ্ট অনুকরণ। উদাহরণস্বরূপ রামের বহুরূপ ধারণ, অন্তর্ধান ও সীতার মানভঞ্জন ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। অন্তিম অধ্যায়ে নগরবধূদের সঙ্গে রামের হোলী উৎসবের বর্ণনা আছে। দশরথ রামকে দূত প্রেরণ করে জানান যে পুরনারীদের সঙ্গে বিহার করা অনুচিত। রাম এই কথা শুনে পুরনারীদের বিদায় করে দেন। এই রচনায় শৃঙ্গাররসাত্মক বর্ণনার আধিক্য দেখা যায়। সেই কারণে সবাইকে এই রাসলীলা শোনানো বারণ আছে—'লোলেয়া নহি লোক সংগ্রহ পরাগুপ্তেতি' (অধ্যায় ১৫)।

উপরি-উক্ত চারটি ধার্মিক রামায়ণের বিবরণে তিনটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম, কোনও রামায়ণই পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ নয়। দ্বিতীয়, কোনও রামায়ণই বিয়োগান্ত নয় এবং তৃতীয়, কোনও রামায়ণেই রচয়িতা এবং রচনার কাল বিশেষভাবে জানা যায় না। প্রথম রামায়ণ 'জৈমিনী অশ্বমেধে' রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনার সঙ্গে অন্য কোনও রামায়ণের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় সীতা বনে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করে-ছিলেন। সীতার বনবাসের সময় সীতার দুঃখে আমরা অভিভূত হই। কিন্তু এখানে সীতার বনবাস সীতার ইচ্ছার ফলে হয়েছে। ফলে সীতার মনে কোনও দুঃখ নেই। তারপর অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বধরাকে কেন্দ্র করে সীতা-পুত্র লব-কুশের সঙ্গে রামসেনা ও রামাদি ভ্রাতাদের যুদ্ধ এখানে বর্ণিত আছে। শেষে বাল্মীকির আগমন ও রামসীতার মিলন বর্ণিত হয়েছে। এমন-কি এখানে সীতার পাতাল প্রবেশের বর্ণনাও নেই। এই কাহিনীতে বিষাদের সুর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও নেই। অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর তফাৎ এত বেশি যে এখানে রাম, সীতা, লব, কুশ এবং বাল্মীকির নাম আছে বলেই এই কাহিনীকে রামকাহিনী বলি নতুবা কাহিনীর ধারা অনুযায়ী একে রামকাহিনী কখনোই বলা-যায় না। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' নাটকে অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে লবকুশের সঙ্গে লক্ষ্মণপুত্র চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। ভবভূতির নাটকও মিলনান্ত।

দ্বিতীয় রামকাহিনী 'সত্যোপখ্যান'। এখানে রাসলীলার বর্ণনায় কৃষ্ণলীলা বর্ণনার প্রভাব দেখা যায়। এখানে রামলীলা বর্ণনাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যের উত্তরপর্বে শৃঙ্গার রসাত্মক বর্ণনার প্রাচুর্য দেখা যায়। এখানে রামকাহিনীর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা নেই। সুতরাং এটিকে রামকাহিনীমূলক কাব্য না বলে রামলীলাবর্ণনামূলক কাব্য বলা উচিত।

তৃতীয় কাব্য 'ধর্মখণ্ড' ও একটি শৈবগ্রন্থ। যদিও এখানে বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত কিছু ঘটনা পাওয়া যায় যেমন কৈকেয়ীর অনুতাপ, সীতাহরণ ঘটনায় মায়া-সীতার বর্ণনা প্রভৃতি, তথাপি কাব্যটিতে রামকাহিনীর পুরোপুরি বর্ণনা নেই। কাব্যটি শৈবগ্রন্থ বলে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই দেখি শিব সীতার স্বয়ংবর সভায় গিয়ে রামকে ধনুর্ভঙ্গের আদেশ দিচ্ছেন। রামের বনবাসের সময় শিব ব্রাহ্মণের বেশে মিলিত হয়েছিলেন। কোথাও দেখি রামকে শিবের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখানো হয়েছে। একস্থলে রাম হনুমানকে বলছেন, 'তুমি শিবের অবতার, আমি স্বয়ং শিব'।

শেষকাব্য 'বৃহৎ কোশল খণ্ড' ১৫ অধ্যায়ে তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বিবাহ-পূর্ব রামলীলা বর্ণনা, দ্বিতীয় খণ্ডে রাম-সীতার বিবাহ এবং তৃতীয় খণ্ডে বিবাহের পর রামের লীলা বর্ণনা আছে। কাব্যের বর্ণনার ধারা অনুসারে বোঝা যায় যে কাব্যের মূল উদ্দেশ্য রামকাহিনী নয়, রামলীলা বর্ণনা। সুতরাং এটিও পুরোপুরি রামকাব্য বলে অভিহিত করতে পারি না।

সংস্কৃত ললিত সাহিত্য :—

১) মহাকাব্য-কালিদাস—রামকথা অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য আলোচনায় প্রথমেই মনে আসে আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে মহাকবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশম'[১] মহাকাব্যের নাম। ১৯টি সর্গে বিভক্ত কালিদাসের এই মহাকাব্য ইক্ষাকু বংশের পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক কীর্তিকাহিনী বর্ণিত। রঘুবংশের মধ্যে রামকথাটুকু বাল্মীকির কাছ থেকে নেওয়া, বাকী সবটাই কালিদাসের। বাল্মীকির ভাব ও ভাষা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গি কালিদাস সগর্বে গ্রহণ করে নিজের সাধনায় তাকে নানাভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাই কালিদাস বাল্মীকির কবি-কীর্তির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী।

কালিদাস আত্মসচেতন সুনিপুণ কবি। রামায়ণের কাহিনীগুলি তিনি তাঁর বর্ণনার বিরল নৈপুণ্যে, বাগ্‌ভঙ্গির রমণীয় চাতুর্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কিন্তু

১ রঘুবংশম—জি, আর, নন্দারজিকর -সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৮৯৭

একথা সত্য, যে যুগের জীবনকাহিনী অবলম্বনে কবি কাব্য রচনা করেছেন, সে যুগের জীবনের সঙ্গে কবির নিবিড় যোগ ছিল না। ফলে কবিকে কাব্য রচনা করতে হয়েছে কবিকল্পনার সাহায্যে, তাঁর নিজের যুগের পটভূমিকায়। কিন্তু বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা করেছেন তাঁর যুগের সমাজ জীবনের ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করে। তাই তাঁর রামায়ণে দেখি সমাজ জীবনের সহজ রূপের সহস্র প্রকাশ। বাল্মীকির কাব্যে ছোট বড় সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, বীরত্ব, ভীরুতা একান্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'রঘুবংশের' কাব্যে যতই মহৎগুণ থাক্-না কেন, বাল্মীকির কাব্যের জীবনের সজীবতা সেখানে বিরল। কালিদাস জীবনের বাস্তবতার অভাব পূরণ করে দিয়েছেন তাঁর কবিকল্পনার বলিষ্ঠতাও বিরল কারুনৈপুণ্যের দ্বারা।

বাল্মীকির রামায়ণে দেখি মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বাৎসল্য, পতিত্ব, সতীত্ব প্রথাবদ্ধ রূপে দেখা দেয়নি। কিন্তু কালিদাসের যুগ পরিপাটির যুগ। তাই এখানে সব-কিছুই নিয়মমাফিক রূপে বর্ণিত।

বিষয়বস্তুতে কালিদাস বহুক্ষেত্রেই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নি। বাল্মীকির রামায়ণে বিচিত্র চরিত্রের সমবায়ে ও সংঘাতে যেখানে জীবনের ভিড় জমে উঠেছে, কালিদাস সেখানে জনপদ ও অরণ্যের ভিড় এড়িয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি প্রধান চরিত্র ও বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকির রামায়ণে রামের অরণ্য জীবন এবং সেই অরণ্যজীবনে মুনি ঋষি এবং পার্বত্য বন্যজাতিগুলির জীবনযাত্রা বেশি স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু কালিদাস এই অরণ্যজীবনের বর্ণনায় কোথাও উৎসাহ প্রদর্শন করেন নি। কালিদাস সযত্নে বাল্মীকির রামায়ণের এই-সব ঘটনাগুলি এড়িয়ে গিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছেন—যেখানে লঙ্কা থেকে রামসীতা বিমানযোগে অযোধ্যায় ফিরছেন। কাব্যের এই ত্রয়োদশ সর্গে কবি তাঁর কবিকল্পনাকে লীলায়িত করার বিশেষ সুযোগ তৈরি করে নিয়েছেন। তাই দেখি সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ সর্গ জুড়ে চলেছে রাম-সীতার পুষ্পক বিমানে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা। এই বর্ণনার চমৎকারিত্ব কালিদাসের কালজয়ী কবিকল্পনার দান। কালিদাস বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে—

'বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং।
মৎ সেতুনা ফেনিল মম্বুরাশিম্॥
ছায়া পথে নেব শরৎপ্রসন্নেম্।
আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥'

রঘুবংশ—ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক-২

বাল্মীকি-রামায়ণে নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে অনুরূপ বর্ণনা আছে :—

> "পশ্য সাগরমক্ষোভ্যং বৈদেহি বরুণালয়ম।
> অপারমিবগর্জন্তং শঙ্খশুক্তি সমাকুলম্ ॥
>
> —বাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১২৩।১৭

বাল্মীকির বর্ণনায় শুধুই সমুদ্রের রূপ কিন্তু কালিদাসের বর্ণনায় সুনীল সিন্ধু ও গগন একাকার। কিন্তু এই বর্ণনার তফাৎ মাপে ঠিক ততটা না হলেও জাতে তাই। আমরা এই প্রসঙ্গে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বাল্মীকির প্রকৃতি বর্ণনা স্মরণ করিতে পারি। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর মধুর বর্ণনা কবিত্ব, নাটকীয়তা ও চরিত্র-চিত্রণ তিনদিক দিয়েই সুসঙ্গত ও সুন্দর। বনবাসের দুঃখ, সীতা হারানোর দুঃখ, বালী-বধের উত্তেজনা ও অবসাদ সমস্ত শেষ হয়েছে। সামনে পড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা—দুই ব্যবস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিল সকলের—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বলিয়ে বাল্মীকি সুতীক্ষ্ণ নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বালস্বভাব লক্ষণের সীতা উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই। শান্ত, শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তর কাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারি। আদিকাব্য সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশস্তি, উত্তরকাব্য খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্ত অভিভূত নন। অথচ যক্ষের বিরহের চেয়ে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, অনেক দীর্ঘস্থায়ী। যক্ষের বিরহ বর্ষভোগ্য, পুনর্মিলনের আশ্বাসবন্ত। কিন্তু রামের বিরহ প্রবল বাধা ও সংশয়সংকুল। রামের দুঃখ লক্ষ্মণের শতগুণ। সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতি সম্ভোগের অন্তরায় হলো না। সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর।

আর সীতাসহ রাম যখন অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন বাল্মীকি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে অরণ্যকাণ্ডের প্রকৃতিমুগ্ধ প্রণয়বিহ্বল রামচন্দ্র আর নেই। অন্তর্বর্তী ঘটনার চাপে তিনি বদলে গেছেন—ফিরে যাচ্ছেন বিজয়ী বীর স্বদেশে যেখানে প্রজা-পালনের বিরাট দায়িত্ব অপেক্ষা করছে তাঁরজন্য। "এই আমার পিতৃ রাজধানী অযোধ্যা, সীতা প্রণাম করো'—রামের এই ক্ষুদ্র গম্ভীর উক্তিটিতে সেই দায়িত্ব পালনের সংকল্প ধ্বনিত হচ্ছে।

কালিদাসের কাব্যে এই জাতীয় বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণ পাওয়া যায় না।

কালিদাস-বর্ণিত রামকাহিনীর মধ্যে .কয়েকটি ক্ষেত্রে কালিদাস ও বাল্মীকির মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে অন্ধ দম্পতির সম্মুখে দশরথ তাদের মৃত পুত্রকে এনেছিলেন। কালিদাস এই দৃশ্যকে আরও করুণ করেছেন, অন্ধ দম্পতির সম্মুখেই তাদের পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে। 'রঘুবংশে' রাম ও লক্ষ্মণ বিরাধ দৈত্যকে বধ করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রোথিত করেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ বিরাধ দৈত্যকে জীবন্ত প্রোথিত করেন। সীতাহরণ-এর কারণ বর্ণনায় কালিদাস ও বাল্মীকির মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। রামায়ণে দেখি দণ্ডকারণ্যে যখন শূর্পণখার প্রেম নিবেদন নিয়ে সবাই পরিহাস করছেন, তখন শূর্পণখা সীতাকে ভক্ষণ করার জন্য ধাবিত হয়। রাম তখন লক্ষ্মণকে বলেন 'সৌমিত্র, এই ক্রূর প্রকৃতির অনার্যার সঙ্গে পরিহাস করা উচিত নয়। দেখ, সীতা ভয়ে মৃতপ্রায় হয়েছেন। তুমি এই প্রমত্তা অসতীকে বিরূপ করে দাও'। লক্ষ্মণ তখন খড়্গাঘাতে শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। বাল্মীকি এখানে রাম-লক্ষ্মণের কাজকে অন্যায় বলেননি, বরং তিনি তাঁদের কাজকে স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কালিদাস ঘটনাটিকে বর্ণনা করেছেন ভিন্ন রূপে। শূর্পণখা যখন একবার রামের কাছে, একবার লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করছে তার এই আচরণ দেখে সীতা হেসে ফেলেন। সেই হাসি দেখে রাক্ষসী ক্রোধে আত্মহারা হয় এবং উগ্রচণ্ডা হয়ে বলে ওঠে "এই পরিহাসের ফল তোকে অচিরাৎ ভোগ করতে হবে। আমার পক্ষে তোর পরিহাস ব্যাঘ্রীর পক্ষে মৃগীর পরিহাসের তুল্য মনে করিস্"—

'সংরম্ভং মৈথেলী হাসঃ ক্ষণ সৌম্যাং নিনায়তাম্।
নিবাত স্তিমিতাং বেলাং চন্দ্রোদয় ইবোদধেঃ॥ ৩৬
ফলমস্যোপহাসস্য সদ্যঃ প্রাপস্যসিপশ্যমাম্।
মৃগাঃ পরিভবো ব্যাঘ্রমিত্য বেহিত্বয়াকৃতম্॥ ৩৭

—'রঘুবংশম', দ্বাদশ সর্গ, ৩৬।৩৭

কালিদাস এখানে সীতাহরণের জন্য সীতাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেছেন। সীতার পরিহাসই সীতার দুঃখের কারণ। কিন্তু বাল্মীকি সীতার পরিহাসের উল্লেখ করেননি।

তেলেগু রঙ্গনাথের রামায়ণেও অনুরূপভাবে সীতার হাসিকেই সীতার দুর্দশার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কবিদ্বয়ের বর্ণনায় মনে হয় যেন তাঁরা শূর্পণখার বিরূপীকরণের জন্য রামকে দায়ী না করে সীতার হাসিকেই দায়ী করেছেন। সীতার হাসিতে শূর্পণখা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে সীতার দিকে ধাবিত হয় এবং

তখন রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে বিরূপ করেন। প্রশ্ন হল : শূর্পণখা যদি সীতার হাসি না দেখত তবে কি সে ভয়ংকর হয়ে উঠত না? অন্যান্য রামায়ণেও সীতার হাসির উল্লেখ নেই। সেখানেও দেখি শূর্পণখা ভয়ংকর হয়ে উঠে সীতাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। শূর্পণখার ক্রোধের কারণ কিন্তু সীতার হাসি দেখা নয়। তার ইচ্ছা পূরণ না হওয়াই তার ক্রোধের কারণ। তাই যদি সে সীতার হাসি নাও দেখত, তবে যেহেতু তার ইচ্ছাপূরণ রাম কিংবা লক্ষ্মণ করেনি, সে ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে তার রাক্ষসীসুলভ আচরণ করত। তাই মনে হয় কবিদ্বয় সীতার হাসিকে যে শূর্পণখার দুর্দশা এবং ফল স্বরূপ সীতার দুর্দশা বলে বর্ণনা করেছেন, তা যুক্তি সংগত ভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

সীতা-নির্বাসন রামের জীবনে একটি কলংকিত অধ্যায় হলেও বাল্মীকি রামের আচরণের কোনও নিন্দা বা সমালোচনা করেননি। রামায়ণে আছে, রাম যখন সীতার চরিত্র সংক্রান্ত জনরব শুনলেন, তখন তিনি প্রথমেই সুহৃদগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই জনরব সত্য কিনা। সবাই যখন সত্য বললেন তখন তিনি সীতাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন, সুমন্ত্রর রথে যেন সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে আসেন। এখানে রামের আচরণের নিন্দাসূচক কোনও উক্তি নেই। সাধারণ মানুষের সমস্ত দুর্বলতার উর্ধ্বে দৃঢ়চিত্ততা ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক রূপে বাল্মীকি রামকে কল্পনা করেছেন।

কিন্তু রামের আচরণে সীতার প্রতি এই ঘোর অবিচার কালিদাস ক্ষমার চক্ষে দেখেননি। কালিদাস সীতাবর্জনের ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :—রাম কর্তৃক পরিত্যাগের কথা শুনে সীতা মূর্ছা গেলেন। মূর্ছিতা সীতাকে দেখে জননী ধরিত্রী বলে উঠলেন—

"ইক্ষ্বাকু বংশ প্রভবঃ কথং ত্বাং
ত্যজেদকস্মাৎ পতিরার্য্য বৃত্তঃ। —৫৫ (চতুর্দশ সর্গ)

অর্থাৎ "পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত পবিত্রতম রামচন্দ্র তোমার পতি। তাদৃশ নির্মল-স্বভাব স্বামী তোমাকে অকস্মাৎ অকারণে কেন পরিত্যাগ করলেন?"

লক্ষ্মণের যত্নে ও শুশ্রূষায় সীতা সংজ্ঞা লাভ করে বললেন—

"বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ সরাজা, বহ্নৌ বিশুদ্ধামপিযৎসমক্ষম্।
মাং লোকবাদ শ্রবণাদ হাসীঃ, শ্রতস্য কিং তৎ সদৃশংকুলস্য ॥"
—৬১ (চতুর্দশ সর্গ)

"লক্ষ্মণ, তোমাদের সেই রাজাকে আমার নাম করে বলবে যে যাঁর চোখের সামনে

অগ্নিতে আমার বিশুদ্ধি পরীক্ষিত হয়েছে সেই তিনিই আমাকে আজ অলীক লোকাপবাদ শোনামাত্র পরিত্যাগ করলেন। একি তাঁর বিদ্যা এবং জগদ্‌বিখ্যাত সূর্যবংশের কুলগৌরবের উপযুক্ত কাজ হলো?"

ঋষি বাল্মীকি সীতাকে বললেন—

"উৎখাত লোকত্রয় কণ্টকেঽপি সত্যং প্রতিজ্ঞেঽপ্যবিকথনেঽপি
ত্বাং প্রত্যকস্মাৎ কুলুষ প্রবৃত্তা বস্ত্যেব মন্যুর্ভবতাগ্রজেমে॥" ৭৩

—চতুর্দশ সর্গ

'তোমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, তোমার স্বামী ত্রিজগতের পরম শত্রুর উচ্ছেদকর্তা, এতেও তোমার স্বামীর বিন্দুমাত্র আত্মশ্লাঘা নেই। কিন্তু এতগুণ থাকা সত্বেও তোমার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করায় তাঁর প্রতি বড়ই বিরাগ জন্মাচ্ছে, বিষম ক্রোধ হচ্ছে।"

বিভিন্ন ব্যক্তির রামের আচরণের নিন্দায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, কালিদাস রামের এই আচরণকে ঘোরতর অন্যায় মনে করেন এবং এই পরিস্থিতিতে বাল্মীকির রামচরিত্র বিশ্লেষণ যে কালিদাস অনুমোদন করেননি তা বোঝা যায়। কিন্তু কালিদাসের রামচরিত্র বিশ্লেষণও গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে কালিদাস বাল্মীকির কবিপ্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন কবতে পারেননি। মানবপ্রেমিক কবি কালিদাসের পক্ষে বাল্মীকিকে ঠিক ঠিক ভাবে বোঝাও সম্ভব ছিল না। বাল্মীকির রাম তাঁর উচ্চ আদর্শ স্থাপনে অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর। সাধারণ মানবিক প্রেম ভালোবাসা কখনই রামায়ণে উচ্চ স্থান পায়নি। বৃদ্ধ দশরথের প্রিয়তমা পত্নী কৈকেয়ীর কাছে অমানুষিক আঘাত পেয়ে চির অবহেলিত কৌশল্যার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন বাল্মীকি যেন কিছুটা বিদ্রূপের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রাবণের সীতার প্রতি অশালীন প্রেমের নিদারুণ পরিণতি বাল্মীকির কাব্যে অকম্প রেখায় চিত্রিত। বাল্মীকি ছিলেন অবহেলিত সমাজের প্রেমিক কবি। আর কালিদাস ছিলেন বিলাসী সামন্ততন্ত্র যুগের প্রেমিক কবি। তাই কালিদাস তাঁর অসামান্য প্রতিভাধর পূর্বগামীর প্রতিভার সঙ্গতি বোধ ও কবিকল্পনার মহত্ত্ব যথোচিতভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।

২। ভট্টিকাব্য (গোবিন্দশংকর বাপত সম্পাদিত, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই ১৮৮৭)—

কালিদাসোত্তর যুগে ভট্টি তাঁর 'রাবণ বধ' বা 'ভট্টিকাব্য' ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে রচনা করেন। কাব্যের বিষয়বস্তু লঙ্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত। রচনার উদ্দেশ্য রামকথা এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে ব্যাকরণের শব্দ ও

ধাতু প্রয়োগ এবং অলংকার শিক্ষা অনায়াসে সাধিত হয়। সেই কারণে টীকাকার মল্লিনাথ এই কাব্যকে উদাহরণ কাব্য বলেছেন। কাব্যটি বাইশ সর্গে লেখা। কাব্যটির চারটি ভাগ আছে, যেমন প্রকীর্ণকাণ্ড (সর্গ ১-৫), অধিকারকাণ্ড (সর্গ ৬-৯), প্রসন্নকাণ্ড (সর্গ ১০-১৩) এবং তিঙন্তকাণ্ড (সর্গ ১৪-২২) প্রকীর্ণকাণ্ডে পাণিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্রের উদাহরণ দিয়ে সীতাহরণ কাহিনী পর্যন্ত আলোচিত। অধিকারকাণ্ডে হনুমানের অশোককানন ধ্বংসের জন্য রাক্ষসদের হাতে শাস্তি প্রদান পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনায় আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, ণত্ব ও ষত্ব বিধানের নিয়মাবলী প্রদত্ত। প্রসন্নকাণ্ডে সেতুবন্ধ পর্যন্ত কাহিনীর মাধ্যমে অলংকারসমূহের উদাহরণ প্রদর্শিত এবং তিঙন্তকাণ্ডে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাহিনী বর্ণন এবং ক্রিয়া ও ক্রিয়ার প্রকারভেদের উদাহরণ প্রদত্ত।

কাব্যশেষে কবি নিজের রচনা সম্বন্ধে বলছেন—

"দীপতুল্য প্রবন্ধোঽয়ং শব্দ-লক্ষণ চক্ষুষাম্
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেন ব্যাকরণাদৃতে ॥"

"আমার এই রচনা ব্যাকরণজ্ঞের কাছে দীপের মতো। অন্ধদের হাত ধরার মতো, ব্যাকরণ বিণাও (ব্যাকরণ শিক্ষক) হতে পারে।"

কবি আবার বলছেন—

"ব্যাখ্যাগমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়োমলম্ ।
হতাদুর্মেধসিশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎ প্রিয়তয়াময়া ॥"

"এই কাব্য ব্যাখ্যার সাহায্যে সুধীব্যক্তির পক্ষে প্রচুর ভোজ। নির্বোধেরা এই কাব্যে নিবারিত। বিদ্বানের প্রিয়তা হেতু আমি এমনই করেছি।"

রামকাহিনী উপজীব্য করেই ভট্টিকাব্য রচিত। ২৪,০০০ শ্লোকে রামায়ণে রামকাহিনী রচিত। কিন্তু ভট্টিকাব্য ১৬৫০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত আকারে রামকাহিনী বর্ণিত। ভট্টি তাঁর কাব্যে রামায়ণ-বর্ণিত বিশদ্ বিবরণ ও পরস্পর-সম্পর্ক-যুক্ত কাহিনীবিন্যাস সযত্নে পরিহার করেছেন। ভট্টিকাব্যের কাহিনীর গতি অত্যন্ত দ্রুত। যদিও ভট্টিকাব্যের ভাষা রামায়ণের তুলনায় সহজ সরল নয় এবং ভাষা ব্যাকরণসিদ্ধ, ভট্টিকাব্যের নানাস্থানে কবির কাব্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষয়বস্তুতে অনেক স্থলে ভট্টির সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি ঘটনা কেবলমাত্র ভট্টিকাব্যে উল্লিখিত আছে কিন্তু রামায়ণে নেই। যেমন :—

১) দশরথ শৈব্য ছিলেন—

"ন ত্র্যম্বকাদন্য মুপাস্থিতা সৌ"—১,৩

২) কেবলমাত্র রাম-সীতার বিবাহের উল্লেখ—সর্গ ২, ৪৩

৩) রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেই খর-দূষণ-সহ ১৪০০০ রাক্ষস নিধন করেছিলেন—সর্গ ৪, ৪১-৪২

৪) লক্ষ্মণ সীতাকে শাপ দিয়েছিলেন। "সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ মিথ্যাপবাদদায়িনী সীতাকে 'তুমি শীঘ্রই শত্রুর কবলিত হবে' এই বলে সেই স্থান থেকে নির্গত হলেন—"

"মৃষোদং প্রবদন্তীং তাং সত্যবচো রঘুত্তমঃ
নিরগাচ্ছত্রুহস্তং ত্বং যাস্যসীতি শপ্‌নবশী॥" —সর্গ ৫, ৬০

৫) রাক্ষসীদের সম্ভোগ বর্ণন—সর্গ—১১

৬) মন্থরার কথা নেই। কৈকেয়ী নিজেই দশরথের কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন।

আবার কতকগুলি ঘটনা আছে যা রামায়ণে উল্লিখিত ঘটনা থেকে পৃথক। যেমন, রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে বলা ও অতিবলাবিদ্যা রাম-লক্ষ্মণকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভট্টিকাব্যে আছে রাম লক্ষ্মণ জয়া ও বিজয়াবিদ্যা পেয়েছিলেন। রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে আছে মন্থরা কৈকেয়ীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু ভট্টিকাব্যে মন্থরার কোনও উল্লেখ নেই। কৈকেয়ী নিজেই রামের রাজ্যাভিষেকে বাধা প্রদান করেছিলেন। রামায়ণে শূর্পণখা সুন্দরী নারী বেশে রাম-লক্ষ্মণ-এর কাছে আসেনি এবং শূর্পণখা যখন সীতাকে ভক্ষণ করার জন্য ধাবিত হয় লক্ষ্মণ তাকে বিরূপ করে দেয়। ভট্টিকাব্যে আছে শূর্পণখা প্রথমে সুন্দরী স্ত্রীবেশে রামের কাছে আসে প্রেম নিবেদন করার জন্য। রাম তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সে তার নিজস্ব ভীষণ রূপ ধারণ করে লক্ষ্মণের কাছে আসে। তখন লক্ষ্মণ তার নাক কান কেটে দেন। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরেরা সীতার ফেলে দেওয়া গহনা রামকে দেখায়। এরপর রামায়ণে সুগ্রীব ও বালীর শত্রুতা এবং পরিশেষে বালীবধ ও তারার শোক বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভট্টিকাব্যে এসব বিবরণের কোনও উল্লেখ নেই। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে বিভীষণ রাবণ-কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে রাবণকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ভট্টিকাব্যে বিভীষণ রাবণকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিষেধ করায় রাবণ তাকে পদাঘাত করে এবং তখন বিভীষণ রাবণকে ছেড়ে চলে যায়। রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় কুবের, যম, ইন্দ্র, বরুণ

মহাদেব এবং ব্রহ্মা এসেছিলেন। কিন্তু ভট্টিকাব্যে দেখি সীতা বায়ু, বসুন্ধরা, সূর্য ও অগ্নির কাছে প্রার্থনা জানাতে তাঁরা এসে সীতাকে সতী বলে অভিহিত করেন। পরিশেষে একথা বলা যায় যে রামায়ণে বর্ণিত উত্তরকাণ্ডের কোনও প্রসঙ্গের উল্লেখ ভট্টিকাব্যে নেই। ভট্টিকাব্য যুদ্ধকাণ্ডেই শেষ হয়। এজন্যই কাব্যটির নামান্তর 'রাবণবধ'। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীর বর্ণনা কবির অভিপ্রেত ছিল না।

ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে এর ব্যাকরণগত দুরূহতা ছাড়াও বিষয়গত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। ভট্টি তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন কারও কারও আত্মশ্লাঘা প্রচারে এবং মাঝে মাঝে ঋতু ও প্রকৃতি বর্ণনায়। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি এবং তাঁর ব্যাকরণ-মুখ্য জটিল ভাষা তাঁর বর্ণনার রসাস্বাদে দুর্লভ বাধার সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্যে আর একটি গুরুতর ত্রুটি এই যে এখানে শব্দ নির্বাচনের কোনও স্বাধীনতা নেই। শব্দগুলি এখানে এমনভাবে ব্যবহৃত যেগুলি প্রতি শ্লোকে কেবলমাত্র ব্যাকরণ রীতি অনুযায়ী প্রযোজ্য এবং সর্বত্রই ভাব ও প্রকাশভঙ্গী ঐ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত। অবশ্য ভট্টির স্বপক্ষে একথা বলা যায় যে তাঁর বর্ণনা অকারণ দীর্ঘ অপ্রাসঙ্গিকতা ও অনাবশ্যক বর্ণনা-বৈচিত্র্য থেকে মুক্ত। তাঁর শব্দ নির্বাচন পদ্ধতি যদিও ব্যাকরণগত কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলের নিগড়ে আবদ্ধ, তথাপি তা কষ্টসাধ্য মিশ্র-শব্দচয়নের জটিলতা থেকে মুক্ত। ব্যাকরণ প্রথাগত শব্দচয়ন তাঁর কাব্যে অবশ্যম্ভাবী হলেও তাঁর রচনা ভাবের দিক থেকে দুর্বোধ্য নয়। তাঁর রচনায় ছন্দোবৈচিত্র্য না থাকলেও এই রচনা প্রাণবন্ত। কিন্তু ভট্টির কবিকল্পনার দ্যুতি তাঁর সমসাময়িক কবিদের তুলনায় ম্লান। এবং তিনি যে প্রেরণা পেয়েছিলেন সেটা পুরোপুরি কোনও কবির কাছ থেকে নয়। ভট্টির পাণ্ডিত্য পণ্ডিতব্যক্তিদিগকে প্রসন্ন করতে পারে কিন্তু তাঁর স্বেচ্ছাকৃত অস্বাভাবিকতার অভিশাপ তাঁর কবিপ্রতিভাকে ম্লান করে দিয়েছে। সীমিত ব্যক্তি তাঁর রচনা পাঠ করেন এবং যাঁরা পড়েন তাঁরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দেখে প্রীত হন না। এবং যতক্ষণ না আমরা কবিতার আনন্দদায়িনী শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে মোহিত করার জন্য প্রয়োগ করছি, কেউ ভট্টিকাব্য আগ্রহভরে পাঠ করবে না।

৩। রাবণ বহ বা সেতু বন্ধ :—এই কাব্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রবরসেন -কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতে রচিত। কাব্যটি তিন নামে পরিচিত—১) রাবণ বহ বা রাবণ-বধ, ২) দহ-মুহ বহ বা দশমুখ বধ, ৩) সেতুবন্ধ। কাব্যটি ১৫ সর্গে বাল্মীকি-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এই প্রাকৃত মহাকাব্যের উল্লেখ বাণের 'হর্ষচরিত' এবং দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' পাওয়া যায়।

প্রথম সর্গে শরৎকাল ও মলয় পর্বতের বর্ণনা আছে। আর আছে যে রামচন্দ্র বানর-সেনাপরিবেষ্টিত হয়ে সমুদ্রতীরে এসেছেন। সমুদ্রের নীল জলরাশি যেন রামচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু সেই সমুদ্র দেখে বানরসেনারা ভয়ে ভীত হয়ে মনে মনে চিন্তা করতে লাগল কেমন করে এই সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় যাওয়া যাবে। দ্বিতীয় সর্গে ৩৬ শ্লোকে সমুদ্র বর্ণনা। কবির সমুদ্র সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের কথা এখানে পরিস্ফুট। তৃতীয় সর্গে বানর রাজা সুগ্রীবের ভয়ে ভীত বানরসেনাদের উদ্দেশে তেজস্বী ভাষণ কবির কবি-প্রতিভার উৎকর্ষের পরিচায়ক। চতুর্থ সর্গে জাম্ববানের কথনের দ্বারা কবির রাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের কথা জানতে পারা যায়। পঞ্চম সর্গে রামের নিক্ষিপ্ত শরের আগুনে সমুদ্রে আলোড়ন সৃষ্টির ফলে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রে আগুন জলছে। ষষ্ঠ সর্গে রামের সমুদ্র বন্ধনে আদেশ প্রদান এবং সপ্তম সর্গে সমুদ্রে সেতুবন্ধনে উদ্যোগ। অষ্টম সর্গে সেতুবন্ধন। এখানে মৎস্য দ্বারা সেতুভঙ্গের উদ্যোগের কথা বর্ণিত আছে। পরে ভরতের মলয় পর্বত ও লঙ্কার সুবেলা পর্বতের মধ্যে সেতুবন্ধনের কথা বর্ণিত। নবম সর্গে সুবেলা পর্বতের বর্ণনা। 'কামিনী-কেলি' নামক দশম সর্গে রাক্ষসদের সম্ভোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। একাদশ সর্গে রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে সীতার করুণ বিলাপের বর্ণনা আছে। সীতার বিলাপ দেখে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র রতির বিলাপের কথা মনে পড়ে। সীতা কিভাবে রামের মুণ্ড দেখলেন তার বিবরণ প্রবর সেন[১] এইভাবে দিচ্ছেন :—

> "পেচ্ছাইঅ সরহসোহরিঅ-মণ্ডলগ্, গাহিঘাঅ-বিসমচ্ছিন্নং।
> দূর ধণু সংঘিঅঙ্কি অসর পুঙ্খালিদ্ধসামলি আবঙ্গং॥"

"(সীতা) রামের (ছিন্ন) মুণ্ড দেখলেন। (যে মুণ্ড) বাঁকা তলোয়ারের প্রবল আঘাতে অসমানভাবে কাটা। (যে মুণ্ডে) চোখের প্রান্ত ভাগ অনেকটা টানা ধনুকের জোড়া তীরের পুচ্ছ ভাগের ঘর্ষণে কালো (দেখাছিল)।"

> "নিসি অরকঅগ্গহাণিঅ — নিলাভঅডনটঠভিউভুমআভঙ্গং।
> গলিঅরুহিরদ্বলহুঅং — অণহিঅ — উম্বিল্লতারঅং রামসিরং॥"

"রাক্ষস চুলের মুঠি ধরে এনেছে তাই ললাটতলের ভ্রূকুটি — ভ্রূভঙ্গ মিলিয়ে গেছে। (সে রাম-শির) নীরক্ত হওয়ায় অর্ধভার হয়েছে আর চোখের তারা উন্মুক্ত কিন্তু তার (পিছনে) হৃদয় সজীবতা নেই।"

শেষ চার সর্গে কবি বানর সেনা ও রাক্ষস সেনার মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ এবং শেষে

১ রাবণবহ — রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ, কলিকাতা।

রাবণ নিধনের কথা বর্ণনা করেছেন। সমাপ্তিতে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক এবং রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

প্রবরসেনের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর কবিতার সম্বন্ধে প্রবর সেনের নিজের কথা স্মরণীয়। কাব্যের প্রথম সর্গে প্রবরসেন বলেছেন, উৎকৃষ্ট কাব্যের অনেকগুলি সুবিধা আছে, যেমন বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, প্রশংসা পাওয়া যায়, সদ্গুণের অধিকারী হওয়া যায় এবং পাঠকেরা মহান ব্যক্তির জীবনচরিত জানতে পারেন। কিন্তু তাঁর রচিত এই ছন্দোবদ্ধ কবিতায় এইসব গুণ নেই। সুতরাং পাঠকেরা এই কবিতায় আকৃষ্ট হন না। 'প্রবরসেনের কাব্যের সারমর্ম থেকে জানা যায় যে তিনি রামায়ণের একটি ছোট অংশ তাঁর কাব্যে উপজীব্য করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনা অনেক মনোহর বর্ণনায় প্রাণবন্ত। এই বর্ণনায় তাঁর কবিপ্রতিভা, তাঁর বহুমুখী জ্ঞানের পরিধি এবং নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমুদ্র, পর্বত, শরৎকাল ও রাত্রির বিশদ্ বর্ণনায় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগের কথা মনে হয় এবং সেইসঙ্গে তাঁর চরিত্র-চিত্রণের ক্ষমতা সুগ্রীব, সীতা ও ত্রিজটার ভাষণে পরিস্ফুটিত। তিনি উপমা, যমক ও রূপক অলঙ্কারগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। নূতন ও মৌলিকভাবে প্রাকৃত ভাষায় মহাকাব্য সম্বন্ধীয় কবিতা রচনা তাঁকে সাহিত্যজগতে বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপনের জন্য তাঁর কাব্যের মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। জানকীহরণ[১] :— সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসোত্তর যুগে 'জানকীহরণ' অন্যতম মহাকাব্য। এর রচয়িতা কুমারদাস। কিম্বদন্তী এই যে তিনি কালিদাসের বন্ধু ছিলেন। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে তিনি এ দেশের রাজা ছিলেন। কবির পরিচয় যাই হোক-না কেন তাঁর খ্যাতি যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ব্যাপক ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে ঐ শতাব্দীতে রচিত রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' অলংকার গ্রন্থে 'জানকী হরণের' শ্লোকের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

কাব্যের নাম থেকে জানা যায় রামায়ণের আখ্যানই এর উপজীব্য। কিন্তু জানকীহরণেই কাব্যের পরিসমাপ্তি নয়। সিংহলে সিংহলী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এই কাব্য পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত এবং রামের পুনরায় রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনাবলী কাব্যেটির প্রতিপাদ্য বিষয়।

কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্যের ভাবগত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাগত অনুকরণ দেখা যায়। ভারবির প্রভাবও এই কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। কাব্য

১ জানকীহরণ, হরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৮৯৩

হিসাবে উচ্চাঙ্গের না হলেও এটি সুখপাঠ্য। অলংকার ও ছন্দোবৈচিত্র্য এই কাব্যের মনোজ্ঞতার অন্যতম কারণ।

প্রথম সর্গে দশরথ ও তাঁর আত্মীয় পরিজন ও অযোধ্যার বর্ণনা, দশরথের মৃগয়ায় গমন, মুনিপুত্র বধ ও মুনির অভিশাপ প্রভৃতি বিবৃত আছে।

দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত বিষয়গুলি হল বৃহস্পতির বিষ্ণুর নিকট রাবণ বধের প্রার্থনা, বিষ্ণুর রাবণ বধে অঙ্গীকার এবং রাম অবতার হয়ে দেবতাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

তৃতীয় সর্গে রাজা দশরথ ও রানীদের ক্রীড়া, কৃত্রিম হ্রদে জলক্রীড়া, বসন্ত ও সূর্যাস্তের বর্ণনা আছে।

চতুর্থ সর্গে দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্য রামাদির জন্ম। তারা বড় হলে বিশ্বামিত্রের আগমন। ঋষির সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের গমন, তাড়কা নিধন ও দৈব অস্ত্র লাভ বর্ণিত আছে।

পঞ্চম সর্গে রাম-লক্ষ্মণের মুনির আশ্রমে গমন। মারীচ ও সুবাহুর আগমন। রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা সুবাহুকে বধ এবং মারীচকে আহত করা প্রভৃতি ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গে মুনি সহ রাম-লক্ষ্মণের মিথিলায় গমন। মিথিলার বর্ণনা। রাজা জনকের সাদর সম্ভাষণ। ঋষি-জনক কথোপকথন। হরধনু ভঙ্গ এবং জনক-কর্তৃক রামকে জামাতা নির্বাচন প্রভৃতি ঘটনাগুলি পাওয়া যায়।

সপ্তম সর্গে রাম-সীতার সাক্ষাৎ, পরস্পরের ভালোবাসা, দশরথের আগমন ও রাম-সীতার বিবাহ বিবৃত হয়েছে।

অষ্টম সর্গে রাম-সীতার ক্রীড়া, সূর্যাস্ত ও রাত্রির বর্ণনা ও মধুপান এবং নবম সর্গে দশরথের পুত্র এবং পুত্রবধূদের সঙ্গে অযোধ্যায় ফেরার পথে পরশুরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ, পরশুরামের তেজোভঙ্গ ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে।

দশম সর্গে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন, মন্থরা-প্ররোচিত কৈকেয়ীর বাধা দান, রামের সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনগমন, রামের চিত্রকূট গমন, ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও পাদুকাগ্রহণ, পঞ্চবটী গমন, শূর্পণখার নাসা-কর্ণছেদন, খর-দূষণ বধ, রাবণের ছদ্মবেশে আগমন ও সীতা হরণ প্রভৃতি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

একাদশ সর্গে রাম-লক্ষ্মণের হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রাম-সুগ্রীব মৈত্রী ও বালীবধ এবং দ্বাদশ সর্গে বসন্ত ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা, সুগ্রীবকে লক্ষ্মণের ধিক্কার, সুগ্রীবের সীতা-অন্বেষণ, বানরসেনা প্রেরণ ও সেতুবন্ধন।

পরবর্তী সর্গগুলিতে রাবণের নিকটে অঙ্গদকে দূত হিসাবে প্রেরণ, রাক্ষসবধ এবং শেষে রাবণ বধ ও পরে রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।

কাহিনী বিন্যাসে দেখা যায়, এই রচনার সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের খুব বেশি অমিল নেই। রামায়ণ-বহির্ভূত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে অন্ততঃ ২০টি শৃঙ্গার রসাত্মক বর্ণনা আছে। উদাহরণস্বরূপ—দশরথ ও তাঁর পত্নীদের বিহার ও জলক্রীড়া, রাম-সীতার পূর্বানুরাগ, মিথিলায় বিবাহের পর রাম-সীতার সম্ভোগ-বর্ণন। এইসব শৃঙ্গার বর্ণনা 'কুমারসম্ভবে'র সঙ্গে সাদৃশ্য প্রতিভাত হয়। 'সেতুবন্ধের' অনুকরণে রাক্ষসদের যুদ্ধের পূর্বে ক্রীড়া বর্ণনা এখানে আছে।

কুমারদাসের বর্ণনা সৌষ্ঠবের কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। চপলমতি বালক রামের পরিচয় দিতে গিয়ে কুমারদাস বলছেন—

'নস রাম ইহ ক যাত ইত্যনুযুক্তো বণিতাভিরগ্রতঃ।
নিজহস্তলুটীবৃতাননো বিদধেঽলীক নিলীয়ম্ অর্ভকঃ॥'

"রাম এখানে নেই। কোথায় সে গেল? যেসব স্ত্রীলোকেরা তাঁর খোঁজ করছিল তারা এই কথা বললে। কিন্তু সেই শিশু দুই হাত দিয়ে তাঁর মুখটি ঢেকে তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল।"

রাম-সীতার সম্ভোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে কুমারদাস বলছেন—

"কৈত বেন কলহেযু স্বপ্তয়া
স ক্ষিপন্ বসনম্ আত্তসাধ্যসঃ।
চোর ইত্যুদিতহাস বিভ্রমং
সপ্রগল্‌ভম্ অবখণ্ডিতোঽধরে॥"

"তাঁরা প্রেমের ক্রীড়ায় যখন মত্ত, হঠাৎ সীতা গভীর নিদ্রার ভান করিলেন এবং রাম তা সন্দেহ করে সন্তর্পণে তাঁর পোশাক স্পর্শ করতে সীতা পরিহাস ছলে 'চোর' বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং রামের অধর চুম্বন করলেন।"

আবার কুমারদাস বলছেন :—

"তস্য হস্তম্ অবলা ব্যপোহিতুম
মেঘলাগুণসমীপ সঙ্গিনম্।
মন্দশক্তিররতিং ন্যবেদয়ন্
লোলনে এ গলিতনে বারিণা।"

"যদিও সীতা ক্লান্তির জন্য রামের হাত সরিয়ে দেওয়ার শক্তি হারিয়েছিলেন তথাপি তিনি যেন তাঁর চকিত চপল আঁখিনির্গত অশ্রু দিয়ে তার উদাসীনতা প্রকাশ করছেন।"

প্রেম ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক কুমারদাস এইভাবে বর্ণনা করছেন :—

“প্রালেয়কাল প্রিয় বিপ্রয়োগগ্লানেব বাত্রিঃ ক্ষয়মাসসাদ’।
জগাম মন্দং দিবসোবসন্ত—ক্রূরাতপশ্রান্তইব ক্রমেণ ॥”

“শীতের শীতলতায় প্রেমিকের বিরহে প্রেমিকা যেমন ম্লান হয়ে যায়, ঠিক তেমনি রাত্রি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং বসন্তের খরতাপে শ্রান্ত দিন মৃদুপদক্ষেপে এগিয়ে আসছে।”

কুমারদাসের রচনা সহজ, সরল, মার্জিত। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ঐশ্বর্যপূর্ণ ও তেজোদীপ্ত। তাঁর প্রকাশভঙ্গিও সাবলীল। ভট্টিকাব্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং জানকীহরণের বিষয়বস্তু এক হলেও ভট্টির রচনা ব্যাকরণপ্রথাগত বলে তা সুচারু হতে পারেনি। কিন্তু কুমারদাস তাঁর রচনাকে কালিদাসের রচনার মতো সহজ, সরল করতে চেয়েছিলেন বলে এই রচনা তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলেনি। তাঁর অনুমোদনকারীরা তাঁকে দ্বিধাহীনভাবে কালিদাসের সঙ্গে সমমর্যাদাসম্পন্ন করলেও এটি তাঁর কবিপ্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন নয়। কিন্তু সংস্কৃত কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে তাঁব যে সম্মানের আসন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি যদি কালিদাসকে অনুসরণ করতে না যেতেন তাহলে তিনি তাঁর মৌলিকতা প্রকাশেব আরও বেশি সুযোগ পেতেন। অনুরূপভাবে মৈথিলী রামায়ণের বিখ্যাত কবি লাল দাসও অপর বিখ্যাত কবি চন্দ্রা ঝাঁ-কে অনুসরণ করতে গিয়ে কবি তাঁর রচনার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেন। উচ্চমানের কাব্য রচনার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছতে পারে নি। তথাপি তাঁর যথাযথ শব্দচয়ন, শব্দনির্বাচন, প্রকাশভঙ্গি, ছন্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি কাব্য-সৌন্দর্যবিঘ্নকারী বিষয়বস্তুর অতিশয়োক্তি ছিল না বলে তাঁর কাব্য নিষ্প্রাণ হয়নি ; সজীব, প্রাণবন্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছিল।

৫। রামায়ণ মঞ্জরী :—(সম্পাদনা : পণ্ডিত ভবদত্ত শাস্ত্রী এবং কে. পি. পরব, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯০৩)

একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরদেশীয় ক্ষেমেন্দ্র সাতকাণ্ডে ‘রামায়ণ মঞ্জরী’ নামে একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ রচনা করেন। মূল রামায়ণ থেকে এর ব্যতিক্রম নিতান্তই নগণ্য। সেই কারণে এই রচনাকে ঠিক মৌলিক রচনা বলা যায় না।

এই রচনার বালকাণ্ড আরম্ভ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী দিয়ে এবং শেষ হচ্ছে দশরথপুত্র রামাদির বিবাহ অন্তে। ক্ষেমেন্দ্র অযোধ্যাকাণ্ড শেষ করেছেন দশরথের মৃত্যুতে। কিন্তু আদি রামায়ণে এই কাণ্ড শেষ হয় রামের দণ্ডকারণ্য প্রবেশের সঙ্গে

সঙ্গে। অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরণের পর রাম-লক্ষ্মণের পম্পা সরোবরে পৌঁছনো পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত। ক্ষেমেন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হনুমানের সাগর লঙ্ঘন বর্ণনা করেন। কিন্তু এই ঘটনা আদি রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত। কেবলমাত্র ঘটনা-বর্ণন পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে, সেইজন্য ক্ষেমেন্দ্র ঘটনাপ্রবাহের একঘেয়েমি থেকে পাঠকদের একটুখানি বিশ্রাম দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ঋতু বর্ণনা করেছেন। শরৎ, বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর বর্ণনা অরণ্যকাণ্ডে ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আছে। 'রামায়ণ মঞ্জরী'র যুদ্ধ কাণ্ড শেষ হয়েছে রাবণ বধের পর, কিন্তু আদি রামায়ণে যুদ্ধ-কাণ্ড শেষ হয়েছে রাবণের রানীদের শোক ও বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং রাম-ভরত মিলন বর্ণনায়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র উপরিউক্ত ঘটনাবলী উত্তরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরবর্তী ঘটনাগুলি যেমন সীতার পাতাল প্রবেশ, রাম ও তাঁর ভ্রাতাদের স্বর্গারোহণ উত্তরকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ক্ষেমেন্দ্রের সমগ্র রচনায় তাঁর শব্দনির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ও রচনাবৈচিত্র্য বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভাষার স্পষ্টতা ও সহজ সরল ভাবে কাহিনী উপস্থাপনের জন্য পাঠকবর্গ তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। রামায়ণ-উপজীব্য অন্য কাব্য-কাহিনীতে রামায়ণের পরিপূর্ণ রূপটি পাওয়া না। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের 'রামায়ণ মঞ্জরী-তে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও রামায়ণের পূর্ণাঙ্গ রূপটি পাই। নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির দ্বারা তাঁর রচনার সরল রূপটি যথোপযোগী উপমা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :—

'রাজা চেদ ধর্মমর্যাদাং লোভাদ উৎক্রম্য বর্ততে।
উন্মৃলোপপ্লবৈনৈতাঃ সর্বথা নিহতাঃ প্রজাঃ॥' ২।২৭৬

"রাজা যদি লোভের বশবর্তী হয়ে ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করেন, তাহলে তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের ধ্বংস করে।"

আবার বলছেন :—

"ততঃ পপাত পৌলস্ত্যঃ স্রস্তসায়ক কার্মুকঃ।
কৃত্তঃ সীতা নিকারেণ ক্রকচেনেব পাদপঃ॥" ৪।১২৯৬

"তারপর পৌলস্ত্যের ধনুক এবং তীর শিথিল হল এবং সে ভূমিতে পতিত হল যেমন কুঠারের আঘাতে গাছ পতিত হয়। মনে হল সীতার অবমাননার জন্য যেন তার মর্মস্থল বিদীর্ণ হল।"

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র 'দশাবতার চরিতম্' নামে ২৯৬ শ্লোকে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি রামকথার এক নবরূপ দান করেন। এবং এই রচনায় তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই রচনার বিশেষত্ব এই যে সমস্ত কাহিনী রাবণের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই রাবণের তপস্যা, বর প্রাপ্তি, অত্যাচার প্রভৃতির বর্ণনা। (১-৬৯ শ্লোক) অনন্তর রাবণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে কন্যারূপে গ্রহণ (শ্লোক ৭০-১০৪)।

১০৫ শ্লোকে রামকথা আরম্ভ। শূর্পণখা রাবণের কাছে তার বিরূপীকরণ ও খর-দূষণ বধের কথা বর্ণনা করে। তারপর রাবণ মারীচের নিকট বিষ্ণু অবতার রামের জন্ম থেকে বনবাস পর্যন্ত সব কথা শোনে (শ্লোক ১০৫-৩০)।

অনন্তর রাবণ মারীচের সহায়তায় সীতাহরণ করে (শ্লোক ১৩১-৫১), পরে রাবণ সুকেতু নামক গুপ্তচরের কাছ থেকে মারীচ বধ, সুগ্রীব সখ্য, হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, অশোকবন ধ্বংস, লঙ্কা দহন প্রভৃতি ঘটনা শোনে (১৫২-৯৪)।

এরপর সুকেতু ও বিভীষণ সীতাকে ফেরত দেওয়ার জন্য রাবণকে অনুরোধ করে। বিভীষণ রাবণের দুর্বুদ্ধি জেনে রামের শরণ নেয়। পরে রাবণ গুপ্তচর-মুখে বিভীষণ অভিষেক, সেতুবন্ধ, রামের ত্রিকূট আগমনবার্তা শোনে (২০৭-১৩)। এরপর রাবণ প্রতিহারপতির নিকট থেকে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন ও কুম্ভকর্ণের জাগরণ কাহিনী শোনে (২১৪-২৩)। প্রতিহারপতি-রাবণ সংবাদের পর বানর দ্বারা রামচরিত বর্ণন করা হয়েছে। কুম্ভকর্ণের বধ থেকে রামের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারে বর্ণিত হয়েছে।

ক্ষেমেন্দ্রর দুটি রামায়ণ-বিষয়ক কাব্য 'রামায়ণ মঞ্জরী' ও 'দশাবতার চরিত' আলোচনা করলে প্রথমেই যে কথা মনে পড়ে তা হল ক্ষেমেন্দ্রের 'রামায়ণ মঞ্জরী' কখনই কবির মৌলিক রচনা নয়। সেকথা আগেই বলেছি। কাব্যটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাল্মীকির অনুগামী। অপর কাব্য 'দশাবতার চরিতম্' কবির মৌলিক রচনা সন্দেহ নেই। এই কাব্যে বর্ণিত রামায়ণের ঘটনা দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম রাবণের তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি থেকে কুম্ভকর্ণের বধ পর্যন্ত ঘটনা এবং দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণ বধ থেকে রামের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত ঘটনা। প্রথম ভাগের বিশেষত্ব এই যে এখানে সমস্ত কাহিনী রাবণের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় ভাগের বৈশিষ্ট্য হল, সমস্ত ঘটনা বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণে বর্ণিত। আবার প্রথম ভাগের ঘটনাবলী রাবণের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হলেও এখানে দেখা যায় যে ৭০ থেকে ১০৪ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত ঘটনাবলীতে রাবণের কর্মবহুল জীবনের কিছু পরিচয় পাই। যেমন তার তপস্যা, বরপ্রাপ্তি, অত্যাচার প্রভৃতি। ১০৫ শ্লোক থেকে ১৩০ পর্যন্ত ঘটনাবলী রাবণ কেবল শোনে, কিছুই করেনি। তারপর সীতা হরণ থেকে লঙ্কা দহন পর্যন্ত ঘটনাবলীতে তার কাজ কেবলমাত্র

সীতাহরণ। অন্যসব ঘটনার সে কেবল শ্রোতা মাত্র। এরপর কুম্ভকর্ণ বধ পর্যন্ত ঘটনাবলীর সঙ্গে রাবণের প্রত্যক্ষ যোগ কিছুই নেই, এইসব ঘটনাগুলি রাবণ কেবল অন্যের কাছ থেকে শোনে।

প্রশ্ন হল—রাবণের অধিকাংশ ঘটনাবলীর রাবণ যদি কেবলমাত্র শ্রোতা হয়ে থাকে এবং এটি যদি কবির মৌলিক সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করে, কবি কেন পরের ঘটনাগুলি বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারে রচনা করলেন? তাছাড়া যদি লঙ্কা দহন, কুম্ভকর্ণ বধ প্রভৃতি ঘটনাগুলির সঙ্গে রাবণের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকে, তবে ঘটনাগুলি ঘটতে পারত কি? কখনই তা মনে হয় না। কবির এই অভূতপূর্ব কাহিনী-বিন্যাস দেখে আরও একটা প্রশ্ন মনে জাগে, কবির এই রচনার উদ্দেশ্য কি? যদি বলা যায় যে কবি সব ঘটনাগুলি রাবণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত করতে চেয়েছিলেন, তবে সে কথাও প্রমাণিত হবে না। কেননা রাবণের কেবলমাত্র দুটি কর্মের বিবরণ দিয়ে, যেমন, তার তপস্যা ও সীতাহরণ, সব ঘটনাগুলি তিনি কেমন করে রাবণের দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করলেন? তাই কবির এই রচনাকে একটি অর্থহীন ও যুক্তিহীন কল্পনাবিলাস বলে মনে হয় এবং আমরা সবিস্ময়ে এই প্রশ্ন না করে পারি না যে কবির লেখনীতে 'রামায়ণ মঞ্জরী'র মতো এমন এক সুন্দর ও সরস-কাব্য রচিত হতে পারে, সেই কবির লেখনী দিয়ে 'দশাবতার চরিতম্'-এর মতো এমন একটি অর্থহীন রচনা কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে?

৬) রামচরিত :— (সম্পাদনা : কে. এল. রামস্বামী শাস্ত্রী, গায়কোয়াড় সংস্কৃত সিরিজ, বরোদা, ১৯৩০)

শতানন্দপুত্র অভিনন্দ নবম শতাব্দীতে ৪০ সর্গে তাঁর বৃহৎ কাব্য 'রামচরিত' রচনা করেন। তাঁর এই মনোহর কাব্যের বলিষ্ঠ পদ্ধতির জন্য তিনি যে যশের অধিকারী হয়েছিলেন, তার জন্য তাঁর পরবর্তী যুগে অনেক কাব্যে তাঁর রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'সূক্তিমুক্তাবলী'তে অভিনন্দের কাব্যের উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সোমেশ্বর দেব তাঁর 'কীর্তি কৌমুদি'তে অভিনন্দের রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উজ্জ্বল দত্ত তাঁর 'উণাদি সূত্রবৃত্তি'তে রামচরিতের অনেক শ্লোকের পুনরুক্তি করেন। একাদশ শতাব্দীতে ভোজ অভিনন্দের কাব্যের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এইসব উল্লেখের জন্য একথা প্রতিভাত হয় যে একাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ৫ শতাব্দী ধরে অভিনন্দ তাঁর কাব্যের জন্য যশস্বী হয়েছিলেন। অভিনন্দ তাঁর কাব্যের ৩৬ সর্গে তাঁর পৃষ্ঠপোষক বিক্রমশীলের পুত্র রাজাহার বর্ষর নাম উল্লেখ করেছেন :—

'জয়ন্তি জগন্তি ভ্রমন্তি কীর্তা সহ হারবর্ষ-নৃপ-শশিনঃ।
শিরসিকৃতা কৃতবিদ্যৈঃ কৃতিরিয়ম্ আর্যা বিলাসস্য॥

রামচরিত — ৩৬ সর্গ — ৮৬ শ্লোক

কিন্তু এই রাজা এবং গৌড়ের ধর্মপালের পুত্র রাজা দেবপাল যে একই ব্যক্তি উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

অভিনন্দের কাব্যকে মহাকাব্য রূপে অভিহিত করা যায় কারণ দণ্ডী-নির্দেশিত মহাকাব্যের লক্ষণগুলি এই কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাব্যের নিয়ম-শৃঙ্খল মেনে চললেও অভিনন্দ কিন্তু তাঁর স্বাধীন কবিকল্পনা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেননি। অন্যান্য রামকাব্যের মতো এই কাব্যের কাহিনী কিন্তু দশরথের কথা ও তাঁর পুত্রদের জন্ম-কথা দিয়ে আরম্ভ হয়নি। এই কাব্যের কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে সীতা উদ্ধারে রামের উদ্বেগ ও সীতা উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তাভাবনা দিয়ে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, যাকে তিনি বর্ষাঋতুর পর লঙ্কায় পাঠিয়ে সীতার সংবাদ নেবেন বলে স্থির করেছেন। তাঁর কাব্যে অনেকস্থলে আদি রামায়ণ থেকে ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হল —

১) বর্ষাঋতুর পর সুগ্রীব নিজেই রামকে সাহায্য করার জন্য রামের কাছে এসেছিলেন, লক্ষ্মণের ডাকে নয়। রাম তাঁর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, তার সাহায্যের উপর খুব একটা নির্ভর করতেন না, কখনও কখনও তার সঙ্গে ভৃত্যের মতো আচরণ করতেন।

২) রামচরিতে আছে যে রাম হনুমানকে অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয় ছাড়াও নূপুর ও স্তনোত্তরীয় দিয়েছিলেন। কিন্তু রামায়ণে হনুমান নিদর্শনস্বরূপ কেবলমাত্র অঙ্গুরীয় নিয়েছিল।

৩) রামচরিতে সাধারণ বানরেরা প্রথমে সীতার খোঁজে বেরিয়েছিল। তারা অকৃতকার্য হলে বানর দলপতিরা অঙ্গদ ও হনুমান-সহ সীতার খোঁজে বার হয়। বিন্ধ্য পর্বতের কাছে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে এক গুহায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখে যে একটি দৈত্য ঘুমিয়ে আছে। অঙ্গদ দ্বারা দুর্দম নামে সেই দৈত্য নিহত হয়। গুহায় প্রবেশ করে হনুমান এক বানরীর প্রেম-প্রস্তাব দুবার প্রত্যাখ্যান করে। সেই বানরী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে হনুমানের কাছে আসে। তার পর গুহার কর্ত্রী স্বয়ংপ্রভার আবির্ভাবে সেই বানরী স্থান ত্যাগ করে। আদি রামায়ণে এই কাহিনী নেই। স্বয়ংপ্রভার গুহাবাসের কারণ রামায়ণ থেকে রামচরিতে ভিন্ন।

৪) 'রামচরিতে' অঙ্গদের সুগ্রীবের প্রতি আনুগত্য পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত। কিন্তু রামায়ণে হনুমানের প্রভাবের জন্য অঙ্গদ সুগ্রীবের কোন কিছু অনিষ্ট করা

থেকে বিরত হয়। 'রামচরিতে' অঙ্গদ সমুদ্র পার হতে যে সমর্থ সেকথা প্রকাশ করে। কিন্তু জাম্ববানের অনুরোধে হনুমানকেই সমুদ্র পার হতে দেওয়া হয়। কিন্তু রামায়ণে অঙ্গদ সমুদ্র পার হতে অসমর্থতা প্রকাশ করে।

৫) এই রচনায় বিভীষণ দার্শনিকের মতো সুগ্রীবকে নাগপাশে বদ্ধ রাম ও বানর-সেনাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে নিষেধ করে; রামায়ণে সুগ্রীব রাক্ষস বংশ ধ্বংসের জন্য কাতর বিভীষণকে দার্শনিকের মতো সান্ত্বনা দেয়।

৬) এই রামায়ণে আছে রাবণের পদাঘাতের পর বিভীষণ প্রথমে রামের কাছে না গিয়ে কুবেরের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু রামায়ণে রাবণ-কর্তৃক বিভীষণকে পদাঘাতের কথা নেই। রামায়ণে রাবণ সরাসরি রামের শরণ নিতে গিয়েছিল।

৭) 'রামচরিতে' আছে, যে চারটি লতা বানর-সেনাদের পুনর্জীবিত করার জন্য আনা হয়েছিল, ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে সেগুলি বিবর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু রামায়ণে লতার বিবর্ণ হওয়ার কথা পাওয়া যায় না।

এই বৃহৎ মহাকাব্যের কাহিনীর গতি অত্যন্ত মন্থর এবং এই গতি বার বার ব্যাহত হয় নগর, সমুদ্র, পর্বত, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত বর্ণনায়। প্রথম দশটি সর্গে বানর দ্বারা সীতার সন্ধানের বিবরণ ও হনুমানের অভিজ্ঞান গ্রহণ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী দশটি সর্গে সীতা-হনুমান সাক্ষাৎকারের ঘটনা বর্ণিত এবং পরের ১৬টি সর্গে বানর-সেনা ও রাক্ষস-সেনাদের যুদ্ধের বিবরণ এবং কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ কথার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পরের চারটি সর্গের রচয়িতা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কারও কারও মতে শেষ চারটি সর্গ অভিনন্দের রচিত, আবার কেউ কেউ এই সর্গগুলির রচয়িতা ভীম কবি বলে অভিহিত করেন। এই চারটি সর্গে রাম-ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ এবং রাবণবধ বর্ণিত আছে। এই সর্গগুলির রচনার পদ্ধতি ও ধারাবাহিকতা অন্যান্য সর্গগুলির ধারা থেকে পৃথক এবং সেইজন্য এই সর্গগুলি যে অভিনন্দর রচনা নয় তা মনে হয়। ভীম কবি অবশ্য বলেছেন, এই রচনা অসম্পূর্ণ ছিল এবং তিনি তা সম্পূর্ণ করেছেন। "ইতিশ্রীমদ্ অভিনন্দ কাব্যে কায়স্থ জাতি কুলতিলকেন মহৎ শ্রীদেবপাল তনয়েন মহৎ শ্রীভীমকৃতৌ সর্গচতুষ্টয্যাং চত্বারিং শত্তমঃ সর্গঃ ॥"

তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন এবং একটি শ্লোকে তিনি তাঁর রচনার প্রশংসা করেছেন—

"ন মধুরং মধু ফল্গু চ ফানিতং
রসাপরাণ সিতাপি সুধা মুধা।

অধর এব নবপ্রমদা ধরো
লসতি ভীম করেঃ ক্ষবিতারসো।"

৭) উদার রাঘব :—চতুদর্শ শতাব্দীতে সাকল্যমল্য নামে কবি 'উদার রাঘব' রচনা করেন। কবি মল্লাচার্য, কবিমল্ল ও মল্লয়াচার্য নামেও খ্যাত ছিলেন। কাব্যটি ১৬ সর্গে রচিত। কিন্তু এর মধ্যে কেবলমাত্র ৯টি সর্গ প্রকাশিত হয়েছে। এতে শূর্পণখার বিরূপীকরণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। বিষয়বস্তু বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ।

এখানে রামকে বিষ্ণুর অবতার এবং লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথাক্রমে শেষ সুদর্শন ও শঙ্খের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতা বনে যাওয়ার জন্য রামকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু এখানে সীতা বিনা রাম বনে যেতে চাননি—

"রামায়ণানীহ পুরাতনানি পুরাতনেভ্যো বহুশঃ শ্রুতানি।
ন ক্বাপি বৈদেহসুতাং বিহায় রামো বনং যাত ইতিশ্রুতং মে॥"

—সর্গ ৫, ৪৮ শ্লোক।

'দশরথ স্বয়ং লক্ষ্মণকে বিদ্রোহ করে রামকে রাজা করতে বলেছিলেন :—

'বীরোঽসি মৌলৈঃ সহলক্ষ্মণ ত্বং রামং প্রতিষ্ঠাপয় রাজ্যপীঠে।'

—(৪.১০৫)

এখানে শৃঙ্গারসের আধিক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ মিথিলার নারী বর্ণন (সর্গ ২) এবং বনবাসের সময় বনবিলাস প্রসঙ্গ (সর্গ ৯,৩৩)।

এখানে রামের বৈরাগ্য (সর্গ ২) বর্ণিত আছে। এবং শূর্পণখার বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে যে লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে বলেছিলেন 'তুমি যা চাচ্ছ, ১৪ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরে স্বজনদের অনুমতি নিয়ে তোমাকে বিবাহ করতে পারি। (৯ : ৯৯)

উত্তরকালীন মহাকাব্য :—

১) পঞ্চদশ শতাব্দীতে বহু রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তার অধিকাংশ অপ্রকাশিত। বামন ভট্টবাণের ৩০ সর্গে রচিত 'রঘুনাথ চরিত' পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। কেরালার বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার রামপাণি বাড় ১৮ শতাব্দীতে ২০ সর্গের 'রাঘবীয়' কাব্য রচনা করেন। (কাব্যটি 'আডেয়ার লাইব্রেরি' দ্বারা প্রকাশিত)। কবি অধিক পরিমাণে বাক্যালংকার ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী কাব্যে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু তাতে কাব্যের সৌন্দর্য ও ভাষার সরলতা নষ্ট

হয়নি। ১৮ শতাব্দীতে মিথিলার রঘুনাথ উপাধ্যায় ৯ সর্গে 'রামবিজয়' মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে কবি রামের নানা বীরোচিত কার্যের বর্ণনা আরম্ভ করে শেষে রাবণবিজয় বর্ণনা করেন। এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মনোরম ভাষায় বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা আছে এবং প্রতিটি সর্গ শেষ হচ্ছে 'শ্রী' শব্দ দিয়ে। (কাব্যটি ১৯৩২ সালে বারাণসীতে প্রকাশিত হয়)।

২) জানকী পরিণয় :--(সম্পাদনা—টি. গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৯১৩)।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চক্রকবি ৮ সর্গে 'জানকী পরিণয়' রচনা করেন। বাল্মীকির বালকাণ্ড অনুসারে দশরথযজ্ঞ থেকে আরম্ভ করে পরশুরামের তেজভঙ্গ পর্যন্ত ঘটনাবলী এই কাব্যে বর্ণিত। চক্রকবির পিতার নাম লোকনাথ এবং মাতার নাম অম্বা। কবির মাতাপিতার পরিচয় কবি প্রতি সর্গের শেষ শ্লোকে দিয়েছেন—

'যং সূনুং জনয়াম্বভূবমহিতঃ শ্রীলোকনাথঃ সুধীঃ।
খ্যাতং চক্রকবিং সতী সমুদয়ৈঃ সম্মানিতাম্বাভিধা॥'

অর্থাৎ "পণ্ডিত প্রবর লোকনাথ ও সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা অম্বার চক্রকবি নামে এক পুত্র ছিল।"

পঞ্চম ও সপ্তম সর্গের শেষ শ্লোক থেকে জানা যায় যে কবির 'রুক্মিণী পরিণয়' ও 'পার্বতী পরিণয়' নামে আরও দুটি কাব্য ছিল।

কবি প্রথম সর্গ আরম্ভ করেছেন অযোধ্যা নগরী এবং নগরীর শাসনকর্তার বর্ণনা দিয়ে।

দ্বিতীয় সর্গে বিষ্ণুর প্রশংসা ও রাবণের অত্যাচার বর্ণিত। সর্গের শেষে দেখি একজন স্বর্গীয় পুরুষ দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর একপাত্র দুগ্ধ ও অন্ন নিয়ে দশরথের নিকট উপস্থিত হয়ে দশরথকে দেবতা-প্রেরিত ওই অন্ন ও দুগ্ধ তাঁর রানীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে বলেন। তৃতীয় সর্গে রামাদি চার ভ্রাতার জন্ম ও বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের রাক্ষস নিধনে গমন বর্ণিত। পরবর্তী দুটি সর্গে তাড়কা নিধন, রাম-লক্ষ্মণের মিথিলা নগরী গমন ও রামের শিবধনু ভঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মিথিলা নগরী যাওয়ার পথে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাহিনী বর্ণনা করেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গে দশরথের মিথিলায় আগমন ও রামাদির বিবাহের বর্ণনা আছে। শেষ সর্গে পরশুরামের তেজভঙ্গ বিবৃত হয়েছে।

কাব্যের বিষয়বস্তু বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী অনুসারে বর্ণিত। মার্জিত কল্পনা-স্পর্শে এই রচনা সুখপাঠ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির রচনায় কবিকল্পনার বিস্তৃতি

লক্ষ করি না। কবির বর্ণনাভঙ্গি উচ্চস্তরের নয় এবং সর্বোপরি কবির বাঁধা ছকে শব্দ নির্বাচন পদ্ধতির জন্য তাঁর রচনা আকর্ষণীয় হয়নি।

৩) রামলিঙ্গামৃত :—১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বারাণসী নিবাসী অদ্বৈত কবি 'রামলিঙ্গামৃত' রচনা করেন। গ্রন্থের হস্তলিপি লণ্ডনে সুরক্ষিত আছে (ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ নং ৩৯২০) কবি যখন তাঁর কাব্য রচনা করেন, তখন গোস্বামী তুলসীদাস বারাণসীতে ছিলেন। কাব্যে ১০টি সর্গ আছে।

সর্গ ১—উপোদ্‌ঘাত—মঙ্গলাচরণের পর গোকুলের দুই গোপীকার সংবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। একজনের জন্ম রঘুকুলে, সে রামকথা বিশেষভাবে জানে। আপন সখীর অনুরোধে রঘুবংশীয় গোপিকা রামচরিত বর্ণনা করেছে (১-২৪)। প্রারম্ভেই রাবণচরিত বর্ণনা। জয় ও বিজয় ভৃগু দ্বারা শাপগ্রস্ত হয়ে রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়ে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করে। প্রহ্লাদের বিভীষণ রূপে জন্মগ্রহণের উল্লেখ আছে। অনন্তর রাবণ ও কুম্ভকর্ণের শিবারাধনা ও বর প্রাপ্তি ও দেবতাদের দ্বারা বিষ্ণুকে অবতাররূপে জন্মগ্রহণের প্রার্থনা বর্ণিত। (২৪-৬৪)

সর্গ ২—রামবাললীলা (১-৭০) :—রামাদির জন্ম, রামের মাতা-কর্তৃক রামের বিশ্বরূপ দর্শন, বাল্যলীলা, রামক্রীড়া, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীত সংস্কার এবং বিশ্বামিত্রের রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা আছে।

সর্গ ৩—রাবণ পরাভব (১-৬৪) —বিশ্বামিত্র সহ রাম-লক্ষ্মণের সীতার স্বয়ংবর সভায় গমন, সীতার সখীদ্বারা রামের সৌন্দর্য বর্ণনা, রাজা, দেবতা ও রাক্ষসগণের স্বয়ংবর সভায় উপস্থিতি. রাবণের ধনুতে গুণ দেওয়ার চেষ্টা ও ব্যর্থতা এবং রামদ্বারা ধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত আছে।

সর্গ ৪—সীতা স্বয়ংবর (১-১০৩) :— দশরথ ও কৌশল্যাদির মিথিলায় আগমন ও রামের বিবাহোৎসব বর্ণনা। রামকে দেখার জন্য স্ত্রীলোকদিগের ব্যাকুলতা কবি এখানে কালিদাসের মতো বর্ণনা করেছেন। এরপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণের আগমন ও ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মাদ্বারা এক দিব্য নগর নির্মাণের উল্লেখ আছে যেখানে লক্ষ্মী, সীতাকে রাম অবতারের রহস্য বর্ণনা করেন।

সর্গ ৫—রামের অরণ্যগমন (১-৬৩) :—মিথিলা থেকে প্রস্থানের পথে রাম-কর্তৃক পরশুরামের দর্পহরণ এবং তারপর বাল্মীকির অনুকরণে রামের নির্বাসন বর্ণিত হয়েছে।

সর্গ ৬—রামের অরণ্যগমন (১-৮১) :—মায়া মনুষ্যহবির পঞ্চবটীতে অবস্থান এবং এখানে সমস্ত পশুপক্ষীদের হিংস্র স্বভাব ত্যাগের বর্ণনা আছে।

শূর্পণখার বিরূপীকরণ উল্লেখের পর নারদ দ্বারা রাবণের নিকট সীতার সৌন্দর্য

বর্ণনা এবং যার ফলস্বরূপ রাবণের মারীচের সাহায্যে সীতাহরণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর সীতা-সন্ধান, শিলাময়ী অহল্যার উদ্ধার এবং কেওট-কর্তৃক রাম-চরণ কথা উল্লিখিত আছে। এরপর কবন্ধবধ এবং "সীতার উদ্ধারের জন্য রামের শিবপূজার বর্ণনা আছে"—

"সীতা সংগমনার্থায় রামো লিংগস্য পূজনং।
চক্রোতেন মহাদেবঃ সীতাশুদ্ধিং চকারহ ॥ ৭৯"

এরপর বানরদের সঙ্গে রামের মিত্রতার কথা বর্ণিত আছে।

সর্গ ৭—রাম-বিভীষণ দর্শন (১-৬২) :—সীতার খোঁজে আসার সময় রাম হনুমানকে এক অঙ্গুরীয় ছাড়া একটি পত্র দিয়েছিলেন। তারপর লঙ্কাদহন ও অঙ্গ-দের দৌত্য বর্ণিত আছে। এখানে মহানাটকের রাবণ-অঙ্গদ সংবাদের অনুকরণ সুস্পষ্ট। সবশেষে সেতুবন্ধ ও রামসকাশে বিভীষণের আগমনের কথা বিবৃত হয়েছে।

সর্গ ৮—যুদ্ধকাণ্ড (১-৬১) :—এখানে রাক্ষসীদের সম্ভোগ বর্ণন, মহীরাবণ-অহিরাবণ-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে যাওয়া, হনুমান-কর্তৃক মকরধ্বজের সহায়তার রাম-লক্ষ্মণের উদ্ধার এবং সর্গ শেষে কুম্ভকর্ণবধ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ও লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত আছে।

সর্গ ৯—অহিরাবণ ও মহীরাবণ বধ (১-৪৫) :—এই সর্গে বিষয়বস্তু শীর্ষক নামানুসারে নয়। এখানে সুলোচনার কথা ও রাবণের যুদ্ধে গমন বর্ণিত হয়েছে।

সর্গ ১০—শিবলিঙ্গ বর্ণন (১-৮৩) :—রণক্ষেত্রে রামকে দেখে রাবণের ভাষণ, রাবণের রাক্ষস বংশ ধ্বংস করার জন্য বিষ্ণুর অবতার কথা, বিষ্ণুর দ্বারা বধ্য ভেবে রাবণের নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া রামের শিবপূজা ও রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং রামনামের স্মরণ মাত্র বানর-সেনাদের সমুদ্র পার হতে সমর্থ হওয়ার কথা পাওয়া যায়।

অনন্তর রাম রাবণকে শিবরূপ দেখান এবং রাবণের সর্বত্র রামরূপে দেখার উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্গ ১১—রাবণবধ (১-৮১) :—রাবণ বধের পর সীতার অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ নেই। রাবণ বধের কথা শুনে সীতার আনন্দ ও মন্দোদরীর বিলাপ এবং সর্বশেষে বিভীষণের অভিষেকের বর্ণনা করা হয়েছে।

সর্গ ১২—রামরাজ্যাভিষেক (১-৫২) :—রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অযোধ্যাবাসীদের আনন্দ এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই সর্গের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে এখানে কৈকেয়ী রামের সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন যে দেবেন্দ্রর

প্ররোচনায় রাবণ বধের জন্য তিনি তাঁকে বনে পাঠিয়েছিলেন। এরপর রামের অভিষেক বর্ণিত হয়েছে।

সর্গ ১৩—রাম-জানকী ক্রীড়া (১-৫২) ·—রাম-সীতার সম্ভোগ এখানে বর্ণিত হয়েছে এবং সর্গ শেষে গর্ভবতী সীতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্গ ১৪-৩৮ শ্লোকে এই সর্গে বাল্মীকির আশ্রমে কুশলবের জন্ম ও শিক্ষার বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সীতা ত্যাগের কোনও উল্লেখ নেই। এখানে আরও বর্ণিত হয়েছে যে নারদের কাছে সংবাদ পেয়ে রাম সসৈন্যে বাল্মীকির আশ্রমে গিয়েছিলেন এবং সেখানে লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধের পর সবাই অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

সর্গ ১৫—কুম্ভকর্ণ বধ (১-৩৪):—এখানে সীতা দ্বারা কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভগর্ভ বধের বর্ণনা আছে।

সর্গ ১৬—শ্রীরঙ্গ বর্ণন (১-৪১) ·—এই সর্গে রামদ্বারা শ্রীরঙ্গ মূর্তি পূজার বর্ণনা আছে।

সর্গ ১৭—শ্রীরামের স্বরূপ বর্ণন (১-৮০):—এখানে বশিষ্ঠের আজ্ঞায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং দেবতাদের রামসীতার স্তুতি বর্ণিত আছে। এরপর সরযূতীর্থ বর্ণনার পর রামসীতা ও অযোধ্যাবাসীদের পরলোকগমন বর্ণিত হয়েছে।

সর্গ ১৮—খিল (১-৯০):—এখানে কোন রামকথা নেই। রামপূজাবিধি এবং এরপর রাম-শঙ্কর এবং রাম-কৃষ্ণর অভিন্নতা বর্ণিত হয়েছে।

কাব্যের বিভিন্ন সর্গের উপরোক্ত বিষয়বস্তুরও বিবরণের পর এখানে রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করা যায় :—

১) রঘুবংশীয় গোপিকা-কর্তৃক রামচরিত বর্ণন।
২) রামের মাতার বিশ্বরূপ দর্শন।
৩) রাবণের সীতার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিতি এবং ধনুর্ভঙ্গে ব্যর্থতা।
৪) নারদ-কর্তৃক রাবণের নিকট সীতার রূপ বর্ণনা এবং যার ফলে সীতাহরণ।
৫) অহিরাবণ ও মহীরাবণ-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে পাতালে নিয়ে যাওয়া এবং হনুমান কর্তৃক মকরধ্বজের সহায়তায় রাম-লক্ষ্মণের উদ্ধার সাধন।
৬) রণক্ষেত্রে রামকে দেখে রাবণের ভাষণ ও রাবণকে রামের শিবরূপে দেখানো।
৭) অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ নেই।
৮) কৈকেয়ী-কর্তৃক রামকে দেবেন্দ্রর প্ররোচনায় বনবাস পাঠানোর কথা বর্ণনা।

৯) সীতা ত্যাগের উল্লেখ নেই।

১০) সীতা-কর্তৃক কুম্ভগর্ভ বধ।

১১) সীতার পাতাল প্রবেশের উল্লেখ নেই। রাম সীতা ও অযোধ্যাবাসীগণের একসঙ্গে পরলোকগমনের কথা বর্ণনা।

১২) সবশেষে, রাম-শঙ্কর, রাম-কৃষ্ণের অভিন্নতা বর্ণনা।

(৪) রাঘবোল্লাস কাব্য :–

এই কাব্য হস্তলিখিত পুঁথিতে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত কাব্য। অনেক লেখা অস্পষ্ট। কিন্তু মোটামুটি কথাবস্তু বোধগম্য হয়। এই হস্তলিখিত কাব্যটির পাণ্ডুলিপি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (ক্যাটালগ নং ৩৯১৫) লণ্ডনে আছে। কাব্যটিতে ১২টি সর্গ আছে। প্রারম্ভিক ৩টি সর্গ নেই। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭টি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রত্যেক সর্গের আরম্ভ এভাবে :–

"জয়ন্তি রঘুনাথস্য পদপঙ্কজ পাংসবঃ।"

কাব্যের অন্তে লেখা আছে সংবত ১৬৯২, সময় ফাল্গুন কৃষ্ণ অষ্টমীতে এই গ্রন্থ শেষ হয়েছে। লিপিকর মানসাহী কায়স্থ। প্রত্যেক সর্গের আরম্ভে কবি নিজে নাম দিয়েছেন এবং শেষে সর্বত্র 'অদ্বৈত বিরচিত' কথাটি লেখা আছে। অতএব এই কাব্যের কবি যে অদ্বৈত তা সুনিশ্চিত। এই অদ্বৈত কবি নিজের নিবাস ছেড়ে কাশীতে বাস করতেন। এই তাঁর অমৃতবাণী শুনে জনতা দুঃখ ভুলে যেত। বারাণসীর মানস নামক সরোবরের ধারে কবি এই কাব্য রচনা করেন।

রামের জন্মোৎসব থেকে আরম্ভ করে রামের বিবাহের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু। এই বিষয় চতুর্থ সর্গ থেকে দ্বাদশ সর্গে বর্ণিত।

চতুর্থ সর্গ—রাম চতুর্ভুজরূপে প্রকট হয়েছেন। রামের জন্ম হয়েছে। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করছেন। ঋষি, কিন্নর আদি স্তুতিগান করছেন। তারপর রাম দিন দিন চন্দ্রকলার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতা দশরথ ঐশ্বর্য বিতরণ করছেন। মাতা সকালে রামকে ওঠাতে গিয়ে বলছেন, 'দয়ার সাগর রঘুনাথ ওঠো, তুমি শুয়ে থাকলে সংসার নষ্ট হবে। তোমার জাগরণেই সকলের জীবন। বিশ্বসংসার তোমার স্তুতি গান করছে। অতএব তোমার শুয়ে থাকা ঠিক নয়। তুমি দেখছ না খলনায়ক রাবণ পৃথিবীতে দুঃখ দিচ্ছে। হে দয়ার সাগর, তুমি ওঠো"। মা ও বাবা বালক রামের সঙ্গে খেলা করছে। কৌশল্যা ও দশরথের স্তুতি দ্বারা সর্গের সমাপ্তি।

পঞ্চম সর্গ—বিশ্বামিত্র এসেছেন ও রামের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন, "মানুষের উপকারের জন্য রামের জন্ম। ভববন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তি

দেওয়ার জন্য রামের আবির্ভাব। দশরথের প্রাসাদ বৈকুণ্ঠ। বিষ্ণু মনুষ্যরূপে এখানে বাস করছেন।" শেষে বিশ্বামিত্র মারীচ ও সুবাহুকে বধ করার জন্য রামকে চাইলেন। দশরথ প্রথমে রামকে পাঠাতে অস্বীকার করেন। দশরথকে বশিষ্ঠ-আদি মুনিরা বোঝালেন এবং রামও দশরথকে বোঝালেন। অনেক বোঝানোর পর দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে মুনির হাতে দিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ—রাম তাড়কা ও সুবাহুকে বধ করলেন এবং মারীচকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর রাম অহল্যা উদ্ধার করলেন।

সপ্তম সর্গ—অহল্যা রামের স্তুতিগান করলেন। পরে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে জনকপুরের দিকে গেলেন।

অষ্টম সর্গ—জনক সবাইকে স্বাগত জানালেন এবং বালক-দুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বিশ্বামিত্র বালক-দুটির পরিচয় দিলেন। এদিকে সীতা স্বপ্ন দেখে তাঁর সখীকে বলেছেন, "আমি এক সুন্দর পুরুষের স্বপ্ন দেখছি, যাঁর শরীর নীল বর্ণ, তুলসীমালা গলে। তাঁর রূপ দেখে আনন্দ পেয়েছি। জানি না আমার ভাগ্যে কি আছে? এই পুরুষের সঙ্গে আমার কবে দেখা হবে? সখী আমার দুঃখ দূর করো।" সখী বললেন, "তোমার আশা পূর্ণ হবে।" এই সময় রামকে আসতে দেখে সীতা সখী-সহ গবাক্ষ দিয়ে রামকে দেখলেন এবং মূর্ছা গেলেন। সীতা সখীকে বললেন, "রামকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে এবং আমি প্রাণে বাঁচব না।" সীতা আবার বললেন, "পিতার হয়তো ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি নিজে গিয়ে তাঁর চরণ সেবা করব।"—

"অহং করিষ্যে স্বয়মেব গত্বা নত্বা চ রামাঙ্ঘ্রি সরোজ সে রাম্।"

—অষ্টম শ্লোক, ১২৮

এদিকে রাম ধনুর্ভঙ্গ করার জন্য প্রস্তুত হলেন। রাম উঠে ধনুক ধরে ভঙ্গ করলেন। চারিদিকে স্তুতিগান ও আনন্দ কোলাহল উঠল। সমগ্র ভূমণ্ডল কেঁপে উঠল এবং ইন্দ্র চমকিত হলেন।

নবম সর্গ—রামের ধনুর্ভঙ্গে শিব, ব্রহ্মা প্রসন্ন হলেন। সীতা রামের গলায় মালা দিলেন। জনক দশরথকে এই বার্তা জানালে দশরথ পাত্রমিত্র-সহ জনকপুরে এলেন। বিশ্বামিত্র দশরথকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন।

দশম সর্গ—রাম-সীতার বিবাহের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রামের সৌন্দর্য বর্ণনা অন্তে এই সর্গের শেষ হয়েছে।

একাদশ সর্গ—রাম-সীতার বিবাহ শেষ পর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বাদশ সর্গ—বিবাহের পর জনক বশিষ্ঠকে বললেন, "বিবাহের যদি কোন অনুষ্ঠান বাকী থাকে তা আমাকে বলুন, আমি তা পূর্ণ করব।" বশিষ্ঠ বললেন, "বেদবিহিত সব অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।" বিবাহের পর দশরথ সবাইকে নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। পথে পরশুরামের সঙ্গে দেখা হল। পরশুরাম রামের স্তুতি করে রামের চরণে প্রণাম করলেন। এরপর সবাই অযোধ্যায় গেলেন এবং অযোধ্যায় আনন্দসাগরে ঢেউ উঠল।

কথাবস্তুর সমীক্ষা :—কাব্যের আরম্ভ বালক-রামের রূপ বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু যে বর্ণনার নূতনত্ব কিছুই নাই, সবই কেবলমাত্র আলংকারিক বর্ণনা। কৌশল্যা এখানে রামকে ঈশ্বর জ্ঞানে স্তুতি করলেন। রাম এখানে চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত।

'রামচরিত মানসে'র বর্ণনা এখানে নেই। এখানে রামেকে ঈশ্বর রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কেবল দশরথের পুত্রস্নেহ এক জায়গায় দেখা যায় যেখানে তিনি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণকে পাঠাতে দ্বিধা করেন। এখানে রাম দশরথকে উপদেশ দিয়েছিলেন যা 'রামচরিতমানসে' নেই। রামের উপদেশ শুনে বশিষ্ঠ আদি মুনিরা বিস্মিত হয়েছিলেন। বালক রামের এই উপদেশ মহত্ত্বপূর্ণ কিন্তু স্বাভাবিক নয়।

তুলসীদাস রাম-সীতার পূর্বানুরাগ দেখাতে গিয়ে জনকের পুষ্পবাটিকায় তাঁদের সাক্ষাৎ করিয়েছিলেন। এই কাব্যে পুষ্পবাটিকার উল্লেখ নেই। এখানে রাম জানকীকে ধনুর্ভঙ্গের আগে দেখেননি। সীতা কিন্তু রামকে গবাক্ষ দিয়ে দেখেছিলেন। তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। রামের প্রতি সীতার এই অনুরাগ রামের অজ্ঞাত ছিল।

এই কাব্যের স্বয়ংবর সভার বর্ণনা 'রামচরিতমানসের' মতো বা আদি রামায়ণের মতো নয়। এখানে ধনুর্যজ্ঞে অন্যান্য রাজারা অবশ্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা একে একে উঠে ধনুর্ভঙ্গ করতে অসমর্থ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। রাবণ বা বাণাসুরের উপস্থিতির কথা এখানে উল্লেখ নেই। রামের ধনুর্ভঙ্গে 'রামচরিতমানসে' লক্ষ্মণ বলেছিলেন—

"দিসি কুঞ্জরুহ কমঠ এহি কোলা
ধরহুধরণি ধরি ধীরন ডোলা
রামু চহন্তি সঙ্কর ধনু তোরা
হোহু সজগ সুনি আয়সু মোরা ॥"

লক্ষ্মণের এই সাবধান বাণী এখানে নেই। ধনুর্ভঙ্গের সময় ভীষণ শব্দ হয়েছিল, সেই শব্দ শুনে সবাই ভীত চকিত হয়েছিল। বিশ্বামিত্রও রাম নাম জপ করেছিলেন। এইগুলি নূতন সংযোজন, 'রামচরিতমানসে' নেই।

'রামচরিতমানসে' ধনুর্ভঙ্গের আগে সীতার ব্যাকুলতার সুন্দর চিত্র আছে। সীতা পার্বতীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেন রাম সফল হন। এই কাব্যে এ-সবের উল্লেখ নেই।

এই কাব্যে পরশুরামের সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ হয়েছিল পথে, জনকপুরে নয়। 'রামচরিতমানসে' এস্থলে লক্ষ্মণ-পরশুরাম সংবাদ আছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্মণ নির্বাক।

কাব্যসৌন্দর্য এখানে বর্তমান। কোমলকান্ত পদাবলী যথাস্থানে আছে।

কাব্যের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে সর্বত্র স্তুতির আধিক্য দেখা যায়। চতুর্থ সর্গে দশরথ ও কৌশল্যা রামের স্তুতি করছেন। পঞ্চম সর্গে বিশ্বামিত্র রামের স্তুতি করছেন। ষষ্ঠ সর্গে সুবাহুবধের পর রামের স্তুতি করা হয়েছে। সপ্তম সর্গে 'স এব রামঃ ভগবান সিত্বং' এই কথা প্রত্যেক শ্লোকের চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করে অহল্যা রামের স্তুতি করছে। অষ্টম সর্গে সীতার সখীরা রামের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা করছে। সীতা স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের প্রশংসা করছেন। এবং পরে রামকে দেখার পর রামকে ঈশ্বর জ্ঞানে স্তুতি ও ধ্যান করছেন। নবম সর্গে বিশ্বামিত্র দশরথকে রামই ঈশ্বর এই কথা বলে প্রকারান্তরে রামের স্তুতি করছেন। দশম সর্গে রামের সৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁর দিব্যরূপের বিবরণ আছে। একাদশ সর্গে হস্তী রামকে ঈশ্বর ভেবে নিজের পিঠ থেকে রামকে নামানোর সময় শোক প্রকাশ করেছে। দ্বাদশ সর্গে পরশুরাম রামের স্তুতি এবং শেষে কবি আত্মপরিচয় দেওয়ার সঙ্গে রামের স্তুতি করছেন। এইভাবে আমরা দেখি যে প্রতি সর্গে রামের স্তুতি আছে। ফলে এই কাব্য ভক্তিকাব্যে পরিণত হয়েছে।

ভক্তিকাব্য রচনার কারণ এই যে কবি নিজেই বীতরাগ সন্ন্যাসী ছিলেন। কবির নাম আগে অদ্বৈত ছিল না। কবির আগের নাম ছিল মুরারি। গুরু কৃপা করে কবির নাম রাখেন অদ্বৈত। কাশীতে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কবি এই কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচনার প্রেরণা কবি রাজা প্রতাপ সাহেবের নিকট থেকে পান। এই কাব্যের স্থানে স্থানে সংসারের প্রতি উদাসীনতার কথা আছে। কবির মন সর্বদাই রামের চরণে স্থির হয়ে আছে।

৫) রামরহস্য বা রামচরিত :—

মোহন স্বামীকৃত রামরহস্য বা রামচরিতের পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে সুরক্ষিত আছে। (লিপিকাল ১৭৫০, ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটলগ নং-৩৯১৭) এই রচনার অধিকাংশ বিষয়বস্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ-উদ্ভূত। এ ছাড়া এখানে সুমন্ত্র দ্বারা স্বয়ংভূ মনু ও তাঁর পত্নীর তপস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। তপস্যার ফলস্বরূপ বিষ্ণুকে তিন জন্মপুত্র রূপে পাওয়ার বরদানের কথা পাওয়া যায়। দশরথ-কৌশল্যার আগে

বসুদেব-দৈবকীরূপে এবং কলিযুগে হরিব্রত-দেবপ্রভা রূপে জন্মের কথা আছে। সূর্যবংশের বর্ণনা থেকে রামের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কোনও মৌলিকতা নেই। বিশেষত্বের মধ্যে বিবাহের পর রামসীতার সম্ভোগ বর্ণনা মহানাটকের সমস্ত দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে নেওয়া হয়েছে। অঙ্গদের কার্যের বিবরণ মহানাটকের এক বিস্তৃত অংশ থেকে আহরণ করা হয়েছে।

'রামলিঙ্গামৃত', 'রাঘবোল্লাস' এবং 'রামরহস্য' — এই তিন কাব্যের বিবরণ-শেষে যে কথাটি প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে তা হল এই তিনটি কাব্যই ভক্তিবাদী রামায়ণ। তাই দেখি এই তিন মহাকাব্যেই রাম-ভক্তি প্রচারের জন্য রামায়ণ-কাহিনীকে পরিবর্তন করা হইয়াছে। 'রামলিঙ্গামৃত'তে যে রামায়ণ-বহির্ভূত ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে করি।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে নারদ রাবণের কাছে গিয়ে সীতার রূপ বর্ণনা করেছিলেন এবং তার ফলে সীতাহরণ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য রামায়ণে শূর্পণখার বিরূপীকরণকে সীতা হরণের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। শূর্পণখা তার বিরূপীকরণের প্রতিকারের জন্য রাবণকে বলেছিল এবং সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেছিল যে সীতাই একমাত্র তার ভার্যা হওয়ার উপযুক্ত। শূর্পণখার কথা শুনে রাবণ সীতা হরণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই রামায়ণেও শূর্পণখার বিরূপীকরণের কথা আছে। এতৎসত্ত্বেও নারদের রাবণের কাছে সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল কি? যদি বলা যায়, সীতা হরণ তরান্বিত করার জন্য কবি নারদকে দিয়ে রাবণের কাছে সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিলেন, এ কথার উত্তরে আমরা বলতে পারি যে ভক্তপ্রাণ নারদের পক্ষে লক্ষ্মীরূপিনী সীতার দৈহিক সৌন্দর্য নারীলোলুপ রাবণের কাছে বর্ণনা করা কখনোই স্বাভাবিক ছিল না। ভক্তকবির কাছে এই বর্ণনা ভক্তিভাবের পরিপন্থী নয় কি? তাছাড়া রাবণ-বধের জন্য সীতা হরণের প্রয়োজন ছিল কি? যদি বলা যায় রাবণ-বধের একটি যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে এটির প্রযোজন ছিল, তাহলে আমরা বলতে পারি যে রাম যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে গিয়ে তাড়কা-সহ বহু রাক্ষস নিধন করেছিলেন তখন তো এরকম একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়নি। রাক্ষসেরা যেহেতু মুনিঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করেছে, সেকারণে তাদের নিধন করতে হবে। এই যুক্তিই কি যথেষ্ট নয়? রাবণের অত্যাচারে মুনিঋষিরা, দেবতারা অতিষ্ঠ ছিল, এটাই তো রাবণ বধের মুখ্য কারণ হওয়া উচিত। সুতরাং রাবণ বধের জন্য সীতাহরণ কোন প্রয়োজন ছিল না।

কবি বলেছেন, রণক্ষেত্রে রামকে দেখে রাবণ ভাষণ দিয়েছিলেন এবং রাম

তাকে শিব রূপ দেখিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় রাবণ মহান ভক্ত ছিল, তা না হলে রাম তাকে শিবরূপ দেখাতেন না। অর্জুন কৃষ্ণভক্ত না হলে কৃষ্ণ তাঁকে বিষ্ণুরূপ দেখাতেন না। তাই যদি হয় তবে ভগবান রামভক্ত রাবণকে বধ করতে পারেন-না, যেমন পারেন না কৃষ্ণ ভক্ত অর্জুনকে। তাহলে রামায়ণের শেষ পরিণতি কি হত তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই মনে হয় কবি রাবণকে ভক্ত করতে গিয়ে রাম-রাবণের সম্পর্ক সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারেননি।

কবি এখানে বলেছেন যে রাবণ বধের পর রাম সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলে কৈকেয়ী রামকে বলেছিলেন যে দেবেন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মনে পড়ে রামের বনবাসের পূর্বমুহূর্তটি। রামের রাজ্যাভিষেকের পূর্বমুহূর্তে কৈকেয়ী দশরথের কাছে বরস্বরূপ রামকে বনে পাঠাতে চাইলেন। সারা অযোধ্যা শোকে, দুঃখে মুহ্যমান হল, প্রিয় পুত্র রামের বনগমনের জন্য দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হন। সবাই কৈকেয়ীর নিন্দায় পঞ্চমুখ হল। সবাই কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিল। কিন্তু রামের বনগমন যদি দেবতার ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তবে তার জন্য কৈকেয়ী সবার কাছে ধিকৃকৃত হবেন কেন? দশরথ তার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হবেন কেন? আর কেনই-বা সারা অযোধ্যা নগরী শোকে মুহ্যমান হবে? তাই মনে হয়, কবির এই কল্পনায় রামায়ণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'রামের বনবাস' আমাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না এবং ফলে রামায়ণের কাহিনী বিন্যাস যথাযথ হবে না।

'রাঘবোল্লাস কাব্যে' সম্পূর্ণ রামায়ণের ঘটনা পাওয়া যায় না। এটিকে রাম-স্তুতিমূলক কাব্য বলা যায়, এখানে প্রায় সর্বত্র রামস্তুতি বর্তমান। যেটুকু কাহিনী এখানে দেখি তা শুধু রামের মহত্ত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের জন্য।

'রামরহস্য কাব্যে'ও মৌলিকতা দেখি না। এটিও পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ নয়, যদিও এখানে রামাদির জন্ম থেকে রামাদির স্বর্গারোহণ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু রামায়ণ-কাহিনীর ঘাতপ্রতিঘাত, কাহিনীর সাবলীল গতি কোন কিছু এখানে নেই। এখানেও অন্যান্য ভক্তিবাদী রামায়ণের মতো মূলত রামের লীলাখেলার বর্ণনা আছে।

স্ফুটকাব্য—শ্লেষ কাব্য—

১) রামচরিত[১]—রামকাহিনী উপজীব্য-শ্লেষকাব্যগুলির মধ্যে প্রথমেই মনে আসে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে'র নাম। কবি

১ শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ দ্বারা সম্পাদিত এবং দিব্যজ্যোতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪।

তাঁর কাব্যের পরিশিষ্ট 'কবি প্রশস্তিতে' তাঁর রচনার প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি উত্তরবঙ্গে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্ধনের পিনাকী নন্দীর পৌত্র এবং প্রজাপতি নন্দীর পুত্র। তিনি রামকথার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামপালের চরিত্র বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে তিনি যে শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা তিনি দ্বৈত অর্থে ব্যবহার করেছেন, সে কারণে এটি একটি শ্লেষকাব্য বা দ্ব্যর্থক কাব্য। এক অর্থে রামচন্দ্রের কথা এবং অন্য অর্থে রাজা রামপালের কথা, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। রাজা রামপালের পুত্র মদনপাল-এর রাজত্বে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবির পিতা রাজা রামপালের সন্ধিবিগ্রহক মন্ত্রী ছিলেন। এতে অনুমান করা যায় যে কবি তাঁর পিতার নিকট থেকেই রামপালের রাজত্বকালীন ঘটনাবলী জেনেছিলেন।

'রামচরিত' কাব্য আর্যা ছন্দে ২২০টি শ্লোকে ৪টি অধ্যায়ে রচিত। কবির নিয়মিত শ্লেষাত্মক শব্দ প্রয়োগের ফলে তাঁর কাব্যের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে। রামকাহিনীর প্রধান অংশ যেমন রামাদির জন্ম, রাম-লক্ষ্মণ দ্বারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমের বিঘ্নসৃষ্টিকারী রাক্ষস নিধন, রামের বনবাস, সীতাহরণ, হনুমানের লঙ্কা দহন প্রভৃতি ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেতু নির্মাণে সুবেলা পর্বতের বর্ণনা ও রাবণ বধ প্রভৃতি ঘটনাবলী বর্ণিত। সুবেলা পর্বতের বর্ণনা তুচ্ছ হলেও কবি ইচ্ছাকৃতভাবে এটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন কারণ রাজা রামপালের একটি ঘটনার সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সীতার গুণাবলীর এবং সীতা, সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ-সহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বণিত আছে। শেষ অধ্যায়ে সীতার বনবাস ও কুশের রাজ্যাভিষেকের পর রাম ও তাঁর ভ্রাতাদের স্বার্গারোহণ বর্ণিত হয়েছে। ঠিকভাবে বলতে গেলে সমস্ত রামকাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম দুইটি অধ্যায়ে বর্ণিত। রামকাহিনীর অতি সামান্য অংশ শেষ দুটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। সমস্ত রচনাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কবি সমস্ত রামকাহিনীর ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছেন মাত্র; কোনও ঘটনারই বিশদ বিবরণ দেননি। অবশ্য কবির এই গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির জন্য দায়ী কবির অস্বাভাবিক এবং দ্ব্যর্থক শব্দ নির্বাচনের কষ্টসাধ্য চেষ্টা। কিন্তু একথা মনে রাখতে হয় যে কবির প্রাথমিক উদ্দেশ্য রাজা রামপালের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রামকাহিনী সঠিকভাবে বর্ণিত হলো কিনা সে বিষয়ে তিনি চিন্তাই করেননি। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনাই এই রচনার বিশেষ কৃতিত্ব, কিন্তু সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর।

'কবিপ্রশস্তি'তে কবির দম্ভোক্তি কবির নিজের প্রতিভার প্রতি আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক। পণ্ডিতব্যক্তিদের পক্ষেও তাঁর রচনা ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরিকে যথোচিত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। "কবি নিজেকে কলিকালের বাল্মীকি বলেছেন"—

"অবদানং রঘু পরিবৃঢ—গৌড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ।
কলি-যুগ রামায়ণামিহ কবিরপি কলিকাল-বাল্মীকিঃ॥"

কবিপ্রশস্তি-১১

'কিন্তু যখনই আমরা বাল্মীকির ভাষার মাধুর্য ও বর্ণনার সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করি, তখন সন্ধ্যাকর নন্দীর স্বকল্পিত উপাধিকে অনুমোদিত করতে পারি না। কষ্টসাধ্য তাঁর এই প্রচেষ্টা, প্রকাশভঙ্গির এই দুরূহতা এবং অসীম সাহসিক শব্দবিন্যাস-কৌশল তাঁর রচনাকে চিত্তাকর্ষক করেনি। নিম্নবর্ণিত শ্লোকগুলি তাঁর এই প্রচেষ্টার উদাহরণ :—

"অন্বয়ভবনং সহসামন্তব্রজম্ অভ্যুপেতসাহায্যম্।
অনুমেনে স মহাদোরবিতনয়ং মিত্রভাবমাপন্নম্॥" ১।৪৪

"যিনি (রাম) সূর্যপুত্র (সুগ্রীব)কে শক্তি দিয়ে সমর্থন কবেছিলেন সে (সুগ্রীব) রামের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে সাহায্যেব শপথ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল।"

'যিনি (রামপাল) তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্তদের নিয়ে সামন্ত রাজন্যবর্গদের সঙ্গে গোপনে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং তারা (সামন্তবাজাবা) ছিলেন তাঁর শক্তির উৎস এবং তারা রাজাকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

"কৃচ্ছেণ রত্নগর্ভাং সূনুস্তস্যাজ্ঞয়াশু চাতুর্থাৎ।
জনকভুবং স সুমন্ত্রাশ্রিত সৌত বিধিস্ততো বনং নিন্যে॥" ৪।৩

"আদেশ প্রাপ্ত হয়ে কষ্ট করে ক্ষিপ্রগতিতে চাতুর্যের সঙ্গে (রাম) মণিমুক্তা-সুশোভিত 'জনক তনয়াকে' রথে করে বনে নিয়ে গেলেন সুমন্ত্রকে সারথি করে।"

'তাঁর (রামপালের) পুত্র সব সময় সুপরামর্শে চালিত হন এবং পুত্রোচিত কর্তব্য করেন। সেই পুত্র তাঁর আজ্ঞাক্রমে ক্ষিপ্রগতিতে এবং চাতুর্যসহকারে অনেক কষ্ট করে তাঁর কনকসদৃশ স্বদেশকে রক্ষা করেন।'

"অথবহুত রসা দৃত্যাযুক্তো রামেণ বিত্তপালস্য।
সূনোরভ্যাসে সহসা সৌরেশিত নয়ঃ প্রৈষি॥" ২।৩৬

"অনন্তর শক্তিশালী সম্মানিত রাম-কর্তৃক সুগ্রীবপ্রভু বালীর পুত্র অঙ্গদ কুবের-ভ্রাতা রাবণের নিকট শীঘ্র প্রেরিত হলেন।"

"অনন্তর শক্তিশালী সম্মানিত রামপাল-কর্তৃক নীতিবিদ্ এই ভীম শীঘ্র বিত্তপালের নিকট প্রেরিত হলেন।"

(২) রাঘব পাণ্ডবীয় :— (সম্পাদনা—শিবদত্ত ও কে. পি. পরব, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই ১৮৯৭)

দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে কবিরাজ যাঁর আসল নাম ছিল মাধব ভট্ট রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে 'রাঘব পাণ্ডবীয়' রচনা করেন। ১৩ সর্গের এই কাব্য জয়ন্তপুরীর কদম্ব কামদেবের সময়ে শ্লেষ অলংকারের সাহায্যে রচিত হয়। এরূপ রচনা একটি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু কবির অসামান্য ধৈর্য ও সুকৌশল তাঁকে এই কার্যে সাফল্য এনে দিয়েছে। সংস্কৃত শব্দের বিভিন্ন অর্থের জন্য এবং যৌগিক শব্দের পৃথকীকরণের বিভিন্ন রীতির জন্য এরূপ দ্বৈত অর্থবহ রচনা সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃত শব্দার্থে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁকে শ্লেষ অলংকার যুক্ত শব্দচয়নে সাহায্য করেছে। তিনি পাণ্ডবদের কাহিনী বিবৃত করেছেন এই কাহিনী অন্য আর-এক অর্থে ব্যবহার করার জন্য। তাঁর এই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যর জন্য তাঁর কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি অবশ্যই ব্যাহত হয়েছে। শ্লোকগুলি তাদের স্বাভাবিক মাধুর্য হারিয়েছে। কিন্তু যে-সব কবি এরূপ রচনায় ব্রতী ছিলেন তাঁদের তুলনায় কবির অসামান্য সাফল্য তাঁকে কবি বাণ ও সুবন্ধুর সমপর্যায়ে উন্নীত করেছে। কবি নিজেও এরূপ মত পোষণ করতেন এবং তিনি প্রথম সর্গে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি—

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তির্মার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতেন বা॥" ১।৪১

কবির শ্লেষালংকার প্রয়োগনৈপুণ্য দেখানো যেতে পারে। কবি তাড়কা বধ ও হিড়িম্বা বধ এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

"বিষমেষুপ্রহারাতাং তাং কৃত্বা পততোদ্রুতম্।
স হিড়িম্বস্য সকলৈরপুষ্ণাত পিশিতাশিনঃ॥" ১।৮৪

"রাম তাঁর সুতীক্ষ্ণ শর দিয়ে তাকে (তাড়কা) বধ করে তার দেহ টুকরো টুকরো করে পক্ষীদের ভোজ্যবস্তু করে দিলেন।"

"ভীমসেন সেই (হিড়িম্ব) রাক্ষসকে বধ করে তার দেহ খণ্ড করে বন্য জন্তুর আহার্যের জন্য দিয়ে দিলেন।"

এই শ্লোকে কবি সীতা ও দ্রৌপদীর দুঃখের বর্ণনাশেষে তাঁদের দীপ্তিময়ী মূর্তির বর্ণনা এইভাবে করেছেন—

"পত্যু প্রতিজ্ঞাণবলঙ্ঘনেন সকুঞ্চুকা সঞ্চিত চারুবেণী।
অনল্প সন্তাপহুতাশমধ্যাদ্ বিনিঃসৃতা রাজবধূর্বিরেজে॥" ১৩।২৪

"রাজবধূ সীতা অগ্নিশুদ্ধা হয়ে প্রজ্বলিত হুতাশন থেকে বেরিয়ে তেজোদ্দীপ্তা হয়ে তাঁর স্বামীকে প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ করলেন।"

'রাজবধূ দ্রৌপদী দুঃখের অমানিশা অতিক্রম করে মনোহর রূপ ধারণ করলেন কারণ তাঁর স্বামী ভীমসেন তাঁর প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হয়েছেন।"

কবি তাঁর কাব্যকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর কষ্টকল্পিত শ্লেষালংকার প্রয়োগের মোহের জন্য তাঁর কাব্য সজীব ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারেনি। তাঁর কাব্যের শ্লোকার্থ অনেকস্থলে ভাষ্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হওয়া খুবই কঠিন।

(৩) দিগম্বর জৈন ধনঞ্জয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে 'রাঘবপাণ্ডবীয়'তে[১] ১০ সর্গে একই সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনী বর্ণনা করেন। জৈন কবি জৈন রামকথা অনুসারে কাব্য রচনা করেছেন। সেইজন্য কাব্যে কয়েকটি বিশেষত্ব দেখা যায় যেমন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অভাব, বালীবধের পর সুগ্রীব দ্বারা আপন কন্যা কল্যাণীকে রামহস্তে সমর্পণ, লক্ষ্মণ দ্বারা কেটি শিলার উপরে ওঠা ইত্যাদি।

(৪) হরিদত্ত সূরি 'রাঘবনৈষধীয়'[২] কাব্যে দুটি সর্গে একই সঙ্গে রাম ও নল চরিত্র বর্ণনা করেন। কাব্যের শেষ থেকে আমরা জানতে পারি হরিদত্ত সূরি গর্গ বংশের জয় শঙ্করের পুত্র—

"গর্গর্ষিবংশ তিলকো জয় শঙ্করাখ্যো
জ্যোতির্বিদ্যাং প্রণয়কৃত সুকবীন্দ্রমাল্যঃ।
আধ্যাত্মিকাবগতি শান্তি পরায়ণোঽভূদ্
ধর্মোপদেশন পটুর্নয় বোধ আসীৎ॥
তৎ সুপূর্হরদত্ত ইত্য মলধী···" —রাঃ নৈঃ, ২।২১-২২

কাব্যের রচনাকাল জানা যায়নি কিন্তু কবির নিজের ভাষ্য থেকে বোঝা যায় যে কাব্যটি ১৭ শতাব্দীর আগে রচিত নয়।

কবি সংক্ষিপ্তভাবে দুটি কাহিনী ১২৪ শ্লোকে প্রথম সর্গে রচনা করেছেন। কবি তাঁর কাব্যে কোনও নূতন ঘটনা উদ্ভাবনে বা তাঁর কাব্যের কাব্যসৌষ্ঠব

১ রাঘব পাণ্ডবীয়—শিবদত্ত এবং কে. পি. পরব দ্বারা সম্পাদিত এবং নির্ণয় সাগব প্রেস, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২ রাঘব নৈষধীয়—শিবদত্ত এবং কে. পি. পরব দ্বারা সম্পাদিত এবং নির্ণয় সাগর প্রেস দ্বারা ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

বাড়ানোর প্রয়াসে কোনও মৌলিকতা প্রদর্শন করেননি। শব্দচয়নের মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারত-কাহিনী সংস্থাপনে অত্যধিক মনোযোগী হওয়ায় কবির রচনা মহত্ত্বপূর্ণ হয়নি। শ্লেষালংকারযুক্ত শব্দচয়নের আধিক্যহেতু তাঁর কাব্য সাধারণ পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠেনি। কবি প্রথম সর্গে সমস্ত কাহিনী এবং দ্বিতীয় সর্গে ছয় ঋতুর বর্ণনা করেছেন। সমস্ত কাব্যের ভাষ্য 'শ্লোকার্থ' পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত হচ্ছে। একটি শ্লোকে তাঁর শ্লেষালংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য প্রকাশিত।

"ইতুক্তঃ কৃতহূতিংস নতস্তুতং তং নিরৈক্ষিষ্ট।
আত্মাজয়াততহর্ষঃ স্বাহেয়ধৃতেঃ স্বরূপসম্পত্তিম্॥" ১ · ১০৭

"মন্দোদরী বললেন, রাবণ শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে জয়লাভে সুনিশ্চিত ভেবে আনন্দিত হয়ে তার পুত্রের দিকে তাকায় যে পুত্র তার সামনে নতজানু হয়ে তার স্বাভাবিক মহত্ত্ব প্রদর্শন করছে।"

"দময়ন্তী বললেন, ভীম তাঁর কন্যার জন্য আনন্দিত হয়ে নলের দিকে তাকালে নল তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। নল ইতিপূর্বে সর্প-প্রেরিত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করে তাঁর স্বাভাবিক রূপে ফিরে পেয়েছিলেন।"

শৃঙ্গারিক খণ্ডকাব্য দূতকাব্য :—সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রামকাহিনীকে উপজীব্য করে অনেক দূতকাব্য রচিত হয়েছে। দূতকাব্যগুলির মধ্যে বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য অথবা বেদান্তদেশিক-রচিত 'হংস সন্দেশ' বা 'হংসদূত' এবং রুদ্রবাচস্পতি-কৃত 'ভ্রমরদূত' উল্লেখযোগ্য।

(১) হংস সন্দেশ বা হংসদূত :—

বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য ১৩শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজা বুক্কের রাজত্বকালে এই কাব্য রচনা করেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১১০টি শ্লোকে এই কাব্য কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে রচিত। এই কাব্যে দুটি আশ্বাস আছে। প্রথমটিতে ৬০টি শ্লোক এবং দ্বিতীয়টিতে ৪০টি শ্লোক। সীতা উদ্ধারের জন্য উদ্গ্রীব রাম সুগ্রীবের সঙ্গে আসন্ন লঙ্কা অভিযান বিষয়ে আলোচনা করছেন, এমন সময় হনুমান লঙ্কা থেকে ফিরে সীতার লঙ্কার দুর্দশার কথা রামের নিকট বর্ণনা করে। সীতার দুঃখের ও দুর্দশার কথা শুনে রাম অত্যন্ত বিমর্ষ হন। তিনি যথাশীঘ্র সীতা উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র হন কিন্তু এই কার্যে অপরিহার্য দেরির জন্য হয়তো সীতার জীবনহানি হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তুঙ্গভদ্রার জলে এই রাজহংস দেখে তাকে লঙ্কায় সীতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাঠালেন।

মেঘদূতের মতো কবি হংসের তুঙ্গভদ্রা থেকে লঙ্কা—দীর্ঘ পথযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। তার যাত্রাপথে তাকে মাল্যবান, অঞ্জনাপর্বত, তুন্দীরা, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম, তাম্রপর্ণী নদী এবং সর্বশেষে সুবেলা পর্বত যেখানে লঙ্কা নগরী অবস্থিত, অতিক্রম করতে হয়েছে। এই দীর্ঘপথ যাত্রার নিখুঁত বিবরণ কবির বর্ণনা-ক্ষমতার পরিচায়ক।

মেঘদূতের উত্তরমেঘের অনুকরণে কবি দ্বিতীয় আশ্বাসে সীতার দুঃখদুর্দশার বর্ণনা করেছেন। রাম হংসকে সীতার আশু মুক্তির আশ্বাস দিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সীতার নিকট থেকে সংবাদ নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

যদিও কবি স্থানে স্থানে বেদান্ত দর্শনের কথা বলেছেন কিন্তু তাতে কবির কাব্যের আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। যদিও রচনাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়নি তথাপি কতকগুলি শ্লোক তাঁর অনবদ্য কবিত্বশক্তির সাক্ষ্য বহন করছে। শেষে এই রচনা সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে দূতকাব্যটি নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের।

(২) ভ্রমরদূতকাব্য :—

বাংলার রুদ্রবাচস্পতি ১৭শ শতাব্দীতে এই কাব্য রচনা করেন। রাম-কর্তৃক সীতার নিকট ভ্রমর প্রেরণ এই কাব্যের বিষয়বস্তু। অশোকবনে সীতার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে দুঃখে অভিভূত রাম একটি হ্রদে এক ভ্রমর দম্পতিকে দেখে পুরুষ ভ্রমরটিকে অনুরোধ করেন তাঁর বার্তা সীতার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। লঙ্কা যাওয়ার পথে ভ্রমরটিকে বিন্ধ্য পর্বত, রেবা, কাবেরী ও কাঞ্চী নদী এবং সমুদ্র অতিক্রম করতে হবে। লঙ্কা নগরীর বর্ণনার শেষে রাম তাঁর দুঃখের বার্তা ভ্রমরটিকে দেন এবং রাম ভ্রমরটিকে এই বলে আশীর্বাদ করেন যে এই কাজের জন্য তার প্রিয়তমার কাছ থেকে সে কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। ভাবগম্ভীর কল্পনা, শব্দ-চয়নের মাধুর্য, প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য, যথাযথ অলংকার প্রয়োগ এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দের ব্যবহার কাব্যটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে। এই কাব্য প্রমাণ করে যে কবি আসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

এগুলি ছাড়া বেংকটাচার্য ১৭শ শতাব্দীতে ৩০০ শ্লোকের 'কোকিলসন্দেশ' কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তাঞ্জুর লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে (তাঞ্জুর ক্যাটালগ নং ৩৮৬২)। ১৯শ শতাব্দীতে ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য-কৃত 'বাতদূতে' বিরহিণী সীতা বায়ুকে দূত করে রামের নিকট সংবাদ পাঠাচ্ছেন। নিত্যানন্দ-কৃত 'হনুমদ্দূত' ২০শ শতাব্দীতে রচিত। এখানে রাম হনুমানকে দূত করে সীতার কাছে সংবাদ দিয়ে পাঠাচ্ছেন। কাব্যটি মেঘদূতের অনুকরণে রচিত।

গীতগোবিন্দ অনুকরণে রামসীতা বিষয়ককাব্য :—

১। রামগীতগোবিন্দ :—

কাব্যটির পাণ্ডুলিপি লণ্ডনে সুরক্ষিত আছে (ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ নং ৩৯১৬)। কাব্যটি জয়দেব-রচিত এরূপ কথিত আছে। এখানে গীতগোবিন্দের স্পষ্ট অনুকরণ দেখা যায়। যেমন :—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণুতদা জয়দেব সরস্বতীম্॥"

— গীতগোবিন্দম্—সর্গ ১, শ্লোক ৩

"যদি রাম পদাম্বুজে রতির্যদি বা কাব্যকলাসু কৌতুকম্য।
পঠনীয় মিদং তদোজসা রুচিরং শ্রীজয়দেব নির্মিতম্॥"

—রাম গীতগোবিন্দ, সর্গ ১

এই কাব্যে ৬টি সর্গে ২৪টি গীতে বিষ্ণু অবতার রামের জন্ম থেকে রাবণ বধের পর অযোধ্যায় রামের অভিষেক পর্যন্ত সমস্ত রামকথা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত আছে। গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হলেও রাধার সৌন্দর্য বর্ণনার মতো সীতার সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই। সমস্ত কাব্যে শুদ্ধ রামভক্তির বর্ণনা দেখা যায়। কাব্যে রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি দেখা যায় :—

(১) জন্মের পর রাম নিজের বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছিলেন।

(২) মিথিলায় পরশুরামের তেজোভঙ্গ।

(৩) কৈকেয়ী দশরথের ভগ্নরথে আসীন ছিলেন।

(৪) রাম-সীতা বিবাহের সময় দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। জনক রামের পা ধুয়েছিলেন।

(৫) পম্পা সরোবরের তটে রাম-নারদ সংবাদ।

২। বিশ্বনাথ সিংহ-কৃত সঙ্গীত রঘুনন্দন :—

রেওয়ার মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ (১৮১৪-৫৪) বিদ্যা ও সঙ্গীতের পোষক ছিলেন। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর অবিচল ভক্তি ছিল। তাঁর অধিকাংশ রচনায় শ্রীরামচন্দ্রের মহত্তর জীবনের উল্লেখ আছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সঙ্গীত-রঘুনন্দন' উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি অনুপ সংস্কৃত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। গ্রন্থটি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রচিত। জয়দেবের গ্রন্থে ১২টি সর্গ ও ২৪টি অষ্টপদী পদাবলী আছে। 'সংগীত রঘুনন্দন'-এ ১৬টি সর্গ

আছে। গ্রন্থটি গীতগোবিন্দের মতো সরস কাব্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জয়দেব দশ অবতারের বর্ণনা করেছেন কিন্তু বিশ্বনাথ ২৪ অবতারের বর্ণনা করেছেন যা যুক্তিসংগত নয়।

'সংগীত রঘুনন্দনে' সর্গের নামগুলির এই রকম :—

১) মঙ্গলাচরণ ২) গ্রহরাস বর্ণন ৩) বসন্তরাস বর্ণনা ৪) জানক্যংতধ্বনি বর্ণন ৫) বসন্তিতা গমনম্ ৬) চারুশীলাকৃত মান্যানুনয় বর্ণনম্ ৭) শ্রীজানকী সমাগম্ ৮) শ্রীজানকী ভূষণ বিধানম্ ৯) দোলা বর্ণনম্ ১০) সর্বাগশোভা বর্ণনম্ ১১) শ্রীজানকী রঘুনন্দন যোগীত বর্ণনম্ ১২) বিরহ বর্ণনম্ ১৩) সরযূ বর্ণনম্ ১৪) সরযূতট বিহার ১৫) সখিস্থিতিনাম সংখ্যা বর্ণনম্ ১৬) গ্রন্থ মাহাত্ম্য বর্ণনম্।

যদিও 'সংগীত রঘুনন্দনে' 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণ আছে তথাপি এ একটি কষ্টসাধ্য কৃতি। গ্রন্থটি যে জয়দেবের পূর্ণ অনুকরণ নয় তা এই গ্রন্থের গদ্যাত্মক ভাব বর্ণনায় বোঝা যায়।

গ্রন্থটি বর্ণনায় যে সরস ও মাধুর্যপূর্ণ নয় তা দুই-একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যায়। যেমন :—

(১) "সুখদ সমীরে সরযূতীরে বিলসিত ললিত নিলয়মনম্।
কাঞ্চনশালং মণিময়জালং মন্যে মদনমুদয়নম্॥ ১
চন্দন চর্চিত কুসুম সমর্চিত মহীপরম রমণীয়ম্।
চন্দ্রসুচুম্বিত চন্দ্রকান্তয় চলিত সলিল কমণীয়ম্॥" ২ —(২য় সর্গ)

এর তুলনা জয়দেবের শ্লোক—'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসত করে বনমালী' অনেক সুন্দর মনে হয়। কবির ৩য় সর্গের বর্ণনা—

"মিথ্যো দর্শন স্পর্শন পুলকিত বপুর্বির্জয়তে পনসম্।
স্বেদ সলীল কর্ণসহিত বদনমপি পয়োনিধিচন্দ্রমসম।" (৬)

কথাসাহিত্য :—

কথাসাহিত্যে বিস্তৃত রামকথা-বিষয়ক রচনা দৃষ্ট হয়। গুণাঢ্য-কৃত 'বৃহৎকথা'তে যে রামকথা বর্ণিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বসুদেব হিণ্ডি'র রচনা থেকে। বসুদেব হিণ্ডি জৈন মহারাষ্ট্রীয় গদ্যতে যে 'বৃহৎকথা'র জৈন রূপ দান করেন, অনুতে সংক্ষিপ্ত আকারে রামকথা পাওয়া যায়।

ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথা মঞ্জরী'তে রামকথা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। সোমদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীতে 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। এখানে রাম-কথার বর্ণনা পাওয়া যায়।

সংঘদাস-কৃত 'বসুদেব হিণ্ডি'[১] :—

সংঘদাস তাঁর 'বসুদেব হিণ্ডি'তে জৈন মহারাষ্ট্রীয় গদ্যতে 'বৃহৎকথা'র যে জৈন-রূপ প্রস্তুত করেন তাতে জৈন রামকথার প্রভাব দেখা যায়। এই রচনা বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে ভিন্ন হলেও এই পরিবর্তন গৌণ। এই রামকথায় সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে এখানে সীতার জন্ম লঙ্কায় বলা হয়েছে।

এই রচনায় বিষয়বস্তুর আরম্ভ রাবণের কথা দিয়ে। রাবণের বংশাবলী এখানে কূর্মপুরাণের অনুকরণে বর্ণিত। এরপর রাবণের লঙ্কায় বসবাস ও মন্দোদরীর সঙ্গে বিবাহের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। অনন্তর দশরথ ও তাঁর পুত্রদের কথার উল্লেখ —কৌশল্যার পুত্র রাম, সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ এবং কৈকেয়ীয় পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন। এরপর মন্দোদরী ও রাবণের কন্যা সীতার জন্মকথা এবং পরিত্যক্তা বালিকা জনকের কন্যা রূপে পরিচিতা। সীতা-স্বয়ংবরে ধনুর্ভঙ্গের উল্লেখ নেই। সীতা স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত বহু রাজাদের মধ্যে রামকে চিনে নিতে পেরেছিলেন। রামের অন্যান্য ভ্রাতাদেরও বিবাহের উল্লেখ আছে। রামের ১২ বৎসর নির্বাসন এবং কৈকেয়ীর দুটি বর প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। সংঘদাসের কৈকেয়ীর বরপ্রাপ্তির বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক ভাবে করেছেন। সংঘদাস বলেছেন যে কৈকেয়ী প্রথম বর পেয়েছিলেন কামশাস্ত্রে নিপুণতার জন্য (রায়া কৈকইত্র সয়ণোবয়ারবিয়কখণাত্র-রাজা কৈকেয্যাশয়নোপচার বিচক্ষণয়া তোষিতঃ)। কৈকেয়ী দ্বিতীয় বরপ্রাপ্তির কারণ হল এইরকম : একবার এক সীমান্তবর্তী রাজা দশরথকে পরাজিত ও বন্দী করেন। এই কথা শুনে কৈকেয়ী নিজে সৈন্য চালনা করে ঐ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং সেই রাজাকে পারজিত করে রাজা দশরথকে উদ্ধার করেন। ভরত দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় পৌঁছে রামের নিকট গিয়েছিলেন। কৈকেয়ী নিজ কার্যের জন্য অনুতাপ করে রামকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করতে বলেছিলেন। এরপর শূর্পণখার বিরূপীকরণ, মারীচের কনক-মৃগের রূপধারণ, সীতাহরণ, জটায়ু-রাবণ যুদ্ধ, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী, বালীবধ, হনুমান-সীতা সংবাদ, সেতু বন্ধন, বিভীষণের শরণাগতি এবং রাবণ বধের পর সকলের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ঘটনাবলী বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসারে বর্ণিত। এখানে জৈন রামকথার প্রভাবও দেখা যায়। লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণবধ এবং লক্ষ্মণকে অষ্টম বসুদেব বলে অভিহিত করা জৈন রামকথার প্রভাবে উল্লিখিত।

রচনাটির অধিকাংশ বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ হলেও বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে দেখা যায়। যেমন :—

১ সংঘদাস-কৃত বসুদেব হিণ্ডি—জৈন আত্মানন্দ সভা, ভাবনগর সংস্করণ। দ্বিতীয় ভাগ পৃ. ২৪০-২৪৬

১) সীতা, রাবণ ও মন্দোদরীর কন্যা।

২) কৈকেয়ী-পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন।

৩) ধনুর্ভঙ্গের ঘটনা উল্লিখিত নয়।

৪) রামের বারো বৎসর নির্বাসন।

৫) কৈকেয়ীর দুটি বর প্রাপ্তির নূতন কাহিনী।

৬) কৈকেয়ীর নিজকার্যের জন্য অনুতাপ।

৭) সুগ্রীবের নিমন্ত্রণ পেয়ে ভরতের চতুরঙ্গ সেনা রাবণ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল।

৮) লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণ-বধ।

৯) উত্তরকাণ্ডের ঘটনা উল্লিখিত নয়।

কথাসরিৎসাগর[১] :—

একাদশ শতাব্দীতে সোমদেব ভট্ট 'কথাসরিৎসাগর' রচনা করেন। এখানে দু'জায়গায় রামকথার বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৪ লম্বকে ১০৭ তরঙ্গের অন্তর্গত ১২-২৬ শ্লোকে রামের বনবাস থেকে রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। এছাড়া অলংকারবতী লম্বকে কঙ্কনপ্রভা নামক বিদ্যাধরী বিরহব্যাকুল নরবাহনকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রামকথার বর্ণনা করে। এখানে উত্তরকাণ্ডের ঘটনা পাওয়া যায়।

এই শেষ বৃত্তান্তে বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করা যায় :—

১) বাল্মীকির আশ্রমে সীতার পরীক্ষা।

২) লবের জন্মের পর বাল্মীকির দ্বারা কুশের অলৌকিক জন্মকথা (৯. ১. ৮৩-৯৩)।

৩) রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে কুশের যুদ্ধ এবং পরিশেষে রামের সঙ্গে পুত্রদ্বয় ও সীতার মিলন (৯. ১. ৯৪-১১২)।

লব ও কুশ একদিন বাল্মীকি-পূজিত শিবলিঙ্গ নিয়ে খেলা করতে থাকে। বাল্মীকি তা দেখতে পেয়ে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কুবেরের সরোবর থেকে স্বর্ণকমল এবং বাগান থেকে মন্দার ফল নিয়ে এসে তাদের শিবলিঙ্গ পূজা করতে আজ্ঞা দেন। লক্ষ্মণ ঐ সময়ে রামের পুরুষমেধের জন্য শুভ লক্ষ্মণযুক্ত পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

লক্ষ্মণ লবকে কুবেরের বাগানে দেখতে পেয়ে তাকে বন্দী করে অযোধ্যায় নিয়ে যায়। এরপর বাল্মীকি কুশকে অযোধ্যায় পাঠান। বাল্মীকির দিব্য অস্ত্রে কুশের হাতে লক্ষ্মণ ও রামের পরাজয় ঘটে। এর পর রাম তাঁর পুত্রদের পরিচয় পেয়ে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রম থেকে আনতে বলেন এবং রাম-সীতার মিলন ঘটে।

বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত যে ঘটনাগুলি 'কথাসরিৎসাগরে' বর্ণিত হল সেগুলির মধ্যে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার পরীক্ষার ঘটনাটি শুধু কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়, চিত্তাকর্ষকও বটে।

ঘটনাটি এইরকম :—

বাল্মীকির আশ্রমে সীতা কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আশ্রমবাসী ঋষিরা সীতাকে সন্দেহ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন যে সীতা নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ করেছে তা না হলে কেনই বা সে স্বামী-পরিত্যক্তা হবে। ঋষিদের সন্দেহের কথা শুনে সীতা বললেন, 'আপনারা যে-কোন উপায়ে আমার সতীত্বের পরীক্ষা নিন। যদি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারি তবে আপনারা আমার শিরশ্ছেদ করবেন।' সীতার এই কথা শুনে ঋষিরা সীতার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "এখানে একটি বিখ্যাত টীটিভ সরোবর আছে। টীটিভ নামে এক সাধ্বী রমণী স্বামী-কর্তৃক মিথ্যা সন্দেহে এখানে পরিত্যক্তা হয়। সেই সাধ্বীর কাতর ক্রন্দনে পৃথ্বীদেবী তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শুদ্ধির জন্য লোক-পাল সরোবর খনন করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তুমিও শুদ্ধির জন্য সেই সরোবরে স্নান করো।' ঋষিদের এই কথা শুনে সীতা সেই সরোবরের নিকটে গেলেন এবং পৃথ্বীদেবীকে স্মরণ করে বললেন, 'যদি আমি স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নেও ভেবে না থাকি তবে যেন আমি সরোবরের অপর পারে যেতে পারি।' এই ব'লে সীতা সরোবরে প্রবেশ করলেন এবং পৃথ্বীদেবী আবির্ভূতা হয়ে সীতাকে ক্রোড়ে নিয়ে সরোবরের অপর পারে গেলেন। এই দেখে ঋষিরা সীতার স্তুতি গাইতে লাগলেন এবং বিনা দোষে সীতাকে পরিত্যাগের জন্য রামকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। সীতা তাঁদের নিবারণ করে বললেন, 'আমার স্বামীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না। যদি শাপ দিতে চান, তবে আমাকেই শাপ দিন।'—

"অস্ত্যত্র টীটিভ সরোনামতীর্থং মহদ্বনে
টীটিভি হি পুরাকাপি ভত্রান্যা সঙ্গশঙ্কিনা ॥ ৭৮
মিথ্যৈব দূষিতা সাধ্বী চক্রন্দা শরণাভুবম্।
লোকপালংশ্চ তৈস্তস্যাঃশুদ্ধ্যর্থং তদ্বিনির্মিতম্ ॥ ৭৯

তত্রৈষা রাঘববধূঃ পরিশুদ্ধিং করোতুনঃ
ইত্যুক্তবদাভিস্তৈঃ সাকং জানকী তৎসরো যযৌ ॥ ৮০
যদ্যার্থ পুত্রাদন্যত্রন স্বপ্নেঽপি মনোমম।
তদুত্তরেয়ং সরসঃ পারমম্ববসুন্ধরে ॥ ৮১
ইত্যুক্তেব প্রবিষ্টা তস্মিন সরসি সা সতী।
নীতা চ পারমুৎসঙ্গে কৃত্বা বিভূর্তয়াভুবা ॥ ৮২
ততস্তাং তে মহাসাধ্বীং প্রাণ মুর্মনয়োঽখিলাঃ।
রাঘবং শপ্তুমৈশ্ছংশ্চ তৎপরিত্যাগ মন্যুনা ॥ ৮৩
যুষ্মাভিরার্য্য পুত্রস্য ন ধ্যাতব্যাম মঙ্গলম্।
শপ্তুমর্হথ মা মেব পাপামঞ্জলিরেষবঃ ॥ ৮৪

—কথাসরিৎসাগর, ২য় খণ্ড, নবম লম্বক, শ্লোক ৭৮-৮৪

সোমদেব ভট্ট সীতার সতীত্ব পরীক্ষার যে উপায় অবলম্বনের পরিকল্পনা করেছেন তা অভিনব সন্দেহ নেই কিন্তু নিতান্তই অস্বাভাবিক মনে হয়। প্রশ্ন হল : ঋষিরা সীতার সতীত্বে সন্দেহ করলেন কেন? ঋষিরা তাঁদের সাধনার শক্তি বলে ত্রিকালদর্শী হন। তাঁদের পক্ষে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলী জানা স্বাভাবিক, সুতরাং সীতা যে শুদ্ধা এবং পবিত্র এটা তাঁদের নিশ্চয়ই জানার কথা। যদি তাঁরা না জানেন তবে তাঁরা ঋষিনামের যোগ্য নন। তাছাড়া ঋষিরা সংসারের ত্যাগী যোগী পুরুষ। তাঁদের মধ্যে দয়া মায়া, মমতা থাকাই স্বাভাবিক। তাই যদি হয় তবে তাঁরা অসহায় সীতাকে আশ্রম থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন? ঋষিদের আর একটি অস্বাভাবিক আচরণের সম্মুখীন হই যখন দেখি ঋষিরা বিনা কারণে নিরাপরাধা সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র অভিশাপ দিতে উদ্যত হন। সত্যই কি রামচন্দ্র সীতাকে বিনা কারণে নির্বাসন দিয়েছিলেন? প্রজানুরঞ্জক রাজা রাম প্রজাদের সীতার চরিত্রের সন্দেহ নিরসনের জন্য সীতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। এই আচরণের দ্বারা রামের প্রজাদের প্রতি ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে এবং এর দ্বারা রামের প্রজানুরঞ্জক আখ্যা সার্থক হয়েছে। তাই বিনা কারণে রাম সীতাকে নির্বাসন দেননি। তাই মনে হয় সীতার সতীত্ব পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সোমদেব ভট্ট যে ঘটনা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন তা যেমনই অশোভন, তেমনই অস্বাভাবিক।

কথাসাহিত্যে যে দুটি রামকাহিনী পাই তার মধ্যে সংঘদাসের রচনা জৈন ভাবধারায় রচিত। কিন্তু এখানে অধিকাংশ কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণের অনুকরণে

বিবৃত আছে। কেবল অন্যান্য জৈন্য রামায়ণের মতো এখানে উল্লিখিত আছে যে লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণ-বধ হয়েছিল। জৈন রামায়ণকারের মতে রাম অহিংসার পূজারী। সমস্ত হিংসার কাজ লক্ষ্মণ করেছে। সেইজন্য তিনি নরকে গিয়েছিলেন, পরে তিনি মুক্তি পান। রাম জন্মেছিলেন রাবণ বধের জন্য। সেই রাম দ্বারা যদি রাবণবধ না হয় তবে রামায়ণের সার্থকতা কি? তাই মনে হয় জৈন রামায়ণকারেরা রামায়ণের সার্থক রূপ দান করেননি। তাঁদের রামায়ণ রামায়ণের একটি বিকৃত রূপ ছাড়া কিছুই ভাবা যায় না।

চম্পূ রামায়ণ[১] :—

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাম-বিষয়ক এক বিস্তৃত চম্পূসাহিত্য দৃষ্ট হয়। একাদশ শতাব্দীর রাজা ভোজ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রচলিত রাম-বিষয়ক চম্পূর রচয়িতা। যুদ্ধকাণ্ডের শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে, প্রথম পাঁচটি কাণ্ড ভোজ দ্বারা এবং ষষ্ঠ কাণ্ড গঙ্গাধর ও গঙ্গাম্বিকার পুত্র লক্ষ্মণ দ্বারা রচিত :—

> "প্রাগ্ ভোজোদিত পঞ্চকাণ্ড বিহাতানন্দে পুনঃ
> কাণ্ড লক্ষ্মণসূরিণাবিরচিত ষষ্ঠাঽপিজীয়াচ্চিরম্ ॥" ৬।১১০

এখানে লেখকের কোনও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সমস্ত রচনা বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণে রচিত। বালকাণ্ডে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর দশরথের পুত্রাদির জন্ম। বিশ্বামিত্রর সঙ্গে রামের গমন, রাম-সীতার বিবাহ ও পরশুরামের তেজোভঙ্গ বর্ণিত। তৃতীয় কাণ্ডের বিষয়বস্তু রামের গমনের পর দশরথের মৃত্যু। এক্ষণে ভরতের স্বার্থশূন্য ভাবে রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যশাসনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত। অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরণ ও রামের শোক বর্ণিত। সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত বিষয়গুলি হল সীতা-হনুমান সংবাদ ও লঙ্কাদহন। ভোজের রচনার এখানেই সমাপ্তি। এরপর রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাবণ-বধ ও রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ঘটনাগুলি লক্ষ্মণসূরি যুদ্ধকাণ্ডে বর্ণনা করেন।

এখানে বর্ণিত রামকাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণের অনুরূপ হলেও এই রামায়ণে রামায়ণ-বহির্ভূত কিছু কিছু ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন—

১) অয়োমুখীর বিরূপীকরণ (পৃ. ২৫০)
২) লঙ্কাদেবী-হনুমান সংবাদ (পৃ. ৩২১)
৩) বিভীষণ-কন্যা অনলার কথা (পৃ. ৩৪২)
৪) সুগ্রীব-রাবণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ (পৃ. ৫৮৪)

১ চম্পূ রামায়ণ—চৌখাম্বাবিদ্যাভবন সংস্করণ, ১৯৫৬

দুরূহ গদ্যাংশ এবং মামুলী ছাঁদে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারের জন্য রচনাটি পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়নি। কিন্তু স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর শ্লোক পাঠককে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়। যেমন :—

"কল্যাণবাদ সুখিতাং সবসৈব কান্তাং
কান্তারচার কথয়া কুলুষীচকার।
অম্ভোদনাদমুদিতাং বিপিনে ময়ূরীং
সন্ত্রাসান্নিব ধনুর্ধ্বনিনা পুলিন্দঃ॥" ২।৩১

"রাম সীতাকে বনগমন-এর সংবাদ দিয়ে হতাশ করলেন, যে সীতা রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য আনন্দসাগরে ভাসছিলেন। যেমনভাবে শিকারী তার ধনুষ্টংকারে ময়ূরীকে ভয়ে ভীত করে, যে ময়ূরী ব্রজদীপ্ত আকাশ দেখে আনন্দিত হয়েছিল।" ঋষি অগস্ত্যর বর্ণনায় কবি বলেছেন :—

"প্রভামিবার্কী তমসাং নিহন্ত্রীম্
ব্রহ্মীং দধানং নিয়মেন লক্ষ্মীম্।
তপনিধিং সোর্যনিধিঃ প্রসন্নঃ।
স্বনাম সংকীর্ত্য ননাম রামঃ॥" ৩।১২

"আনন্দিত এবং নির্ভীক রাম ঋষির নাম উচ্চারণ করে ঋষির চরণে পতিত হলেন, সেই ঋষি যিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়ে সূর্যকিরণে দূরীভূত অন্ধকারের মতো তাঁর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছিলেন।"

চম্পূ-রামায়ণে বর্ণিত রামকাহিনীতে বিশেষ কোনও মৌলিকতা আমরা লক্ষ্য করি না। সমস্ত কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণে রচিত। যে কয়টি মৌলিক ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে তা এতই অনাবশ্যক যে সেগুলির দ্বারা মূলকাহিনী প্রভাবান্বিত হয়নি। সুতরাং সেগুলিকে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক ঘটনা বলা যায় না।

নাটক*

১। প্রতিমা-ভাস (সম্পাদনা · টি. গণপতি শাস্ত্রী, ১৯১৫)

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকাবলীর মধ্যে ভাসের নামে প্রচলিত সপ্তাঙ্ক প্রতিমা নাটকের নাম প্রথমেই উল্লেখনীয়। নাটকের বিষয়বস্তুর পরিধি রামের বনবাস থেকে আরম্ভ করে চৌদ্দ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষণীয় যে কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ডের ঘটনাগুলি বিশেষভাবে এই নাটকে উল্লিখিত নয়। নাটকের অভিনব পরিকল্পনার জন্য রামায়ণ-কাহিনী বিশেষভাবে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে দেখা যায় রামের অভিষেক উৎসবে কৈকেয়ী দশরথের কাছে ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনা ও রামচন্দ্রের চৌদ্দ বৎসর বনগমন এই দুটি বর প্রার্থনা করলেন। এই অঙ্কে নাট্যকারের বল্কল-সম্পর্কিত ঘটনার উদ্‌ভাবন আমাদের সেই প্রবাদ বাক্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে বর্তমানকালেই ভাবী ঘটনার পূর্বগামিনী ছায়া পড়ে। রামের অভিষেকের আগে সীতা নিছক কৌতুকের জন্য তাঁর দাসী-কর্তৃক রঙ্গালয় থেকে আনীত বল্কলের পোশাক পরেন। এই ঘটনা যেন বল্কল-পরিহিত অবস্থায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার আসন্ন বনযাত্রার পূর্বসংকেত। অভিষেক বন্ধ হওয়ার কথা রামের নিকট শুনে সীতা বুঝতে পারেন, যে বল্কলের পোশাক তিনি কেবল কৌতুকের বশেই পরেছিলেন তার গূঢ় তাৎপর্য কী।

দ্বিতীয় অঙ্কে দশরথের বিলাপ ও মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকারের লেখনীতে এই বিয়োগান্ত দৃশ্যের করুণ রস সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

তৃতীয় অঙ্কে প্রতিমা-গৃহের ঘটনা বর্ণিত। এই অঙ্কে প্রকৃতপক্ষে নাটকের নামকরণের সার্থকতা পাওয়া যায়। এই অঙ্কেই নাট্যকারের অত্যাশ্চর্য সৃজনীশক্তি এবং ঘটনাবিন্যাসের অপূর্ব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরত পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় ফিরছেন। ঘটনার গুরুত্ব এই যে সারথি অযোধ্যায় সব দুঃসংবাদের খবর জেনেও ভরতের জিজ্ঞাসায় কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিচ্ছে না। আসলে ভরতকে আনা হচ্ছে

* সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের তুলনামূলক এই আলোচনায় ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় রচিত 'সংস্কৃত নাটকে রামায়ণের প্রভাব' গবেষণাগ্রন্থটি আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

রাজ্যাভিষেকের জন্য। সারথির গোপনীয় সংবাদ অত্যন্ত নৈপুণ্য সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নাটকীয়ভাবে তা রাজকুমারের প্রতিমা-গৃহে প্রবেশের মুখে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই প্রতিমা-গৃহে ইক্ষাকুবংশের মৃত রাজাদের যেমন রঘু, দিলীপ, অজ এবং দশরথের মূর্তি রক্ষিত আছে। দশরথের মূর্তি সেখানে দেখে রাজকুমার দেহমনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি পিতার মূর্তির বিষয় কিছুই জানতে চান না, কিন্তু মন্দিররক্ষক সমস্ত রহস্যের আবরণ উন্মোচন করেন। ভরত সমস্ত ঘটনা শুনে জননীকে তিরস্কার করে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে গমন করেন।

চতুর্থ অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় রাম-ভরত সাক্ষাৎকার। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। রামচন্দ্র তা অস্বীকার করে ভরতকেই অযোধ্যায় রাজা হতে বললেন। তিনি বললেন, দুটি শর্তে রাজা হতে পারেন, এক, চোদ্দ বৎসর পর ফিরে রামকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে হবে এবং দুই, তিনি রামের পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে রামের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। রাম তাতে স্বীকৃত হলেন এবং ভরত ও সুমন্ত্র অযোধ্যায় ফিরে এলেন। এই অঙ্কে নাট্যকার ভরত চরিত্রের মহত্ব সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছেন।

পঞ্চম অঙ্কের ঘটনাস্থল জনস্থানে রাম আশ্রম। রাম-সীতা দশরথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করছেন। এমন সময় সেখানে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাবণ প্রবেশ করে। সেই সন্ন্যাসী তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানে রামকে মুগ্ধ করে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথা উঠলে সন্ন্যাসী রামকে অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে একটি কাঞ্চন বর্ণ মৃগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শুনেই রাম স্বর্ণমৃগ আনতে উদ্যত হন। এমন সময় আশ্রমের নিকটেই একটি স্বর্ণমৃগের দেখা পেয়ে রাম মৃগটি আনার জন্য সীতাকে একা আশ্রমে রেখে গেলেন। সুযোগ বুঝে রাবণ স্বমূর্তি ধারণ করে সীতাকে হরণ করে। এই ঘটনায় লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক—সমস্ত ষষ্ঠ অঙ্কটির পরিকল্পনা অভিনব। সুমন্ত্রর নিকট সীতা-হরণের সংবাদ শুনে ভরত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত দুঃখকষ্টের জন্য মাতা কৈকেয়ীকে দায়ী করে। কৈকেয়ী উপযুক্ত সময় বুঝে এইবার পুত্রের নিকট সমস্ত ঘটনার রহস্যভেদ করলেন। সিন্ধুবধজনিত পুত্রহারা অন্ধমুনির অভিশাপ বর্ণনা করে কৈকেয়ী জানালেন যে ঋষিশাপকে সত্যে পরিণত করার জন্য এবং একমাত্র রাম বনে গেলেই ঋষিবাক্য সত্যে পরিণত হতে পারে এই ভেবে, বশিষ্ঠ ও বামদেবের অনুমতি নিয়ে এবং সুমন্ত্রের জ্ঞাতসারে তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারও কোনও ক্ষতি না করে তিনি সমস্ত দোষ নিজে গ্রহণ করেছেন শুধু ঋষিবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদনের জন্য। ভরত এই কথা শুনে মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাবণের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে অভিযানে গেলেন।

সপ্তম অঙ্কে রাবণবধের পর জনস্থানে রামের আশ্রমে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার সহিত মাতৃগণ সহ অন্যান্যদের মিলন ও রামের অভিষেক এবং কৈকেয়ীর আদেশে সকলের অযোধ্যায় যাত্রা বর্ণিত।

বিষয়বস্তুর পর্যালোচনায় দেখা যায় এই নাটকের কাহিনী বাল্মীকি-রামায়ণ কাহিনী থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। যেমন—

১) বল্কল ঘটনার উপস্থাপন।

২) ভরতকে ছল করে অযোধ্যায় আনয়ন ও প্রতিমা-গৃহে পিতার মৃত্যু ও রামের বনবাসের কথা জানানো।

৩) রাবণের সন্ন্যাসীর বেশে আগমন ও স্বর্ণমৃগ আনয়নের উদ্দেশ্যে রামকে দূরে পাঠিয়ে সীতাহরণ।

৪) সীতাহরণের ঘটনায় সর্বত্র লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি।

৫) সুমন্ত্রের নিকট সীতাহরণের সংবাদ পেয়ে ভরতের সৈন্য নিয়ে রাবণের বিরুদ্ধে অভিযান।

৬) কৈকেয়ী চরিত্র নূতনভাবে উপস্থাপন।

৭) রামের আশ্রমে সকলের উপস্থিতি ও রামের অভিষেক।

রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক কাহিনী এই নাটকে স্থান পেলেও এই নাটকের উপর রামায়ণের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। এই নাটকের স্থানে স্থানে রামায়ণের ভাব ও ভাষা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন :—

১) "যদি ন সহসে রাজ্ঞো মোহং ধনুঃ স্পৃশ মা দয়া।
স্বজন নিভৃতঃ সর্বোঽপ্যেবং মৃদুঃ পরিভূয়তে॥ —প্রতিমা। ১ম অঙ্ক
ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে॥"—রামায়ণ। অযোধ্যা, ২১।১১

২) "অঙ্গং মে স্পৃশ কৌশল্যে, ন ত্বাং পশ্যামি চক্ষুষা।
রামং প্রতি গতা বুদ্ধিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে॥ —প্রতিমা। ২য় অঙ্ক
ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ।
রামং মেহনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ত্ততে॥"—রামায়ণ। অযোধ্যা, ৪২।৩৪

নাটকটিকে বিচার করতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয়, এই নাটকের নাটকীয় পরিকল্পনার মূলে রয়েছে কৈকেয়ীর চরিত্রকে নবরূপে উপস্থাপন। মনে হয় বাল্মীকি-রূপায়িত কৈকেয়ীর চরিত্র নাট্যকারের মনঃপূত হয়নি, তাই তিনি কৈকেয়ীকে নব-

রূপে রূপায়িত করেছেন। রামায়ণের কৈকেয়ী ভাবাবেগপ্রবণ, জেদী, স্বার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন ও নিষ্ঠুর কিন্তু এখানে নাট্যকার কৈকেয়ীকে সর্বগুণান্বিতা মহীয়সী নারীরূপে কল্পনা করেছেন এবং এই নারীচরিত্রের সাহায্যে নাট্যকার ঋষিবাক্যকে সত্যে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ঋষির বিধানকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা যেমনই অবাস্তব তেমনই অস্বাভাবিক। নারী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে, পুত্রের প্রতি তার মমতা বোধ থাকবে, সমস্ত পরিজনের কাছে সে আদরণীয়া ও মাননীয়া হবে, সবার প্রতি তার মমত্ববোধ ও সহানুভূতি থাকবে এটাই কাম্য। এবং এটা ঋষিবাক্যও বটে। কিন্তু যে নারী অদৃষ্টবাদকে সত্যে পরিণত করার ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য, নিষ্ঠুর নিয়তির সহায়তা করার জন্য স্বামীর মৃত্যুতেও বিচলিত হবে না, পুত্রের কটূক্তি ও সর্বসাধারণের ঘৃণা যার মনে কোনও রেখাপাত করবে না, সেই নারীকে কি আমরা সুস্থ ও স্বাভাবিক বলব, না এক অস্বাভাবিক মনের মূর্ত প্রতীক বলে অভিহিত করব? যে নারী যে-কোন কারণেই হোক-না কেন তার স্বাভাবিক কুসুম কোমল মনোবৃত্তি বিসর্জন দেয়, যে নারী সবার ঘৃণা কুড়িয়ে অবিচলিত ধৈর্যে তার আশু পরিণাম সম্বন্ধে নির্বিকার থাকে, তাঁকে আর যা বলা যাক কখনই বরণীয়া, মাননীয়া বলা যায় না। জীবনরহস্য সম্বন্ধে নাট্যকারের যথাযথ ধারণার অভাবের জন্য যে কথা কৈকেয়ীর জানার কথা নয় সেকথাও তিনি জানতে পেরেছেন। রামায়ণে আছে দশরথের শাপের কথা কৈকেয়ী জানতেন না। রামের বনগমনের পর শোকসন্তপ্ত রাজা যখন কৌশল্যার গৃহে যান, তখন কৌশল্যার তিরস্কারে তিনি অন্ধমুনির অভিশাপের কথা বলেন। কাজেই কৈকেয়ীর একথা পূর্বে জানার কথা নয়। কিন্তু এই নাটকে অস্বাভাবিক উপায়ে কৈকেয়ী সেটা জানতে পেরেছেন।

নাটকের কাহিনী নূতনভাবে উপস্থাপনের ফলে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রামায়ণের কবির দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পার্থক্য ঘটেছে। রামায়ণের কাহিনীতে দৈবের প্রাধান্য দেখা যায়। মানুষ যে কত অসহায়, কত অক্ষম এবং তার বিধিলিপি যে কিভাবে তার সমস্ত পরিকল্পনা, তার সমস্ত শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে তার এক সকরুণ চিত্র রামায়ণে দেখা যায়। কিন্তু রামায়ণের কবি কর্মকে কখনও ছোট করে দেখেননি। বরং তিনি মানুষের কর্মকে তার অদৃষ্টের সঙ্গে এক সূত্রে বেঁধে উভয়ের সঙ্গে এক মনোরম যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। কিন্তু প্রতিমা নাটকের নাট্যকারের জীবনের গতি প্রকৃতির দৃশ্য সম্বন্ধে ধারণা রামায়ণের কবির ধারণা থেকে শুধু ভিন্ন নয়, অস্বাভাবিকও বটে। নাট্যকারের মানবজীবনে কর্মের প্রাধান্য বেশি। তাই দেখি মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া যেন অদৃষ্ট ফল দান করিতে পারে না।

রামায়ণে দেখি দৈব ও পুরুষকারের সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। কিন্তু এই নাটকে এই মিলন লক্ষ্য করা যায় না। নাট্যকারের জীবনদর্শনে দৈবের স্থান সুনির্দিষ্ট। মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় দৈব পরিণতি লাভ করে। জীবনের গতিপথের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাবে প্রতিমা নাটকে যে জীবনের অস্বাভাবিক রূপ-রেখা আমরা দেখি তাতে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের নিতান্তই অভাব প্রতিভাত হয় এবং ফলে নাটকটি তেমন রসোজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

এই নাটকের কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করলেও নাটকের দোষত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে। নাটকের মূলচরিত্রটি তিনটি—রাম, ভরত ও কৈকেয়ী। রামের চরিত্র এখানে যেন একটি ছন্দোহীন ত্রুটিমুক্ত চরিত্র। মানবের চরিত্র নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। মানবের চরিত্রে নানা দোষগুণের প্রকাশও আমরা দেখি। নাটকে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের বিকাশই আকর্ষণীয় কিন্তু রামচরিত্রের এইরূপ পরিণতি এখানে দেখি না। রাম যেন সব কিছুতেই নির্বিকার, যে-কোন ঘটনার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁর চিত্তের ভাবের পরিবর্তন আমরা কোন কিছুতেই দেখি না। অভিষেক বন্ধ হওয়ার কথা রামচন্দ্র অতি নির্বিকার চিত্তে সীতার নিকট বর্ণনা করছেন এবং এই কথা বর্ণনা করেই অন্য লঘু প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তাঁর মনের ভাবের পরিবর্তন তাঁর বর্ণনায় বা তাঁর আকৃতি প্রকৃতিতে প্রতিভাত হল না। অনুরূপ ক্ষেত্রে বাল্মীকি রামের মনের ভাব-বৈক্লব্য প্রদর্শন করতে বিস্মৃত হননি। নিভৃতে নিজকক্ষে সীতার সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর আকৃতি ও ভাষণে অন্তরের নিদারুণ ব্যথা বেদনা তিনি গোপন করেননি। সীতা যখন সানন্দে রামের জন্য অপেক্ষা করেছেন এমন সময়—

"প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্।
প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ॥
অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চতং পতিম্।
অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তা-ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্॥
তাং দৃষ্টা সহি ধর্ম্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্।
তং শোকং রাঘবঃ সোঢ়ুম ততো বিবৃততাংগত॥"

(অ. ২৬। ৫. ৭)

অর্থাৎ "রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হয়ে আনন্দিতজনগণেপূর্ণ সুশোভিত নিজভবনে প্রবেশ করলেন, রামকে সমাগত দেখে সীতা সত্বর তাঁর নিকটে গমন করলেন এবং নিজ পতিকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তাবিমূঢ় দেখে কাঁপতে লাগলেন।

ধর্মাত্মা রাম সীতাকে দেখে মনোগত শোক গোপন করতে পারলেন না, তা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।"

কিন্তু প্রতিমা নাটকের রাম সুখে দুঃখে এমনই উদাসীন যে এতবড় দুর্ঘটনা যেন কিছুই নয় এমনভাব প্রকাশ করে বলছেন—

'শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ গৃহীত ঘটেঽভিষেকে।
ছত্রে স্বয়ং নৃপতিনারুদতা গৃহীতে॥
সদভ্রান্তয়া কিমপি মন্থরয়া চ কর্ণে।
রাজ্ঞঃ শনৈরভিহিতং ন চাস্মি রাজা॥' (অ-১ ॥ ৭)

অর্থাৎ "তারপর শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ ঘট ধরে দাঁড়াল, মহারাজ ধরে রইলেন রাজছত্র। অভিষেক শুরু হতে যাবে এমন সময় মন্থরা মহারাজের কানে কানে কী যেন বললেন আর আমিও রাজা হলাম না।"

রামায়ণের রামের সঙ্গে এই নাটকের রামের আর এক দিকে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণের রাম নানা সংকটময় মুহূর্তে অবিচলিত থেকে তাঁর সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, অসাধারণ দৃঢ়তা ও বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। বনগমন, সীতাহরণ, অগ্নিপরীক্ষা, সীতা নির্বাসন, লক্ষ্মণ বর্জন প্রভৃতি তার প্রমাণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাল্মীকি রাম চরিত্রের আর একটি শোভনীয় মানবিক দুর্বলতার দিকও আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাই সীতা হরণের পর রামচন্দ্র "শোক রক্তেক্ষণঃ শ্রীমান্ উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।" তাই লক্ষ্মণের শক্তিশেলের পর তাঁকে কেঁদে বলতে শুনি—

"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥" (ল. -১০২ ॥১৪)

কিন্তু প্রতিমা নাটকের রামের মধ্যে এইরূপ কোন মানবীয় আবেগ নেই। আছে কেবল শুষ্ক কর্তব্যনিষ্ঠা ও সুগভীর গুরুভক্তি।

পঞ্চম অঙ্ক সীতাহরণের ঘটনা সংস্থাপনে যে ত্রুটি ও চরিত্র সৃষ্টিতে যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তা মনকে পীড়িত করে। এখানে একটি বিচিত্র পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাবণের মাধ্যমে রামকে এক হাস্যকর প্রতারণার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নাট্যকার নায়ক চরিত্রে অস্বাভাবিকতা ও লঘুতা এনেছেন। নায়কচরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা দেখানোর অত্যধিক আগ্রহে নাট্যকার ঘটনা ও চরিত্রের স্বাভাবিকতার প্রতি দৃষ্টি দেননি।

কৈকেয়ী চরিত্র নূতন ভাবে সংস্থাপন যে অশোভন অস্বাভাবিকতা নাট্যকার দেখিয়েছেন আমরা তা আগেই আলোচনা করেছি।

কিন্তু ভরত চরিত্র-কল্পনায় নাট্যকার রামায়ণেরই অনুসরণ করেছেন। ভরতের

কর্তব্যনিষ্ঠা, ভ্রাতৃভক্তি, মাতার প্রতি বিরাগ সবই মূল রামায়ণের অনুসরণে বিবৃত। কিন্তু তথাপি নাট্যকার ভরত চরিত্রের কয়েকটি নূতনত্ব উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, নাটকে ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নের কোনও সংযোগ নেই। রামায়ণে শত্রুঘ্ন ভরতকে উত্তেজিত হতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু ভরত-চরিত্রকে এককভাবে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে এখানে ভরত একাকী এই কার্য করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভরতের বারংবার মূর্ছা ও তৃতীয়তঃ, মাতার প্রতি ব্যবহার ও বাক্যে ভরতের শালীনতাবোধ ও সংযম প্রদর্শন রামায়ণ-বহির্ভূত। পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে এবং সীতাহরণ সংবাদ শ্রবণে ভরতের মূর্ছা রামায়ণে উল্লিখিত নয়। রামায়ণে ভরত মাতা কৈকেয়ীর অন্যায় কার্য দেখে মাতাকে 'পাপদির্শিনি', 'পাপ নিশ্চয়ে নৃশংসে', 'দুষ্টচারিণী' ইত্যাদি সম্বোধনে যে তীব্র শ্লেষ বাক্য বলেছিলেন, এই নাটকে অনুরূপ ক্ষেত্রে ভরতের বাক্যে সেই ক্ষুব্ধ শ্লেষের উল্লেখ নেই। বরং ভরতের বাক্যে শালীনতা-বোধ ও সংযমের পরিচয় আছে। এতে ভরত-চরিত্রের একটি সমুন্নত চিত্র আমরা পাই সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্য যে ভরত-চরিত্রের স্বাভাবিকতা এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ভরত শিষ্টাচার রক্ষার আগ্রহাতিশয্যে 'প্রতিমা' নাটকে একটি কৃত্রিম মানুষে পরিণত হয়েছেন।

পরিশেষে, এই নাটক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নাটকে নাট্যকারের যথা করণীয় কাজ এখানে করা হয়নি। নাট্যকারের কাজ কাহিনীকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় গতি ও পরিণতি দান করা। সংঘাত ও গতিই নাটকের জীবন। 'প্রতিমা' নাটক যে রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি তার কারণ হল যে নাটকের পরিকল্পনায় নাটকের গতি ও সংঘাতের অভাব। এই নাটকে নানা সংঘাত ও পরস্পরসম্বন্ধীয় ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতিতে নাটককে প্রাণবান করে তোলা হয়নি। বস্তুত কাহিনীর শিথিল বন্ধন, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পরিত্যাগ, অনাবশ্যক ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ, প্রভৃতি কারণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সীতাহরণের পর রাম-সুগ্রীব মৈত্রীকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সীতাহরণ ঘটনা বর্ণনায় সে রসস্ফূর্তির অবকাশ ছিল তারও সদ্ব্যবহার করা হয়নি। জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধবর্ণনা বিশদ্‌ভাবে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। রাবণ বধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গৌণ সংলাপের মাধ্যমে পরোক্ষে বর্ণনা অনুচিত হয়েছে। নাটকের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক—ঘটনাবলীর অপরিহার্যতা ও ক্রমিক পরিণাম—সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিই উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে নাটকটিও পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হয়নি।

২। অভিষেক। ভাস (সম্পাদনা: টি. গণপতি শাস্ত্রী, ১৯৬৩)
রামকর্তৃক বালী বধের পর সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক থেকে আরম্ভ করে চোদ্দ বৎসর পরে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাহিনী মহাকবি ভাসের দ্বিতীয় নাটক 'অভিষেকে'র বিষয়বস্তু। ভাসের 'প্রতিমা' নাটকে রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক ঘটনা উল্লিখিত হলেও 'অভিষেক' নাটকে রামায়ণ-বর্ণিত কয়েকটি ঘটনার পরিবর্তন এবং কয়েকটি ঘটনাবর্জন ব্যতীত সমস্ত নাটকটি বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসরণে রচিত। সুগ্রীব, বিভীষণ এবং রামের অভিষেক এই নাটকে বর্ণিত বলে নাটকটির নামকরণ হয়েছে 'অভিষেক'।

নাটকের প্রারম্ভেই বালীর প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। রামমিত্র সুগ্রীবকে রাজ্যদান করার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বালীকে প্রচ্ছন্নভাবে বধ করেন। কিন্তু রামের এই কার্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি। যদিও রাম বলেছিলেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে বলপূর্বক গ্রহণের জন্য তিনি বালীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং যদিও শেষে বালী বলেছিলেন যে রামের হাতে মৃত্যু বরণ করে সে পাপমুক্ত হয়েছে, তথাপি রামের কাজটি যে যথোপযুক্ত সে কথা আমরা মনে করতে পারি না।

দ্বিতীয়াঙ্কে, হনুমান-সীতা সংবাদ রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে রচিত।

তৃতীয় অঙ্কে, হনুমান-কর্তৃক অশোকবন ধ্বংস, মেঘনাদ-কর্তৃক হনুমানকে বন্দীকরণ, রাবণ-হনুমান সংবাদ, লঙ্কাদাহ ও রাবণ-কর্তৃক বিভীষণ ত্যাগ বর্ণিত।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই রাম-বিভীষণ মিলন। সমুদ্রবন্ধনের জন্য রাম সমুদ্রের প্রতি দিব্যাস্ত্রক্ষেপণে উদ্যত হলে বরুণ আবির্ভূত হন এবং সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করে রামাদির লঙ্কা গমনের পথ করে দেন। তারপর বানররূপধারী শুক সারণকে সেনাপতি নীল বন্দী করে আনলে, বিভীষণ গুপ্তচর বৃত্তি জন্য তাদের শাস্তির প্রস্তাব করলে রাম তাদের শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন।

পঞ্চম অঙ্কে রাবণ-সীতা সংবাদ—জনৈক রাক্ষস-কর্তৃক মায়া রাম-লক্ষ্মণের ছিন্ন মুণ্ড প্রদর্শন করলে সীতার শোক বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দূত এসে মেঘনাদবধের সংবাদ দিলে রাবণ মূর্ছিত হয়। পরে যুদ্ধে যাত্রায় উদ্যত হয়। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সমস্ত অনর্থের মূল সীতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু দূত দ্বারা প্রতি-নিবৃত্ত হয়ে রাবণ যুদ্ধযাত্রা করে।

ষষ্ঠ অঙ্কে, বিদ্যাধরগণের সংলাপে রাম-কর্তৃক রাবণ-বধ বর্ণিত। অতঃপর রাম রিপুগৃহে বাসের জন্য সীতাকে দেখতে অনিচ্ছুক হলে, সীতা রামের এই মনোভাবের কথা জানতে পেরে অগ্নিপ্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ

সীতার অগ্নিপ্রবেশের ব্যবস্থা করলে সীতা অগ্নিপ্রবেশ করেন এবং অগ্নি স্বয়ং সীতাকে এনে রামের হাতে দেন। অতঃপর রামের রাজ্যাভিষেক ও নাটকের সমাপ্তি।

নাটকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকটি মূল রামায়ণের অনুসরণ করলেও নাটকীয় প্রয়োজনে নাট্যকার রামায়ণ-কাহিনীর পরিবর্তন করেছেন। যেমন :—

১) নাটকে রাম বালীবধ করেছিলেন হনুমানের অনুরোধে সুগ্রীবকে রক্ষা করার জন্য। রামায়ণে রাম বালীর প্রতি শরনিক্ষেপ করেছিলেন পরাজিত সুগ্রীবের কাতর অনুনয়ে।

২) রামায়ণে দেখি, বালী যুদ্ধের পূর্বেই রামের বিষয় অবগত ছিল কিন্তু নাটকে আছে বালী তার প্রতি নিক্ষিপ্ত রামের নামাঙ্কিত শর দেখে রামকে চিনতে পারে।

৩) রামায়ণে তারার দীর্ঘ করুণ বিলাপ আছে। কিন্তু নাটকে বালী তার পতনের পর তারাকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে।

৪) বালীবধে পুত্র অঙ্গদের করুণ বিলাপ নাটকের নূতন সংযোজন।

৫) ভ্রাতৃবধূগমনের জন্য তার কেন শাস্তি হল, সুগ্রীবের কেন হল না—বালীর রামকে এই প্রশ্ন নাটকে নূতন সৃষ্টি।

৬) নাটকে আছে, হনুমান অশোক বনে সীতাকে দেখে প্রথমে তাঁকে চিনতে পারেনি, রাবণ-সীতার আলাপে চিনতে পারে। কিন্তু রামায়ণে আছে রাবণ-সীতা সংলাপের পূর্বে হনুমান সীতাকে চিনতে পারে।

৭) নাটকে দেখি রামচন্দ্র সাগরের উদ্দেশ্যে বাণ নিক্ষেপে উদ্যত হলে, বরুণ আবির্ভূত হয়ে সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করে রামকে পথদান করেন—রামায়ণে এরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই।

৮) নাটকে দেখি, বিভীষণ রাক্ষসকুলকে উদ্ধার করার জন্য রাম পক্ষে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু রামায়ণে বিভীষণের এরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

৯) নাটকে রামায়ণে উল্লিখিত দুইবারের পরিবর্তে রাবণ-কর্তৃক একবার দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে।

এই নাটকে উল্লিখিত কাহিনীর সহিত 'প্রতিমা' নাটকের কাহিনীর বিচার করলে মনে হয় যেন নাটক দুটি পরস্পরের পরিপূরক। 'প্রতিমা' নাটক রচনা করে নাট্যকার হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে এই নাটকে প্রয়োজনীয় ঘটনাবলী, যেমন, রাম-সুগ্রীব মিলন ও রাবণের ঘটনাবলী যথোচিত গুরুত্ব লাভ করেনি। নাট্যকার

সেই দোষ দূর করার জন্য যেন এই নাটক রচনা করেছেন। 'প্রতিমা' নাটক অযোধ্যাকাণ্ড থেকে আরম্ভ করে লঙ্কাকাণ্ডে শেষ হয়েছে। কিন্তু 'প্রতিমা' নাটকে কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডকে যথোচিত স্থান দেওয়া হয়নি। 'অভিষেক' নাটকে নাট্যকার এই তিন কাণ্ডের বিষয়গুলিকে স্থান দিয়ে যেন এই অপূর্ণতা দূর করার চেষ্টা করেছেন।

নাটকীয় প্রয়োজনে রামায়ণ-কাহিনীর পরিবর্তন ঘটলেও এই নাটকে রামায়ণের প্রভাব যে ব্যাপক ও গভীর তা দেখা যায়, যেমন :—

১। ক) সুগ্রীবঃ। দেব অহং খল্বার্য্যস্য প্রসাদাদ্ দেবানামপি
রাজ্যমাশঙ্কে। কিং পুনর্ব্বানরানাম ?

—'অভিষেক', ১ম অঙ্ক, ৫

খ) শকং খলু ভবেদ্ রাম সহায়েন ত্বয়ানঘ।
সুররাজ্যমভিপ্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো॥

—'বাল্মীকি-রামায়ণ', কিষ্কিন্ধ্যা, ৮।৩

২। ক) রাবণ। এষা সীতা পাদপ মূলা শ্রিত্য ধ্যান্যসংবীত হৃদয়ান
শনক্ষামবদনা স্বদেহমিব প্রবেষ্টুকামা সংগূঢ়স্তনোদরী
দুর্দ্দিনান্তর্গতা চন্দ্রলেখব রাক্ষসীগণ পরিবৃতোপবিষ্টা॥

—'অভিষেক', ২য় অঙ্ক, ১১

খ) ততো দৃষ্ট্বৈব বৈদেহী রাবণং রাক্ষসাধিপম্।
প্রাবেপত বরারোহা প্রবাতে কদলী যথা॥
উরুভ্যামুদরং ছদ্য বাহুভ্যাং চ পয়োধরৌ।
উপবিষ্টা বিশালাক্ষী রুদতী বরবর্ণিনী॥

—'রামায়ণ', সুন্দরকাণ্ড, ১৯।২৩

৩। ক) সীতা। হস্সখু রাবণও। যো ব অণগদ সিদ্ধিং বিণ জাণাতি।

—'অভিষেক' ২য় অঙ্ক, ১৫

খ) হই সন্তো ন বা সন্তি যতো বা নানুবর্ত্তসে।
যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচার বর্জিতা॥

—'রামায়ণ', সুন্দরকাণ্ড, ২১।১

উপরোক্ত আলোচনায় নাটকের কাহিনীর উপর রামায়ণের প্রভাব যে কত গভীর, কত ব্যাপক তা বোঝা যায়। নাটকে রামায়ণ-কাহিনী থেকে এই নাটকে

যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেই পরিবর্তনের কি ফল হয়েছে তা এখন আমরা বিচার করব।

প্রথম পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি বালীবধ ঘটনার বিবৃতি প্রসঙ্গে। রামায়ণে যে বাণে রাম বালীবধ করেছিলেন তা সাধারণ বাণ নয়। সে বাণ মন্ত্রপূত দিব্যাস্ত্র। দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে বালীবধ হওয়ায় বালীর তেজস্বিতা ও বীর্য যেমন সূচিত হয়েছে, রামচন্দ্রের বীরত্বও তেমনি প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের বাণ রাম-নামাঙ্কিত লৌকিক বাণ। সামান্য লৌকিক বাণে বালীর মতো বীরের নিধন সাধন যোদ্ধা চরিত্রকে বীরত্বে ও শৌর্যে মণ্ডিত করে না এবং যিনি বাণ প্রয়োগ করেছেন তাঁরও বীরত্ব এখানে পরিস্ফুট হয়নি।

রামায়ণে আছে, তারা রাম-সুগ্রীব মৈত্রীর সংবাদ বালীকে দিয়েছিল। এখানে নাট্যকার রাম-সুগ্রীব মৈত্রীর সংবাদ রাম-নামাঙ্কিত বাণের দ্বারা দেখিয়েছেন। ফলে তারা-চরিত্রটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। রামায়ণে তারা-চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা আরও একটি কারণে দেখা যায়। সুগ্রীবকে প্রতিজ্ঞাপালন কর্মে উপদেশ ও অনুপ্রেরণা দান করে এবং লক্ষ্মণের ক্রোধাগ্নি থেকে তাকে রক্ষা করে তারা মূল ঘটনার অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে। তাছাড়া স্ত্রী চরিত্রের সার্বজনীন মূর্তি হিসেবে তারা-চরিত্রের সার্থকতা আছে। রামায়ণে তারার করুণ বিলাপের মধ্য দিয়ে বালীবধ দৃশ্যের করুণরসকে ঘনীভূত করার চেষ্টা দেখি। বালীর পতনের পর তারার আগমন ও বিলাপের মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির যে প্রচুর অবকাশ ছিল বালীবধের পর তারার অনুপস্থিতিতে তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বস্তুবিন্যাসে শেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সীতার অগ্নিশুদ্ধি ব্যাপার। নাটকে এই ব্যাপারটির বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে :—

রাবণবধের পর এবং বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করার পর লক্ষ্মণ এসে রামকে সংবাদ দিলেন যে সীতা স্বয়ং রামসমীপে আসছেন। রাম লক্ষ্মণকে বললেন যে রিপুগৃহে বাসের জন্য তিনি তাঁকে দর্শন করতে পারেন না। লক্ষ্মণ রামের এই মনোভাবের কথা সীতাকে জানালে সীতা অগ্নিপ্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। লক্ষ্মণ এই কথা রামকে জানালে, রাম লক্ষ্মণকে সীতার অগ্নিপ্রবেশের ব্যবস্থা করতে বলেন। সীতার অগ্নিপ্রবেশের পর স্বয়ং অগ্নিদেব-কর্তৃক সীতার নিষ্পাপত্ব কথন ও রামের হাতে সীতাকে প্রত্যর্পণ ঘটল। অনুরূপ পরিস্থিতিতে রামায়ণে আছে, যুদ্ধজয়ের খবর রাম হনুমানের দ্বারা সীতাকে দেন। হনুমানের মুখে সীতার প্রত্যাগমনের ইচ্ছা শুনে রাম বিভীষণকে সীতাকে আনতে পাঠান। এই সময়ে রামের মনের দুঃখ, ক্ষোভ ও দ্বিধা বাল্মীকি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন :—

"এব মুক্তো হনুমতা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ।
আগচ্ছৎ সহসাধ্যা নমীষদ্বাষ্প পরিপ্লুতঃ॥
স দীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য মেদিনীমবলোকয়ন্।
উবাচ মেঘসংকাশং বিভীষণমুপস্থিতম্॥"

—'বাল্মীকি-রামায়ণ', যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪।৫-৬

অর্থাৎ 'ধার্মিকপ্রবর রঘুনন্দনকে হনুমান এরূপ বললে তিনি বাষ্পাকুল লোচনে সহসা চিন্তা করতে লাগলেন, অনন্তর ভূতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও সম্মুখে উপস্থিত বিভীষণকে বললেন।'

লঙ্কা থেকে সীতার আগমন বার্তা শুনে—

"তামাগতামুপশ্রুত্য রক্ষোগৃহ-চিরোষিতাম্।
রোষং হর্ষঞ্চ দৈন্যং চ রাঘবঃ প্রাপ শত্রুহা॥"

—'রামায়ণ', যুদ্ধকাণ্ড, ১১৪-১৭

অর্থাৎ 'বহুকাল রাক্ষসগৃহবাসিনী সীতার আগমন বার্তা শুনে শত্রনাশন রাম এক সঙ্গে ক্রোধ, হর্ষ ও দুঃখ প্রাপ্ত হলেন।'

সীতাকে দেখে—

"পশ্যতস্তাং তু রামস্য সমীপে হৃদয়প্রিয়াম্।
জনবাদ ভয়াদ্ রাজ্ঞো বভূব হৃদয়ং দ্বিধা॥"

—'রামায়ণ', যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬।১১

অর্থাৎ—'সমীপবর্তিনী প্রাণপ্রিয়া জানকীকে নিরীক্ষণ করলেন কিন্তু লোকাপবাদের ভয়ে রাজা রামের মন দ্বিধাবিভক্ত হল।'

এই সময় রাম-সীতার কথোপকথন নাটকে পরিত্যক্ত হয়েছে। সীতা অগ্নি-প্রবেশ থেকে অগ্নি-কর্তৃক সীতাকে প্রত্যর্পণ সমস্ত ঘটনা লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের সংলাপের দ্বারা ব্যক্ত করাতে এই মূল্যবান দৃশ্যটির পরিত্যাগ নাটকের অনুকূল হয়নি। নাটকীয় পরিস্থিতি ও রাম-সীতার চরিত্র সৃষ্টির যে দুর্লভ সুযোগ নাট্যকার পেয়েছিলেন তার সদ্ব্যবহার না করায় নাটকের রস ও চরিত্র উভয়েরই হানি হয়েছে।

রামায়ণের মতো এই নাটকে রসের ক্রমিক পরিণতি ঠিকভাবে দেখানো হয়নি। নাট্যকার চরিত্রসৃষ্টিতেও সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কোন চরিত্রই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। রামচন্দ্রের জয়ের একমুখী প্রবাহ এবং রাবণের পরাজয়ের নিরবচ্ছিন্নতা সুখকর হয়নি।

'প্রতিমা' নাটক ও 'অভিষেক' নাটকের পারস্পরিক তুলনা করলে দেখা যায় যে নাটক দুটি যান্ত্রিকভাবে উপস্থাপিত। একটি নির্দিষ্ট মঞ্চে প্রাণহীন ব্যক্তিত্ব-হীন কয়েকটি চরিত্রকে উপস্থাপিত করে নাট্যকার যেন তাদের জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করে চলেছেন। ঘটনার দ্বন্দ্ব, গতি ও পরিণতি এবং তাদের ক্রমবিকাশ কোনটাই নাটকে স্থান পায়নি। চরিত্রে অভিনবত্ব উপস্থাপন ও রসস্ফূর্তি দান যে সম্ভব তার পরিচয় কালিদাসের 'রঘুবংশে'র মহাকাব্যে ও ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত' নাটকে পাই। কিন্তু ভাসের 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটকদ্বয়ে সেই সৃষ্টি-প্রতিভার যেন অভাব আছে মনে হয়।

৩। 'মহাবীর চরিতম্'। ভবভূতি (সম্পাদনা : টি. আর রত্নম আইয়ার এবং কে. পি. পরব, তৃতীয় সংস্করণ ১৯১০, বোম্বাই)

রাম-কাহিনীর অবলম্বনে রচিত ভবভূতির প্রথম নাটকের নাম 'মহাবীর চরিতম্'। ভাসের রচিত নাটকগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু ভবভূতির আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি বলা যায়।

'মহাবীর চরিতে'র বিষয়বস্তু রামের বিবাহ থেকে আরম্ভ করে রাবণ-বধের পর রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেকে শেষ হয়েছে। নাট্যপরিকল্পনায় 'মহাবীর চরিতে' মূল রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক কাহিনী দেখা যায়।

এইসব পরিবর্তনের মধ্যে রাবণকে সীতার কর-প্রার্থী করা ও কৈকেয়ীকে মূল ঘটনাস্রোত থেকে সরিয়ে আনা মুখ্য পরিবর্তন। সীতার কর-প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব নাটকীয় সংঘাতের পক্ষে অনুকূল মনে করে 'মহাবীর চরিতে' ভবভূতি একে নাটকীয় ক্রিয়ারূপে গ্রহণ করেছেন। কৈকেয়ীর প্রতি সমবেদনার মনোভাব আমরা ইতিপূর্বে ভাসের নাটকে দেখেছি। এখানেও সেই একই মনোভাব বর্তমান।

কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেও নাটকের বিষয়বস্তু যে বাল্মীকি দ্বারা প্রভাবিত তা ভবভূতি নিজেই স্বীকার করে বলছেন

"প্রাচ তসঃ মুনিবৃষা প্রথমঃ কবীনাং
যৎ পাবনং রঘুপতেঃ প্রণিনায় বৃত্তম্।
ভক্তস্য তত্র সমরংসত মেঽণি বাচ
স্তৎ সুপ্রসন্নমনসঃ কৃতিনো ভজন্তাম॥" ১।৭

রামায়ণের রামচন্দ্র একটি পরিপূর্ণ আদর্শ মনুষ্য চরিত্র। মহাকবি তাঁকে নানা বিস্ময়কর বিচিত্রতর পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে তাঁর গুণাবলীর বিকাশ সাধন

করেছেন। শৈশবে তাঁকে আমরা যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস-রাক্ষসীদের হন্তারূপে দেখি, পতিতপাবন নারায়ণরূপে অহল্যা-উদ্ধার-কর্তা হিসাবে দেখি। হরধনুভঙ্গে, পরশু-রামের দর্পচূর্ণে তাঁর শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাই। আবার আকস্মিকভাবে তাঁর রাজ্যাভিষেক বন্ধ হওয়ার জন্য তাঁর ধৈর্যচ্যুতি দেখি না, কর্তব্যপরায়ণতা থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখি না। তাঁর সত্যানুরাগ, পত্নীপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি, প্রতিজ্ঞাপালন ও প্রজানুরঞ্জন—নানা দিক দিয়ে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে উঠেছে।

ভবভূতি কিন্তু তাঁর 'মহাবীর চরিতম' নাটকে রামচন্দ্রের পরিপূর্ণ মানবচরিত্রটি বর্ণনা করতে চাননি। তাঁর রামের একটি বিশিষ্ট মূর্তি দেখি—সেটি হল রাম বীর, এইখানেই নাটকের নামকরণের সার্থকতা। তাঁর নাটকে তিনি রামের হরধনুভঙ্গ, পরশুরামের দর্পচূর্ণ, বালীবধ, রাক্ষসনিধন বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। বীর মূর্তি অঙ্কনই যে তাঁর নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য তা তিনি এইভাবে বলছেন :—

"তেনেদ মুদ্ধৃত জগত্রয় মনুমূল
মস্তোকবীরগুরু সাহসমদ্ভূতং চ।
বীরাদ্ভুতপ্রিয়তমা রঘুনন্দনস্য
ধর্মদ্রুহো দময়িতুশ্চরিতং নিনায়।" ১৬

রামায়ণের রাম একটি আদর্শ পুরুষ। কিন্তু 'মহাবীর চরিতে' রামের মানবভাবের চেয়ে দেবভাব বেশি বলে মনে হয়। মানবচরিত্র অঙ্কনে ভবভূতির দক্ষতার পরিচয় আমরা 'উত্তররামচরিতে' পাই। তাই আমাদের প্রশ্ন : কোন্ অদৃশ্যশক্তি ভবভূতিকে 'মহাবীর চরিতে' রামের মনুষ্য চরিত্র অঙ্কিত করতে না দিয়ে রামের দেবচরিত্র রূপায়ণ করতে নিয়োজিত করলেন ? 'মহাবীর চরিতে' দোষগুণে গঠিত রাম মনুষ্য চরিত্র পেলেন না কেন ? মনে হয় রামায়ণের 'অবতারবাদ' নাট্যকারের অবচেতন মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সেই কারণে সেই প্রভাব নাট্যকারের চিন্তা-ধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল যে নাট্যকার মনুষ্য রাম সৃষ্টি না করে একটি নির্দোষ দেবমূর্তি গঠন করেছেন।

এ ছাড়া ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রের সহিত ধর্মদ্রোহী রাবণের বিরোধ এই নাটকের উপজীব্য। ধর্মের সহিত অধর্মের বিরোধ এবং ধর্মের জয়ও রামায়ণের বিষয়বস্তু। অতএব সব দিক দিয়েই 'মহাবীর চরিতে'র উপর রামায়ণের প্রভাব অবিসংবাদিত।

নাটকের বস্তুবিচারের পূর্বে আমরা নাটকীয় বিষয়বস্তুর পরিচয় এইভাবে দিতে পারি :—

প্রথম অঙ্কের ঘটনাস্থল বিশ্বামিত্রের আশ্রম। আশ্রমে সীতা ও উর্মিলার সঙ্গে কুশধ্বজের আগমন ও রাম-সীতার ও লক্ষ্মণ-উর্মিলার পরস্পরকে দর্শন ও পূর্বরাগ, তাড়কাবধ, রাম-কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে আশ্রমে আনীত হরধনুভঙ্গ, মাল্যবান-কর্তৃক প্রেরিত রাবণদূত দ্বারা রাবণের পক্ষ হতে সীতার পাণি প্রার্থনা; কুশধ্বজ-কর্তৃক সীতা ও উর্মিলাকে রাম ও লক্ষ্মণের হাতে প্রদানের প্রস্তাব, বিশ্বামিত্র-কর্তৃক ভরত ও শত্রুঘ্নের হাতে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তিকে প্রদানের প্রস্তাব, সুবাহু বধ, মারীচ পরাজয়—এগুলি হল প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় অঙ্কে মাল্যবানের রাম-জামদগ্ন্য দ্বন্দ্ব সংঘটনে প্রয়াস বর্ণিত। মাল্যবান দূতের দ্বারা রাম-কর্তৃক হরধনুভঙ্গের সংবাদ জামদগ্ন্যকে দিলে, গুরুর অবমাননায় ক্রুদ্ধ জামদগ্ন্যের রামকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আগমন। সমস্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে রাম-জামদগ্ন্য দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, দশরথ প্রভৃতির অনুরোধ এবং শেষে রাম-কর্তৃক জামদগ্ন্যকে যুদ্ধে আহ্বান বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কে মাল্যবানের কূটনীতির আর-এক পরিচয় পাওয়া যায়। মাল্যবানের পরামর্শে শূর্পণখা-কর্তৃক মন্থরা দাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করে রামাদিকে বনবাসে প্রেরণ করে নিজ আয়ত্তে আনা এই কূটনীতির উদ্দেশ্য।

নাটকীয় দৃশ্যে দেখা যায় রাম-কর্তৃক পরশুরাম পরাজিত হয়েছেন। জনক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বিদায় নেওয়ার পূর্বে রামকে বৈষ্ণব ধনু দান করে দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী রাক্ষসদের হাত থেকে ঋষিদের রক্ষা করার ভার দিয়ে যান। তারপর মন্থরাবেশী শূর্পণখা রামকে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনার কথা জানালে রাম বনবাস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। ভরত, যুধাজিৎ, দশরথ সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করে রাম বনগমন করলেন।'

পঞ্চম অঙ্কে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ, রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ, রামের বিষাদ ও ক্ষোভ, সুগ্রীব সখা বিভীষণ-কর্তৃক শ্রমণীকে রামের নিকট দূতরূপে প্রেরণ, মাল্যবানের প্ররোচনায় বালী-রাম যুদ্ধ এবং রাম-সুগ্রীব মৈত্রী প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অঙ্কে বর্ণিত বিষয়গুলি হল: হনুমানের লঙ্কাদহন, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, হনুমানের সহিত সীতার সাক্ষাৎ ও অভিজ্ঞান গ্রহণ। মন্দোদরী-কর্তৃক রাবণকে সেতুবন্ধন বর্ণিত হলে রাবণের অবিশ্বাস। এমন সময় প্রহস্ত এসে রাবণকে জানালে যে রাম সাগরে সেতু রচনা করে সসৈন্যে লঙ্কাপুরীতে এসেছেন। অতঃপর রামদূত অঙ্গদের সঙ্গে রাবণের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন, পুত্রসহ রাবণের সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা, ইন্দ্র-কর্তৃক রামকে রথ প্রেরণ এবং যুদ্ধান্তে রাবণের নিধন বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অঙ্কে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রামের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত।

এই সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে নাটকীয় কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণ-কাহিনী অনেক পার্থক্য আছে। যেমন :—

১) বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম-সীতার সাক্ষাৎ ও পূর্বরাগ। রাবণের পক্ষ হতে সীতার করপ্রার্থনা করে মাল্যবানের দূত প্রেরণ। বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে আশ্রমে হরধনুর আবির্ভাব ও রাম-কর্তৃক হরধনুভঙ্গ।

২) রাম-জামদগ্ন্য কাহিনীর অভিনবত্ব উপস্থাপন।

৩) মন্থরা-কৈকেয়ীর ঘটনার নবরূপ দান।

৪) ভরত-রাম সংবাদের নূতনরূপ।

৫) শবরী-কর্তৃক নাটকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ।

৬) বালী-সুগ্রীব-বিভীষণ মৈত্রী।

৭) রাম-বালী দ্বন্দ্বের নূতনত্ব।

৮) রাবণের বিস্ময়কর অজ্ঞতা।

এইসব মুখ্য পরিবর্তন ছাড়াও কিছু কিছু গৌণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন :— বিশ্বামিত্র-কর্তৃক ভরত ও শত্রুঘ্নর সঙ্গে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির বিবাহ প্রস্তাব. সীতা ও উর্মিলার সাক্ষাতেই তাড়কাদি বধ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের অনুপস্থিতিতে রামাদির বিবাহ ও বনগমন, জামদগ্ন্য-কর্তৃক রাক্ষস নিধনের জন্য রামকে ধনুপ্রদান, ঋষিপ্রদত্ত দায় রক্ষার জন্য রামের বনগমন ইচ্ছা, বিদেহ পুরীতে রামের রাজ্যাভিষেক, দশরথের প্রতিশ্রুত বাক্যের সুযোগ গ্রহণ করে রামের বনগমন প্রার্থনা, ভরতের পক্ষে যুধাজিৎ-কর্তৃক রামের পাদুকাভিক্ষা, রামের বনগমনকালে জনকের উপস্থিতি, কৈকেয়ী-অরুন্ধতী সংবাদ, ইত্যাদি।

মুখ্য এবং গৌণ পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলে নাট্যকারের বস্তুবিন্যাসের পরিকল্পনা সহজেই জানা যায়। সীতাকে উপলক্ষ্য করে রাম-রাবণ দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সমস্ত ঘটনা এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। নানা পরিবেশে নায়কের চরিত্রকে উপস্থাপিত করে এবং তাঁকে বিভিন্ন বীর চরিত্রের সংস্পর্শে এনে নায়ক-চরিত্রের বীরগুণ পরিস্ফুট করা হয়েছে।

নাটকীয় ঘটনাগুলিকে একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ঘটনার ধারাকে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে নাট্যকার বাল্মীকি-রামায়ণ কাহিনীর নানা পরিবর্তন সাধন করেছেন।

এই পরিবর্তিত কাহিনী চরিত্রসৃষ্টি ও রসের দিক দিয়ে কতখানি সার্থক হয়েছে এখন আমরা তার বিচার করব।

নাটকে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বকে গতি ও পরিণতি দান করার জন্য চারটি প্রধান পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে: ১) রাম-পরশুরাম সংঘাত, ২) ছদ্ম মন্থরার দ্বারা প্রতারিত করে রামকে বনে আনয়ন, ৩) বালী-রাম যুদ্ধ ও ৪) লঙ্কাসমর।

নাটকীয় ঘটনার প্রয়োজনে যে চারটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ মূল রামায়ণ-কাহিনীর অনুরূপ, যদিও খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নাট্যকারের মৌলিক পরিকল্পনার পরিচায়ক।

'মহাবীরচরিতে' রাম-পরশুরাম দ্বন্দ্ব মাল্যবানের কূটনীতির প্রথম পর্যায়। রামায়ণে এই ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্ত। রামাদির বিবাহের পর সকলের অযোধ্যায় ফেরার পথে পথিমধ্যে ভীষণ দর্শন পরশুরামের দেখা পেলেন। পরশুরাম রামকে ধনুতে জ্যারোপণ করতে এবং তার পরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। পুত্রের অমঙ্গল চিন্তায় ভীত হয়ে দশরথ ঋষির কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু পরশুরাম সব-কিছু অগ্রাহ্য করে রামকে পুনরায় পূর্বোক্ত আদেশ করলেন। রাম তখন ঋষিবাক্য মান্য করতে ধনুতে শরযোজনা করলেন এবং ঋষির তপস্যার্জিত দিব্যলোক ধ্বংস করলেন। অকস্মাৎ জামদগ্ন্যের আগমন, দশরথের ভয় এবং তাঁকে প্রসন্ন করতে স্তুতি ও অনুনয়, রাম-কর্তৃক ঋষির আহ্বান গ্রহণ ও ঋষির পরাজয়। এগুলি হল রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনার ধারা। নাটকেও তাই আছে। সুতরাং নাটকীয় বস্তুবিন্যাস রামায়ণের অনুসরণ করেছে।

কিন্তু রাম-কর্তৃক হরধনুভঙ্গের সংবাদ পরশুরাম কোথায় শুনলেন, রামায়ণে তার উল্লেখ নেই। ভবভূতি এই উল্লেখকে প্রশংসনীয়ভাবে নাটকীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। তিনি দূত মাধ্যমে সুকৌশলে রাবণ-জামদগ্ন্যের সংযোগ স্থাপন করে হরধনুভঙ্গের ব্যাপারে মাল্যবানের কূটনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। তখনই মাল্যবানের মনে হল দুজনের সংঘর্ষের অপেক্ষা উভয়ের মৃত্যু আমাদের কাছে প্রিয়।

"যদি প্রপদ্যেত ধনুঃ প্রমাথঃ
শিষ্যায় শম্ভোর্ন তিনিক্ষতে সঃ।
আয়োধনে চেদ্ভয়ো নিঘাতঃ
সংরম্ভযোগাদিতি হি প্রিয়ং নঃ॥" ২।১২

সেই কারণে শূর্পণখার প্রশ্নের উত্তরে মাল্যবান বলছেন :—

'পরশুরামোত্তেজনং কর্তব্য মিতি।' —(২য় অঙ্ক), ২।১৪

রাম-জামদগ্ন্য দ্বন্দ্বে জামদগ্ন্যের পরাজয়েব সম্ভাবনা আছে—শূর্পণখার এই উক্তি নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রগতির সুন্দর সূচনা করেছে।

ছদ্ম মন্থরার দ্বারা প্রতারিত করে রামকে বনে আনয়ন মাল্যবানের কূটনীতির দ্বিতীয় পর্যায়। রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে নিজ আয়ত্তে পাওয়ার জন্য মাল্যবানের কূটনীতির অনুকূলে রামায়ণ-কাহিনী পরিবর্তন করা হয়েছে। ছদ্মদাসীর মাধ্যমে রাম কৈকেয়ীর অনুরোধ জানতে পারলেন। এই আকস্মিক অদ্ভুত আদেশের বিষয় রাম বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ কবলেন না। দশবথ জনক, ভবত কারো মনে কোন সংশয়ের উদয়মাত্র হল না যে কৈকেয়ীর পক্ষে একাজ করা সম্ভব কিনা। কৈকেয়ীব অপবাধ-প্রবণতা ও অন্যায় কার্য, ইতিপূর্বে সকলের সুবিদিত থাকলে তবেই এই আদেশকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে গ্রহণ করা চলে। এতে কৈকেয়ীর চরিত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নাট্যকার কি অনপনেয় কলঙ্কে তাঁকে মসীলিপ্ত করলেন তা ভেবে দেখলেন না। কৈকেয়ীর প্রার্থনার পরিণাম কি ভীষণ হতে পারে তা যুধাজিতের বিবৃতিতে বোঝা যায়। "পতি মৃত্যুমুখে গমন করছে, দুইপুত্র বনে গমন করছে। হতভাগী বধূ রাক্ষসদের নিকট বলির মতো প্রেরিত হয়েছে। কুলকলঙ্কিণী আমার ভগিনীর দৌরাত্ম্য অবিকল জগৎকেও বিকল করে দিয়েছে।"

> "পতির্মৃত্যো র্বক্ত্রে্ রজতি বনমেতৎ সুতযুগং
> বধূটী রক্ষোভ্যো বলিরিব বরাকী প্রনিহিতা।
> নিরালম্বলোকঃ কুলযশসা তচ্চ নিহতং
> স্বসুর্মেদৌরাত্ম্যং জগদবিকলং বিক্লবয়তি॥" ৪।৫৩

যে কার্যের এত ভয়াবহতা ও বহুমুখী পরিণতি তার সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা নেই, প্রতিরোধ করার উদ্যম নেই। তাকে একটা সিদ্ধবস্তু বলে ধরে নেওয়া যেমন অযৌক্তিক তেমনই অস্বাভাবিক। রামায়ণে এই বিপর্যয়ের প্রতিরোধের জন্য আকুল চেষ্টা দেখা যায়। কৈকেয়ীর চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে গভীর জীবনবোধকে যে অস্বীকার করা হয়েছে তা নাট্যকার একবারও ভাবলেন না। নাটকীয় কাহিনীর এই পরিবর্তন নাটকে কার্যকারণ-শৃংখলা সৃষ্টির পরিবর্তে অতি-নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি করে নাটকীয় পরিকল্পনাকে অত্যন্ত দুর্বল করে তুলেছে। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা রামায়ণ-কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘটনারূপে অবস্থান করে সমস্ত কাহিনীকে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি দান করেছে। এই ঘটনা মানবের চিন্তা ও কর্মকে রহস্যজনক অদৃষ্টের সঙ্গে গ্রথিত করে মানবজীবনের ভয়াল সুন্দর

রূপটিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরেছে। এই একটি কাহিনী থেকেই রামায়ণের নানা ঘটনা-পরম্পরা : বনগমন, সীতাহরণ, রাম-রাবণ যুদ্ধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতা-নির্বাসন প্রভৃতি অপরিহার্য কার্য-কারণ শৃংখলায় গ্রথিত হয়েছে। কোথাও অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু নাটকীয় পরিকল্পনায় কৈকেয়ীর কাহিনীর রূপান্তর কাহিনীতে শুধু শিথিলতা সঞ্চার বা অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি করেনি, জীবনের রহস্যজনক গতিপথ সম্বন্ধে নাট্যকারের ধারণা যে কত স্বল্প তাও প্রকটিত করে তুলেছে।

রাম-বালী যুদ্ধ নাটকে মাল্যবানের কূটনীতির তৃতীয় পর্যায়। কিন্তু রাম-বালী বিরোধের কারণ কি ? এই বিরোধের কারণ হয়তো বালী-রাবণ মৈত্রী হতে পারে। কিন্তু সুগ্রীব ও বালীর বিরোধ মূলক সম্পর্কটির পরিবর্তন কেন করা হল তা বোঝা গেল না। এই পরিবর্তনের নাটকীয় প্রয়োজন কি ছিল নাট্যকার তার নির্দেশ দেননি। আবার বিভীষণের সঙ্গে সুগ্রীবের মিত্রতার মূল কোথায় ? কেন বিভীষণ শবরীর মাধ্যমে রামচন্দ্রের শরণ নিলেন তার কোনও ইঙ্গিত নাট্যকার দেননি। কাহিনীর গ্রন্থন হিসাবে এই অংশের দুর্বলতা সুস্পষ্ট। রামায়ণে বর্ণিত রাম-সুগ্রীবের কার্যাবলীর যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বিভীষণ-কর্তৃক রামের নিকট আশ্রয় গ্রহণের সংগত কারণও রামায়ণে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে রাম-বালীর দ্বন্দ্বের কারণটি যেমন দুর্বল, তেমনি বিভীষণ-সুগ্রীবের সম্পর্কও। রাম-বিভীষণ-সুগ্রীবের সম্পর্কও সুসংবদ্ধ নয়। নাটকীয় প্রয়োজন এইগুলিকে যথা-যথভাবে গ্রথিত করা হয়নি।

রাম-রাবণ দ্বন্দ্ব মাল্যবানের কূটনীতির শেষ পর্যায়। সমগ্র নাটকের দ্বন্দ্ব রাবণ ও রামের সংঘাতকে কেন্দ্র করে। অথচ রাবণ প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে নেই। কারণ ষষ্ঠ অঙ্কে রাবণ-মন্দোদরীর সংলাপ থেকে জানা যায় যে এতাবৎ অনুষ্ঠিত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে রাবণ বিস্ময়কর ভাবে অজ্ঞ। রাবণের অজ্ঞতা রামায়ণেও আছে। সীতাহরণের পর রামের প্রতিক্রিয়া কি হয় রাজা হিসাবে সে দিকে লক্ষ্য রাখা রাবণের উচিত ছিল। কিন্তু রাবণ যথাযথ ভাবে তা করেনি। কিন্তু নাটকের অজ্ঞতার তুলনায় মহাকাব্যের রাবণের অজ্ঞতা অকিঞ্চিৎকর। রামায়ণের রাবণ অরণ্যকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত সমস্ত ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেখানে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি ঘটনার পুরোভাগে রাবণ আছে সক্রিয়ভাবে। কিন্তু ভবভূতির রাবণ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর কোনও সংবাদ রাখে না। রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব যেখানে নাটকের বিষয়বস্তু সেখানে প্রতিনায়কের অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তা বস্তুবিন্যাসের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়।

তাই মনে হয় নাটকীয় দ্বন্দ্ব যেন সাজানো; স্বাভাবিক নয়। এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় যেন হতে হবেই। জীবনসংগ্রামে প্রতিপক্ষরই কখনও জয়, কখনও পরাজয় হয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন জয় ও সাফল্য জীবনে কারো পক্ষে সত্য হয় না। অথচ জীবন-বহির্ভূত এই ঘটনাকে নাট্যকার নাটকে রূপ দিয়েছেন। তাই জীবনরহস্যের মোটামুটি স্বাভাবিক পরিচয় যে বস্তুবিন্যাসে না থাকে তাকে সুষ্ঠু বস্তুবিন্যাস বলা যায় না। যে-কোন জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের চিন্তা, কর্ম ও ধারণা-বহির্ভূত এক অদৃশ্য শক্তি মানবজীবনকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। মানুষের সব চিন্তা, চেষ্টা ও হিসাবকে ওলটপালট করে এই রহস্যময় শক্তি মানবজীবনকে এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর রূপ দান করে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টিতে জীবনের ঐ তাৎপর্যের পরিচয় অন্তত আভাসেও মেলে। 'মহাবীর চরিতে'র বস্তুবিন্যাসের মধ্যে এই জীবনরহস্যের পরিচয় নেই। এতে পুরুষকার আছে ; দৈব নেই ; পরিকল্পনা আছে, আকস্মিকতা নেই ; স্বচ্ছতা আছে, রহস্যময়তা নেই। মাল্যবানের একটির পর একটি চেষ্টা রামের দ্বারা ব্যাহত হয়েছে এবং রাম চরম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু জীবনের গতিপথ এমন সহজ সরল নয়। তার অগ্রগতির তির্যক পথের বাঁকে আকস্মিকতা ও অচিন্তনীয়তার যে আঘাত মানুষকে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত করে তোলে, মানবজীবনের সঙ্গে তার সংযোগ অপরিহার্য। যে-কোনও জীবনালেখ্যে এই সংযুক্তির পরিচয় না থাকলে তা অসম্পূর্ণ। 'মহাবীর চরিতে'র বস্তুবিন্যাস এই অসম্পূর্ণতার দোষে দুষ্ট।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যে-জীবনের কাহিনী সুদীর্ঘকাল, বিভিন্নদেশ, বিচিত্র পরিস্থিতি ও নানা মানুষের মধ্যে বিস্তৃত তাকে নাটকীয় ঐক্যে বিবৃত করা সুকঠিন একথা স্বীকার করতেই হয়। সে কারণে বাধ্য হয়ে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটককে বৈচিত্র্যহীন নীরস বর্ণনার সংলাপের রূপ গ্রহণ করতে হয়। ঘটনার সংঘাত ও ঘটনার সুষ্ঠু পরিণতি সাধন—এ দুটি যে নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের রহস্য কবিশিল্পী ভবভূতি তা জানতেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে বাল্মীকির অনুসরণ করে বালকাণ্ড হতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত সুদীর্ঘ রামায়ণ-কাহিনীকে নাটকীয় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার শক্তি তাঁর আছে কিনা। জীবনের সুবিশাল পটভূমিতে পরিপূর্ণ মানবচরিত্র অঙ্কন করতে অলৌকিক শিল্পপ্রতিভার প্রয়োজন। নিজ শিল্পসৃষ্টি ক্ষমতার সীমারেখা কোথায় ভবভূতি তা জানতেন না বলে বাল্মীকির বিস্তৃত পটভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই ভুলের ফল নাটকীয় বস্তু ও চরিত্রাবলীর মধ্যে প্রকট হয়ে আছে। বস্তুতঃ বিদগ্ধ সাহিত্যজ্ঞানী ভবভূতি জানতেন, নাটকে কি করতে হবে, কিন্তু জানতেন না কি করে নাটককে ইপ্সিত রূপদান করা

যায়। তাই তাঁর রচনার নাটকীয় ঘটনাবলীকে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করার চেষ্টা যতটা দেখা যায়, সেই চেষ্টার সাফল্য ততটা দেখা যায় না।

৪। উত্তররাম চরিতম্। ভবভূতি (সম্পাদনা : টি. আর. রত্নম আইয়ার এবং কে. পি. পরব, প্রথম সংস্করণ ১৮৯৯)

'উত্তররামচরিতম্' রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত ভবভূতির দ্বিতীয় নাটক। আমরা এতাবৎ রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত তিনটি নাটকের আলোচনা করেছি—ভাসের 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক এবং ভবভূতির 'মহাবীর চরিতম্' নাটক। বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করে আমরা কোন ক্ষেত্রেই নাট্যকার-দ্বয়ের শিল্পবোধ, সাহিত্য সৃষ্টি বা জীবন রূপায়ণের উচ্চ প্রশংসা করতে পারিনি। 'উত্তররামচরিতে'র আলোচনায় আমরা ভবভূতির শিল্পসৃষ্টির অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। 'উত্তররামচরিতে'র সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উক্তির মাধ্যমে ভবভূতি যে গর্বোক্তি করেছেন "শব্দ রুক্ষ্ম বিদঃ কবে : পরিণতাং প্রাজ্ঞস্য বাণীমিমাম্" —তা সর্বৈব সত্য। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে বিশেষ ক্ষেত্রে শিল্পনৈপুণ্যে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকেও অতিক্রম করে গেছেন।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্' একটি অনন্য কীর্তি। ঘটনাবহুলতা এর বৈশিষ্ট্য নয়, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রেমার্তির মর্মভেদী প্রকাশই এর মৌল বৈশিষ্ট্য। অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুকূলে রসসিদ্ধ বাল্মীকি রামায়ণ-কাহিনীকে নূতন পরিণতি দান করতে গিয়ে ঘটনার গ্রন্থনে, শিল্পসৃষ্টির নিপুণতায় ও কার্য-কারণ-সম্পর্কের সুশৃঙ্খল বিধানে নাট্যকার অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন।

রামায়ণ-কাহিনীর এই অংশের যে অপূর্ব নাট্যোপযোগিতা আছে তা অপর কোন নাট্যকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে রাম-সীতা চরিত্রের যে অনুপম মানবীয় আলেখ্য অঙ্কন করা যায় তা ভবভূতির পূর্বে কেহই সম্যক অনুধাবন করেননি। রাম সীতাকে বিসর্জন দিলেন একথার উল্লেখ রামায়ণেও আছে। কিন্তু রামের দুঃখের গভীরতা ও বিস্তার কিরূপ, বেদনার আঘাতের তীব্রতা কিরূপ এবং রামচন্দ্রের সীতা-প্রেমের নিষ্ঠা ও প্রগাঢ়তা কতখানি তার বিশদ্ বিবরণ রামায়ণে নেই। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে তার কিছু কিছু আভাসমাত্র আছে। যেমন :—

সীতা লোকাপবাদ শুনে রামের প্রচণ্ড বেদনার বর্ণনায় কালিদাস লিখেছেন—

'অয়োঘনেনায় ইবাভিতপ্তং
বৈদেহিবন্ধোর্হৃদয়ং বিদদ্রে।' (রঘু, ১৪)

অর্থাৎ 'তপ্ত লৌহের আঘাতে যেন বৈদেহিবন্ধু রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হল।' ভবভূতি বাল্মীকি-বর্ণিত রামচন্দ্রের পরম বিষাদের ইঙ্গিত গ্রহণ করেছেন এবং তাকে যে অমৃতরূপ দিয়েছেন তার আস্বাদ বিশ্বসাহিত্যে শাশ্বত হয়ে আছে।

'উত্তররামচরিতে'র উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হতে গৃহীত। এখানে রাম-কর্তৃক সীতানির্বাসন ও তৎসঙ্গে পুনর্মিলন বর্ণিত। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও অনেক বিষয় ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্মিলন এবং মিলনান্তে সীতার ভূতল প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে 'উত্তররামচরিতে' ঘটনাগুলি সেরূপে বর্ণিত হয়নি। 'উত্তররামচরিতে' সীতার রসাতল বাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সঙ্গে রামের পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছে। এরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করে ভবভূতি রসজ্ঞতার ও আত্মশক্তি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

'উত্তররামচরিতে'র সমগ্র নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের মূলে আছে একটি দ্বন্দ্ব—তা হল রামচন্দ্রের কুলধর্ম ও রাজধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেমের বিরোধ। এর ফলেই সীতা বিসর্জন, এই রাজধর্ম রক্ষার্থই শূদ্রক বধের জন্য রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্য যাত্রা, এরই উদ্দেশ্যে লবণদৈত্য বধার্থ শত্রুঘ্নকে মধুপুরে প্রেরণ। এই মূল উৎসটি কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে গৃহীত। অবশ্য নাট্যকার এর পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন।

বিষয়বস্তু বর্ণনায় প্রথম অঙ্কে দেখি লক্ষ্মণ রাম-সীতাকে একখানি চিত্র দেখাচ্ছেন তাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্যন্ত রাম-সীতার পূর্ববৃত্তান্ত চিত্রিত। এই আলেখ্য দর্শন কেবল প্রেমপূর্ণ-স্নেহ যেন আর ধরে না। যখন আত্মশুদ্ধির কথার প্রসঙ্গ মাত্রে রাম, সীতার অবমাননা, সীতার পীড়নের জন্য আত্মতিরস্কার করছিলেন তখন সীতা কেবল 'হোদুঅজ্জউও হোদুএহি পেকখক্ষ্যদাবহে চরিদং' বললেন। একথাতেই প্রেম যেন উছলে উঠল। চিত্রদর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্মুখ সীতাপবাদ সংবাদ রামকে দিলেন। রাম সীতাকে বিসর্জন দেওয়ার অভিপ্রায় করলেন। রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম, বলে ভারতখ্যাত কিন্তু বাল্মীকি কখনও রামচন্দ্রকে নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি। রামচন্দ্র অনেক নিন্দনীয় কর্ম করেছেন যথা বালীবধ, শম্বুকবধ ইত্যাদি। কিন্তু যে-সকল অপরাধে তিনি অপরাধী তাদের মধ্যে সীতা বিসর্জন অপরাধ সবচেয়ে গুরুতর। রামায়ণের রাম এবং ভবভূতির রাম দুজনেই সীতা বিসর্জন করেন।

কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। প্রজারঞ্জন রাজাদের কর্তব্যবলে এবং তা ইক্ষাকু বংশের কুলধর্ম বলে ভবভূতির রাম সীতাকে বিসর্জন দেন। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্বেই বলেছিলেন—

"স্নেহং দয়াং চ সৌখ্যং চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥" ১।১২

অর্থাৎ—"প্রজারঞ্জনে আমি স্নেহ, দয়া, সখ্য এমন-কি জানকীকে পর্যন্ত ত্যাগ করতে দুঃখ বোধ করব না।"

দুর্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনে বললেন—

"সত্যং কেনাপি কার্য্যেণ লোকস্যারাধনম্ ব্রতং।
যৎ পুরিতং হি তাতেন মাংচ প্রাণাংশ্চ মুঞ্চতা॥ ১।৪১"

অর্থাৎ "যে-কোন উপায়ে লোকের আরাধনাই সজ্জনের ব্রত, পিতা আমাকে এবং নিজের প্রাণ ত্যাগ করে সেই ব্রতই পালন করে গেছেন।"

ভবভূতির রামচন্দ্র কুলধর্ম এবং রাজধর্ম পালনার্থ সীতাকে ত্যাগ করলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নন। তিনি জানতেন সীতা পবিত্রা—

'অন্তরাত্মা চমে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।'

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পত্নীকে ত্যাগ করলেন। 'আমি রাজা রামচন্দ্র ইক্ষাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করবে, আমি এ অকীর্তি সইব না। যে স্ত্রীর লোকাপবাদ আমি তাঁকে ত্যাগ করব।' রামায়ণে রামচন্দ্রের এরূপ গর্বিত চিত্তভাব। রামায়ণের রাম বীর, তাঁর চরিত্র গাম্ভীর্যে ও ধৈর্যে পরিপূর্ণ কিন্তু ভবভূতির রামচন্দ্রের চরিত্রে বীর লক্ষণের কিছুই নেই, গাম্ভীর্য ও ধৈর্যের বিশেষ অভাব। সীতার অপবাদ শুনে ভবভূতির রাম মূর্ছা গেলেন। তারপর তাঁর হৃদয়ভেদী বিলাপ সুদীর্ঘ সংলাপে উচ্চারিত। যেমন:—

"হা দেবী দেবযজন সম্ভব্যে; হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিতব সুন্ধরে। হা নিমিজনক নন্দিনি; হা পাবক বশিষ্ঠাররুন্ধতী প্রশস্তশীল শালিনী; হা রামময় জীবিতে; হা মহারণ্য বাসপ্রিয়সখি; হা প্রিয়স্তোক বাদিনি; কথমেবং বিধায়াস্ত বায়মীদৃশং পরিণামঃ।" ১।৪৩

অর্থাৎ—"হায় দেবী তুমি পবিত্র যজ্ঞভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমার জন্মের অনুগ্রহে পৃথিবী পবিত্র হয়েছিল। তুমি নিমিজনকনন্দিনী, পাবক, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী তোমার চরিত্রের স্তুতি করেছেন, তুমি অগ্নি বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী-স্তুত চরিত্রের অধিকারিণী, তোমার জীবন রামময়, মহারণ্যে তুমি ছিলে আমার প্রিয়

সঙ্গিনী ; তুমি আমার পিতার প্রিয় ছিলে, কত অল্পভাষিণী তুমি ; এইরকম তুমি, তোমার কি করে এই দশা হল।"

উক্তি সকরুণ বটে কিন্তু বাগাডম্বরে এই করুণ রসের আন্তরিক তীব্রতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই সকরুণ বিলাপ দেখে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির রামকে 'কাপুরুষ' মনে করেছেন। এরূপ অতি সাধারণ মানবীয় আচরণ দেখে আমাদেরও সীতা-বিসর্জনের মতো স্বার্থপরতাশূন্য রাজধর্মপালন যেন এই রামের পক্ষে অস্বাভাবিক মনে হয়।

এরূপ স্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করলেন ? সীতাপবাদ শ্রবণে রামচন্দ্র সিংহের মতো রোষে দুঃখে গর্জন করে উঠলেন এবং সভাসদগণকে তা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। সভাসদগণ লোকাপবাদ ঘটনা সত্য বলতে ধীর প্রকৃতি রাজা কাউকে কিছু না বলে সভা ছেড়ে উঠে গেলেন। মূর্ছাও গেলেন না, ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃতে কাতরতাশূন্য ভাষায় ভ্রাতৃগণকে ডাকলেন এবং তাঁদের সমক্ষে পর্বতবৎ অবিচলিত থেকে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। বললেন—'আমি সীতাকে পবিত্র জানি এবং সেইজন্য গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু এজন্য লোকাপবাদ শুনছি। অতএব আমি সীতা ত্যাগ করব।' স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে লক্ষ্মণকে তিনি আদেশ করলেন—'তুমি সীতাকে বনে রেখে এসো।' যেমন অন্যান্য রাজকার্যে রাজানুচরকে নিযুক্ত করেন, সেরূপভাবে লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জন-এ নিযুক্ত কবলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করলেন না। .

বাল্মীকি শোকবিহ্বল রামের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন .

"এবমুক্তাতু কাকুৎস্থো বাষ্পেন পিহিতেক্ষণঃ
সংবিবেশ সধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিত
শোক সংবিগ্নো হৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বিপঃ॥" উ. ৪৬ (২৪-২৫)

অর্থাৎ—"এই কথা বলতে বলতে ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ রামের দুই নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। ঐ সময় তাঁর হৃদয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং তিনি হস্তীর ন্যায় সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতে লাগলেন।"

ভবভূতির পক্ষে বক্তব্য এই যে 'উত্তররামচরিত' নাটক। নাটক ও কাব্যে উদ্দেশ্য ভিন্ন প্রকার। কাব্যের উদ্দেশ্য কার্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কী করল তা-ই উপাখ্যান-কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করতে চায়। সে-সকল কার্য করবার সময় কে কী ভাবল তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নাটকে তার প্রয়োজন আছে। নাট্যকারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাই।

সুতরাং তাঁকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করতে হয়। অনেক বাগড়ম্বর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তথাপি 'উত্তররামচরিতে'র প্রথমাঙ্কের রাম-বিলাপ মনোহর নয়। সেগুলি বীরবাক্য নয়, মনে হয় যেন প্রেমমুগ্ধ কোনো অসারবান যুবকের কথা।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবর্ষ কাল ব্যবধান। 'উত্তররামচরিতে'র একটি দোষ এই যে নাটক-বর্ণিত ক্রিয়াগুলির পরস্পর কালগত নৈকট্য নেই। এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সীতা যমজ সন্তান প্রসব করে স্বয়ং পাতালে অবস্থান করলেন। তাঁর পুত্রেরা বাল্মীকি-আশ্রমে প্রতিপালিত হতে লাগল। রাম কর্তৃক শূদ্রকে দণ্ডদান, দণ্ডকারণ্য দর্শনে রামচন্দ্রের সীতার স্মৃতি জাগরণ ও তজ্জন্য বেদনা বোধ ও অগস্ত্য আশ্রমে গমন দ্বিতীয় অঙ্কের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অঙ্ক কাব্যসৌন্দর্যে অতি মনোহর। এটিই সুবিখ্যাত ছায়াঅঙ্ক। সীতা-স্মৃতি-বিজড়িত দণ্ডকারণ্যের নানাদৃশ্য দর্শনে রামচন্দ্র শোকে অধীর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তমসার আদেশে সীতা রামচন্দ্রকে স্পর্শ করলে তিনি জ্ঞান লাভ করলেন এবং পরিচিত স্পর্শের আস্বাদ পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। সীতাদেবী তাঁর প্রতি রামচন্দ্রের গভীর অনুরাগ দর্শনে প্রীত হলেন। অতঃপর বাসন্তী ও রামচন্দ্র সাক্ষাৎকার। সীতা নির্বাসনের জন্য বাসন্তী রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করলে রামচন্দ্র বললেন যে প্রজানুরঞ্জনের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে এই নিষ্ঠুর কার্য করতে হয়েছে। সীতা-শূন্য তাঁর জীবন যে এখনও রয়েছে এজন্য আক্ষেপ করলেন। এটিই তৃতীয় অঙ্কের বিষয়বস্তু। এই অঙ্কের অনেক নাট্যগত দোষ, কারণ নাটকের পক্ষে এই হৃদয়োচ্ছ্বাস নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যা কাজ, বিসর্জনান্তে রামসীতার পুনর্মিলন, তার সঙ্গে এর কোনও প্রত্যক্ষ সংস্রব নেই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হলে নাটকের কার্যের কোনও হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক-মধ্যে সন্নিবেশিত হলে বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যা-কিছু নাটকে বিবৃত হবে তা নাটকের উদ্দেশ্যের পথে সহায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু এই অঙ্কের কোনও অংশ সেরূপ নয়।

তাছাড়া এখানে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাতে নাট্য-রচনা-কৌশল বিপর্যস্ত হয়েছে! কিন্তু সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন যে অন্য অনেক নাটক একেবারে বিলুপ্ত হয় বরং তাও স্বীকার্য তথাপি 'উত্তররামচরিতের' এই তৃতীয় অঙ্ক ত্যাগ করা যেতে পারে না। এর একমাত্র কারণ কাব্যাংশে এর তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

চতুর্থ অঙ্কে বাল্মীকি-আশ্রমে জনক-কৌশল্যা-অরুন্ধতী সাক্ষাৎকার ও সকলের

সীতা প্রসঙ্গ আলোচনা। তাঁদের লবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও সীতার আকৃতির সঙ্গে তার আকৃতির সাদৃশ্য আলোচনা।

পঞ্চম অঙ্কে বর্ণিত বিষয় হল : চন্দ্রকেতু-সুমন্ত্র এবং সুমন্ত্র-লবের কথোপকথন ও যুদ্ধার্থে গমন।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষয়বস্তু চন্দ্রকেতু ও লবের যুদ্ধদর্শনে রামচন্দ্র কর্তৃক বাল্মীকি-আশ্রমে অবতরণ, সেখানে কুশ ও লবের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, সীতার আকৃতির সহিত উভয়ের আকৃতির সাদৃশ্য দর্শনে এবং তাঁদের জৃম্ভকাস্ত্র লাভে বিস্ময়, কুশ ও লব কর্তৃক রামায়ণ গান। ভবভূতির দোষ নির্বাচন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন যে ভবভূতির রচনার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে এমন দীর্ঘ সমস্যাঘটিত রচনা আছে তাতে অর্থবোধ ও রসগ্রহণ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে থাকে। যেমন

পুষ্পবৃষ্টি— "অবিরলমিলিত বিকচকনককমলকমনীয় সংহতিঃ
অমর তরুতরুণমণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাত।" ৬।৩

অর্থাৎ "অজস্র পূর্ণবিকশিত স্বর্ণকোমল মণিমুকুলে থাকবে মধু—তাই এই পুষ্পবর্ষণ হবে রমণীয়।"

বরুণাস্ত্রসৃষ্ট মেঘ—

"অবিরল বিলোলঘুম্মন্ত বিজ্জুল্লদা বিলাসমণ্ডি দেহিং
মত্তঘোর কণ্ঠ সামলে হিং জলহরেহিং"—ইত্যাদি ৬।৬

অর্থাৎ "মত্ত ময়ূরের স্কন্ধের মতো কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণ মেঘে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে গেছে—বিদ্যুতের রেখায় সেই মেঘমালা সজ্জিত, তার থেকে অবিরাম ক্ষণিকের দীপ্তি ঝলসিত হচ্ছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে "দীর্ঘ সমাস যে রচনা দোষ মধ্যে গণ্য তা অনস্বীকার্য। যাহা কিছুতে অর্থবোধের বিঘ্ন হয়, তা দোষ দুষ্ট। ঈদৃশ সমাসে অর্থবোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকেও ইহা দোষ কারণ ইহাতে অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি এই সমাসগুলি কবিত্ব পরিপূর্ণ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"

সপ্তমাঙ্কে বাল্মীকির আশ্রমে সর্বসাধারণের সম্মুখে গর্ভনাটকের সাহায্যে সীতার বিশুদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক রামসীতার মিলন দেখানো হয়েছে! বলা বাহুল্য, এরূপ ঘটনা-সন্নিবেশ মূল রামায়ণসম্মত নয়। রামায়ণে রাম-সীতার বিচ্ছেদ বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করেছে। রাম-সীতার আন্তরিক মিলন সম্পূর্ণ হয়নি বলে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁদের বাহ্য মিলন ঘটাননি। ফলে মহাকাব্যের কাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই

বিয়োগান্ত পরিণতি লাভ করেছে। ভবভূতির সমস্যা ছিল এখানে। এই বিষাদান্ত পরিণতিকে মিলনান্ত করতে হবে। নাটকীয় পরিণতিকে কার্য-কারণ-সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। তাই ভবভূতি প্রথম থেকেই প্রস্তুত হয়েছেন। বিরহে ও মিলনে, স্মৃতিতে ও প্রত্যভিজ্ঞায়, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে রাম-সীতার গভীর প্রণয়কে অবলম্বন করে নাটকীয় ঘটনাকে সঙ্গত পরিণতি দান করতে চেষ্টা করেছেন। দেবতা ও ঋষিগণকে এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছেন। মিলনকে সম্পূর্ণ করতে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির মানসিক বেদনা বিদূরিত করেছেন এবং প্রজাসাধারণের প্রত্যয় সম্পাদন করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে রাম সীতার পারস্পরিক সংশয় নিরসন করে, চতুর্থ অঙ্কে জনকের প্রসন্নতা সম্পাদন করে এবং সপ্তম অঙ্কে গর্ভনাটকের সাহায্যে প্রজাসাধারণের সন্তোষ বিধান করে শিল্পী নাট্যকার ভবভূতি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।

নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে নাটকীয় কাহিনীর নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি প্রধানত দেখা যায়—

১) জনকাদি আত্মীয়গণ ও বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতি মিত্রগণ চলে গেলে সীতার বিষাদ এবং তজ্জন্য লক্ষ্মণ-কর্তৃক আলেখ্য প্রদর্শন রামায়ণে নেই। এখানে কালিদাসের প্রভাব আছে বলে মনে হয়।

২) রামায়ণে লোকাপবাদ বৃত্তান্ত রামের গোচরে এনেছিলেন ভদ্র নামে এক সভাসদ। নাটকে দুর্মুখ এই কাজ করেছেন।

৩) সীতা বিসর্জনের সময় কৌশল্যাদি মাতৃগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি হিতৈষী গুরুজনবর্গ অযোধ্যায় ছিলেন না। এ কাহিনী নাট্যকারের অভিনব পরিকল্পনা।

৪) শম্বুকের ঘটনার নব উপস্থাপন ও দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাবলী নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত।

৫) তৃতীয় অঙ্ক নাট্যকারের অপূর্ব কল্পনা ও অসাধারণ শিল্পকুশলতার নিদর্শন। এও সম্পূর্ণ অভিনব।

নাট্যপরিকল্পনায় এই পরিবর্তন কতখানি সার্থক হয়েছে এবং নাট্যকার তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের দোষ-গুণ আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সামাজিক জীবনের অন্তরালে যে শাশ্বত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত, সুখে দুঃখে বিজড়িত, বিচ্ছেদ-বেদনায় বিহ্বল, প্রিয়সঙ্গপিপাসু একটি হৃদয় রয়েছে, তার অনবদ্য ও অমর আলেখ্য ভবভূতি রচনা করেছেন। তথাপি এই মানবহৃদয়ের আলেখ্য রচনায় নায়ক-নায়িকার চরিত্র রামায়ণের রাম-সীতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করতে পারেনি। বরং তারই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও তা স্বীকার করে নিয়েই এই চরিত্রগুলির

মানবিক বৈচিত্র্য রচিত হয়েছে। রাম-সীতার প্রেমধর্ম উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও এই প্রেম উভয়ের সমাজধর্মকে বিশেষতঃ রামের রাজধর্মকে উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং রাজধর্মকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করে তারই রাজসিংহাসনে প্রেমকে স্থাপিত করেছে। ভাস হতে ভবভূতি পর্যন্ত যে তিনটি নাটকে রাম-কাহিনী গৃহীত হয়েছে সেগুলিতে রাম চরিত্রের কর্তব্যপরায়ণ লোকশিক্ষাদানকারী মূর্তিই প্রদর্শিত হয়েছে। 'মহাবীর চরিত' রচনাকালে ভবভূতি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে ধর্মবীররসের পরিস্ফুটনে বাল্মীকিকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয় অসাধ্যও বটে। তাই তাঁর রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত দ্বিতীয় নাটকে তিনি সম্পূর্ণ অভিনবপন্থা গ্রহণ করে মানব রামকে, প্রেমিক রামকে, অদৃষ্টবিড়ম্বনায় বিড়ম্বিত রামকে নাটকের নায়করূপে গ্রহণ করেছেন। বহুদর্শী, অভিজ্ঞ কবি রামায়ণের রাম-সীতার জীবনের মধ্যে শাশ্বত মানবভাগ্যের বিচিত্র ও বেদনাময় লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রেম, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও জীবনের নানা সদ্‌গুণাবলী যে কাউকে মানবজীবনের অপরিহার্য বেদনাভোগ হতে মুক্ত করতে পারে না, রামায়ণের সেই পরম সত্যই ভবভূতি 'উত্তররামচরিতে'র রাম-সীতার জীবনালেখ্য রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। মানবের বাহ্য জীবনের অন্তরালে তার একটি নিভৃত স্বকীয় জীবন আছে, সেখানে তার সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা উল্লাস-বেদনা একান্ত তার নিজস্ব, ভবভূতির রামচন্দ্রের সেই অন্তর জীবনের অপূর্ব পরিচয় 'উত্তররামচরিতে'র অঙ্কে অঙ্কে বিস্তারিত করে দেখিয়েছেন। প্রেমার্তির তীব্রতা অপূর্ব কবিতায় উদ্ভাসিত হয়ে মানবজীবনের চিরন্তন বেদনাকে শাশ্বতকালের বাণীরূপ দান কবেছে। আর নাট্যকার এই প্রেমের উপর নাটকীয় ঘটনাকে সুকৌশলে এমনভাবে স্থাপিত করেছেন যে শিল্পীধর্মের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় না করে রামায়ণের রসসিদ্ধ কাহিনীকে এক অভিনব ও আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি দান করতে সমর্থ হয়েছেন—এখানেই ভবভূতির সৃষ্টিপ্রতিভার মৌলিকত্ব ও বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর অমর অবদান।

৫। অনর্ঘরাঘব—মুরারি মিশ্র। (সম্পাদনা—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, কলিকাতা, ১৮৬০)

ভবভূতির পর রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে যে নাটকাবলী রচিত হয় তার মধ্যে কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্মনের 'রামাভ্যুদয়' নাটক ও মায়ুরাজের 'উদাত্ত রাঘবে'র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয় নাটকই অপ্রাপ্য। ভবভূতির পর রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত যেসব নাটক পাওয়া যায় তার মধ্যে মুরারি-

বিরচিত 'অনর্ঘ রাঘব' উল্লেখযোগ্য। নাটকে এরূপ নামকরণের সংকেত সপ্তমাঙ্কে সুগ্রীব কর্তৃক কথিত নিম্নলিখিত সংলাপে আছে—

"অয়মেনন মহোদধি-ভোগিনা
বলয়িতো বসুধা-ফল-মণ্ডনঃ।
জগদনর্ঘমবাপ্য ভবাদৃশং
কিমপি রত্ন মহং কুরুতেত রাম্॥" অ ৭।২৯

নাটকটি যে রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত তা এর নামেই প্রকাশিত। তাছাড়া এ-বিষয়ে কবির স্পষ্টোক্তি আছে—

"ধীরোদাত্ত গুণোত্তরো রঘুপতিঃ কাব্যার্থবীজং মুনি
বাল্মীকিঃ ফলতি স্ম যস্য চরিত—স্তোত্রায় দিব্যা গিরঃ॥"

রামায়ণের বালকাণ্ড হতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনাবলী এই নাটকের উপজীব্য।

নাট্যবস্তুর সংক্ষিপ্তসার :—

রাজপুরোহিত বামদেবের পরামর্শে উদ্বেগাকুল দশরথ-কর্তৃক যজ্ঞরক্ষার্থে ও রাক্ষস-বিনাশের উদ্দেশ্য রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রেরণ—এই হল প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু। দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রামচন্দ্র-কর্তৃক অহল্যা উদ্ধার, বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্বের কারণ, রামের অস্ত্র ও বিদ্যালাভ বর্ণিত আছে।

নাটকীয় দৃশ্যে তাড়কাবধের পর রামচন্দ্রের জনকরাজের ও তাঁর হরধনু সম্বন্ধে কৌতূহলের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় অঙ্কের বিষয়বস্তু হ'ল—রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনু ভঙ্গ, দশানন পুরোহিত শৌষ্কল কর্তৃক রাবণের জন্য সীতাকে দান করার দাবি, জনকাদি কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান ও রামকে কন্যাদান ও শৌষ্কল-ভীতি প্রদর্শন।

চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে মাল্যবানের কূটনীতি বর্ণিত। এর দ্বারা শূর্পণখা কর্তৃক মন্থরার ছদ্মবেশে রামাদিকে বনে আনার ব্যবস্থা।

নাটকীয় দৃশ্যে রাম-জামদগ্ন্যের দ্বন্দ্ব ও জনক-দশরথাদির সাক্ষাতে রামাদির বনগমনের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে রামাদির শৃঙ্গবেরপুরে আগমন, গুহক সংগম, চিত্রকূট-এ উপস্থিতি, রাম-ভরত সাক্ষাৎকার, বিরাধ বধ, পঞ্চবটীতে আগমন, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ এবং জটায়ুর সংলাপে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

নাটকীয় দৃশ্যে বর্ণনীয় বিষয়গুলি হ'ল--সীতাবিরহে রামের বিলাপ, দুন্দুভি দৈত্যের কংকালাপসরণ, গুহকর্তৃক হনুমান-প্রদত্ত সীতার উত্তরীয় রামকে দান ও

দশাননকর্তৃক সীতা হরণের সংবাদ দান, সূর্যবংশীয় বলে সুগ্রীবের সঙ্গে রামের মিত্রতা লাভে ইচ্ছা, বালীর সিংহাসনে সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করতে রামের অভিপ্রায় ঘোষণা, দুন্দুভি দৈত্যের কংকালাপসারণের জন্যে রামের সঙ্গে বালীর যুদ্ধ ও মৃত্যু এবং সুগ্রীবের অভিষেক।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে খর-দূষণাদি বধ, রাম-বিভীষণ মৈত্রী, অশোকবন ভঙ্গ, রাক্ষস-সৈন্য বধ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদবধ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নাটকীয় দৃশ্যে রাম কর্তৃক রাবণবধ বর্ণিত।

সপ্তম অঙ্কে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রামের অভিষেক বর্ণিত হয়েছে।

নাটকীয় চরিত্রগুলির মধ্যে সীতা, রাবণ, সুগ্রীব, হনুমান রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হননি—তাদের পরোক্ষ উল্লেখ মাত্র আছে। বশিষ্ঠ ভরত ও শত্রুঘ্নর উপস্থিতি মাত্র আছে।

বিষয়বস্তু আলোচনা করলে রামায়ণ-কাহিনী থেকে নাটকীয় কাহিনীর নিম্নলিখিত বিভিন্নতাগুলি লক্ষিত হয় :—

(১) বামদেবের পরামর্শে দশরথক কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ—রামায়ণে বশিষ্ঠ দশরথকে যুক্তি দিয়েছিলেন।

(২) বালী ও সুগ্রীবের বিচ্ছেদের নূতন কারণ প্রদর্শন। জাম্ববানের কথামতো বালী রাবণপক্ষ ত্যাগ করতে অসম্মত হওয়ায়, জাম্ববানের পরামর্শে সুগ্রীব কর্তৃক বালীকে পরিত্যাগ ও হনুমানের সুগ্রীবের পক্ষে যোগদান।

(৩) বালীর সাহায্যার্থে খর-দূষণাদির আগমন।

(৪) তাড়কা-বধের পূর্বেই রামের জৃম্ভকাস্ত্রলাভ।

(৫) পুরোহিত শৌষ্কলের মাধ্যমে রাবণ কর্তৃক সীতার কর প্রার্থনা ও রাবণ পুরোহিতের সাক্ষাতেই রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ ও কন্যাদান ব্যবস্থা। শৌষ্কলের সতর্ক-বাণী ও ভীতি প্রদর্শন।

(৬) মাল্যবানের পরামর্শে শূর্পণখা কর্তৃক মন্থরার রূপধারণ ও কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা পূর্ণ করবার ছলে রামাদিকে বনে আনয়ন।

(৭) জনক ও দশরথের সাক্ষাতে রামচন্দ্রের বনগমন ও জনক কর্তৃক দশরথকে সান্ত্বনা দান।

(৮) রামচন্দ্রকে সুগ্রীব পক্ষে আনার জন্য জাম্ববান ও শ্রমণার পরামর্শ ও চেষ্টা, বিনা সাক্ষাতেই রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা বর্ণনা, দুন্দুভির কংকালাপসারণ-জনিত অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রামের সঙ্গে বালীর যুদ্ধ।

(৯) · দণ্ডকারণ্যে পুরোহিতবেশী রাবণের সঙ্গে লক্ষ্মণের কথোপকথন ও জাম্ববান কর্তৃক শ্রবণ।

বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায় যে যদিও ঘটনার ক্রম রামায়ণ-কাহিনীকে যথাযথ অনুসরণ করছে, তথাপি রামায়ণ-কাহিনীর কার্যকারণ-শৃঙ্খলা নাটকে পাওয়া যায় না। সীতার কর প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টতঃ নাট্যকার ভবভূতির 'মহাবীরচরিত'কে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ভবভূতির বস্তুবিন্যাসে যেটুকু নিপুণতা আমরা দেখি আলোচ্য নাটকে তা দৃষ্ট হয় না।

মুরারির নাটকে বিবদমান দুই পক্ষ। এক পক্ষে যজ্ঞরক্ষাকারী ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা ঋষি ও রাজা এবং অপর পক্ষে যজ্ঞবিঘ্নকারী ও অধর্মচারী রাক্ষসের দল। বিশ্বামিত্র এক পক্ষের ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করছেন, অপর পক্ষের ঘটনার নিয়ন্তা মাল্যবান। রাম ও রাবণ যেন তাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিশ্বামিত্রই যে লক্ষ্য তা মাল্যবানের নিম্নোক্ত সংলাপ থেকে বোঝা যায়—সে প্রথমে বলছে যে 'বিশ্বামিত্রকে বশীভূত করতে পারলে তারা আর বধযোগ্য হবে না।'

"অহো মৈথিলস্য নৃপতেরনাত্মজ্ঞতা।
বিশ্বামিত্রে বশীকৃতে হৃদিবয়ং মাভূম সংবধিন
স্তে দৃষ্ট্বা ন কথং পুরাণমুনয়ো মান্যাঃ পুলস্ত্যাদয়ঃ
জামাতাঽপি মহেন্দ্রমৌলিবলভীপর্য্যং করস্মাঙ্কুর—
জ্যোৎস্নামৃষ্টনখেন্দু দীধিতিরয়ং নাপেক্ষিতো রাবণঃ॥" অ-৪।১০

মাল্যবান আবার বলছে :—

"অহো দুরাত্মনঃ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণস্য কুশিকবংশ জন্মনো
দুর্নাটকম্ যজ্ঞোপপ্লবশান্তয়ে পরিণতো রাজাত্মজং যাচিত
স্তং চানীয় বিনীয় চায়ুধবিধৌ তে জঘ্নিরে রাক্ষসাঃ।
ত্রৈয়ক্ষং বিদলয্য কর্ম্মকমথ স্বীকার্য্য সীতা মিতো॥
নো বিদ্মে কুহনাবিটেন বটুনা কিং তেন কারিষ্যতে॥" অ। ৪।১১

অর্থাৎ, 'দুরাত্মা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষার জন্য রাজপুত্রদের নিয়ে এসে তাদের অস্ত্রে সজ্জিত করে রাক্ষস নিধন করেন। তারপর হরধনু ভঙ্গ করিয়ে সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ দেন। সেই মুনি আর কি করবে জানি না।'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে রাম-রাক্ষস দ্বন্দ্বের যে দুর্নাটক

তার স্রষ্টা কুশিকবংশজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। তারই দ্বারা তাড়কা বধ থেকে সীতা-বিবাহ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে ও ভবিষ্যতে আর কি হবে কে জানে?

নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের যান্ত্রিকতা এই উক্তিতেই প্রকট হয়ে উঠেছে। যে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের ইচ্ছাক্রমে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে রামচন্দ্র নানা ঘটনার মাধ্যমে রাক্ষস-বধ লীলা অভিনয় করেছেন, নাটকের শেষে বশিষ্ঠের প্রশ্নের ও রামের উত্তরের মধ্যেও এই ভাব বিদ্যমান।

বশিষ্ঠ বলিলেন—'রামভদ্র কিংতে ভূয়ঃ প্রিয়মুপহরামি?'

রামচন্দ্র উত্তর দিলেন—'পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বনে গিয়ে, সেতুবন্ধন করে রাবণ সহ রাক্ষসদের নিধন করেছি। কেউ আর উৎপাত করতে আসবে না।'

> "তাতাজ্ঞামধি মৌলি মৌক্তিকমণিং কৃত্বা মহাপৌত্রিণো
> দ্রংষ্ট্রাবিন্ধ্য বিলাসিতপত্রশবরী দৃষ্টা ভৃশং মেদিনী।
> সেতু দক্ষিণ পশ্চিমৌ জলনিধী সীমন্তয়নির্মিতঃ
> কল্পান্তং চ কৃতং সমস্তম দশগ্রীবোপসর্গং জগৎ॥" অ-৭।১৫

নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ যজ্ঞবিঘ্ন-উপশম চেষ্টায় এবং সমাপ্তি সেই চেষ্টার সিদ্ধিতে। সেই চেষ্টার অনুপ্রেরণা দান করেছেন বিশ্বামিত্র এবং সিদ্ধির জন্য সহর্ষ অভিনন্দন জানিয়েছেন বশিষ্ঠ।

যান্ত্রিকতাপূর্ণ হলেও নাটকের মূল কাঠামোটি যে রামায়ণসম্মত তাতে সন্দেহ নেই।

রামায়ণের বস্তুবিন্যাসের মূলে আছে এক অপূর্ব জীবনরহস্যবোধ। মানুষের সজ্ঞান কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে রহস্যবাদের গ্রন্থনে সেই জীবনের ধারা অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে যা ঘটেছে তা যেমন অভাবিতপূর্ব তেমনিই স্বাভাবিক। আকস্মিকতার সঙ্গে সম্ভাব্যতার অপূর্ব সমন্বয়ে কাব্যটি শাশ্বত সত্যে রসমাধুর্যে পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

'মহাবীর চরিতে' এরূপ জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'অনর্ঘ রাঘবে' তা একেবারে অনুপস্থিত। কাহিনীর অসংলগ্ন বিন্যাসে তা সুস্পষ্ট। কৈকেয়ী-মন্থরা কাহিনীর পূর্ণ সাহিত্যিক মূল্য মুরারিও বুঝতে পারেননি। তাই ভাস ও ভবভূতির অনুকরণে তিনিও এই ঘটনার অবিশ্বাস্য নবরূপ উপস্থাপন করেছেন। রামের বনগমন উপলক্ষে রামায়ণে করুণ রসের যে অশ্রুনির্ঝর উৎসারিত হয়েছে, মুরারির নাটকে তার হাস্যকর প্রতিধ্বনি আছে মাত্র। ভবভূতি কেন্দ্রীয় নাটকীয় দ্বন্দ্বের সহিত পরশুরাম ও বালীকে সুকৌশলে সংযুক্ত করে নাটকীয় সংঘাতকে গতিময়

করে তুলেছেন। কিন্তু মুরারির নাটকে পরশুরাম ও বালীর কাহিনী মূল নাটকের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি। বালীর সঙ্গে সুগ্রীবের বিচ্ছেদের ও রামের সঙ্গে বালীর যুদ্ধের কারণ হাস্যকর বললে লঘু করে বলা হয়। রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা কোথায় কিভাবে হল তা সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়নি। গুহক চণ্ডাল কোন নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রামচন্দ্রের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন ও সুগ্রীবের প্রতি রামের অনুগ্রহের জন্য তিনি কেন যে কৃতার্থ হয়েছিলেন, নাট্যকার তার কোন সঙ্গত কারণ দেখাননি। রাবণকে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে একবার সন্ন্যাসীবেশে লক্ষ্মণের সঙ্গে কথোপকথনরত দেখিয়ে ও পরে তাকে রঙ্গমঞ্চ থেকে একেবারে অদৃশ্য করে নাট্যকার নাট্যজ্ঞানের বিস্ময়কর অজ্ঞতা দেখিয়েছেন। কাব্যের অসঙ্গত উচ্ছ্বাস নাটককে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বস্তুত নাটকীয় বস্তুবিন্যাস এতই অসংলগ্ন যে নাটকের ক্রিয়া, গতি ও পরিণতিকে তা পদে পদে খণ্ডিত করেছে।

নাট্যকারের সামঞ্জস্য জ্ঞানের অভাব বিষ্কম্ভক ও মূল দৃশ্যাবলীর সংস্থানের মধ্যে প্রকট। বিষ্কম্ভক নাটকীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে মাত্র। কিন্তু আলোচ্য নাটকের বিভিন্ন বিষ্কম্ভকে রামায়ণের সমস্ত মূল ঘটনাই বিবৃত হয়েছে এবং মূল দৃশ্যাবলীতে গৌণ ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে।

চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে কোন চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল নয়। নাটকের মুখ্যপুরুষচরিত্রগুলি হলেন—দশরথ, বিশ্বামিত্র, রাম ও মাল্যবান। গৌণ পুরুষগুলি হলেন—লক্ষ্মণ, শৌষ্কল ও জনক। নাটকে মুখ্য নারী চরিত্র নেই। শূর্পণখা, শ্রমণা, কলহংসিকা প্রভৃতি গৌণনারীচরিত্র যারা আছে তাদের নাটকীয় কথাবস্তুর মধ্যে সংযোগসূত্র রচনার জন্য নাটকে আনা হয়েছে। ষষ্ঠাঙ্কে বিদ্যাধর-হেমাঙ্গদের উক্তিতে মন্দোদরীর উল্লেখমাত্র আছে। সীতার উল্লেখও পরোক্ষ। নাটকের একেবারে শেষে "কৃতমঙ্গলোপচারা মধ্য মাম্বা ভবতীং প্রতীক্ষতে"—বলে শত্রুঘ্নের উক্তিতে কৈকেয়ীর পরোক্ষ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখের নাটকীয় প্রয়োজন বোঝা যায় না। জাম্ববান চরিত্র এই নাটকে নূতন। এই চরিত্রটি না করেছে নাটকীয় ক্রিয়ার সাহায্য, না হয়েছে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। নাটকের চরিত্রগুলি প্রায়ই রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও চরিত্র-গুলির উপর বাল্মীকির প্রভাব অত্যন্ত অল্প। রামায়ণে গৌণ চরিত্রগুলিও দু-একটি রেখায় তাদের চিত্র যেমন সুস্পষ্ট মূর্তিলাভ করে, প্রাণরসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—নাটকে তা দেখা যায় না। বস্তুতঃ নাটকের চরিত্রগুলি যেন ব্যক্তিত্ববিহীন ও প্রাণ-চাঞ্চল্যবিহীন। তাই চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে নাটকের কোন চরিত্র যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি—তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

রসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, যুদ্ধ-আশ্রয়ী বীর রস স্পষ্টতই নাটকে উদ্দিষ্ট রস, যদিও তাতে ধর্মবীর রসের স্পর্শ আছে। এই রসের আলম্বন বিভাব তাড়কা, পরশুরাম, রাবণ প্রভৃতি ; উদ্দীপন বিভাব শত্রুপক্ষের কার্যাবলী ও ও উক্তিনিচয় এবং অনুভাব, নায়কের বাক্য ও কার্য। নাটকে সঞ্চারী ভাবের যে সামান্য পরিচয় আছে, তা মূলরস পুষ্টির আনুকূল্য করেছে বলে মনে হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে তা অঙ্গীরস-বিরোধী হয়ে উঠেছে। রামায়ণের রাম চরিত্রে যুদ্ধবীর রস ও ধর্মবীর রস উভয়ই সম্যক স্ফূর্তি লাভ করেছে। নাটকের রসের উপর রামায়ণের যুদ্ধবীর রসের প্রভাব থাকলেও রস সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

মুরারির নাটকের কাহিনীর উপর রামায়ণের প্রভাব অবিসংবাদিত, যদিও মুরারির আদর্শ ছিল ভবভূতি। কিন্তু মুরারির অনুকরণে আদর্শের সম্মান বিন্দুমাত্র রক্ষিত হয়নি।

৬। আশ্চর্যচূড়ামণি—শক্তি ভদ্র। (সম্পাদনা—শংকররাজ শাস্ত্রী, মাদ্রাজ, ১৯২৬)

দাক্ষিণাত্যের কবি ও নাট্যকার শক্তি ভদ্রের আবির্ভাবকাল পণ্ডিতগণ নবম শতাব্দী বলে মনে করেন। তার আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে রাবণ বধের পর রাম-সীতার অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী। বাল্মীকি-রামায়ণ-কাহিনী নাটকের মূল উপজীব্য হলেও নাট্যকার নাটকে নানা বিষয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। অঙ্কানুসারে নাটকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ :—

প্রথম অঙ্ক—রাম-সীতার জন্য পর্ণকুটির নির্মাণ-রত লক্ষ্মণের নিকট প্রেম নিবেদনার্থ শূর্পণখা উপস্থিত হল। লক্ষ্মণ তাকে অপসৃত করার জন্য পর্ণগৃহ প্রবেশের পর আসতে বললেন ; অতঃপর রাম-সীতা এলেন ; রাম-লক্ষ্মণের কথপোকথনে জানা গেল যে লক্ষ্মণ বনবাস-এর জন্য কৈকেয়ীর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। রামচন্দ্র কৈকেয়ীর দোষাপসারণের চেষ্টা করলেন। কৈকেয়ী রাজা দশরথের মৃত্যুর কারণ লক্ষ্মণের এই কথায় রামচন্দ্র মৃত্যুর জন্য দৈবকে দায়ী করেন। সীতাও রামচন্দ্রের উক্তি সমর্থন করে বললেন যে—দৈবই দায়ী।

"যুজ্যতে তাদৃশেন বিধিনা ভবিতব্যম্।
কা পুনরন্যথা আত্মানং লোকং চ বিনাশয়তি।"

লক্ষ্মণ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক—অঙ্কের আরম্ভে শূর্পণখা পুনরায় রামচন্দ্রকে পতিরূপে পাওয়ার চেষ্টা করলেন। রাম সন্ন্যাসধর্মাবলম্বন হেতু তাঁকে ত্যাগ করে লক্ষ্মণের নিকট যেতে বললেন। শূর্পণখা মনে মনে স্থির করল যে লক্ষ্মণ যদি তাকে গ্রহণ না করে তবে সে স্বরূপ ধারণ করবে। লক্ষ্মণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্বরূপ ধারণ করে শূর্পণখা লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠে গ্রহণ করে শূন্যে উড়ে গেল। রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে উদ্যত হলে সীতা বললেন 'আর্যপুত্র, কো মাং রক্ষতি?' লক্ষ্মণকে তার হস্তগত আয়ুধ রক্ষা করল। শূর্পণখাকে ভূপাতিত করে লক্ষ্মণ তার নাসাকর্ণচ্ছেদন করলেন। স্ত্রীলোককে আঘাত করার জন্য লক্ষ্মণ লজ্জিত হলেও রাম তার কার্য সমর্থন করলেন। শূর্পণখা খর-দূষণ ও রাবণকে এই অপমানের সংবাদ জানানোর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বৃদ্ধতাপস ও ঋষিকুমারের সংলাপ থেকে জানা গেল যে রাম খর-দূষণাদিকে বধ করেছেন। সংবাদ পেয়ে রাবণ ক্রোধান্বিত হয়ে মারীচের কাছে এসে মারীচকে 'ত্বং মৃগরূপেন রামং বিলোভ্য দূরীকুরুষ, তাবদহং সীতাং স্বীকরিষ্যামি' বলে অনুরোধ করে। মারীচ রাম-পরাক্রম স্মরণ করে প্রথমে সম্মত হল না। পরে রাবণ তাকে বধ করতে উদ্যত হলে প্রাণভয়ে রাজী হয়।

নাটকীয় দৃশ্যে দেখা যায় রামের বামাক্ষি স্পন্দিত হলে রাম অশুভ আশঙ্কা করতে থাকেন। তারপর খর-দূষণাদির রাক্ষস বধের জন্য ঋষিপ্রদত্ত কবচ ধারণ করে এবং রাম-সীতার জন্য অঙ্গুলীয়ক ও শিরোমণি গ্রহণ করে লক্ষ্মণ রামসীতাকে সেগুলি গ্রহণ করতে বলেন। রাম সীতা সেগুলি গ্রহণ করলেন। এমন সময় বন উজ্জ্বল করে এক স্বর্ণমৃগের আবির্ভাব হল। সীতা মৃগটিকে পেতে ইচ্ছা করলে রাম লক্ষ্মণকে সীতাকে রক্ষা করতে আদেশ দিয়ে মৃগের সন্ধানে গেলেন। হঠাৎ রামের আর্তস্বর শ্রুত হল। সীতা ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যেতে বললেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বোঝানোর নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেন। অতঃপর রাবণ শূর্পণখা ও সারথি উপস্থিত হল। রাবণ রামরূপ ধারণ করে সীতার নিকট এল। রাবণের আদেশে সারথি লক্ষ্মণ রূপ ধারণ করে বললেন—'তপস্বিগণ ধ্যান যোগে জেনেছেন যে ভরতের রাজ্য বিপন্ন, তাই সত্বর তাঁর সাহায্যার্থে যাওয়ার জন্য রথ প্রেরণ করেছেন।' সকলে তখন আকাশমার্গে উড্ডীন হলেন।

ইতোমধ্যে শূর্পণখা সীতার রূপ ধারণ করে রামের নিকট এল। কিন্তু অদ্ভুতাঙ্গুলীয়কের আকস্মিক স্পর্শে শূর্পণখা স্বরূপ ধারণ করলে সমস্ত ব্যাপারটি রাম-লক্ষ্মণ জানতে পারলেন এবং শূর্পণখার মাধ্যমে রাবণকে শাসন বাক্য প্রেরণ করলেন।

চতুর্থ অঙ্ক—রাবণ লক্ষ্মণরূপী সারথিকে রথ থামাতে বলে সীতাকে পুরী প্রবেশ করতে বলে। সীতা তখনও রাবণকে রাম মনে করে আছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার না হয়ে একটা বিষণ্ণ ভাব রয়েছে। ইতিমধ্যে রাবণ কামপীড়িত হয়ে সীতার কেশ বন্ধন করতে গেলে আশ্চর্যচূড়ামণি সংযোগ-এ রাবণ স্বরূপ লাভ করল। তখন সীতার আর্তস্বর শোনা গেল। সীতার আর্তস্বরে আকৃষ্ট হয়ে জটায়ু সীতাকে রক্ষা করতে এল এবং রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হল। রাবণ সীতাকে নিয়ে চলে গেল।

পঞ্চম অঙ্ক—এখানে সীতার নিকট রাবণের প্রেমনিবেদনের ঘটনা বর্ণিত। অশোকবনে সীতার নিকট প্রণয়-নিবেদনকারী রাবণের ব্যবহার দেখার জন্য মন্দোদরী চেড়ী সহ প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেন। অতঃপর রাবণ অশোকবনে প্রবেশ করলে অমাত্যগণ নানাভাবে রাবণকে পরস্ত্রী ধর্ষণকার্য থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। পরস্ত্রীহরণকরা অনুচিত, অমাত্যদের এই কথায় রাবণ শাস্ত্রে যাঁরা পরস্ত্রীহরণ করেও পূজ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের কথা বলে। সাধু প্রকৃতির রামচন্দ্রের প্রতি এই ব্যবহার অনুচিত, অমাত্যদের এই কথায় রাবণ রাম যে সাধু ব্যক্তি নন তা বলে এবং প্রমাণ স্বরূপ বিনা কারণে রামের বালীবধের কথা বলে। অমাত্যগণ তখন রাবণকে ত্রিবর্গ সাধন করতে বললে রাবণ বললেন যে ধর্ম ও অর্থ তাঁর আয়ত্ত, কিন্তু কাম আয়ত্তে নয় বলে তিনি সীতাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। এরপর রাবণের আদেশে অমাত্যগণ নিষ্ক্রান্ত হলে রাবণ সীতার কাছে প্রেম নিবেদন করে। রাবণের চেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং সীতা তাকে কটূক্তি করলে রাবণ সীতাকে বধ করতে উদ্যত হয়। তখন মন্দোদরী আত্মপ্রকাশ করে রাবণকে নিবারণ করে। অতঃপর সীতা আত্মহত্যা করার সংকল্প করেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক—এই অঙ্কে সীতা-হনুমান সংবাদ বর্ণিত। হনুমানের সংলাপে বালীবধ, রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, বানরগণ কর্তৃক সীতা অন্বেষণ, হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন প্রভৃতির বর্ণনা আছে। হনুমান সীতাকে রামপ্রদত্ত অভিজ্ঞান অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক দেয় এবং রাম শীঘ্রই রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করবেন এই বলে সীতাকে সান্ত্বনা প্রদান করে। সীতাকে শোকাহত না হতে অনুরোধ জানিয়ে সে বিদায় গ্রহণ করে।

সপ্তম অঙ্ক—বিষ্কম্ভকে বিদ্যাধর-মিথুনের সংলাপে রাবণাদি রাক্ষসগণের নিধন সংবাদ ব্যক্ত হয়েছে। রাম বিভীষণকে রাজা রূপে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করতে বললে বিভীষণ সুগ্রীবের মাধ্যমে প্রস্তাব করেন যে সীতা নগরী থেকে নিষ্ক্রমণ না করলে তিনি নগরে প্রবেশ করবেন না। রামাদেশে তখন সীতাকে আনয়নের ব্যবস্থা হল। সুবেশধারিণী সীতাকে দূর থেকে দেখে এবং তাঁকে বিরহক্লিষ্টা

মনে না হওয়ায় রাম সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সীতা রামের এই সন্দেহের কথা জানতে পেরে অগ্নিপ্রবেশ করতে চাইলে রাম আদেশ দিলেন এর ব্যবস্থা করতে। সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, এমন সময় নারদ দেবগণ ও দশরথাদির সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেবগণ ও পিতৃগণের আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করলে নারদ বললেন যে তাঁরা পতিব্রতা সীতাকে দেখতে এসেছেন। রাম তখন তাঁর সীতাকে সন্দেহের কারণ সীতার রূপশোভার উল্লেখ করলে নারদ বললেন যে অনসূয়ার বরে তা সম্ভব হয়েছে। রাম তখন সন্তুষ্ট হলেন। নারদ তখন রামকে বললেন যে রাবণ বধের সঙ্গে তাঁর বনবাস কাল শেষ হয়েছে। এখন দেবগণ ও পিতৃগণ সীতা ও লক্ষ্মণসহ তাঁকে অযোধ্যায় যেতে আদেশ করছেন। নারদ সবাইকে পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় যেতে বললে রাম সকলকে নিয়ে অযোধ্যার পথে যাত্রা করলেন।

নাটকের বস্তুবিন্যাস আলোচনা করলে প্রথমেই নাটকে দুটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এ-যাবৎ আলোচিত রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র 'উত্তররামচরিত' ছাড়া প্রতি নাটকই রামের বাল্যজীবন থেকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত রামায়ণের প্রধান ঘটনাবলীকে নিজ নিজ আলোচ্য বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই নাটকের বিষয়বস্তুর আরম্ভ হয়েছে অরণ্যকাণ্ডের শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ থেকে এবং শেষ হয়েছে লঙ্কাকাণ্ডে, সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনে। এতে নাটকের নির্বাচিত নাট্যঘটনার সংসক্তি বেড়েছে। অপর বৈশিষ্ট্য হল নাটকীয় দ্বন্দ্বে মূল রামায়ণ-কাহিনীর অনুমোদন। 'মহাবীর চরিত' 'অনর্ঘরাঘব' 'বালরামায়ণ' 'প্রসন্ন রাঘব' প্রভৃতি নাটকে দেখা যায় রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছে সীতা-কর গ্রহণকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এখানে দ্বন্দ্বের মূলে আছে প্রথমে শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ এবং পরে রাবণের সম্ভোগ লিপ্সা। এই দিক দিয়ে ঘটনার গতি রামায়ণ কাহিনীকে বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করেছে।

'আশ্চর্য চূড়ামণি' নাটকে নাট্যকার কতকগুলি অভিনবত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন :—

(১) সিন্ধুবধের কাহিনী রামসীতার গোচরীভূত হওয়া।

(২) শূর্পণখা রামকে পতিরূপে প্রার্থনা করলে সীতার সেই প্রার্থনার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও রামকে তজ্জন্য অনুরোধ।

(৩) শূর্পণখার কর্তৃক লক্ষ্মণকে নিয়ে আকাশপথে অদৃশ্য হওয়া।

(৪) লক্ষ্মণের সাহায্যার্থে রাম যেতে উদ্যত হলে সীতার ভীতিজনিত নিষেধ।

(৫) রাবণের আসন্নযুদ্ধ সম্বন্ধে রামের আশঙ্কা।

(৬) অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক ও আশ্চর্যচূড়ামণির অলৌকিক শক্তির কল্পনা।

(৭) সীতাহরণের উদ্দেশ্যে রাবণ, সারথি ও শূর্পণখার যথাক্রমে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার রূপ ধারণ।

(৮) অদ্ভূতাঙ্গুলীয় স্পর্শে শূর্পণখার স্বরূপ প্রাপ্তি।

(৯) আশ্চর্যচূড়ামণির স্পর্শে রাবণের স্বরূপ প্রাপ্তি।

(১০) মন্দোদরীর অশোকবনে গমন ও সীতা-নিধনে উদ্যত ক্রুদ্ধ রাবণকে বাধাদান।

(১১) সীতাকে পরীক্ষা করে গ্রহণ করা কর্তব্য বলে লক্ষ্মণের অভিমত ও সুবেশধারিণী সীতার সম্বন্ধে লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমানের প্রতিকূল মন্তব্য।

অন্যান্য নাটকের ন্যায় এই নাটকেও দুটি ধারা দেখা যায়—একটি রামায়ণের কাহিনীর ধারা এবং অপরটি নাট্যকারের মৌলিক কল্পনার ধারা। একটির কাঠামোর চতুষ্কোণে অপরটি রচিত। রাম-লক্ষ্মণকে দেখে শূর্পণখার মদনপীড়া, লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ, খর-দূষণাদি বধ, স্বর্ণমৃগ দর্শনে সীতার লোভ ও রাম কর্তৃক তার পশ্চাদ্ধাবন, রামের রক্ষার্থে লক্ষ্মণ যেতে অস্বীকৃত হলে সীতার নিষ্ঠুর ভর্ৎসনা, সীতাহরণ, রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ ও মৃত্যু, বালীবধ, রাম-সুগ্রীব মিলন, বিভীষণের সঙ্গে মিত্রতা, লঙ্কাযুদ্ধ, রাবণাদি সহ রাক্ষস বধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনাগুলিই রামায়ণ-কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। নাট্যকারের মৌলিকতা উপরে বিবৃত হয়েছে।

নাট্যকের বস্তুবিন্যাসের বিশ্লেষণ ও বিচার করিবার পূর্বে নাটকের নামকরণ ও তার সঙ্গে নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় খর-দূষণাদির রাক্ষসবধের জন্য ঋষিগণ রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাকে যথাক্রমে অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক, কবচ ও চূড়ামণি দান করেছেন। নাটকের পক্ষে এইগুলির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। কারণ নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল রাবণ কর্তৃক রামরূপ ধারণ করে সীতাহরণ এবং শূর্পণখা কর্তৃক সীতারূপ ধারণ করে রামকে প্রবঞ্চনা, এই মূল বৈশিষ্ট্যের যথাযথ পরিণতি লাভের পক্ষে অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক ও আশ্চর্যচূড়ামণির প্রয়োজন অপরিহার্য। শুধু এই ঘটনা নয়। অন্যান্য নাটকীয় ঘটনার অগ্রগতিতে এই আশ্চর্যচূড়ামণি সাহায্য করেছে। আলোচ্য নাটকে সীতার অগ্নিপরীক্ষার ব্যাপারে যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তার মূলে আছে এই চূড়ামণির প্রভাব। রামচন্দ্র যখন সুবেশধারিনী সীতাকে দেখে সন্দেহ করলেন এবং তাঁর সন্দেহের কথা যখন নারদকে জানালেন তখন নারদ বললেন 'তস্যামহর্ষি-

পত্ন্যাস্তাবদনসূয়ায়াঃ বরপ্রদান বশাৎ খলু'। তৎক্ষণাৎ রামের মনে পড়ল অনুসূয়ার আশীর্বাদের কথা।

নাটকীয় বস্তুবিন্যাসে দুটি গ্রন্থির সাহায্যে নাটকীয় গতির আবরণ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটি রাবণ ও শূর্পণখার ছদ্মরূপ ধারণ ও দ্বিতীয়টি সীতার রূপশোভার প্রতি রামের বক্রদৃষ্টি। দুটি গ্রন্থিই ছিন্ন হয়েছে—অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক ও আশ্চর্য-চূড়ামণির সাহায্যে। তাই এই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'আশ্চর্যচূড়ামণি'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাট্যকার নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে আশ্চর্যচূড়ামণি ও অদ্ভুতাঙ্গুলীয়কের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। এতে নাট্যকারের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে সত্য। কিন্তু কতখানি বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে বলা শক্ত। কারণ রাবণের ও শূর্পণখার যথাক্রমে রাম ও সীতার রূপ ধারণ এবং অঙ্গুলীয়ক ও চূড়ামণির সাহায্যে সেই মায়া নিরসন দ্বারা নাট্যকার একটি চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেও তা যেন একটা অপরিপক্ব কৌশল হয়েছে বলে মনে হয়। সীতা ও রাম আকাশ ও ভূমি হতে পরস্পরকে দেখতে পেলেন। সীতার মনে একবার ধিক্‌কারও হল। রামের মনে সন্দেহ হল। কিন্তু তিনিও সিদ্ধান্ত করলেন "সত্যংসীতা পরপুরুষ গোচরেন তিষ্ঠতি, ধ্রুবমিয়ং বঞ্চনা সীতা মায়া রাম পার্শ্বে। যথা সোঽহং ন ভবামি তথা সীতাপি ন ভবতি।" সীতাও অনুরূপভাবে সমস্যার সমাধান করে স্থির করলেন "সত্যমেবৈতৎ কুতঃ আর্য্যপুত্রস্য স্ত্রী সম্বন্ধঃ, যথাসাহং ন ভবামি তথার্য্য পুত্রোঽপি স ন ভবতি।" অথচ উভয়ের মনে এই চিন্তার উদয় হল না যে অদ্ভুতাঙ্গুলীয়ক ও আশ্চর্যচূড়ামণির সাহায্যে এগুলি রাক্ষসীর মায়া কিনা পরীক্ষা করে দেখা যাক। পরে যে ঘটনা অর্থাৎ পরস্পরের স্পর্শ আকস্মিকভাবে ঘটানো হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রথমেই সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। কাজেই যে পরিবেশ সৃষ্টি করে এই চমৎকারিতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে তার মূল অতি শিথিল বলে এই অবস্থাটি নাট্যকারের নিপুণ হস্তের পরিচয় দেয় না। তবে ঘটনার এরূপ সংস্থাপন না হলে পরবর্তী নাট্য-কৌতূহলও (Dramatic suspense) রক্ষিত হয় না।

নাট্যকার শক্তিভদ্র হয়তো মনে করেছিলেন যে রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ করিয়ে বাল্মীকি সীতার প্রতি সুবিচার করেননি। যিনি পতিব্রতা ও সতীত্ব শক্তির প্রতিমূর্তি, তাঁকে রাবণ স্বমূর্তিতে হরণ করলে অথচ সে সতীত্বতেজে ভস্মীভূত ও বিকলাঙ্গ হল না—এ যেন সতীত্ব শক্তির অপমান। তাই বোধ হয়, তিনি রামরূপে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কল্পনা করে বাল্মীকির ত্রুটি সেরে নিলেন। কিন্তু অদ্ভুত কল্পনার দ্বারা তা করতে গিয়ে ঘটনার স্বাভাবিকতার প্রতি তিনি যথোচিত দৃষ্টি

দান করতে পারেননি। এই অস্বাভাবিকতার উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। আর-একটি অস্বাভাবিকতা হল রাবণের ব্যবহার। সীতাকে নিজ আয়ত্তাধীন করেও তিনি তাঁকে স্পর্শ বা আলিঙ্গন করেনি! রামায়ণের কবি এর কারণস্বরূপ নল-কুবেরের অভিশাপের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই নাট্যকার সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করেননি। তিনি নিম্নোক্ত দুটি সংলাপে তার কারণ নির্দেশ করেছেন।

১) "রাম ইতি

ময়িবুদ্ধ্যাপ্য সন্দিগ্ধামিমাং ন স্প্রষ্টুমুৎসহে।
অহো তৎপূর্ব দৃষ্টানাং কষ্টঃ স্ত্রীণাং সমাগতিঃ॥"

২) "ভবত্বনয়া তাবৎ স্পর্শসুখ মনুভবামি। অহো নু খলু বলবান সংস্তবঃ

তথাহি — অপি বাসববারণস্য বক্তে
মদকম্পাষিত-কর্ণচামরাগ্রে।
অনিবারিত বিক্রমঃ করো মে
দয়িতাং স্প্রষ্টুমলং ন তাপসস্য॥"

অর্থাৎ প্রথম দৃষ্ট স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করার দুরূহতা এবং অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করার ক্ষমতার অভাবই রাবণের পক্ষে বাধা বলে নাট্যকার দেখিয়েছেন। কিন্তু বহুবল্লভ এই রাক্ষসরাজের পক্ষে এই উক্তি দুটি নিতান্তই বিসদৃশ হয়েছে তা ন্যাট্যকার না বুঝলেও যে-কোন সাধারণ লোকের কাছে তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। সীতাও চতুর্থ অঙ্কে নানাভাবে মনের ভীতি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু একবারও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে আশ্চর্যচূড়ামণির সাহায্যে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেননি। তাই স্বাভাবিক ভাবে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে নাট্যকারের চমৎকার সৃষ্টির চেষ্টা 'বালোচিত' হওয়ায় তেমন সার্থক হয়ে ওঠেনি।

রসসৃষ্টিতেও নাট্যকার সফলকাম হননি। নাটকে একদিকে রাম-সীতাকে অবলম্বন করে যে শৃঙ্গার রসের সৃষ্টি হতে পারত নাট্যকার তাকে যেমন স্ফূর্তি লাভ করতে দেননি, তেমনি রাম-রাবণকে অবলম্বন করে যে বীররসের অবতারণা ও পরিণতি দেখানো যেতে পারত তাও সুষ্ঠুভাবে করতে পারেননি। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা নাটকীয় বস্তুবিন্যাসকে একত্রে বাঁধবার যেমন ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, তেমনি রসসিদ্ধ কাহিনী ও চরিত্রাবলী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণার অভাবে চরিত্র ও পরিস্থিতির মাধ্যমে রসসৃষ্টিতেও নাট্যকার বিফলকাম হয়েছেন। নাটকের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বিচরণ করলেও সামাজিক মনে নিগূঢ় বিস্ময়জাত অদ্ভুত রসের উৎপত্তি হয় না। রামায়ণের রাম-সীতাদির চরিত্রে যে-যে রসের অবতারণা করে

মহর্ষি বাল্মীকি মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে রসসিক্ত করে তুলেছেন, নাট্যকার তার ব্যতিক্রম করায় চরিত্র ও রসসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৭। বাল রামায়ণ—রাজশেখর (সম্পাদনা—গোবিন্দ দেব শাস্ত্রী, বারাণসী, ১৮৬৯)

রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রাজশেখর-রচিত নাটকের নাম 'বাল রামায়ণ'। রাজশেখরের আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর শেষে বা দশম শতাব্দীর প্রথমে বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

'বাল রামায়ণ' দশ অঙ্কে বিভক্ত।

প্রথম অঙ্কে—সীতা-কর গ্রহণকে কেন্দ্র করে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বই যে নাটকের বিষয়বস্তু তা প্রথমাঙ্কের বিষ্কম্ভকে দেখা যায়।

নাটকীয় দৃশ্যে আছে যে রাবণ নিজে মিথিলায় এসে জনকের নিকট সীতার কর প্রার্থনা করলে জনক হরধনুভঙ্গ পণের কথা উল্লেখ করেন। রাবণের অনুরোধে সীতাকে ও হরধনুকে আনয়ন করা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাবণ প্রাকৃত জনের মতো পণরক্ষা করে সীতাকে বিবাহ করতে অসম্মত হয়ে হরধনু দূরে নিক্ষেপ করে। হরধনুর অবমানায় ক্রুদ্ধ হয়ে জনক রাবণকে যুদ্ধে আহ্বান করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুনঃশেফের অনুরোধে বিরত হন। রাবণ ঘোষণা করেন—

"নিজভুজলবদৃপ্যদ্বীর বীর্য্যে সমাজে
হঠহরণ বিনোদং রাক্ষসেন্দ্রঃ করোতু॥" ১।৬০

দ্বিতীয় অঙ্কে—রাবণ-জামদগ্ন্য বিরোধের ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। রাবণ সীতা-পরিণেতাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামদগ্ন্যের নিকট কুঠার প্রার্থনা করে দূত পাঠায়। রাবণকে কুঠার দানের পরিবর্তে হরধনু অবহেলার জন্য রাবণকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে জামদগ্ন্য লঙ্কায় আসেন। উভয়ের মধ্যে কটূক্তি বিনিময়ের পর যুদ্ধোদ্যম হলে ঋচিক, পুলস্ত্য প্রভৃতি ঋষির অনুরোধে উভয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত হন এবং রাবণ ও জামদগ্ন্যের মধ্যে পুনরায় মিত্রতা স্থাপিত হয়।

তৃতীয় অঙ্কে—রাম কর্তৃক তাড়কা ও সুবাহু বধ ও মারীচকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপের বর্ণনা আছে। এরপর বর্ণিত হয়েছে সীতাবিরহতপ্ত রাবণের চিত্তবিনোদনের জন্য অনুষ্ঠিত রাম-সীতা-পরিণয় নাটকের অভিনয়ের কথা। এই নাটকাভিনয়ের দ্বারা ইতিমধ্যে যে রামচন্দ্র হরধনুভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেছেন—নাট্যকার সেই সংকেত দিলেন। এই গর্ভনাটকের উপর কালিদাসের রঘুবংশের ইন্দুমতী-স্বয়ংবরের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

চতুর্থ অঙ্কের বর্ণিত বিষয় হল—রাম-ভার্গব দ্বন্দ্ব। দানব বিজয়ে ইন্দ্রকে সাহায্য করে ফেরার সময় দশরথকে ইন্দ্র আদেশ দিলেন মিথিলা থেকে পুত্র ও পুত্রবধূগণকে অযোধ্যায় নিয়ে যেতে। সেই সময় ইন্দ্র দশরথকে বলেছিলেন যে হরধনুভঙ্গের জন্য রাম-ভার্গব সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। মাতালির সংলাপে ও চিত্রদর্শনের মাধ্যমে ভার্গবের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা, মাতৃবধ, কার্ত্তবীর্যার্জুন বধ প্রভৃতি বিবৃত হয়েছে। অতঃপর ভার্গবের আগমন ও আস্ফালন। বিনয়োক্তি দ্বারা রামের তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা, ক্রুদ্ধ জনকের ধনুর্ধারণ ও দশরথ কর্তৃক নিবৃত্তি। বিশ্বামিত্রের অনুরোধ ও ভার্গবের প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি ঘটনায় 'মহাবীর চরিত' ও 'অনর্ঘ রাঘবে'র অনুকরণ সুপ্রকট। এই অঙ্কের অভিনবত্ব হল লক্ষ্মণ কর্তৃক ভার্গবের বৈষ্ণবী ধনুতে জ্যারোপণের ফলস্বরূপ পারিতোষিক হিসাবে উর্মিলাকে লাভ। এতেও ভার্গবের ক্রোধের উপশম হল না। তিনি আবার রামকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং রাম তাঁর আহ্বান গ্রহণ করলেন।

পঞ্চম অঙ্কে—সীতা-প্রেমে রাবণের উন্মাদ দশার বর্ণনা ও যন্ত্র-জানকীর সাহায্যে তার বিরহ মোচনের চেষ্টার বর্ণনা আছে। এই অঙ্কে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'রও কোন স্থলে 'উত্তররামচরিতে'র প্রভাব আছে। অঙ্কের শেষ ভাগে রাম কর্তৃক শূর্পণখার নাসাচ্ছেদ ও তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অংশ মূল রামায়ণ-কাহিনীর অনুসরণ করেছে।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষয়-বিন্যাস অভিনব। রাবণমন্ত্রী মাল্যবানের নির্দেশমতো মায়াময় ও শূর্পণখা দশরথ ও কৈকেয়ীর ছদ্মবেশে বরদান ছলে রামকে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে প্রেরণ করে। এদিকে স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সকৈকেয়ী দশরথ বামদেবের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করে বিশেষ দুঃখিত হন। দশরথের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বামদেব সবিস্তারে রামাদির বনগমন বৃত্তান্ত এবং শত্রুঘ্ন-সহ ভরতের রামপাদুকা গ্রহণপূর্বক নন্দীগ্রামে অবস্থিতির কথা বলেন। এরপর জটায়ুর দূত রত্নশিখণ্ডের আগমন। তার কাছে জানা গেল যে সীতার আনন্দবিধানের জন্য রাম স্বর্ণমৃগের অন্বেষণে গেলে লক্ষ্মণও সীতার আশঙ্কা নিবারণার্থে মুনিপত্নীদের নিকট সীতাকে রেখে রামের অনুসরণ করেন। তারপর রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং বাধাদানের জন্য পক্ষিসৈন্য নিয়ে রাবণের সঙ্গে জটায়ুর যুদ্ধ এবং অবশেষে জটায়ুর মৃত্যু বর্ণনান্তে অঙ্কের সমাপ্তি।

এই অঙ্কের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দশরথ ও কৈকেয়ীর অবস্থা ও ব্যবহার বর্ণনে। রামচন্দ্রের বনগমনের পর দশরথের মৃত্যু হয়নি। তিনি রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ সংবাদ শুনেছিলেন। কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও সুমিত্রার পরম সখ্যভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সপ্তমাঙ্কের বিষ্কম্ভকে কবন্ধ দৈত্য নিধন, সপ্তশালভেদ, বালীবধ, সুগ্রীবের

অভিষেক, হনুমানের লঙ্কা গমন, অশোকবন ধ্বংস, সীতার শিরোমণি আনয়ন, বিরাধ বধ, বিভীষণের রাম পক্ষে যোগদান ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নাট্যাংশে রাম কর্তৃক সমুদ্র আক্রমণ, সমুদ্রের আবির্ভাব ও সেতু-বন্ধনের উপদেশ এবং নলের অধিনায়কত্বে সেতু-বন্ধন আরম্ভ বর্ণিত হয়েছে। সেতু-বন্ধনকালে রাক্ষসসৈন্যগণের আক্রমণ ও রাবণ-পুত্র সিংহনাদের সঙ্গে রামাদির কথোপকথন ও যুদ্ধোদ্যম বর্ণনার পর এই অঙ্কের পরিসমাপ্তি।

অষ্টমাঙ্কের বিষ্কম্ভকে দেখা যায়, শুক-সারণের মাধ্যমে রাবণ রামের নিকট প্রস্তাব করেন যে নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা করা হবে। যে জয়লাভ করবে সে অপরের কলত্রাদি সহ রাজ্য গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবের ফলে রামের পক্ষে অঙ্গদ ও রাবণের পক্ষে রাবণ-পুত্র নরান্তক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হল এবং যুদ্ধে নরান্তক নিহত হল। রাবণ তখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করতে এবং নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার হতে নির্গত মেঘনাদকে আহ্বান করতে আদেশ দিল। নানা প্রচেষ্টায় কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হল এবং মেঘনাদ ও লক্ষ্মণের তুমুল যুদ্ধ হ'ল। ভীষণ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ উভয়েই নিহত হল।

নবমাঙ্কের বিষ্কম্ভকে লঙ্কাযুদ্ধে নিহত উল্লেখযোগ্য বীরগণের এবং তাদের নিহন্তাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আকাশে বিমানে অবস্থিত ইন্দ্র ও দশরথ কর্তৃক রাম-রাবণের যুদ্ধ দর্শন, ভীষণ সংগ্রামে রাবণবধ বর্ণানান্তে দেবগণের আনন্দ উৎসবের মধ্যে অঙ্কের পরিসমাপ্তি।

দশমাঙ্কের প্রথমে 'মহাবীর চরিতে'র অনুকরণে লঙ্কা ও অলকার কথোপকথনের মাধ্যমে সীতার অগ্নিপরীক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বিমানযোগে রাম-সীতার অযোধ্যা-যাত্রা। পথে বিভিন্ন যাত্রাপথ অবলম্বন করে এবং নানা দেশ দর্শনান্তে সকলের অযোধ্যায় উপস্থিতি ও পুনর্মিলন।

নাটকীয় বস্তুবিন্যাস বিশ্লেষণ করলে এই নাটকের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে অভিনবত্ব লক্ষ্য করা যায় :—

(১) কাহিনীর মূল দ্বন্দ্ব সীতার কর প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে রাম ও রাবণের যুদ্ধ।

(২) রামায়ণের কাহিনীর বিবর্তনের কেন্দ্রস্থল কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা। নাটকে সে কাহিনী অত্যন্ত গৌণ এবং প্রকৃত দশরথ ও কৈকেয়ীকে এই অনুচিত ও অন্যায় কার্য থেকে দূরে রেখে ছদ্ম দশরথ ও কৈকেয়ীর সাহায্যে তা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩) দশরথ-চরিত্রের নবরূপদান নাটকীয় কাহিনীর বিশেষত্ব। বাল্মীকির মহাকাব্যে দশরথ বৃদ্ধ স্ত্রৈণ মূঢ় ও অসহায়ভাবে দুর্বল। ইন্দ্রসখা, বীরশ্রেষ্ঠ দানব-দলনকারী, রাজ্যেশ্বর দশরথের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ধৈর্য ও শক্তিমত্তা থাকা প্রয়োজন

রামায়ণের দশরথের তা নেই। রাজশেখর দশরথ-চরিতের এরূপ উপস্থাপনা উপযুক্ত মনে করেননি। তাই তাঁর নাটকে দশরথ-চরিত্রে স্বাভাবিক বীর্য, ধৈর্য ও সংযম লক্ষিত হয়। কৈকেয়ীকেও তাঁর তীব্র স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি দান করে তাঁর কুল-গরিমা ও মাতৃমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

(৪) বাল্মীকি-রামায়ণে রাম-রাবণের দ্বন্দ্বের মূলে আছে শূর্পণখার অপমান। রাবণ ভগ্নীর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৌশলে সীতাহরণ করে। রামায়ণের রাবণের এই কার্য তস্করোচিত কার্য। রাজশেখর একে রামায়ণের অন্যতম ত্রুটি মনে করে রাবণ-সীতার সম্পর্ক নূতন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। রাবণের মতো বীর সামান্য স্ত্রীলোকের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কুলধ্বংসকারী এক মহাঅন্যায় করবে তা রাজশেখর উচিত মনে করেননি। তাই নারীলিপ্সু এই রাজাকে সীতা-করপ্রার্থী ও সীতার রূপে উন্মাদ করে রাম-রাবণ যুদ্ধের মৌলিক উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন।

(৫) রাবণ কর্তৃক পরশু প্রার্থনা ও রাবণ-জামদগ্ন্য যুদ্ধোদ্যম অভিনব কাহিনী যা মূল রামায়ণে নেই।

(৬) পক্ষিসৈন্য সহ জটায়ুর রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ, সাগরে সেতু-বন্ধনকালে রাক্ষস সৈন্যদলের বাধাদান—এগুলিও নাটকের অন্যতম অভিনবত্ব।

(৭) তৃতীয় অঙ্কে রাম-সীতা-পরিণয় ও পঞ্চম অঙ্কে সীতা-প্রেমে উন্মাদ রাবণের বর্ণনা অভিনব হলেও এরূপ ঘটনা-বিন্যাস নাটকে অতিনাটকীয় ভাবের সৃষ্টি করেছে।

(৮) লক্ষ্মণ কর্তৃক জামদগ্ন্যের ধনুতে জ্যারোপণ ও পুরস্কারস্বরূপ উর্মিলা-প্রাপ্তি নাটকের নূতনত্ব।

(৯) রামায়ণে দশরথ রামের বনগমনের পর প্রাণত্যাগ করেছিলেন। নাটকে দশরথ জটায়ুর দূত রত্নশিখণ্ডের মুখে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ ও রাবণের সহিত যুদ্ধে জটায়ুর প্রাণত্যাগ পর্যন্ত শুনেছিলেন। নাটকে দশরথের প্রাণত্যাগের কাহিনী নেই।

(১০) নাটকে অঙ্গদ ও নরান্তকের যুদ্ধের নব উপস্থাপন ঘটেছে। শুক-সারণের মাধ্যমে রাবণ রামের নিকট প্রস্তাব করে যে নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসা করা হবে। যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করবে সে অপরের কলত্রাদিসহ রাজ্য গ্রহণ করবে। এই প্রস্তাবের ফলে রামের পক্ষে অঙ্গদ ও রাবণের পক্ষে তাঁর পুত্র নরান্তক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং যুদ্ধে নরান্তক নিহত হয়।

নাটকীয় কাহিনী বিচার করলে দেখা যায় কাহিনীতে দুটি ধারা সমান্তরাল-ভাবে চলেছে। একদিকে আছে নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবিত কাহিনী এবং অপর দিকে আছে মূল রামায়ণ-কাহিনীর প্রভাব। সে কাহিনীকে কেন্দ্র করে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অবতারণা করা হয়েছে—সীতা-কর গ্রহণের জন্য হরধনুভঙ্গ পণ—তা রামায়ণ থেকে গৃহীত। দ্বিতীয় অঙ্কের কাহিনী নাট্যকারের মৌলিক উদ্ভাবন হলেও এখানে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের প্রভাব দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কে তাড়কা ও সুবাহু বধ এবং মারীচের বিতাড়ন রামায়ণ-কাহিনীর অনুরূপ। চতুর্থ অঙ্কে রাম-ভার্গব দ্বন্দ্বও রামায়ণ-সম্মত যদিও ভবভূতির প্রভাব এখানে অধিকতর। প্রথমাঙ্কে রাবণের সীতার জন্য বিরহোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা প্রধানত 'বিক্রমোর্বশী' প্রভাবিত হলেও অঙ্কের শেষাংশে শূর্পণখার কাহিনী রামায়ণ-সম্মত। রামায়ণে দেখা যায় খর ও দূষণ শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং পরে রাবণকে সীতা হরণে উত্তেজিত করেছিল। নাটকেও শূর্পণখা অনুরূপ কার্যই করেছে। এই ঘটনা নাটকের মূল দ্বন্দ্বকে গতিদানে সাহায্য করেছে। ষষ্ঠ অঙ্কের বিষয়বিন্যাসে দেখা যায় যে, মন্থরা কর্তৃক উত্তেজিত কৈকেয়ী বর প্রার্থনার দ্বারা রামাদির বনগমন ব্যবস্থা, রামাদির যাত্রাপথ বর্ণনা, ভরতের পাদুকা গ্রহণ ও শত্রুঘ্ন-সহ নন্দীগ্রামে অবস্থিতি, রাম কর্তৃক সীতার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন, লক্ষ্মণের অনুগমন, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ ও জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ ও জটায়ু বধ ইত্যাদি নানা ঘটনার বর্ণনায় নাট্যকার বাল্মীকি-রামায়ণ কাহিনীকে প্রধানত বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন। এই অঙ্কের বিষয় সন্নিবেশ অভিনব হলেও রামাদির যাত্রাপথ বর্ণনায়, ভরতের পাদুকা গ্রহণ ব্যাপারে স্বর্ণমৃগানু-সন্ধানে রামচন্দ্রের যাত্রায় ও লক্ষ্মণের অনুগমনে ও জটায়ুর সঙ্গে যুদ্ধে রামায়ণের প্রভাব লক্ষিত হয়। নাটকের সপ্তমাঙ্ক প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে রামায়ণ দ্বারা প্রভাবান্বিত। কেবল সেতুবন্ধনে রাক্ষসসৈন্যগণের বাধাদান নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা। রাবণ কর্তৃক যন্ত্র-জানকীর শিরশ্ছেদ মূল রামায়ণে মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীতা বধের অনুরূপ। অষ্টমাঙ্কের অঙ্গদ-নরান্তক দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিকল্পনায় অভিনবত্ব থাকলেও এই অভিনবত্ব রামায়ণ-কাহিনীকে অবলম্বন করেই প্রদর্শিত হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে :

'অনন্তর মহাশক্তিশালী অঙ্গদ নরান্তকের বক্ষঃস্থলে যমসদৃশ মহাবেগবান্ গিরি-শৃঙ্গতুল্য মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিল, সেই মুষ্টিপ্রহারে বক্ষঃস্থল ভিন্ন নিমগ্ন হল এবং পিশাচ নরান্তকও আঘাতজনিত জ্বালা বমন করে রক্তাক্তদেহে ভূতলে পতিত হল।'

"অথাঙ্গদো মৃত্যু সমানবেগবৎ
সংবর্ত্য মুষ্টিং গিরিশৃঙ্গকল্পম্।

নিপাতয়ামান তদা মহাত্মা
নরান্তকস্যোরসি বালিপুত্রঃ ॥" রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৬৯।৯৩

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, রাবণের কার্য সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণের উক্তি, রাম-কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ ও কুম্ভকর্ণের বধ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্তির পূর্বে লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদকে আক্রমণ ও তুমুল যুদ্ধের পর মেঘনাদ বধ ইত্যাদি নানা ঘটনার বর্ণনায় নাট্যকার রামায়ণ-কাহিনীকেই মূলতঃ অনুসরণ করেছেন।

নবমাঙ্কে রাম-রাবণ যুদ্ধ মোটামুটি রামায়ণ-অবলম্বনে রচিত। দশমাঙ্কে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অযোধ্যা গমনের পূর্বে ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন রামায়ণ-কাহিনী-সম্মত। প্রত্যাগমনের পথে নানা দেশ ভ্রমণের বর্ণনায় ভবভূতি ও কালিদাসের প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, নাটকের প্রথমাঙ্ক থেকে দশমাঙ্ক পর্যন্ত নাট্যকাহিনী রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রামায়ণ-কাহিনীর চতুঃসীমার মধ্যে নাট্যকার নাটকীয় বিষয়বস্তুকে স্থাপিত করে নাট্যবস্তুর অভিনবত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ নাটকের মূল বস্তুবিন্যাসে, কি অবান্তর ঘটনা-যোজনায় রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। রামায়ণের বহু ঘটনাকে তিনি যথাযথ গ্রহণ করেছেন এবং কতগুলি ঘটনাকে পরিবর্তিত করে মূলদ্বন্দ্বের উপযোগী করার চেষ্টা করেছেন।

রামায়ণ ছাড়া পূর্ববর্তী কবি ও নাট্যকারের প্রভাব এই নাটকে কম নয়। কৈকেয়ীর ঘটনার নব উপস্থাপনে রাজশেখর ভাসের তথা ভবভূতির অনুগামী। নাটকীয় দ্বন্দ্ব তো স্পষ্টই 'মহাবীর চরিতে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত। চিত্রপ্রদর্শনের মাধ্যমে ভার্গবের পূর্বজীবনের ঘটনাবলী প্রদর্শন 'উত্তররামচরিতে'র আলেখ্য দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। পতিগৃহে যাত্রাকালে জনকের উপদেশাবলী 'শকুন্তলা' নাটকের কণ্বের উপদেশাবলীর অনুরূপ। পঞ্চম অঙ্কে রাবণের উন্মত্তদশা অঙ্কনে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র প্রভাব সুস্পষ্ট। রাবণ কর্তৃক বিভিন্ন ঋতুবর্ণনার উপর কালিদাদের 'ঋতুসংহারে'র প্রভাব সহজেই দৃষ্ট হয়। সীতা-স্বয়ংবর বর্ণনায় কালিদাসের 'রঘুবংশে' বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের অনুকরণ সুস্পষ্ট। গর্ভনাটকের পরিকল্পনায় হর্ষ ও ভবভূতির প্রভাব অনুমান করা অসংগত নয়।

রামায়ণের বস্তুবিন্যাসের সঙ্গে নাটকের বস্তুবিন্যাসের তুলনা করলে দেখা যায় যে নাট্যকার যে অভিনবত্বগুলির উল্লেখ করেছেন তার পশ্চাতে নাট্যকারের একটি বিশিষ্ট মনোভাব কাজ করছে। রামায়ণের কাহিনীর বস্তুবিন্যাসের কেন্দ্রস্থল হল কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা প্রসঙ্গ। এই কেন্দ্রীয় উৎস হতেই পরবর্তী সমস্ত কাহিনী স্বাভাবিক উৎপত্তি ও গতি লাভ করেছে। রাজশেখর নাটকের মূল প্রবাহ কৈকেয়ীর

ঘটনা থেকে সরিয়ে রাবণ-সীতা কাহিনীর উপর কেন্দ্রীভূত করেছেন। কাহিনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হয়েছে। নাটকের প্রথম অঙ্কেই মূল দ্বন্দ্বই বিবৃত হয়েছে। নাটকের তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্কে বস্তুবিন্যাসের অঙ্গীভূত মনস্তাত্ত্বিক তীব্রতাকে রূপ দেওয়া হয়েছে! নাটকের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও পরবর্তী সমস্ত অঙ্কই এই মনস্তাত্ত্বিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পথে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে।

বস্তুবিন্যাসের এই পরিবর্তনের ফলে আর-একটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে গেছে। রামায়ণের বস্তুবিন্যাসের দুটি দিক আছে—একটি দৈব দিক আর-একটি মানব দিক। যজ্ঞরক্ষার জন্যও রাবণ-সহ রাক্ষসগণের বধের জন্য দেবগণের অনুরোধে বিষ্ণু চার অংশে নিজেকে বিভক্ত করে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অলৌকিক গুণগরিমার অধিকারী হয়েও লোকজীবনে নিয়তির নিষ্ঠুর পীড়ন ও আকস্মিক আঘাত সহ্য করে বিষ্ণুরূপী রাম দেবকার্য সাধন করেন। রামায়ণের জীবনালেখ্য তাই দৈব ও পুরুষকারের সমন্বয়ে গঠিত।

'বাল রামায়ণে'র কাহিনী-বিন্যাসে ঘটনাবলী স্বাভাবিক পারম্পর্যে গ্রথিত হলেও এতে এই দিকটার অভাব আছে। এই অভাব প্রকট হয়েছে দশরথ-কাহিনীর নব উপস্থাপনে। সমস্ত কাহিনীকে কেবল মানবভিত্তিক করতে গিয়ে এবং স্বভাবকে উপেক্ষা করে ঔচিত্যবোধকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাট্যকারকে একদিকে ছদ্ম দশরথ ও ছদ্ম কৈকেয়ীর উপস্থাপন করতে হয়েছে এবং অন্য দিকে দশরথ ও কৈকেয়ীর রসসিদ্ধ চরিত্র দুটিকে যথাক্রমে ক্ষাত্র সংযম ও আদর্শ চরিত্রের প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। এর ফলে এই অংশে কাহিনী-বিন্যাস যান্ত্রিক ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবশ্য নাট্যকারের এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কারণ দশরথ-চরিত্রকে তিনি যেভাবে নাটকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তা করতে গেলে দশরথ ও কৈকেয়ীকে রাম-নির্বাসন-রূপ অপরাধ থেকে দূরে রাখতেই হয় এবং তা করতে গেলে রাম-নির্বাসনের নূতনতর উপায় আবিষ্কার করতে হয়। নাট্যকার যে এক্ষেত্রে ছদ্ম দশরথ ও ছদ্ম কৈকেয়ীর সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের এই মৌলিক দিকটিও বাল্মীকির প্রভাব অতিক্রম করতে পারেনি।

৮। প্রসন্নরাঘব। জয়দেব। (সম্পাদনা—কে. পি. পরব, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯১৪)

রাজশেখর ও মুরারির পর রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটকের নাম 'প্রসন্নরাঘব'। নাটকের রচয়িতার নাম জয়দেব। পণ্ডিতগণ জয়দেবের আবির্ভাবকাল

ত্রয়োদশ শতাব্দী মনে করেন। নাট্যকার প্রস্তাবনায় নিম্নোক্ত শ্লোকে নাটকের নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন।—

"প্রত্যঙ্কমঙ্কুরিত-সর্বরসাবতারং
নব্যোল্লসৎ কুসুমরাজিবিরাজিবন্ধম্।
ঘর্মেতরাংশুরিব বক্রতয়াতিরম্যম্
নাট্য প্রবন্ধ মতিমঞ্জুলসংবিধানম্॥" ১।৭

বাল্মীকির প্রতি নাট্যকারের আসক্তি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে : 'মম পুনঃ কবি কমল সদ্মনি মুনৌ বল্মীকজন্মনি মনঃ কৌতুকিতম্, যস্যৈকমপি বদনারবিন্দ মাসাদ্য চতুর্মুখ বিনোদবিহার বিনোদ মনুভবতি ভারতী নাম রাজহংসী।' নাটকের বিষয়বস্তুর উল্লেখ নিম্নোক্ত শ্লোকে আছে :—

'সুললিত বদনামুদারবৃত্তাংকৃতিমথবা যুবতিং পরস্যহৃত্বা।
তটমপি পরমণবস্য গত্বা বদ কতরঃ সুখভাজনং জনঃ স্যাৎ॥'

'রাম-যুবতী-সীতা হরণ ও তজ্জাত দুঃখ' নাটকের বিষয়বস্তু এটাই সুকৌশলে ব্যক্ত হয়েছে।

অঙ্কানুসারে নাটকের বিষয় সংক্ষেপ :—

প্রথম অঙ্ক—কালিদাসের 'রঘুবংশে'র স্বয়ংবরের অনুকরণে সীতা-করপ্রার্থী রাজাদের বর্ণনা আছে। নৃপতিদের ধনুর্ভঙ্গ চেষ্টা ব্যর্থ হল। অতঃপর রাবণ আত্মপরিচয় গোপন করে সভায় প্রবেশ করে ধনু ও কন্যা কোথায় আছে জানতে চাইল। বন্দী মঞ্জরীক তাকে অগ্রে ধনুর্ভঙ্গ করতে অনুরোধ করলে রাবণ ধনুতে হাত দিয়ে দেখলে 'ন চলত্যপি'। তখন রাবণ চতুরতা-সহকারে বললে 'ধনুরিতি বক্রঃ পন্থাঃ তৎসরলেন করবাল ধারা পথেন সীতা মানয়ামি।' তারপর স্বরূপ ধারণ করে সমবেত রাজাগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করে। ইতিমধ্যে বাণাসুর এসে উপস্থিত হল এবং উভয়ের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হল। বাণের উদ্দেশ্য ছিল বীরত্বের পরিচয় দেওয়া, আর রাবণের উদ্দেশ্য ছিল মদনতৃষ্ণা নিবারণ করা। ধনুর্ভঙ্গে ব্যর্থ হলে রাবণ তাকে বিদ্রূপ করে। বাণ তাকে পরাজিত করার সংকল্প নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। ইতিমধ্যে রাবণ মারীচের 'কঠোর ক্রন্দন' শুনতে পেল এবং তাকে আশ্বাস প্রদান করতে প্রস্থান করল।

দ্বিতীয় অঙ্ক—এই অঙ্কের বিষ্কম্ভকে ভিক্ষু তাপসের ছদ্মবেশধারী রাবণানুচরের সংলাপ থেকে জানা গেল যে, বিশ্বামিত্রের অনুরোধে যজ্ঞরক্ষার্থে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ করার জন্য বিশ্বামিত্র কৌশল্যার কর্ণভূষণ করার উদ্দেশ্যে দশরথকে 'দিব্য

তাটংকযুগল' দান করেন। রাবণ-মন্ত্রী মাল্যবান নিকষার জন্য তা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়কাকে প্রেরণ করে। তাড়কা তা করতে গেলে রামবাণে সে ও তার পুত্র সুবাহু নিহত হয় এবং রাম-বাণ-পীড়িত মারীচ কোনক্রমে বেঁচে যায়।

এদিকে নাটকীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে জনক রাজার উদ্যানবাটিকার কুঞ্জে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের জন্য কুসুম চয়ন করতে গেছেন। লক্ষ্মণ কুসুম চয়ন করতে করতে সখীসহ সীতাকে দেখেন। সীতাকে দেখে লক্ষ্মণের মাতৃভাব উদয় হয় এবং লক্ষ্মণকে দেখে সীতা স্নেহপরায়ণা হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সীতা রামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন। সীতা ও রাম পরস্পরকে দেখলেন এবং পরোক্ষভাবে প্রণয় সম্ভাষণ করলেন।

তৃতীয় অঙ্ক—রাম-লক্ষণ-সহ বিশ্বামিত্র জনকপুরীতে প্রবেশ করলে শতানন্দ ও জনক তাঁদের অভ্যর্থনা করে। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় দান করেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গ করলেন। জনক রামাদির চার ভ্রাতার সঙ্গে সীতা প্রভৃতি চার ভগ্নীর বিবাহের ব্যবস্থা করলেন।

চতুর্থ অঙ্ক—তাণ্ড্যায়নের মুখে রামকর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ সংবাদে ভার্গবের ক্রোধ। রামচন্দ্র দর্শনে মুনির কোমল চিত্তবৃত্তির প্রকাশ কিন্তু লক্ষ্মণের শ্লেষবাক্যে মুনির ক্রোধ। বিশ্বামিত্রের প্রতি অপমান বচনে রামচন্দ্রের ক্রোধ। ভার্গবের প্রতি জনক-শতানন্দের সতর্কবাণী। রামচন্দ্র কর্তৃক নারায়ণী ধনুগ্রহণ ও ভার্গবের 'ত্রিদশপুরী গতিচ্ছেদ', ভার্গবকর্তৃক রামকে পুরাণ-পুরুষজ্ঞান ও আশীর্বাদান্তে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক—গঙ্গা, যমুনা ও সরযূর কথোপকথনের দ্বারা সুগ্রীব-বালী বিরোধ থেকে আরম্ভ করে কৈকেয়ীর বর প্রভাবে সীতা, লক্ষ্মণ-সহ রামচন্দ্রের বনগমন, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ, মারীচ কর্তৃক স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে রাম-লক্ষ্মণকে প্রতারণা, মারীচবধ, রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, জটায়ু বধ, রাম-সুগ্রীব মিলন প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। সীতা-অন্বেষণরত হনুমান কর্তৃক সাগর লঙ্ঘন বর্ণনার দ্বারা অঙ্কের পরিসমাপ্তি।

ষষ্ঠ অঙ্ক—সীতা-বিরহে উন্মাদ রামের অবস্থা বর্ণন, রত্নশেখর কর্তৃক ইন্দ্রজালের সাহায্যে লঙ্কার ঘটনা প্রদর্শন। গর্ভনাটকের সাহায্যে লঙ্কাপুরীতে সীতা ও রাবণের কথোপকথন এবং হনুমান-সীতা সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। সীতার স্বপ্নদর্শন বৃত্তান্ত ও অক্ষ নিধন বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম অঙ্ক—বিষ্কম্ভকে পুলস্ত্য শিষ্য ও মাল্যবানের অনুচর করালকরের সংলাপে জানা গেল যে, পরস্ত্রী গ্রহণ করতে নিষেধ করায় রাবণ বিভীষণকে পদাঘাতে বিতাড়িত করেছে। মাল্যবান সীতা-বিরহতপ্ত রাবণের চিত্তবিনোদনের জন্য চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

নাটকীয় দৃশ্যে দেখা যায় যে মাল্যবান-এর পরিকল্পনা অনুসারে রচিত চিত্রাবলী প্রহস্ত রাবণকে দেখাচ্ছে। এখানে রাম-বিভীষণ মিত্রতা ও সাগর-বন্ধন বর্ণিত হয়েছে এবং রাম যে রাবণকে নিহত করে বিভীষণকে লঙ্কার রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন এবং সুগ্রীবকে কপিরাজ্য দান করবেন একথা লক্ষ্মণ কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

এমন সময় রামসৈন্যের কোলাহল শোনা গেল। প্রহস্ত এর প্রতিবিধান করতে বলায় রাবণ তা উপহাস করে উড়িয়ে দিল। নেপথ্যঘোষণার দ্বারা রাম-রাবণ-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ সংবাদ বিবৃত হলে রাবণ কুম্ভকর্ণকে নিদ্রাভঙ্গ করিয়ে তাকে রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদেশ দেয় এবং মেঘনাদকেও যুদ্ধে যেতে আদেশ দেয়। কিন্তু পরেই ঘোষিত হল যে যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ নিহত হয়েছে। রাবণ ও মন্দোদরী মূর্ছিত হল। মূর্ছাভঙ্গে রাবণ প্রতিশোধ নিতে যুদ্ধে গেল।

অতঃপর বিদ্যাধর-মিথুনের সংলাপের দ্বারা পরবর্তী ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। রামাদির সঙ্গে রাবণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামের বিলাপ, হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন আনয়ন, লক্ষ্মণের জীবনপ্রাপ্তি, রাম ও রাবণ যুদ্ধ এবং রাবণ বধ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথাও উল্লিখিত। অতঃপর প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করতে করতে পুষ্পকরথে আরোহণ করে রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।

নাটকীয় কাহিনীতে রামায়ণ-কাহিনী হতে নিম্নলিখিত অভিনবত্ব দেখা যায়:—

১) সীতা-কর-প্রার্থী রাবণ হরধনুর্ভঙ্গে অসমর্থ হয়ে ছলেবলে কৌশলে সীতাহরণ করতে কৃতসংকল্প। সীতা হরণের ইচ্ছার মূলে আছে রাবণের কামপীড়া। শূর্পণখার কাহিনী এখানে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেনি।

২) বাণ-রাবণ দ্বন্দ্ব।

৩) যজ্ঞরক্ষার্থে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ করায় বিশ্বামিত্র কর্তৃক রাজা দশরথকে কৌশল্যার জন্য তাটংকযুগল দান, মাল্যবান কর্তৃক নিকষার জন্য সেই তাটঙ্ক সংগ্রহের জন্য তাড়কাকে নিয়োগ। তাড়কাবধের নূতন কারণ সৃষ্টি।

৪) রাম ও সীতার বিবাহের পূর্বে পরস্পরকে দর্শন ও পূর্বরাগ।

৫) রাম-ভার্গব দ্বন্দ্বে শতানন্দ ও জনকের অংশ গ্রহণ।

৬) গর্ভনাটকের পরিকল্পনা ও সীতার স্বপ্ন দর্শন।

নাটকীয় বস্তুবিন্যাস একটু গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে নাটকের ঘটনাবিন্যাস অসংলগ্ন হয়েছে। নাটকের মূল দ্বন্দ্বের উৎস রূপে গ্রহণ করা হয়েছে রাবণের সীতালাভ বাসনাকে। এবং সেই কামনার প্রতিবন্ধকস্বরূপ ব্যক্তিবর্গ ও ঘটনাবলীর সঙ্গে তার সংঘাত। স্পষ্টতই নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি জয়দেবের পূর্ববর্তী

নাট্যকারগণ—ভবভূতি, মুরারি ও রাজশেখর দ্বারা প্রভাবিত। জীবন আলেখ্য রচনায় পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের যতই অপূর্ণতা থাকুক-না কেন নাটকীয় ঘটনার পারম্পর্য রচনায় এই নাট্যকারগণ বিশেষতঃ রাজশেখর উল্লেখযোগ্য কুশলতা দেখিয়েছেন। রামকাহিনী থেকে তাঁরা নিজ নিজ নাটকে মুখ্য ও গৌণ নানাপ্রকার পরিবর্তন করেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত ঘটনাকে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বাঁধতে তাঁরা চেষ্টা করেছেন। জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘবে'র বস্তুবিন্যাসে এর অভাব দেখা যায়। সীতাকে নিজ আয়ত্তে আনার জন্য রাবণের চেষ্টাকে নাটকীয় ঘটনাবলীর মূল উৎস-রূপে গ্রহণ করলেও নাট্যকার একে যথোচিত গতি ও পরিণতি দান করতে পারেননি।

নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখানো হল—রূপলিপ্সা রাবণের কার্যাবলীর মূল কারণ। অঙ্কের শেষে মারীচের আর্তরোদনের দ্বারা রাবণকে আকৃষ্ট করে নাট্যকার রাম-রাবণ দ্বন্দ্বের নূতনতর কারণের উপস্থাপন করলেন। এর সমর্থন পাওয়া গেল বিশ্বামিত্র কর্তৃক উপহৃত তাটঙ্ক যুগলের কাহিনীর পরিকল্পনায়। মাল্যবান নিকষার জন্য এই তাটংকযুগল সংগ্রহ করতে তাড়কাকে আদেশ দিলে তাড়কা এই কার্য করতে গিয়ে পুত্র সুবাহু-সহ রাম-বাণে নিহত হল এবং মারীচও রাম-বাণে পীড়িত হয়ে রাবণের নিকট দুঃখের কাহিনী নিবেদন করল। সুতরাং তাড়কার ঘটনায় এই অভিনবত্ব সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল বোঝা গেল না। বাণের সঙ্গে আসন্ন দ্বন্দ্ব হতে রাবণকে সরানোর জন্য মারীচের 'কঠোর ক্রন্দন' শোনানো হল বটে কিন্তু তাড়কা-মারীচের ঘটনাকে তার সংগত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া হ'ল না। রাবণের মনে বরং এই ঘটনার কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি—তাই দেখা গেল।

ভবভূতির অনুসরণে মাল্যবানকে নাটকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু একেও যথাযথ পরিণতি দান করা হয়নি। সপ্তমাঙ্কে কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদ বধের ব্যাপারেও নাট্যকার মাল্যবানের উল্লেখ করেছেন। ভবভূতির বস্তুবিন্যাসে মাল্যবানের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। এখানে সে অংশ তাকে দেওয়া হয়নি। অথচ অকারণে নাটকীয় ঘটনার অন্যতম নিয়ন্তা হিসাবে তাকে এনে নাট্যকার বস্তুবিন্যাসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছেন।

রামায়ণে তাড়কাবধের কারণ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষা। রাবণবধের কারণও দেবদ্বিজ, ধর্ম ও যজ্ঞ রক্ষা। সেদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় মহাকাব্যের কাহিনী-গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যসূত্র বর্তমান আছে। শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদের পর শূর্পণখা যখন রাবণকে সীতাহরণে প্ররোচিত করে, তখন রাবণ মারীচের মায়াশক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। মারীচ নানাভাবে রাবণকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে রাবণের ভয়ে স্বর্ণমৃগের রূপ

ধারণ করে। রামায়ণের রাবণের মারীচের নিকট এই সাহায্য প্রার্থনা খুবই স্বাভাবিক। একে মারীচ স্বজাতি, সে নিজেও রামের দ্বারা প্রপীড়িত। তদুপরি মাতৃহন্তা ও ভ্রাতৃহন্তার প্রতি তাঁর বৈরভাব স্বাভাবিক। এই অবস্থায় স্বকার্য সাধনের জন্য তার সঙ্গে রাবণের সংযোগ সংগত। কিন্তু 'প্রসন্ন রাঘব' নাটকে মারীচের ঘটনার উপস্থাপনের সঙ্গে নাটকের নিগূঢ় যোগ কোথাও নেই। সে কারণে বস্তু-বিন্যাসে এটিও অবান্তর হয়ে উঠেছে।

ঠিক একভাবেই অবান্তর হয়ে উঠেছে নাটকের রাম-ভার্গব দ্বন্দ্বটি। রামায়ণের বস্তুবিন্যাসে রাম-ভার্গব দ্বন্দ্ব একটি দুর্বল অংশ। রামকে রাক্ষসবধের জন্য বৈষ্ণবীয় ধনুদান-এর কারণস্বরূপ উল্লিখিত হলেও এর আকস্মিকতা ও অসংলগ্নতা পাঠকের শিল্পবোধকে পীড়া দেয়। ভবভূতি ও রাজশেখর তা বুঝে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভাবন-এর দ্বারা এই দ্বন্দ্বকে নাটকের মূল দ্বন্দ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু 'প্রসন্ন-রাঘবে' তার পরিচয় নেই। 'মহাবীর চরিতে' মাল্যবান দূত দ্বারা ভার্গবকে রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। 'বাল রামায়ণে' রাবণ ভার্গবের কুঠার চেয়ে তাকে মূল ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখানে নাট্যকার সেভাবে চেষ্টা না করে গতানুগতিকভাবে রামায়ণ-কাহিনীর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই অংশেও পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি। ভার্গবের সঙ্গে শতানন্দের বাদানুবাদে তার দৃষ্টান্ত বর্তমান।

'প্রসন্নরাঘব' নাটকের বস্তুবিন্যাসের এই অসংলগ্নতা পঞ্চম অঙ্ক হতে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। পঞ্চম অঙ্ক হতে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত নাটকের ঘটনাবলী দু-একটি অতি গৌণ নূতনত্ব ব্যতীত, মূলত রামায়ণ-কাহিনীকে অনুসরণ করেছে। দশরথের নিকট কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা হতে আরম্ভ করে রামাদির বনগমন, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ, সীতা হরণ, বালীবধ, সুগ্রীব ও বিভীষণ-এর সহিত মিত্রতা, অক্ষনিধন, হনুমান-সীতা সাক্ষাৎকার, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ ও রাবণ বধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, বিভীষণের অভিষেক ও রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি মুখ্য ঘটনাবলীতে রামায়ণ-কাহিনীই নাট্যকারের উপজীব্য হয়েছে দেখা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাট্যকার নাটকের প্রথম দিকে যেভাবে বস্তুবিন্যাস করে নাটকীয় দ্বন্দ্বে স্থাপিত করলেন, শেষের দিকে তাকে পরিস্ফুট ও যথাপরিণতি দান না করে মহাকাব্যের কাহিনীকেই গ্রহণ করলেন। 'প্রসন্নরাঘবে'র বস্তুবিন্যাসে নাটক ও মহাকাব্যের এক বিচিত্র সমন্বয় হয়েছে। ভবভূতি, মুরারি ও রাজশেখর রামায়ণ-কাহিনীর পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং নূতন পরিবর্তনে নাটকীয় দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রেখেছেন হয় রাবণকে, নাহয় তার মন্ত্রী মাল্যবানকে। শূর্পণখা কর্তৃক মন্থরার ছদ্মবেশ

ধারণ দ্বারা দশরথের প্রতারণা, মায়াময় ও শূর্পণখা কর্তৃক যথাক্রমে ছদ্ম দশরথ ও ছদ্ম কৈকেয়ীরূপে রামাদিকে বনে প্রেরণ, বালীর কাহিনীর নবরূপ দান প্রভৃতি নানা ঘটনায় নাটকীয় ক্রিয়া যে এই মূল উৎস হতে উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত তা দেখা যায়। নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপপত্তি ও পরিণতি প্রদর্শনে যতই ত্রুটি থাকুক-না কেন, নাট্যকারগণ যে-সমস্ত ঘটনাকে একটি কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'প্রসন্নরাঘবে'র বস্তুবিন্যাসে এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতের' অনুকরণে জয়দেবও 'প্রসন্নরাঘবে' গর্ভনাটকের পরিকল্পনা করেছেন। এই গর্ভনাটকের বিষয়বস্তু রামকে রাবণ-সীতা সংবাদ জ্ঞাপন। নাটকের কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের দিক থেকে এর প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। হনুমানের মুখেই রামচন্দ্র এ-বিষয়ে অবগত হতে পারতেন। রামায়ণে তাই করা হয়েছে। যদি এর উদ্দেশ্য হয় রামকে সীতার পবিত্রতা ও তাঁর প্রতি গভীর প্রণয়ের প্রমাণ জ্ঞাপন, তাহলে সে উদ্দেশ্যও নাট্যকার যথাযথ পূরণ করেননি। কারণ সে ক্ষেত্রে অগ্নিপরীক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভবভূতির গর্ভনাটক তাঁর নাটকের সুষ্ঠু মিলনান্তক পবিণতির জন্য অপরিহার্য ভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। রামায়ণের কাহিনীবিন্যাসের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে রাম-সীতার মিলনকে অবাধ কবতে হলে সেই মিলনের যে বাহ্যিক প্রবল বাধা ছিল, প্রজাসাধারণের সেই অবিশ্বাসকে দূব করতে হবে। গর্ভনাটকের সাহায্যে তা সম্পন্ন করে ভবভূতি রাম-সীতার মিলনকে নিরঙ্কুশ করেছেন ও বাল্মীকির বিয়োগান্ত ঘটনাবিন্যাসকে অতিসুন্দর, সংগত, স্বাভাবিকভাবে মিলনান্ত করেছেন। 'প্রসন্নরাঘবে'র গর্ভনাটক মূল নাটকের দিক থেকে এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করেনি। বস্তুতঃ এর প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কিনা তা নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যদি মনে করা যায় যে রাম কর্তৃক সীতা-উদ্ধার-কার্যকে ত্বরান্বিত করাই এর উদ্দেশ্য, তা হলে এজন্য গর্ভনাটকের প্রয়োজন ছিল না। বিষ্কম্ভকে তা করা যেত। এই গর্ভনাটক বাল্মীকির কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছে। একমাত্র রাবণের কামপীড়িত চরিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করে তোলা ছাড়া বস্তুবিন্যাসের দিক থেকে এর কী সার্থকতা আছে তা বোঝা যায় না। রাম ও সীতার পূর্বরাগের মধ্যেও এই অসংলগ্ন কাহিনীবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পূর্বরাগে নাটকের কি প্রয়োজন সাধিত হয়েছে তা বুঝতে পারা যায় না। নাটকের রস বিচারে এই অঙ্কের অসংলগ্নতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। রাম-সীতার পূর্বরাগ-এ যেখানে বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রসের প্রকাশ, রাবণের কামপীড়াবর্ণনে সেখানে এই রসের বিকৃতি ঘটেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে রসবিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

'প্রসন্নরাঘবে'র বস্তুবিচার করলে দেখা যায়, এই অসংলগ্ন বস্তুবিন্যাসের মূলে আছে একদিকে পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের প্রভাব অপরদিকে বাল্মীকির প্রভাব। নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনে যেমন পূর্ববর্তী নাট্যকারগণের প্রভাব প্রকট, তেমনি নাটকের শেষাংশে মূলতঃ রাম-কাহিনীর অনুবর্তন বাল্মীকির প্রভাবের পরিচায়ক। মাঝে রাম-সীতার পূর্বরাগের যে বর্ণনা আছে, তাও নাট্যকারের মৌলিক উদ্ভাবনা নয়। এর বীজ যত গৌণভাবেই হোক 'মহাবীর চরিতে' ছিল। সেখানেও প্রাগ্-বিবাহ সাক্ষাৎকার ও পরস্পরের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও দণ্ডীর 'দশ-কুমারচরিতে'র 'অবন্তী সুন্দরী কথা' ও কালিদাসের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পূর্বরাগের দ্বারাও জয়দেব প্রভাবিত হতে পারেন। মোট কথা 'প্রসন্ন রাঘবে'র বস্তুবিচার করলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে যে নাট্যকারের উপর পূর্ববর্তী নানা কবি ও নানা নাট্যকারের প্রভাব রয়েছে। যে কবি ও নাট্যকারের যেটুকু তাঁর ভালো লেগেছে নাটকীয় প্রয়োজন বা বস্তুসংহতির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তাকেই জয়দেব স্বীয় নাটকে অন্তর্নিবিষ্ট করেছেন। তাই জয়দেবের নাটকের বস্তুবিন্যাস অসংলগ্ন বলে মনে হয়।

৯। কুন্দমালা। দিঙ্‌নাগ। (সম্পাদনা : বামকৃষ্ণ কবি, এস. কে. রাম-নাথ শাস্ত্রী, দক্ষিণ ভারতী সিরিজ, মাদ্রাজ, ১৯২৩)

'কুন্দমালা' নাটক কবি দিঙ্‌নাগের রচনা বলে কথিত হলেও নাটকের রচয়িতা যে কে সে-বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃতসিদ্ধান্ত আজও গৃহীত হয়নি। নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধেও নানা মত দৃষ্ট হয়।

'কুন্দমালা' নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে সংকলিত। লোকাপবাদভীত রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা-বিসর্জন ও রাম-সীতার পুনর্মিলন নাটকের মূল বিষয়বস্তু।

নাটকের বস্তুসংক্ষেপ :—

প্রথম অঙ্ক—আসন্নপ্রসবা সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ গঙ্গাতীরে এলেন এবং তাঁকে বৃক্ষচ্ছায়াতলে বসিয়ে লোকনিন্দাভীত রামচন্দ্রের সীতা-নির্বাসন আদেশ শোনালেন। লক্ষ্মণ সীতাকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দুঃখে দেহত্যাগ না করেন তা হলে রঘুবংশ নির্বংশ হবে। লক্ষ্মণ সীতাকে রক্ষা করার জন্য সকলের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বিদায় দিলেন। বাল্মীকি শিষ্যমুখে ক্রন্দনরত সীতার কথা শুনে এবং ধ্যানযোগে তাঁর চারিত্রিক বিশুদ্ধির বিষয় অবগত হয়ে তাঁকে নিজ আশ্রমে নিয়ে এলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, কুশ ও লব নামে সীতার দুই পুত্র

জন্মেছে এবং তারা রামায়ণ পাঠ করছে। এদিকে নৈমিষারণ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে এবং বাল্মীকি-সহ সব মুনিঋষি সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

নাট্যদৃশ্যে সীতা-বেদবতীর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। প্রথমেই বেদবতী কর্তৃক রামচন্দ্রের নিষ্ঠুরতার নিন্দা এবং সীতা কর্তৃক লঙ্কাযুদ্ধে রামের প্রণয়-গভীরতার নিদর্শন জ্ঞাপন। বেদবতী বললেন যে, তাঁর বনবাস সময় শেষ হয়ে এসেছে। নেপথ্য থেকে এমন সময় ঘোষিত হল যে বাল্মীকিকে নিমন্ত্রণ করার জন্য রামের দূত এসেছে।

তৃতীয় অঙ্ক—প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, কুশীলব-সহ সীতা নৈমিষারণ্যে এবং অপর দিকে লক্ষ্মণাদি-সহ রামচন্দ্র গোমতীতীরস্থ বাল্মীকির আশ্রমে এসেছেন।

অঙ্কারম্ভে দেখা গেল সীতা-বিরহে বিলাপরত রামচন্দ্র ধীরে-ধীরে চলেছেন। রামের মনকে অন্য প্রসঙ্গে সরিয়ে নেবার জন্য লক্ষ্মণ গোমতী নদীর প্রতি রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। নদীতীরে তাঁরা একটি কুন্দমালা দেখতে পেলেন। মাল্য-রচনার কৌশল দেখে রামচন্দ্র এটি সীতার রচিত মাল্য বলে মনে করলেন। এবং তাঁরা মাল্য-রচয়িত্রীর সন্ধানে চললেন। এক ছায়া-কুঞ্জে তাঁরা যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন সীতা নিকটস্থ কুঞ্জে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় পুষ্পচয়ন করতে করতে রামের বিলাপ-ধ্বনি শুনে দুঃখিত হলেন এবং অতিকষ্টে আত্মপরিচয় প্রদান লোভ সংবরণ করলেন। এমন সময় ঋষি বাদরায়ন বাল্মীকি-আশ্রমে রামাদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেন।

চতুর্থ অঙ্ক—অঙ্কের প্রারম্ভে যজ্ঞবেদী ও বেদবতীর সংলাপ আছে। এতে তিলোত্তমা কর্তৃক সীতার ছদ্মবেশে সীতা-প্রেম পরীক্ষার কথা আছে।

অঙ্কারম্ভে দেখা যায় সীতা চিত্রকূটে-প্রাপ্ত পরিচ্ছদ পরিধান করে নির্বাসিত অবস্থার জন্য বিলাপ করছেন। বেদবতী হ্রদে ক্রীড়াশীল রাজহংস মিথুনকে দেখে সীতাকে সান্ত্বনা লাভ করতে অনুরোধ করলেন। এমন সময় কণ্বের সঙ্গে রামচন্দ্র নৈমিষশোভা দেখতে এলেন। যজ্ঞধূমে পীড়িত নয়ন শীতল করার জন্য রামচন্দ্র হ্রদের জলে চক্ষু ধৌত করতে গেলেন। সেখানে তিনি জলে সীতার প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন এবং তাঁর অন্বেষণের বৃথা চেষ্টা করে মূর্ছিত হলেন। সীতা তাঁর মূর্ছাভঙ্গের জন্য নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন করতে লাগলেন। মূর্ছাভঙ্গের পর রামের করুণ বিলাপ শুনে সীতা আত্মপরিচয় দিতে উদ্যত হলে বিদূষক এসে তিলোত্তমা কর্তৃক সীতার পরীক্ষা প্রসঙ্গ রামচন্দ্রকে বললেন।

পঞ্চম অঙ্ক—রামচন্দ্র সিংহাসনে বসে বিগত ঘটনাবলীর কথা ভাবছিলেন। এমন সময় বিদূষক এসে খবর দিল যে, রামের মতো দেখতে বাল্মীকির দুই বালক

শিষ্য বাল্মীকি কর্তৃক রচিত রামায়ণগান করতে এসেছে। বালক দুটিকে দেখে রামচন্দ্র অভিভূত হয়ে তাদের আলিঙ্গন করেন ও তাদের নিজ সিংহাসনের পাশে উপবেশন করান। বিদূষক এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চীৎকার করে উঠলে রামচন্দ্র কারণ জানতে চান। বিদূষক বললেন যে ইক্ষাকুবংশভূত না হয়ে যে সিংহাসনে বসবে, তার মস্তক বিদীর্ণ হবে। কিন্তু এই বালকদ্বয়ের ক্ষেত্রে তা হল না। রাম ভাবলেন যে, এ শুধু বাল্মীকির আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। কথোপকথন থেকে জানা গেল যে বালক দুটি সূর্যবংশোদ্ভব যমজ। পিতার নাম 'নিষ্ঠুর' ও মায়ের নাম 'দেবী'। রাম এই সাদৃশ্য দর্শনে আশ্চর্য হন ও অস্থির হয়ে পড়েন। নেপথ্য থেকে বালক-দ্বয়কে রামায়ণগান করতে বলা হল। রাম তাঁর বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে সেই গান শোনার জন্য আহ্বান করতে আদেশ দিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্ক—অঙ্কের প্রথমেই রাজসভায় সমবেত পুরজনের সামনে রামের আদেশে কুশীলব রামায়ণ গান আরম্ভ করল। শুনে রাম বুঝলেন গানের বিষয়বস্তু তাঁদেরই কথা। রামের আদেশে লবকুশ সীতা হরণের পর থেকে সংগীত আরম্ভ করল। নির্বাসিতা সীতার দুঃখে রামচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়লেন। দারুণ বনে সীতা নির্বা-সিতা হয়ে বিলাপ করছেন এই পর্যন্ত গেয়ে বালকদ্বয় নিবৃত্ত হল। অতঃপর কণ্বমুনি এসে গান আরম্ভ করলেন। এই সংগীতে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রয়দান, কুশীলবের জন্ম বর্ণিত হল। আবেগে অভিভূত হয়ে রামলক্ষ্মণ, কুশ ও লব মূর্ছা গেলেন। এমন সময় বাল্মীকি ও সীতা এলেন। সকলের জ্ঞান হলে এবং সকলে শান্ত হলে বাল্মীকি সীতার প্রতি অবিচারের জন্য রামকে ভর্ৎসনা করলেন। বাল্মীকি সীতাকে নিজ সতীত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য বললে সীতা বসুমতীর নিকট আবেদন জানালেন। বসুমতী আবির্ভূতা হয়ে সীতার সতীত্বের ঘোষণা করলে পুষ্পবৃষ্টি হল। সমবেত জনসাধারণ সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করলেন। বসুমতী সীতাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিতা হলেন। বাল্মীকি কর্তৃক কুশ ও লব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হল। এখানে নাটকের পরিসমাপ্তি।

বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায় যে নাটকে রামায়ণ-কাহিনী-বহির্ভূত নিম্নলিখিত অভিনবত্বগুলি আছে:—

(১) দ্বিতীয় অঙ্কে সীতা ও বেদবতীর কথোপকথন।

(২) অশ্বমেধ যজ্ঞার্থে নৈমিষারণ্যে রামচন্দ্রের পরিজন সহ আগমন। বাল্মীকি, সীতা ও লবকুশেরও নৈমিষারণ্যে গমন।

(৩) ভ্রমণরত রামচন্দ্রের নদীস্রোতে ভাসমান কুন্দমালা দর্শন। রচনা-কৌশল দর্শনে এটি সীতা-নির্মিত বলে রামচন্দ্রের অনুভব। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতার পদচিহ্ন

দর্শন ও অন্বেষণ। নেপথ্য হতে সীতার বিরহী রামচন্দ্রের বিলাপ শ্রবণ ও রামচন্দ্রের গভীর সীতা-প্রেম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা।

(৪) তিলোত্তমা কর্তৃক সীতার ছদ্মবেশে রামের সীতা-প্রেম পরীক্ষার প্রস্তাব। রামকর্তৃক গোমতী নীরে সীতার প্রতিবিম্ব দর্শন, মিলন চেষ্টা ও মূর্ছা।

(৫) রামায়ণগানের জন্য বাল্মীকির আদেশে কুশলবের রামচন্দ্রের রাজসভায় আগমন এবং তাদের অভিনবরূপে রামায়ণগান পরিবেশন।

(৬) কণ্ব কর্তৃক সংগীতের মাধ্যমে রামাদির নিকট কুশ ও লবের সত্য পরিচয় দান। পৃথ্বী কর্তৃক সীতার সতীত্ব ঘোষণা ও রাম কর্তৃক সীতাকে পুনর্গ্রহণ।

স্পষ্টতই, নাটকের উপর 'উত্তররামচরিতে'র প্রবল প্রভাব আছে। রামায়ণের কাহিনীর কাঠামো, অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ ও 'উত্তররামচরিতে'র প্রভাব অলোচ্য নাটক রচনায় এই তিন শক্তি বিশেষ কার্যকরী হয়েছে।

প্রথমেই কুন্দমালার নামকরণের তথা নাটকীয় সার্থকতা বিচার প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। 'কুন্দমালা'র নাট্যকার রামসীতার মিলনেব জন্য ভবভূতি অপেক্ষা ভিন্নতর অথচ অভিনব এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সীতার প্রতি রামের গভীর প্রেম দেখানোর জন্য ভবভূতি রামচন্দ্রকে সীতা-স্মৃতি-বিজড়িত দণ্ডকারণ্যে এনে তাঁর ভাবাবেগ উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সীতা-জীবিত সংশয়িত রামচন্দ্রের দেহে সীতার অদৃশ্য স্পর্শ দান করে তাঁকে আশ্চর্য করছেন। 'কুন্দমালা'র নাট্যকার এর তুলনায় বাস্তবতার পন্থা অবলম্বন করেছেন। 'কুন্দমালা' রচনার বিশিষ্ট ও অন্যান্য সুলভ কলাকৌশল প্রদর্শনের দ্বারা সীতা সম্বন্ধে রামের কৌতূহল তথা তাঁর জীবিত থাকা সম্বন্ধে ক্ষীণ আশা জাগিয়ে তুলে শেষে নদীসৈকতে সীতার পদচিহ্ন প্রদর্শনের দ্বারা সীতার জীবিতাবস্থায় থাকার কথা নাট্যকার প্রকাশিত করেছেন। ফলে রামের মিলনাকাঙ্ক্ষা ও তীব্র বেদনাবোধ ব্যঞ্জনার রূপ লাভ করেছে এবং এরই পরিণতি রূপে ভবিষ্যৎ মিলনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছে।

এছাড়া রামচন্দ্র কর্তৃক কুন্দমালা প্রাপ্তির ব্যাপারেও দৈবের যোগাযোগ লক্ষণীয়। দৈবের অলক্ষ্য নির্দেশেই যেন গোমতীর স্রোতে ভাসমান কুন্দমালা রাম-লক্ষ্মণের নিকট এল। লক্ষ্মণ দৈবের এই পূর্বলীলা লক্ষ্য করেছিলেন। এই লীলা লক্ষ্য করলেই আমাদের মনে পড়ে ভবভূতির কলাকৌশল। 'উত্তররামচরিতে' গঙ্গাদেবীর নির্দেশে নদীদ্বয়ের মনে রামচন্দ্রের প্রতি সহানুভূতি এবং তাঁকে সাহায্য করার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। কুন্দমালার নাট্যকারের অবচেতন মনে ভবভূতির নদীসমূহের এই সক্রিয় সহানুভূতির ছবি বদ্ধমূল হয়েছিল বলে মনে হয়।

নাটকের বস্তু বিচার করলে দেখা যায়, ভবভূতির নাটকের মতো এই নাটকের

সমস্যা হ'ল—বিনা অপরাধে পরিত্যক্তা জানকীর সঙ্গে রামচন্দ্রের নাট্য-শাস্ত্রসম্মত মিলনটি কিভাবে সম্পন্ন করা যায়। ভবভূতি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন আলোচ্য নাটকের নাট্যকারও সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ অন্তরালবর্তিনী সীতার সম্মুখে সীতাবিরহব্যাকুল রামচন্দ্রের দীন আকৃতি ও মর্মভেদী বিলাপ উপস্থাপিত করে নায়ক-নায়িকার নিরঙ্কুশ মিলনের প্রস্তুতি আলোচ্য নাটকেও করা হয়েছে।

এখানেও বিষয়বস্তুর বিন্যাস দুই প্রকারে করা হয়েছে—পরিচয় ও মিলনের বাহ্য প্রস্তুতি ও তার জন্য আন্তর প্রস্তুতি। বাহ্য উপায় হিসাবে নাট্যকার দুটি বস্তুর উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমতঃ প্রতিশ্রুতিমত সীতা কর্তৃক গোমতী জলে নিক্ষিপ্ত কুন্দমালার সাহায্যে রামের নিকট সীতার জীবিত থাকা ও সান্নিধ্য প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ কুশ ও লবের আকৃতিগত সাদৃশ্য—পরিচয় ও মিলনকে নিকটতর করে তোলা। আন্তর মিলনের জন্য যে উপায় নাট্যকার অবলম্বন করেছেন তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

ভবভূতির নাটকে এই দুই প্রকার ব্যবস্থা আছে। তবে সেখানে কুন্দমালার সাহায্যে সীতার জীবিত থাকার প্রমাণের ব্যবস্থা নেই। লবকুশের সঙ্গে রামচন্দ্রের সাদৃশ্যগত পরিচয়টিও বিস্তৃততর পটভূমিকায় সাধিত হয়েছে। আন্তর ব্যবস্থা সেখানে আরও সূক্ষ্ম, শিল্পকলাপূর্ণ, করুণ ও রসমধুর হয়ে উঠেছে। এছাড়া প্রধানতঃ 'উত্তররামচরিত' আন্তর দ্বন্দ্বের নাটক হলেও বাহ্যক্রিয়াও এখানে নিতান্ত গৌণ নয়। কুন্দমালা'র তুলনামূলক ভাবে নাটকীয় ক্রিয়ার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণের বস্তুবিন্যাসের সঙ্গে এই নাটকের বস্তুবিন্যাসের তুলনা করলে দেখা যায় যে নাট্যকার প্রারম্ভে রামায়ণের বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রের বিধান মান্য করতে গিয়ে তিনি লৌকিক উপায়ে রামায়ণ-কাহিনীর পরিণতি থেকে ভিন্ন পরিণতি সাধন করেছেন। যে মৌলিক পন্থাই নাট্যকার অবলম্বন করুন-না কেন, রামায়ণের রামচন্দ্রের রাজধর্ম ও সমাজধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নাট্যকারকে তাঁর নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হয়েছে। বাল্মীকির রস-সিদ্ধ কাহিনীর নীতিগত সমস্যাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি।

নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রায় সম্পূর্ণভাবে রামায়ণের কাহিনীকে অনুসরণ করেছে, নূতনত্বের মধ্যে দেখা যায় রামায়ণের বাল্মীকি মুনি বালকগণের মুখে সীতার কথা শুনে সীতার নিকটে আসেন এবং তিনি ধ্যানযোগে সব জ্ঞাত হয়েছেন তা জানিয়ে তাঁকে সাদরে আশ্রয় দান করেন। আলোচ্য নাটকে বাল্মীকি আগে সীতার কাছে এসে পরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে ধ্যানযোগে তাঁর সতীত্ব অবধারণা করেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে ভাগীরথীতীরে এনে সব ঘটনা বর্ণনা করে তাঁকে সেখানে

রেখে অযোধ্যায় চলে যান এবং পরে বাল্মীকি তাঁকে আশ্রয় দান করেন। নাটকের প্রথম অঙ্কেই নাট্যকার লক্ষ্মণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা রাম যে জানকীময় ও অন্য পত্নী গ্রহণ করবেন না তা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বললেন—

"ইদম পরমার্যেন সন্দিষ্টম্—

ত্বং দেবী চিত্তনিহিতা গৃহদেবতা মে
স্বপ্নাগতা শয়নমধ্য সাথী ত্বমেব।
দারান্তরা হরণ—নিঃস্পৃহ মানসস্য
যাগে তব প্রতিকৃতির্মম ধর্মপত্নী।"

এই উক্তি নাটকের নাট্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কারণ যে আন্তর পুনর্মিলন আলোচ্য নাটকের বিষয়বিন্যাসের মুখ্য উপাদান প্রথমেই তা প্রকটিত হওয়ায় তার নাটকীয় মূল্য নিঃশেষে বিনষ্ট হয়েছে। ভবভূতি স্বভাবশিল্পীর মতোই একে প্রচ্ছন্ন রেখে যথাকালে এবং যথাস্থানে এর প্রকাশ করে স্বায় নাটকের নাট্যধর্মকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। আলোচ্য নাটকের প্রথম অঙ্ককে বাল্মীকির উক্তিতে ভবিষ্যৎ মিলন সূচিত হয়েছে। সীতা বাল্মীকিকে বন্দনা করলে বাল্মীকি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন—

বীর প্রসবা ভব, ভর্ত্তুশ্চ পুনর্দর্শমাপ্নুহি।

আশীর্বাদের প্রথমাংশের সার্থকতা নাটকে প্রদর্শিত হয়নি। কারণ রামসৈন্যের সঙ্গে লব-কুশের যুদ্ধ প্রদর্শিত হয়নি। আশীর্বাদের শেষাংশ নাটকে সত্য হয়ে উঠেছে।

নাটকের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি। এই অংশে মানব-মানবীরূপে রামসীতার আলেখ্য-চিত্রণ করা হয়েছে। 'উত্তররামচরিতে' প্রজা-পালক রামচন্দ্রের একটা মানবিক দিক আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং মহর্ষি বাল্মীকি তার নানা আভাস কাহিনীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে দিয়েছেন। রাজস্বভাবের অন্তরালে যে প্রেমিকহৃদয় নিয়তি নিপীড়িত হয়ে তীব্র মর্মদাহ ভোগ করছিল বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো তার জ্বালা বাল্মীকির রচনাতেও ঝলসিত হয়ে উঠেছে। ভবভূতি রাম-চরিত্রের এই মানবিক দিকটিকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করে অলৌকিক প্রতিভাবলে তার অনবদ্য রসচিত্র জগৎকে উপহার দিয়েছেন। আলোচ্য নাটকের নাট্যকারও বাল্মীকির ইঙ্গিত ও ভবভূতির পন্থা গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কে কুশ, লব ও সীতার মিলন বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের বস্তুবিন্যাসে রামায়ণ-কাহিনীর অনুসরণ সুস্পষ্ট। আলোচ্য নাটকে দেখা যায়, বাল্মীকির আদেশে কুশ ও লব রামায়ণ গান শোনানোর জন্য রামের সভায় এসেছে।

যে আকৃতিগত সাদৃশ্য রামচন্দ্রের সঙ্গে লব ও কুশের মিলনের ভূমি প্রস্তুত করেছে তার ইঙ্গিত রামায়ণে আছে—

"জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষো নানুপশ্যামঃ গায়তো রাঘবস্য চ॥"

ষষ্ঠ অঙ্কে যদিও নাট্যকার পদ্মপুরাণ বা ভবভূতির অনুসরণ করেছেন তথাপি রামায়ণের প্রভাব এখানেও লক্ষ্য করা যায়।

রামায়ণে দেখা যায়—

"তস্মিন গীতে তু বিজ্ঞায় সীতা পুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো বচনমব্রবীৎ॥"

আলোচ্য নাটকেও রামায়ণগীতের মাধ্যমেই কুশ ও লব যে সীতার সন্তান তা প্রকাশিত হয়েছে। রামায়ণে রামচন্দ্র বাল্মীকিকে আহ্বান করে আনিয়ে সীতার বিশুদ্ধি প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। এই নাটকেও বাল্মীকি সীতাকে বিশুদ্ধির পরিচয় দান করতে আহ্বান জানান। রামায়ণের মতো আলোচ্য নাটকেও পৃথিবী সীতার বিশুদ্ধি ঘোষণা করেন। যদিও এক্ষেত্রে পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টিতে রামায়ণ ও 'কুন্দমালা'র মধ্যে পার্থক্য আছে তথাপি এই অংশের কতকগুলি মূল ঘটনায় নাটকের বস্তুবিন্যাসের উপর রামায়ণের প্রভাব অনস্বীকার্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে লোকাপবাদ ভয়ে সীতা-নির্বাসন, বাল্মীকি কর্তৃক সীতাকে আশ্রয় দান, রামায়ণ শ্রবণার্থ লবকুশের বাল্মীকির আদেশে রাম সমীপে আগমন, তিনজনের আকৃতিগত সাদৃশ্য দর্শন ও বাল্মীকির আদেশে সীতার চারিত্রিক বিশুদ্ধি ঘোষণার জন্য পৃথিবীকে আহ্বান ও পৃথিবী দেবী কর্তৃক সীতার বিশুদ্ধি ঘোষণা ইত্যাদি বস্তুবিন্যাসের অনেকগুলি প্রধান ঘটনায় 'কুন্দমালা' নাটকের উপর রামায়ণের বিশেষ প্রভাব আছে। আর সীতা ও রামের যে-দিকটি নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু তার ইঙ্গিতও রামায়ণে আছে। কিন্তু একথা সত্য, নাটকের মুখ্য চরিত্র-দুটি রাম সীতা রামায়ণের মতো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত হয়নি। কেমন একটা আবেগ-বাহুল্য উভয় চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। নাটকীয় সংঘাতের দ্বারা চরিত্র-দুটির মূর্তি দান করা কুত্রাপি সম্ভব হয়নি।

১০। শ্রীহনুমান্নাটক বা মহানাটক (সম্পাদনা—ভেংকটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, ১৯০৯)

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ 'হনুমান্নাটক বা মহানাটক'কে অবনতি যুগের নাটক বলে অভিহিত করেন। এই নাটকের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। সমাপ্তি

শ্লোকে এই নাটকের রচনা ও প্রচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পরিচয় দেওয়া আছে—

"রচিতমনিলপুত্রেনাথ বাল্মীকিনাব্ধৌ
নিহিতমমৃতবুদ্ধ্যা প্রাঙ্‌ মহানাটকংযৎ।
সুমতি-নৃপতি-ভোজনাদ্ধৃতং তৎক্রমেন
গ্রথিতমবতু বিশ্বং মিশ্র-দামোদরেন।" ৪।৯৬

উক্ত শ্লোকে দেখা যায়, 'মহানাটকে'র রচয়িতা অনিলপুত্র হনুমান; বাল্মীকি নিজ রামায়ণ মহাকাব্য 'মহানাটকে'র দ্বারা বিলুপ্ত হতে পারে আশঙ্কা করে তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। ধারারাজ ভোজদেব সেতুবন্ধে তীর্থযাত্রা করে সমুদ্রস্থ পর্বত-শিখরে তা লিখিত দেখে সেই পর্বতশিলাগুলি সংগ্রহ করেন। ভোজরাজের সভাপণ্ডিত মহাকবি দামোদর মিশ্র তাদের একত্র গ্রথিত করে 'হনুমান্নাটক' নামে তা প্রচার করেন।

হনুমান্নাটকের দুই প্রকার পাঠ আছে। পশ্চিম ভারতে প্রচলিত পাঠের নাম 'হনুমন্নাটক', দামোদর মিশ্র এর সম্পাদনা করেন। এতে চতুর্দশ অঙ্ক ও ৫৮৪টি শ্লোক আছে। পূর্ব ভারতের (বঙ্গদেশে) প্রচলিত সংস্করণের নাম 'মহানাটক'। এর সম্পাদক মধুসূদন। এর অঙ্ক ও শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে দশ ও ৭২০। উভয় নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায় এমন সাধারণ শ্লোকের সংখ্যা ৩০০। বর্তমান আলোচনায় দামোদর মিশ্রের চতুর্দশ অঙ্ক সমন্বিত হনুমন্নাটককেই গ্রহণ করা হয়েছে।

এই নাটকে নানা নাটক, কাব্য ও মহাকাব্য থেকে শ্লোক গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র রামায়ণ-কাহিনী নাটকে উপজীব্য হলেও বস্তুবিন্যাসে এটি 'মহাবীরচরিত', 'অনর্ঘরাঘব', 'বালরামায়ণ', 'প্রসন্নরাঘব', 'দূতাঙ্গদ' প্রভৃতির পরিকল্পনাকেই অনুসরণ করেছে।

অঙ্কানুসারে নাটকের বিষয়বস্তু এরূপ :—

নাটকের প্রথম অঙ্ক দেখা যায়, রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত তাড়কাদি বধ করে বিদেহপুরীতে এসেছেন। সীতা-স্বয়ংবর সভায় রাবণপুরোহিত রাবণের নিমিত্ত কন্যা প্রার্থনা করলে পণের উল্লেখ করে জনক তাতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। রাম হরধনুভঙ্গ করে সীতার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর রাম-পরশুরাম দ্বন্দ্ব ও পরশুরামের পরাজয় বর্ণনার পর রাম-সীতার বিবাহান্তে প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কে রাম-সীতার সম্ভোগ লীলা বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় অন্ধমুনির শাপ বশতঃ কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা; লক্ষ্মণ, সীতা সহ রামের বনগমন-

এর বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এখানে রাম-চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না— বর্ণনাটি এই রকম—

"গুরোর্গিরা রাজ্যমপাস্য তূর্ণং
বনং জগামাথ রঘুপ্রবীরঃ॥" ৩।৯

অর্থাৎ 'গুরুর আদেশে শীঘ্র রাজ্য পরিত্যাগ করে রামচন্দ্র বনে গেলেন।'

মারীচ কর্তৃক স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণ করে রামাদিকে ছলনার কথা বর্ণিত আছে। চতুর্থ অঙ্কে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ-এর পর বিরহ-কাতর রামের বর্ণনাটি সুন্দর—

"রে বৃক্ষাঃ পর্ব্বতস্থা গিরি গহন লতা বায়ু না বীজ্যমানা।
রামোঽহং ব্যাকুলত্মা দশরথতনয়ঃ শোকশুক্রেন দগ্ধঃ
বিম্বোষ্ঠী, চারুনেত্রী, সুবিপুলজঘনাবদ্ধনাগেন্দ্রকাঞ্চী
হা সীতো, কেন সীতা মম হৃদয়গতা কো ভবান কেন দৃষ্টা।" ৫।১০

অর্থাৎ 'রামচন্দ্র ব্যাকুল নয়নে বৃক্ষ, তরুলতা, পর্বত, অরণ্যকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এবং বিম্বোষ্ঠী, চারুনেত্রী, সীতাকে উদ্দেশ্য করে হা সীতা, হা সীতা বলে ঘুরে বেড়ালেন'—

জটায়ু বধের বর্ণনা আছে। পঞ্চম অঙ্কে রামের বিরহ ও শোক, হনুমান ও সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে বালীবধ বর্ণিত। ষষ্ঠ অঙ্কে রূপায়িত বিষয় হল— রামের আদেশে হনুমান কর্তৃক সাগর লঙ্ঘন, হনুমান-সীতা সংবাদ, লঙ্কাদাহ ও হনুমানের রামের নিকট প্রত্যাবর্তন। সপ্তম অঙ্কের বিষয়বস্তু : রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে পদাঘাত ও বিদূরীকরণ ও সেতুবন্ধ। অষ্টম অঙ্কে রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূত রূপে প্রেরণ ও উভয়ের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। নবম অঙ্কের প্রথমে দেখা যায় রাবণ নিজ ভবনশিখরস্থ মঞ্চ থেকে দগ্ধ লঙ্কার অবস্থা ও রাম-সৈন্য নিরীক্ষণ করছে। এমন সময় মন্দোদরী সীতা-প্রত্যর্পণের নিমিত্ত রাবণকে অনুরোধ জানাতে, মন্ত্রীগণ সবাই রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ জানায়। মন্ত্রীগণের এই পরামর্শ শুনে পাছে বন্দী ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মন্ত্রীগণের সহায়তায় তাকে হত্যা করে তাই রাবণ কুম্ভকর্ণকেই প্রথম যুদ্ধে পাঠাতে মনস্থ করে। দশমাঙ্কে রাবণ কর্তৃক মায়া রাম-লক্ষ্মণ বধ, সীতার শোক, সরমা কর্তৃক সীতাকে প্রবোধ দান, রাবণ কর্তৃক মায়া রাম বেশ ধারণ ও মায়া রাবণের ছিন্নমুণ্ড ধারণ পূর্বক সীতার নিকট আগমন ও সীতাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। একাদশ অঙ্কে দেখা যায়, রাবণ রাম-লক্ষ্মণকে নিধন করার জন্য প্রভঞ্জনী নামক রাক্ষসীকে প্রেরণ করেছে। অঙ্গদ-জাগরিত হয়ে তাকে দেখতে পায় ও নিহত করে। রাবণ—মন্ত্রী

মহোদর দ্বারা রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণের উপদেশ প্রদান। অতঃপর রাবণের আদেশে কুম্ভকর্ণ-এর নিদ্রাভঙ্গ হয়। কুম্ভকর্ণ রাবণকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানালে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই যুদ্ধযাত্রা করতে কৃতসঙ্কল্প হয়। ফলে কুম্ভকর্ণ রাবণকে আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধে যায় এবং তুমুল যুদ্ধের পর নিহত হয়। দ্বাদশ অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় হ'ল মেঘনাদ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন, রাবণের আদেশে সরমা কর্তৃক সীতাকে তৎপ্রদর্শন, সীতার বিলাপ, গরুড় কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের মুক্তি, মেঘনাদ কর্তৃক মায়া-সীতা বধ, রামের মূর্ছা ও লক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান, মেঘনাদ কর্তৃক নিকুম্ভিলা যজ্ঞারম্ভ, হনুমান কর্তৃক যজ্ঞভঙ্গ ও লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ বধ। ত্রয়োদশ অঙ্কের বর্ণনীয় বিষয় হচ্ছে রাবণ কর্তৃক শক্তিশেলক্ষেপ ও হনুমান কর্তৃক তা ধারণ, রাবণ কর্তৃক ব্রহ্মাকে হত্যার উদ্যোগ, ব্রহ্মার উপদেশে নারদ কর্তৃক রণক্ষেত্র থেকে হনুমানকে স্থানান্তরে অপসারণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ধারণ, হনুমান কর্তৃক রাবণ বৈদ্য সুষেণকে আনয়ন, সুষেণ কর্তৃক বিশল্যকরণী আনয়নাদেশ, হনুমানের গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে ভরত কর্তৃক হনুমানকে বাণবিদ্ধকরণ, ভরত-হনুমান সংবাদ, লক্ষ্মণের চেতনালাভ ও সকলের আনন্দ।

চতুর্দশ অঙ্কে রাম-রাবণ যুদ্ধ, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, সীতা নির্বাসন ইত্যাদি বর্ণিত আছে। এই অঙ্কের অভিনবত্ব—রাবণ কর্তৃক সীতাকে প্রত্যর্পণ বা যুদ্ধ বিষয়ে মন্দোদরীর নিকট পরামর্শ প্রার্থনা, মন্দোদরী ও সীতা কর্তৃক রাম-রাবণ যুদ্ধ দর্শন, মন্দোদরীর বিলাপ, লক্ষ্মণ ও হনুমান কর্তৃক লঙ্কা হতে সীতাকে আনয়ন, রাম কর্তৃক মন্দোদরীকে বিভীষণের গৃহে থাকতে আদেশ দান, অঙ্গদের রামের সহিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও দৈববাণীর দ্বারা তার নিবৃত্তি ইত্যাদি।

উপরের বস্তুসংক্ষেপ থেকে দেখা যায় যে নাট্যকার স্বীয় নাটকে রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নলিখিত অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য এই অভিনবত্বসমূহ নাট্যকারের মৌলিক সৃষ্টি নয়। এগুলি বিভিন্ন নাটক থেকে গৃহীত :

(১) সীতা-স্বয়ংবরে রাবণ পুরোহিতের উপস্থিতি ও রাবণের নিমিত্ত সীতার কর প্রার্থনা।

(২) রাম-জানকীর বিবাহোত্তর প্রণয়লীলা বর্ণনা।

(৩) শূর্পণখার অনুল্লেখ। বালীবধে তারার সন্তোষ ও সুগ্রীবের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা। রামের সঙ্গে বালীর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ ও রামকে অভিশাপ দান।

(৪) রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূত রূপে প্রেরণ।

(৫) রাবণ কর্তৃক প্রাসাদ থেকে দগ্ধলঙ্কা ও রামসৈন্য দর্শন।

(৬) মন্দোদরী কর্তৃক সীতা-প্রত্যর্পণের জন্য রাবণকে অনুরোধ।

(৭) মন্ত্রিগণ কর্তৃক সীতা-প্রত্যর্পণ-এর জন্য অনুরোধ ও কুম্ভকর্ণের রাজা হবার বিষয়ে রাবণের ভয়।

(৮) মায়া রাম-লক্ষ্মণ বধ।

(৯) রাবণ কর্তৃক রামবেশ ধারণ, ছদ্মরাবণের ছিন্ন শির প্রদর্শন ও সীতাকে আলিঙ্গনের চেষ্টায় ক্লীবত্ব প্রাপ্তি,

(১০) রাম-লক্ষ্মণের নিধনের জন্য রাবণ কর্তৃক প্রভঞ্জনীকে প্রেরণ ও অঙ্গদ কর্তৃক প্রভঞ্জনী নিধন।

(১১) রাবণের আদেশে সরমা কর্তৃক সীতাকে রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন প্রদর্শন।

(১২) হনুমান কর্তৃক শক্তিশেল ধারণ ও পরে ব্রহ্মার উপদেশে নারদ কর্তৃক হনুমানকে যুদ্ধক্ষেত্র হতে অপসারণ।

(১৩) লক্ষ্মণের চিকিৎসার জন্য রাবণ-বৈদ্য সুষেণকে হনুমানের আনয়ন।

(১৪) বিশল্যকবণী নিয়ে ফেরার সময় ভরত কর্তৃক হনুমানকে শরাঘাত।

(১৫) সীতা-প্রত্যর্পণ বিষয়ে মন্দোদরীর সঙ্গে রাবণের যুক্তি।

(১৬) মন্দোদরী ও সীতা কর্তৃক রাবণ-যুদ্ধ দর্শন।

(১৭) হনুমান ও লক্ষ্মণ কর্তৃক লঙ্কা হতে সীতাকে আনয়ন।

(১৮) রাম কর্তৃক মন্দোদরীকে বিভীষণের গৃহে অবস্থান করতে আদেশ দান।

(১৯) পিতৃবৈরী প্রতিবিধানের জন্য রামের সঙ্গে অঙ্গদের যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও দৈববাণী হেতু অঙ্গদের নিবৃত্তি।

নাটকটির বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায় যে যদিও নাট্যকার লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীকেই বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তথাপি নাটকীয় সংঘাতের মূলে আছে ভবভূতির 'মহাবীরচরিতে'র প্রভাব। নাটকীয় দ্বন্দ্বের পরিচয় নাটকের প্রথম অঙ্কেই আছে। তা হ'ল রাবণ কর্তৃক সীতা-কর প্রার্থনা, জনকের প্রত্যাখ্যান ও সেই কারণে সীতাপতি রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের বিরোধ। কিন্তু 'মহাবীরচরিতে' বা 'বালরামায়ণে' এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্রীয় সংঘাত রূপ গ্রহণ করে যেভাবে নাটকীয় পরিকল্পনা করা হয়েছে তা এখানে দেখা যায় না। এই দুটি নাটকে রাবণসচিব মাল্যবান রাবণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করেছে। এখানে সীতাকে আয়ত্তে পাওয়ার জন্য নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর সেই দৃঢ়গ্রন্থন দৃষ্ট হয় না। প্রথম অঙ্কে নাটকীয় সংঘাত সূচিত হলেও

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে রামের সংযোগ অত্যন্ত পরোক্ষ ও ক্ষীণ। দ্বিতীয় অঙ্কে সুদীর্ঘ রাম-সীতা প্রণয়লীলা বর্ণনার দ্বারা রামসীতার প্রগাঢ় প্রণয় প্রদর্শন করে ভবিষ্যতে নাট্যবস্তুর একটি উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করা হলেও বর্ণনার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য এর চমৎকারিত্ব ও নাটকীয়ত্ব নষ্ট করেছে। তৃতীয় অঙ্কের বিষয়বস্তু অন্ধমুনির শাপবশতঃ কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা ও তার ফলে রামাদির বনগমন —মূল নাট্যদ্বন্দ্বের সঙ্গে এক হিসাবে সম্পূর্ণ অসংশ্লিষ্ট। কারণ এখানে 'মহাবীর-চরিতে'র ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত না হয়ে রামায়ণের অদৃশ্য শক্তিই কার্যকরী হয়ে কখনো রাবণের সহায়ক, কখনো বা তার ধ্বংসকারক হয়েছে। নাটকীয় পরিকল্পনায় শূর্পণখার অনুল্লেখ নাট্যকারের অন্যতম অভিনবত্ব। বোধহয় নাট্যকার মনে করেছেন যে জনক কর্তৃক রাবণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও পুষ্কলের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে রামচন্দ্রের সীতাকে বিবাহ এই উভয় কারণই সীতাহরণের পক্ষে রাবণ কর্তৃক যথেষ্ট হেতুরূপে গৃহীত হতে পারে। এজন্য শূর্পণখার নাসাকর্ণ-চ্ছেদরূপ নূতন উত্তেজক কারণের প্রয়োজন নেই। নাটকীয় মূলদ্বন্দ্বের প্রতি লক্ষ রাখলে নাট্যকারের এক্ষেত্রে তেমন অসঙ্গতি হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কয়েকটি অভিনবত্ব শুধু রামায়ণ-বিরোধীই নয়, এগুলি নাটকীয় ক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গেও সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হনুমান কর্তৃক শক্তিশেল ধারণ ও অঙ্গদ কর্তৃক রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধোদ্যমের কথা বলা যেতে পারে। ভরত কর্তৃক হনুমানকে শরবিদ্ধকরণ কী নাটকীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে তা বোঝা যায় না। রাম-বালীর সম্মুখযুদ্ধ 'মহাবীরচরিতে'র প্রভাব নির্দেশ করে।

নাটকীয় বিষয়বস্তুর এই অসংলগ্নতার মূলে আছে নাটকটির কাব্যভাব। বস্তুত 'হনুমান্নাটক'কে দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পাশ্চাত্য আদর্শে এ তো নাটক নয়ই, প্রাচ্য আদর্শেও একে শ্রব্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করাই সমীচীন। 'মহাবীরচরিত', 'বালরামায়ণ', 'দূতাঙ্গদ', 'শকুন্তলা', 'রামায়ণ' এবং অন্যান্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত নানা কাব্য ও নাটক হতে শ্লোক গ্রহণ করে আলোচ্য নাটকটি রচিত হয়েছে।

নাটকীয় পরিকল্পনায় বাল্মীকির প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার নিমিত্ত রাম-লক্ষ্মণের আগমন হতে আরম্ভ করে রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত মূল ঘটনাবলী প্রধানতঃ রামায়ণ-কাহিনীকেই অনুসরণ করেছে। মায়া-রাম, লক্ষ্মণ বধ, রামবেশধারী রাবণ কর্তৃক মায়া-রাবণের মূর্তি প্রদর্শন প্রভৃতি যে অতিনাটকীয় ঘটনা এই নাটকে আছে তাতেও রামায়ণের মায়া-রামবধের প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। রাম-সীতার প্রণয়লীলার যে সুদীর্ঘ

বর্ণনা নাটকে আছে তার আভাসও রামায়ণের নিম্নলিখিত শ্লোকে আছে বলে অনুমান করা যেতে পারে—

"রামশ্চসীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূন ঋতূন।
মনস্বী তদ্‌গতমন্যস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ॥"

—রামায়ণ, বালকাণ্ড। ৭৭।২৫-২৬

অর্থাৎ "মনস্বী রাম সীতার হৃদয়ে বাস করতঃ সীতাকে মন সমর্পণপূর্বক তাঁর সহিত দ্বাদশ বৎসর কাল বিহার করলেন।"

তবে রাম-সীতার লীলা-বিলাসের মধ্যে 'কুমার-সম্ভবের' অষ্টম সর্গের প্রভাব সমধিক বলে মনে হয়। নাটকে মন্দোদরী রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ করেছিল, রামায়ণে এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত না থাকলেও মৃত্যুর পর মন্দোদরীর বিলাপে এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে—

"ক্রিয়তামবিরোধশ্চ রাঘবেনেতি যন্ময়া।
উচ্যমানন্নগৃহ্ণাসি তস্যেয়ং বুষ্টিরাগতা॥"

—রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড। ১১১।১৮-১৯

অর্থাৎ 'রামচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে সন্ধি করতে বার বার বলেছিলাম। তুমি তা শোননি, তারই ফল আজ ফলেছে।'

রামায়ণে মাল্যবান ও কুম্ভকর্ণ সীতা-প্রত্যর্পণের জন্য রাবণের কাছে অনুরোধ করেছিল। এই নাটকেও রাবণের মন্ত্রিবর্গ ও কুম্ভকর্ণ রাবণকে একই উপদেশ দান করে। রামায়ণে দেখা যায় শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করতে সুষেণ বিশল্যকরণী আনয়নের পরামর্শ দেয়, তবে এই সুষেণ রাজবৈদ্য ছিল না। নাটকের পরামর্শদাতাও সুষেণ তবে সে হনুমান কর্তৃক আনীত রাজবৈদ্য। রামায়ণে আছে লঙ্কাযুদ্ধের পর রামচন্দ্রের আদেশে হনুমান সীতাকে সংবাদ দিতে যায়। নাটকে লক্ষ্মণও হনুমানের সমভিব্যাহারী হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় নাট্যকার রামায়ণ-কাহিনীকে বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন।

নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণকে অনুসরণ করলেও নাটকীয় সংঘাতটি 'মহাবীর-চরিত' থেকে গৃহীত। নানা অভিনবত্ব নাটকের বস্তুবিন্যাসকে দৃঢ়ীভূত না করে বরং শিথিল ও অসংলগ্ন করেছে। বর্ণনার দীর্ঘত্ব নাটকীয় সংঘাত ও গতি রচনায় কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা তথা সামঞ্জস্যবোধের অভাব—সব মিলিয়ে নাটকটিকে বিকলাঙ্গ করে তুলেছে। বিভিন্ন নাটক ও কাব্য থেকে প্রয়োজনীয় শ্লোকাদি গ্রথিত করে গ্রন্থকার নাটক নামে কাব্য-লক্ষণাক্রান্ত এক বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণ-কাহিনী থেকে গৃহীত হলেও রামায়ণ-কাহিনীর যে যে অংশ নাট্যগুণ-সমন্বিত সেগুলিকে নাট্যকার সযত্নে বর্জন করে অপেক্ষাকৃত গৌণ অংশগুলির বর্ণনায় মনঃসংযোগ করেছেন। নাট্যকার দ্বন্দ্ব, পরিবেশ ও বিভিন্নমুখী চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নাটককে গতিশীল না করে বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়েছেন। ফলে এটি রসোত্তীর্ণ নাটক না হয়ে সুদীর্ঘ রামায়ণ-কাহিনীর শ্রুতিমধুর বর্ণনায় পর্যবসিত হয়েছে।

১১। অদ্ভুতদর্পণ — মহাদেব। (সম্পাদনা — শিবাদত্ত এবং কে. পি. পরব, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯০৬)

'অদ্ভুতদর্পণে'র নাট্যকার কৃষ্ণসূরির পুত্র মহাদেব সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। নাটকের বিষয়বস্তু অঙ্গদ-দৌত্য থেকে আরম্ভ করে লঙ্কাযুদ্ধের পর রামাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলী।

নাটকীয় বস্তুসংক্ষেপে এরূপ —

প্রথম অঙ্ক — যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করার উদ্দেশ্যে রাবণের নিকট অঙ্গদকে প্রেরণ করায় লক্ষ্মণ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন সময় রামচন্দ্র এলেন। নেপথ্য-ভাষণ ও জাম্ববানের উক্তি থেকে জানা গেল যে মেঘনাদ সপরিবারে বিভীষণকে ধ্বংস করার জন্য বিভীষণের গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে। পরে বিভীষণের অমাত্য সম্পাতি ও অনল সংবাদ দিল যে এই সংবাদ পূর্বেই জানতে পেরে সম্পাতি বিভীষণের পরিবারবর্গকে মৈনাক পর্বতে রেখে এসেছে। লক্ষ্মণ এই তুচ্ছ কথোপকথনে ক্ষুব্ধ হয়ে শ্লেষবাক্য দ্বারা রামচন্দ্রকে নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলেন। অনল রামচন্দ্রকে জানালেন, বিভীষণ সংবাদ পেয়েছেন যে রাক্ষসগণ মায়াশক্তি অবলম্বনে যুদ্ধ করবে।

এমন সময় দধিমুখ বানরের ছদ্মবেশে সম্বর রাক্ষস সংবাদ দিল যে পিতৃবৈর-নির্যাতনের জন্য অঙ্গদ রাবণের পক্ষে যোগ দিয়েছে। একথা কেউ বিশ্বাস করল না। জাম্ববানের সন্দেহ হল, এ বানর ছদ্মবেশী। রামের অনুমোদনক্রমে ছদ্মবেশী সম্বরকে জাম্ববান বন্দী করল।

দ্বিতীয় অঙ্ক — এই অঙ্কের বিষ্কম্ভকে আছে, ছদ্মবেশী সম্বর কৌশলক্রমে সত্য-দধিমুখকে ছদ্মবেশী রাক্ষস বলে জাম্ববানের হাতে বন্দী করালো। জাম্ববান সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করতে দধিমুখকে নিয়ে বিভীষণের কাছে গেল।

অঙ্কারম্ভে রাম, লক্ষ্মণ ও ছদ্মবেশী সম্বরকে দেখা গেল। সম্বর রামচন্দ্রকে বললে যে, কোনো রাক্ষসের নিকট থেকে মিথ্যা সংবাদ পেয়ে সুগ্রীব অঙ্গদকে রক্ষা করতে

একাই লঙ্কায় গেলে সেখানে সুগ্রীব শত্রুপক্ষ-প্রবিষ্ট অঙ্গদ কর্তৃক নিহত হয়েছে। রামচন্দ্র সুগ্রীবের শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলে লক্ষ্মণ তাঁকে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় কপিদের নেপথ্য কোলাহল জানা গেল যে অঙ্গদ লঙ্কা হতে ফিরেছে। সম্বর তখন মতলব স্থির করল যে অঙ্গদকে লক্ষ্মণের ক্রোধপাত্র করে কার্যোদ্ধার করবে। বানরদের উদ্দেশ্যে তদুপযোগী বাক্য বলে সম্বর নিষ্ক্রান্ত হল।

তৃতীয় অঙ্ক—এই অঙ্কে সম্বরের মায়াকৌশল প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমতঃ সে অঙ্গদের ছদ্মবেশে রামের নিকটে এসে নানা চাতুর্যপূর্ণ বাক্যে রামচন্দ্রকে বিমুগ্ধ করতে চেষ্টা করল। পরে যখন সে দেখল যে লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন তখন সে সত্য অঙ্গদ আসছে মনে করে তাকেই লক্ষ্মণের ক্রোধপাত্র করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং অন্তর্হিত হল। ইতিমধ্যে রাক্ষস প্রহস্ত আকাশ-যুদ্ধে আহত হয়ে রামের নিকট পতিত হয়েছে এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞা লাভ করে বানরদের উদ্দেশ্যে ক্রোধোক্তি প্রকাশ করছে, দেখা গেল।

সম্বর অন্তর্হিত হলে সুগ্রীব প্রবেশ করলে লক্ষ্মণ তাকে মায়া-সুগ্রীব মনে করলেন। কিন্তু রাম তাকে সত্য সুগ্রীব বলে গ্রহণ করলেন। তাঁরা তিনজন নিষ্ক্রান্ত হলে প্রহস্ত ছদ্মবেশী সম্বরকে বানর মনে করে ধরে ফেলল।

চতুর্থ অঙ্ক—জাম্ববান প্রকৃত দধিমুখের নিকট সমস্ত সংবাদ ও ছদ্মবেশী সম্বরের প্রতারণার কথা অবগত হল। সে আরও অবগত হল যে, আকাশ হতে ভ্রষ্ট অদ্ভুত মণি গ্রহণ করে সুগ্রীব রাম সমীপে গমন করেছে। এদিকে প্রহস্তের হস্তে আবদ্ধ সম্বর ইঙ্গিতে তার আত্মপরিচয় দিলে প্রহস্ত বিস্মিত হয়ে তাকে সব কথা বলল। প্রহস্ত রামাদিকে আগমন করতে দেখে পলায়ন করল। জাম্ববান সম্বরকে বন্দী করল। আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হলে জাম্ববান রামের আদেশে তাকে কিষ্কিন্ধ্যায় আবদ্ধ করে রাখতে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বানরসৈন্যদের মধ্যে কোলাহল শ্রবণে রাম দেখলেন, মেঘনাদ নাগাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। মেঘনাদের পরাক্রমে ও অস্ত্রবলে বানর বাহিনী পর্যুদস্ত ও ব্যাকুল হলে রামচন্দ্র বানরগণকে আশ্বস্ত করে গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

পঞ্চম অঙ্ক—মাল্যবান ও ময়দানবের কথোপকথন থেকে বিভীষণ কর্তৃক রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ করতে অনুরোধ, রাবণ কর্তৃক বিভীষণকে পদাঘাতে বিতাড়ন ও বিভীষণ কর্তৃক রামপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা জানা গেল। অতঃপর এক অনুচর এসে মাল্যবানকে সংবাদ দিল যে রাবণ স্বয়ং সংগ্রামে গিয়েছে এবং মাল্যবানকে আদেশ দিয়ে গেছে যে সে যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করে এবং

ত্রিজটা প্রমুখ রাক্ষসীগণের দ্বারা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে। মাল্যবানের ও ময়ের সংলাপ থেকে আরও জানা গেল যে, রাবণের কিরীটস্থিত অদ্ভুতদর্পণ মণি অঙ্গদের পদাঘাতে বিচ্যুত হলে সম্পাতি তা দেখতে পেয়ে বিভীষণকে বলে ও বিভীষণ রামচন্দ্রকে তা দান করে।

অনন্তর বিদ্যুজ্জিহ্ব রাবণাদেশে শূর্পণখা রামচন্দ্রের মস্তক দেখিয়ে তাঁকে রাবণের বশীভূতা করতে আদেশ করে। শূর্পণখা রামচন্দ্রের কর্তিত মায়ামুণ্ড সীতাকে দেখালে সীতা শোকে বিহ্বল হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সীতাদেবীর এরূপ অবস্থা দর্শনে শূর্পণখা ও রাক্ষসীগণ ভীত হয়ে স্থান ত্যাগ করলে ত্রিজটা ও পরে সরমা সেখানে উপস্থিত হয়। সীতাকে মূর্ছিত দেখে তারা বহু যত্নে সীতার চৈতন্য সম্পাদন করে মায়ানাটিকার সাহায্যে রাম-রাবণের যুদ্ধবৃত্তান্ত প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করে।

ষষ্ঠ অঙ্ক— ষষ্ঠ অঙ্ক থেকে অষ্টম অঙ্ক পর্যন্ত ত্রিজটা কর্তৃক মায়া-নাটিকা প্রদর্শিত হয়েছে। এই মায়া নাটিকা বস্তুতঃ সীতাকে প্রদর্শিত হলেও রাবণ ও মহোদর অন্তরাল থেকে তা দেখে। এদিকে রাম-লক্ষ্মণও অদ্ভুতদর্পণের সাহায্যে তা দেখলেন। এতে মেঘনাদ বধ ও কুম্ভকর্ণ বধ পর্যন্ত বিবৃত আছে। রাবণ একে সরমা ও ত্রিজটার অপকারেচ্ছা মনে করে তাদের বধ করতে উদ্যত হলে নেপথ্য ভাষণের দ্বারা প্রকৃত কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের নিধন বার্তা ঘোষিত হল। রাবণ শোকে, দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং পরে সংজ্ঞালাভ করে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করে।

নবম অংশ— এই অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ ও রাম কর্তৃক রাবণ নিধন ও বিভীষণ-অভিষেক বর্ণিত হয়েছে। অঙ্কের শেষের দিকে সীতাদেবীর রামের নিকট গমন বর্ণিত হয়েছে।

দশম অঙ্ক—এই অঙ্কে সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও দশরথের আশীর্বাদ-এর পর ত্রিজটা ও সরমার সঙ্গে রামাদি সকলে বিমানযোগে অযোধ্যা গমন করলেন।

উপরে বর্ণিত বস্তুসংক্ষেপ হতে দেখা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তু রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের কিছুটা ও লঙ্কাকাণ্ডের মূল ঘটনাবলী নিয়ে রচিত হয়েছে। ঘটনাবলীর মধ্যে মেঘনাদ কর্তৃক নাগাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে প্রহস্তাদি নিধন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞে মেঘনাদ বধ, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও নিধন ও পরিশেষে রাবণ বধ বর্ণিত হয়েছে। নাটকের শেষে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা বর্ণিত হয়েছে। তাহলে দেখা যায়, ঘটনাবলীর বিন্যাসে নাট্যকার মুখ্যত রামায়ণ-কাহিনীর অনুসরণই করেছেন। তৎসত্ত্বেও নাট্যকীয় বস্তুবিন্যাসে নিম্নলিখিত অভি-নবত্বগুলি লক্ষ্য করা যায় :—

(১) অঙ্গদের দৌত্য ও অঙ্গদের রক্ষার্থে সুগ্রীবের লঙ্কায় গমন।

(২) মেঘনাদ কর্তৃক সপরিবারে বিভীষণকে ধ্বংস করার জন্য গোপনে তার গৃহে অগ্নিসংযোগ ও তৎপূর্বেই সম্পাতি কর্তৃক তাদের নিরাপদ স্থানে অপসারণ।

(৩) ছদ্মবেশী সম্বর কর্তৃক সুগ্রীব ও অঙ্গদ সম্বন্ধে নানা ছলনাময় কাহিনীর উদ্ভাবন।

(৪) বিদ্যুজ্জিহ্বের আদেশে শূর্পণখা কর্তৃক সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন।

(৫) ত্রিজটাকর্তৃক প্রদর্শিত সমগ্র মায়া-নাটকটি নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি।

স্পষ্টতই নাটকের গঠনে অন্যান্য প্রভাব দেখা যায়। মেঘনাদ কর্তৃক বিভীষণের গৃহে অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে মহাভারতের জতুগৃহদাহে ও মায়া-নাটিকা প্রদর্শন ব্যাপারে 'প্রসন্নরাঘবে'র তথা ভবভূতির প্রভাব আছে তা সহজেই প্রতিভাত হয়। এছাড়া নাটকটির নামকরণে ও অদ্ভুতদর্পণ মণির সাহায্যে নানা ঘটনা প্রদর্শনের মধ্যে 'আশ্চর্য চূড়ামণি'র প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

নাটক ও কাব্যের নামকরণের সঙ্গে তার বস্তুবিন্যাসের নিগূঢ় সম্পর্ক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। অদ্ভুতদর্পণ মণি সম্বন্ধে নাটকে নিম্নলিখিত দুটি উক্তি আছে। প্রথম উক্তিটিতে বলা হয়েছে যে রাবণের মুকুট থেকে চ্যুত অদ্ভুত মণি এখন রামের কাছে শোভা পাচ্ছে। দ্বিতীয় উক্তিতে বলা হয়েছে যে, সেই অদ্ভুতদর্পণ মণিতে সব-কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে।

১) আকস্মিক প্লুতকপীন্দ্র পদাভিঘাত—
নির্ধূত বাবণ কিরীটতটচ্যুতেষু।
আশাবপাতিষু মণিদ্বয়মেক এব
সংপাতিনা স্বয়মদর্শি বিভীষণায়॥ ৫।২৩
তেনচাপি পরিজ্ঞাতমহিমা মণিরদ্ভুতঃ
কালোচিততয়া সদ্যঃ করং রামস্য লম্ভিতঃ॥ ৫।২৪

২) অস্তি মহারাজ লংকেশ্বরস্য শ্বশুরেণ দানবেন্দ্রেন
দর্শনোপদীকৃতো মহামণিরদ্ভুত দর্পণো নাম।
প্রতিফলতি যত্র সর্বংবস্তু যদা যোজনত্রিতয়াৎ
তত্তৎক্রিয়াশ্চ সর্বা বিনা পুনর্মাণসীং বৃত্তিম্॥

নাটকের প্রথম অঙ্ক হতে পঞ্চম অঙ্কের বিষয়বিন্যাসের মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম রাক্ষসগণের কূটকৌশল ও মায়াশক্তি অবলম্বনের দ্বারা ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা; দ্বিতীয় অঙ্গদ ও সুগ্রীবাদির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের কিরীট হতে অদ্ভুতদর্পণ

মণির বিচ্যুতি ও রাম-কর্তৃক তা লাভ। এই অদ্ভুতদর্পণ মণি রামের হস্তে আনয়নের জন্যই নাটকের এই অংশের বস্তুবিন্যাস এরূপভাবে করা হয়েছে। এই-রূপে অদ্ভুতদর্পণকে রামের করায়ত্ত করিয়ে এরই সাহায্যে মায়ানাটিকার প্রদর্শন নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। নাটকীয় বস্তুবিন্যাসে অদ্ভুতদর্পণের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে বলেই নাট্যকার নাটকের এই নামকরণ করেছেন।

এইভাবে অদ্ভুতদর্পণ মণিকে নাটকের বিষয়বস্তুর কেন্দ্রস্থলে রেখে একে মুখ্য ঘটনার নিয়ামকরূপে না দেখলে সমগ্র নাটকীয় বস্তুবিন্যাস নিতান্তই অসংলগ্ন ও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বর্ণনায় পর্যবসিত হয়। অবশ্য অদ্ভুতদর্পণকে মুখ্যস্থানে সংস্থাপন করলেও বিষয়বস্তুর এই অসংলগ্নতা ও শিথিল বন্ধনের দোষ দূর হয় না। বস্তুত এই নাটকে কোন কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব আছে বলে মনে হয় না। যদিও রাম-রাবণের দ্বন্দ্বকে নাটকীয় সংঘাতের বিষয়বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি কয়েকটি বালোচিত প্রতারণা কাহিনী এবং মায়ানাটিকার সাহায্যে কয়েকটি অলৌকিক দৃশ্য প্রদর্শন ব্যতীত নাটকে বিশেষ কিছুই নেই। কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের যুদ্ধ এবং মৃত্যু বর্ণনাও চারটি শ্লোকে শেষ করা হয়েছে।

রাম-রাবণের যুদ্ধের ও রাম-কর্তৃক রাবণ নিধনের কিছু বিস্তৃত বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু নাটকের এই পরিণতিতেও কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় তেমন সুগ্রথিত হয়নি।

নাটকের বস্তুবিন্যাসের উপর রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিদ্যুজ্জিহ্বের আদেশে শূর্পণখা কর্তৃক রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন হতে আরম্ভ করে ত্রিজটা ও সরমা কর্তৃক সীতার আনুকূল্য, ইন্দ্রজিতের নাগাস্ত্র সহ যুদ্ধ, প্রহস্ত নিধন, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ, মেঘনাদ ও কুম্ভকর্ণবধ, রাবণবধ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ও সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ঘটনাই রামায়ণ-কাহিনী-সম্মতভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। আর রাক্ষসগণের মায়াযুদ্ধের কথা বলে বিভীষণ রামচন্দ্রকে সতর্ক করেছিলেন এবং যার পরিচয় সম্বরের নানা ছলনাময় কাহিনীর মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও রামায়ণে গরুড়ের উক্তি লক্ষণীয়। নাগপাশে আবদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে মুক্ত করে গরুড় রামচন্দ্রকে বলেছিল—'এখন আপনারা মুক্ত হলেন। আপনারা কর্তব্যকর্মে আর ভুল করবেন না। রাক্ষসেরা যুদ্ধে কূটকৌশল অবলম্বন করে আর শুদ্ধ, স্বভাব-সরলতাই আপনাদের বল। এই দৃষ্টান্তে রাক্ষসদের কখনোই বিশ্বাস করবেন না। কারণ রাক্ষসেরা সর্বদাই কুটিল স্বভাব।'

"মোক্ষিতৌ চ মহাঘোরদস্মাৎ শায়ক-বন্ধনাৎ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যো যুবাভ্যাং নিত্যমেব হি॥

প্রকৃত্যা রাক্ষসাঃ সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরানাং শুদ্ধভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্।
তন্ন বিশ্বসনীয়ং বো রাক্ষসানাং রণাজিরে।
এতে নৈবোপমানেন নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ॥

বস্তুতঃ মায়াযুদ্ধের বা মায়া প্রদর্শনের কৌশলটি বাল্মীকি হতেই গৃহীত। তবে নাট্যকার এতে নানা অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া ময়-কর্তৃক মালী সুমালীর কাহিনী, রাবণ-কর্তৃক রম্ভাধর্ষণ ও নলকুবেরের কাহিনী, রাম-কর্তৃক লোকাপবাদচিন্তা, মেঘনাদ-কর্তৃক মায়াসীতাবধ ও অভিচার-যজ্ঞ কালে মেঘনাদ নিধন, মাতলির মাধ্যমে ইন্দ্র-কর্তৃক রথ প্রেরণ, রামের প্রতিনিধি হিসাবে ভরতের রাজ্য শাসন, ইন্দ্রের বরে মৃত বানরদের পুনর্জীবন লাভ ইত্যাদি নানা গৌণ ব্যাপারেও রামায়ণের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। কাজেই নাটকীয় কাহিনীতে রামায়ণের গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য।

মায়ানাটিকার প্রদর্শন প্রসঙ্গে পাত্রপাত্রীর উপস্থাপন ও তাদের সংলাপ যোজনার মধ্যে শিল্পকৌশল আছে। প্রকৃত রাম-লক্ষ্মণ, বিকৃত রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ-মহোদর, সীতা-সরমা-ত্রিজটা প্রভৃতির কথোপকথনের মধ্যে স্বাভাবিক যোগসূত্র ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে নাট্যকার সুন্দর কলাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।

রসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে এই নাটকের উপর রামায়ণের প্রভাব অতি ক্ষীণ। কারণ রামায়ণের বীর বা করুণ কোনো রসকে মুখ্যভাবে নাটকে গ্রহণ করা হয়নি। বস্তুতঃ এই নাটকে কোন রসই স্ফূর্তি লাভ করেনি। কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত বস্তুবিন্যাস এবং উপযুক্ত চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমেই রসস্ফূর্তি লাভ করে। আলোচ্য নাটকের নাট্যকার প্রথম অঙ্ক হতে অষ্টম অঙ্ক পর্যন্ত নানা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দ্বারা অদ্ভুত রস সৃষ্টির যে প্রয়াস করেছেন নাটকের শেষ দুটি অঙ্কে বাস্তব ঘটনার সমাবেশ ও তদনুযায়ী উপসংহার করার ফলে তা ব্যাহত হয়েছে। ফলে নাটকটি অদ্ভুত বা বাস্তবঘটনা-সঞ্জাত বীর বা করুণ রস কোনো রসের নাটকই হয়ে ওঠেনি।

১২। জানকী পরিণয়—রামভদ্র দীক্ষিত। (সম্পাদনা—টি. গণপতি শাস্ত্রী, ত্রিভেন্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৯১৩)

'জানকী পরিণয়' নাটকের রচয়িতা রামভদ্র দীক্ষিত সপ্তদশ শতাব্দীর ব... ...
টির রচনাকৌশলের মধ্যে অভিনবত্বের বিশেষ পরিচয় আছে।

নিম্নে নাটকের বস্তুসংক্ষেপ প্রদত্ত হল :—

প্রথম অঙ্কের দশাননানুচর শুক ও সারণের কথোপকথনে প্রকাশ পেল যে জনক-কন্যা সীতাকে লাভ করার জন্য রাবণ সারণের মাধ্যমে জনককে অনুরোধ করেছে যে তিনি যেন তাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু রামগতচিত্ত কন্যাকে রাবণের হাতে সমর্পণ করবেন কিনা সন্দেহ থাকায় সারণ প্রস্তাব করে যে রাবণ, সারণ ও বিদ্যুজ্জিহ্ব যথাক্রমে রাম-লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের রূপ ধারণ করে জনকের নিকট সীতার কর প্রার্থনা করবে ও এইভাবে ছলনা করে রাবণ সীতাকে বিবাহ করবে। আরও জানা গেল যে দশানন সীতাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক এই সংবাদ জানতে পেরে জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে সীতার উপযুক্ত বর-সংগ্রহ-কার্যে নিযুক্ত করেন। বিশ্বামিত্র 'সপুত্রদারং দশরথমুপ নিমন্ত্রয়িতুং' অযোধ্যায় গেছেন এবং জনকরাজ 'যজ্ঞ দর্শন-ব্যাজেনকৌশিকাশ্রমপদং গতঃ।' অযোধ্যা থেকে বিশ্বামিত্রাদি যাতে প্রত্যাবর্তন না করতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের বধার্থ তাড়কাকে নিযুক্ত করা হল।

সারণের প্রস্তাবানুসারে রাবণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও সারণ বিমানযোগে কৌশিকা-গ্রামে গমন করলেন। তিরস্করণীবিদ্যাপ্রভাবে সবাই অন্যের অলক্ষ্যে অবতরণ করলেন। সেখানে তারা বিশ্বামিত্র ও শতানন্দের শিষ্যদ্বয়ের সংলাপে রাম-জানকী পরিণয় সম্বন্ধে জনক ও শতানন্দের মনোভাব বুঝতে পাবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে অত্রি ও অনুসূয়ার সংলাপে রামকে স্বপ্নে দর্শন করে সীতার বিরহ ব্যাকুল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া অনুসূয়াকে দেবগণ কর্তৃক প্রদত্ত 'চীনাংশুকমঙ্গরাগশ্চ' সীতাকে উপহার দেওয়ার কথাও আছে।

নাট্যদৃশ্যে দেখা যায় রাবণ সীতাকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। এমন সময় সীতার নেপথ্যভাষণ শ্রুত হল। রাবণ একে পিকবধূর কণ্ঠস্বর বলে মনে করল।

অতঃপর সখীগণসহ সীতার প্রবেশ। বিরহ বেদনা দূর করার জন্য সখীগণের উপদেশে সীতা চিত্রপটে রামের আলেখ্য অঙ্কন করলেন। সীতার অঙ্কিত তাঁর প্রেমাস্পদ রামচন্দ্রের আলেখ্য দেখে রাবণ হতাশ হয়ে ভাবলে 'কথামিদ মন্যথা বর্ত্ততে, হৃদয়, বৃথা তে মনোরথঃ'। সখীগণের সংলাপে জানা গেল যে বিশ্বামিত্র সীতাকে রাক্ষসাঙ্ককরণ মণি দিয়েছেন। সীতাকে রাবণ দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সারণ অযোধ্যক মুনির বেশে ক্লান্তি দূর করার ছলে ছায়া ও ব্যজন দানের জন্য আহ্বান জানাল। সখীগণসহ সীতা এসে আত্মপরিচয় দান করলে সখীগণ মুনিবেশী সারণকে বলল, যদি মুনি সুসংবাদ প্রদান করেন তবে তিনি জানকীর রত্নকটকযুগল উপহার পাবেন। কৌশিক মুনি সেইদিনই রামচন্দ্রসহ আশ্রমে

আসবেন, মুনিবেশী সারণ এই কথা বললে তাকে রত্নকটকযুগল উপহার দেওয়া হল। এমন সময় .নপথ্যভাষণে মহর্ষি অত্রির পত্নী অনুসূয়ার আগমন ঘোষিত হলে সীতা সখীসহ নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাক্ষসগণও রাম, লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের বেশ ধারণ করে নিষ্ক্রান্ত হল।

তৃতীয় অঙ্কের বিষ্কম্ভকে মারীচের সংলাপে তাড়কা ও সুবাহু বধ, মারীচকে শতযোজন দূরে নিক্ষেপ, মারীচ-সহচর করালের পলায়ন ও পুনরায় মারীচের সঙ্গে সংযোগ ও উভয়ের রামের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের নবপরিকল্পনা বর্ণিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা হল মায়াসীতার অগ্নিপ্রবেশ প্রদর্শন পূর্বক রামকেও অগ্নিপ্রবেশ করানোর ও বিশ্বামিত্রসহ দশরথাদির অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করানোর ব্যবস্থা। এই ষড়যন্ত্র অনুসারে করাল রাম-সখা পিঙ্গল ও মারীচ কৌশিক-শিষ্য কাশ্যপের বেশ ধারণ করে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। রাক্ষসগণের ষড়যন্ত্র প্রায় সফল হয়ে এসেছে এমন সময় অকস্মাৎ রামের পদস্পর্শে একটি প্রস্তর মূর্তি ধারণ করল ইনি গৌতম-পত্নী শাপগ্রস্তা অহল্যা। অহল্যা মারীচাদির সত্য পরিচয় দান করলে তারা পালিয়ে গেল।

চতুর্থ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে দেখা যায় ইন্দ্র কর্তৃক রাক্ষসগণের মনোভাব বোঝার জন্য প্রেরিত গন্ধর্ব চিত্রাঙ্গদ জনৈক রাক্ষসীর নিকট থেকে জানতে পারল যে রামাদির বেশ ধারণ করে রাবণ প্রভৃতি সীতাকে বঞ্চনার দ্বারা গ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদ জনককে খবর দান করার জন্য গেল।

নাট্যদৃশ্যে দেখা যায় বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণের বেশ ধারণ করে বিদ্যুজ্জিহ্ব, রাবণ ও সারণ জনকপুরে এল এবং জনক তাদের অভ্যর্থনা করলেন। শতানন্দ ও জনক সীতা প্রভৃতি চারটি কন্যা রামাদি চার ভ্রাতাকে সম্প্রদানের ইচ্ছা করে কন্যা আনয়নের ব্যবস্থা করলেন। এমন সময় নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদের ঘোষণা শ্রুত হল যে রাবণাদি রামাদির ছদ্মবেশ ধারণ করে জনককে প্রবঞ্চিত করে সীতালাভের জন্য এসেছে। এদিকে দূত এসে ঘোষণা করল, রাম-লক্ষ্মণ-সহ বিশ্বামিত্র এসেছেন। উদ্বিগ্ন রাক্ষসত্রয় বিদায় নেওয়ার সময় বলে গেল যে যাঁরা আসছেন তাঁরাই ছদ্মবেশী রাক্ষস। বিশ্বামিত্রসহ রাম-লক্ষ্মণ এলেন। এরা রাক্ষস কিনা জানবার উদ্দেশ্যে শতানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে জনক বললেন যে তিনি কন্যা সীতাকে বীর্য-শুল্কা করেছেন। যে হরধনু ভঙ্গ করতে পারবে সেই সীতাকে লাভ করবে। বিশ্বামিত্রের আদেশে রাম হরধনু ভঙ্গ করলেন। তিরস্করণীবিদ্যার প্রভাবে রাবণ প্রচ্ছন্নভাবে সবই দেখলে।

পঞ্চম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিরাধ-শূর্পণখা সংলাপের মাধ্যমে—মাল্যবানের

পরামর্শে ভার্গবকে রামের নিকট প্রেরণ, জামদগ্ন্য বিজয়, বিদ্যুজ্জিহ্ব সারণ ও শূর্পণখা কর্তৃক যথাক্রমে কৈকেয়ী, দশরথ ও মন্থরার ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক দশরথকে প্রতারিত করে রামাদিকে বনে নির্বাসন, দশরথের পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ, ভরত-রাম সমাগম ও রামের পাদুকা নিয়ে ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। খর কর্তৃক রামবধে নিযুক্ত বিরাধের ইচ্ছা ছিল, সে রামকে হত্যা করে সীতাকে গ্রহণ করবে। এদিকে শূর্পণখার ইচ্ছা ছিল সে রামকে নিয়ে সুখে কালাতিপাত করবে। উভয়ে যথাক্রমে রামসীতার ছদ্মবেশ ধারণ করে পরস্পরকে প্রতারিত করে সত্য রামসীতার সঙ্গ লাভ করেছে মনে করল। পুষ্পচয়নের জন্য রামবেশী বিরাধ সীতাবেশিনী শূর্পণখার স্কন্ধে আরোহণ করলে, শূর্পণখা তাকে সত্য রাম মনে করে আকাশপথে উড়ে গেল এবং দূর হতে জটায়ু তা দেখে গর্জন করে উঠলে ভয়ে নেমে এল। এতক্ষণে তাদের পরস্পরের মনের ভ্রম বুঝতে পেরেছে। লক্ষ্মণ এতক্ষণ প্রচ্ছন্নভাবে এদের অনুসরণ করছিলেন। তারা ভূমিতে অবতরণ করলে লক্ষ্মণ বিরাধকে বধ ও শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ করলেন। শূর্পণখার দুরবস্থার খবর পেয়ে খর রামকে আক্রমণ করতে এল ও রামের সঙ্গে তার যুদ্ধ হল।

ষষ্ঠ অঙ্কের বিষ্কম্ভকে বিভীষণ-কন্যা অনলার সঙ্গে সম্পাতির কথোপকথন থেকে জানা যায় রাবণ সীতাহরণ করছে এবং রাম ইতিমধ্যে বালীবধ ও সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছেন। রামের শৌর্য বীর্য, কিরূপ তা রাবণকে দেখিয়ে সীতা-প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে বিভীষণাদি অমাত্যবর্গ একটি প্রেক্ষণকাভিনয়ের ব্যবস্থা করে। প্রেক্ষণকের বিষয়বস্তু হল সীতাহরণের পর রাম কর্তৃক সীতান্বেষণ হতে বালীবধ পর্যন্ত ঘটনাবলী। রাবণ, অমাত্য মহাপার্শ্বসহ অভিনয় দেখতে এল। এদিকে সীতা ও অনলা রাক্ষসাঙ্ককরণ মণি ও অনলা কর্তৃক বিদ্যুজ্জিহ্বের স্ত্রী মায়াবতীর নিকট হতে আহৃত রত্নকটকযুগলের সাহায্যে অন্যেরা অদৃশ্য ভাবে এই অভিনয় দেখতে লাগলেন। অতঃপর সুগ্রীবের রাজ্যে ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষেক, জটায়ুর অগ্রজের মুখে সীতার অবস্থিতি জানতে পেরে সীতার অন্বেষণে হনুমানের লঙ্কাগমন, সীতাদির অশোকবনে গমন ও হনুমানের আগমন প্রতিষেধার্থে নাগরিকগণের প্রতি রাবণের নির্দেশ বর্ণনান্তে অঙ্কের সমাপ্তি ঘটেছে।

সপ্তমাঙ্কের বিষ্কম্ভকে শূর্পণখা বিলাপের মাধ্যমে রাবণাদি রাক্ষসগণের নিধন, বিভীষণের রাজ্যপ্রাপ্তি ও তজ্জন্য শূর্পণখার দুঃখ বর্ণিত হয়েছে। সম্পাতির সংলাপে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামাদির পুষ্পকারোহণে অযোধ্যায় যাত্রা এবং ভরতকে সংবাদ দানের জন্য হনুমানের পূর্বেই তথায় গমন বিবৃত হয়েছে। প্রতিহিংসা গ্রহণার্থে শূর্পণখা সংকল্প করল বৃদ্ধা তাপসীর বেশে ভরতকে রামাদির মৃত্যু সম্বন্ধে

মিথ্যা সংবাদ দিয়ে ভরতাদির মৃত্যু ঘটাবে। সেই উদ্দেশ্যে সে অযোধ্যায় যাত্রা করল।

সংকল্প অনুসারে শূর্পণখা গিয়ে ভরতকে মিথ্যা সংবাদ দিলে ভরত ও শত্রুঘ্ন অনলে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময় জনক এসে সব সংবাদ শুনে তিনিও অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিতে সংকল্প করলেন। এমন সময় নেপথ্যে ঘোষণা হল সীতা ও লক্ষ্মণসহ রাম আসছেন, ভরত প্রভৃতি যেন অগ্নিতে আত্মবিসর্জন না করেন। হনুমান এসে লঙ্কাযুদ্ধের বর্ণনা করল। অতঃপর রামাদির আগমন ঘটলে মিলনোৎসবের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটল।

নাটকের বিষয়বিন্যাস আলোচনা করলে নিম্নলিখিত নূতনত্ব সমূহ লক্ষ্য করা যায় :—

১) রাবণের সীতা-কর প্রার্থনা, রামগতচিত্ত বলে সারণের প্রস্তাবক্রমে রামের ছদ্মবেশে রাবণ কর্তৃক সীতালাভের চেষ্টা।

২) জনক কর্তৃক সীতার বর সংগ্রহে বিশ্বামিত্রকে নিয়োগ ও কন্যাসহ জনকের বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আগমন।

৩) বিবাহের পূর্বে স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দর্শন করে সীতার রামচন্দ্রের প্রতি গভীর প্রেম ও তীব্র মিলনকাঙ্ক্ষা।

৪) বিশ্বামিত্র কর্তৃক সীতাকে বাক্ষসান্ধকরমণি ও রত্নকটকযুগল উপহার দান।

৫) অযোধ্যায় ঋষির ছদ্মবেশে সারণের সীতার নিকট আগমন। সারণ কর্তৃক রত্নকটক যুগল উপহার রূপে গ্রহণ।

৬) অত্রিপত্নী অনুসূয়ার সীতার বিবাহের পূর্বে কৌশিকাশ্রমে আগমন ও সীতাকে চীনাংশুক ও অঙ্গরাগ প্রদান।

৭) তাড়কাবধের নূতন কারণ আবিষ্কার, রামকে হত্যা করার জন্য মারীচের নূতন ষড়যন্ত্র ও আকস্মিক ভাবে অহল্যা উদ্ধার।

৮) রাক্ষসী মায়া নির্ণয়ার্থ জনক কর্তৃক কন্যাকে বীর্যশুল্কারূপে ঘোষণা ও হর-ধনুভঙ্গ পণ।

৯) তিরস্করণীবিদ্যাপ্রভাবে অদৃশ্যভাবে রাবণাদির হরধনুভঙ্গ ও রামসীতা পরিণয়োদ্যোগ দর্শন।

১০) খর কর্তৃক রামবধের উদ্দেশ্যে বিরাধকে নিয়োগ, বিরাধ ও শূর্পণখার রাম ও সীতারূপে পরস্পরকে ছলনা।

১১) প্রেক্ষণকের সাহায্যে রাম কর্তৃক সীতা-অন্বেষণ থেকে বালী বধ পর্যন্ত ঘটনাবলী প্রদর্শন।

১২) প্রচ্ছন্নভাবে সীতা ও অনলার প্রেক্ষণকাভিনয় দর্শন।

১৩) হনুমানের লঙ্কায় আগমন—প্রতিষেধার্থে নাগরিকগণের প্রতি রাবণের নির্দেশ।

১৪) রাবণাদি বধের প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ভরতাদির নিকট শূর্পণখার মিথ্যা সংবাদ দান।

এই নাটকের পরিকল্পনায় নাট্যকার স্পষ্টতঃই তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকার ও কবিগণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। নাটকীয় দ্বন্দ্বে ভবভূতি, রাজশেখর, মুরারি, জয়দেব প্রভৃতির প্রভাব সহজেই দৃষ্ট হয়। শূর্পণখার ছলনার তথা অনুসূয়া কর্তৃক সীতাকে চীনাংশুক ও অঙ্গরাগ প্রদানের কাহিনীতে আশ্চর্যচূড়ামণির প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। প্রেক্ষণকের অভিনয় ভবভূতি, রাজশেখর তথা জয়দেবের প্রভাব নির্দেশ করে। ঘটনার নিয়ন্ত্রণে রাবণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা 'মহাবীরচরিত' তথা 'বালরামায়ণে'র অনুরূপ। অযোধ্যক মুনির বেশে সারণের কৌশিকাশ্রমে এসে ছায়া ও ব্যজন দানের আহ্বান কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের দুর্বাসার আহ্বানের অনুরূপ। রাবণ প্রভৃতি কর্তৃক রামাদির ছদ্মবেশ ধারণ পরিকল্পনায় নলোপাখ্যানের প্রভাব দৃষ্ট হয়। সীতা কর্তৃক রামচন্দ্রের আলেখ্য অঙ্কন দ্বারা বিরহবিনোদনের পরিকল্পনায় শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র সাগরিকার অনুরূপ চেষ্টার সাদৃশ্য দেখা যায়।

নাটকীয় ঘটনা সমাবেশ অতি অদ্ভুত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশের ও মিথ্যা ঘটনার সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াস এবং ঠিক চরম মুহূর্তে এই মিথ্যা রচনার প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন ও সেই চেষ্টার বিফলতা—এই হল নাট্যকারের কলাকৌশল। রাবণ যখন রামের ছদ্মবেশে সীতাকে বিবাহ করতে যাবে সেই সময় চিত্রাঙ্গদের নেপথ্যঘোষণায় রাবণাদির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হল। মায়াসীতার শোকে রামচন্দ্রের অনলে আত্মবিসর্জনের পূর্বমুহূর্তেই প্রস্তরশিলার সঙ্গে রামচন্দ্রের আকস্মিক পদসংযোগে অহল্যা উদ্ধার হওয়ায় মারীচাদির ষড়যন্ত্রের সত্য রূপ প্রকাশিত হল। আবার শূর্পণখার মিথ্যাভাষণে প্রতারিত ভরতাদি যখন অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মবিসর্জন-এ উদ্যত সেই সময়ে হনুমান এসে রামাদির আগমনবার্তা ঘোষণা করল। বস্তুতঃ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি অঙ্কে নাট্যকার নানা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করে তাঁর নাটকের বিষরবস্তু রচনা করেছেন।

নাটকের ঘটনা সংস্থাপন যদিও অত্যন্ত অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য তথাপি নাট্যবস্তু রচনায় নাট্যকার কিছু কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। নাটকীয় দ্বন্দ্ব হচ্ছে সীতা-পরিণয় উপলক্ষে রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বে রামকে পরাভূত ও নিহত করার

জন্য রাক্ষসগণের মায়াশক্তির প্রয়োগ। মন্ত্রী সারণ-এর পরিকল্পনা করে এবং সারণ, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও রাবণ, মারীচ ও শূর্পণখা এতে অংশগ্রহণ করে। তাড়কা, বিরাধ, খর ও বালীকে শত্রু নিপাতের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। মন্থরাদির ছদ্মবেশে রামাদিকে বনে প্রেরণ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং শেষাঙ্কে তাপসবেশিনী শূর্পণখা কর্তৃক ভরতাদিকে হত্যা করার চেষ্টা এই পরিকল্পনার পরিণতি।

অঙ্কগুলির ঘটনা পরম্পরা বিচার করলে বস্তুবিন্যাসে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা রচনার চেষ্টা প্রতিভাত হবে। প্রথম অঙ্কে রাবণের সীতালাভের চেষ্টা ও মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাম-রূপ ধারণ। দ্বিতীয় অঙ্কে বাবণ কর্তৃক রামগতপ্রাণা সীতাকে দর্শন, রাবণের সীতা-লালসার তীব্রতা ও জানকীবল্লভ রামের প্রতি বিরাগের বৃদ্ধি। তৃতীয় অঙ্কে সীতা-লাভ নিষ্কণ্টক করার জন্য রাবণের নিয়োগে মারীচ কর্তৃক মায়া-সীতার অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা রামচন্দ্রের প্রাণনাশের চেষ্টা। চতুর্থ অঙ্কে রাম-এর ছদ্মবেশে রাবণের সীতা-লাভের চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা প্রদর্শিত হয়েছে। রাম-সীতার পরিণয়ের পর রাবণের উদ্দেশ্য একই রইল অর্থাৎ রামকে বিনাশ করে কিভাবে সীতা লাভ করা যায়। সেই কারণে বাম-জামদগ্ন্য দ্বন্দ্ব, ছদ্ম দশরথ, কৈকেয়ীর সাহায্যে রামকে বনে এনে সীতাহরণ করা এবং রামকে হত্যা করার জন্য বিরাধ, খর ও বালীকে নিয়োগ প্রভৃতির পরিকল্পনা হল। শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে রাবণাদি নিহত হলেও শূর্পণখা শেষ চেষ্টা হিসাবে মায়াশক্তির সাহায্যে ভরতাদিকে নিহত করার চেষ্টা করল। বস্তুতঃ নাটকীয় মূল দ্বন্দ্বটি যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় গ্রথিত তা অনস্বীকার্য।

মূল ঘটনাবলীর গৌণঘটনা রচনাতেও এই কার্য-কারণ-সম্পর্কটি দেখা যায়। সীতাকে অনুসূয়া কর্তৃক চীনাংশুক ও অঙ্গরাগ প্রদান ও বিশ্বামিত্র কর্তৃক রত্নকটকযুগলের নাটকীয় প্রয়োজনও প্রদর্শিত হয়েছে—শত্রুগৃহে অবস্থিতি সত্ত্বেও সীতার মালিন্য ও কাতরতা না আসায় এবং সীতা ও অনল কর্তৃক প্রচ্ছন্নভাবে প্রেক্ষণকাভিনয় দর্শন ব্যাপাবে, অহল্যার আকস্মিক উদ্ধারে ও চিত্রাঙ্গদ কর্তৃক রাবণাদির ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক সীতাকে লাভ করার চেষ্টার সংবাদ সংগ্রহে ও যথাকালে তার ঘোষণায় এই একই কৌশল প্রদর্শিত হয়েছে। বস্তুতঃ সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হয় যে বস্তুপরিকল্পনা যতই অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত হোক-না কেন বস্তুরচনায় শিল্পকৌশল যথাসম্ভব প্রদর্শিত হয়েছে। রামায়ণ-কাহিনীকে দৃশ্যকাব্যের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে গিয়ে ভবভূতি 'মহাবীর চরিতে' সর্বপ্রথম এই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করেন ও তা ক্রমে মুরারি, রাজশেখর, জয়দেব ও অন্যান্য কবিগণের দ্বারা অনুসৃত হয়। রামভদ্র দীক্ষিত এই

বিষয়ে পূর্বস্বরীদের সার্থক অনুবর্তী। বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে এই নাটকের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে, যদিও নাট্যবস্তু রচনায় ভবভূতি প্রভৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তথাপি রামায়ণের প্রভাব একেবারে অদৃশ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মারীচ কর্তৃক উদ্ভাবিত মায়া-সীতার সাহায্যে রামকে আত্মবিসর্জনে প্ররোচিত করার প্রচেষ্টা রামায়ণে মেঘনাদ কর্তৃক মায়াসীতার মুণ্ডপ্রদর্শনের দ্বারা রামচন্দ্রকে প্রতারিত করার চেষ্টার অনুরূপ। বস্তুতঃ সমস্ত রাক্ষসী মায়ার ব্যাপারটিই রামায়ণ থেকে গৃহীত। নাটকের জনকের মতো রামায়ণের জনক প্রত্যক্ষভাবে জানকীকে বীর্যশুল্কারূপে ঘোষণা না করলেও, হরধনুভঙ্গ ব্যতীত জানকীকে লাভ করা যাবে না—রামায়ণে কাহিনীর এই বস্তু-বিন্যাসের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই বীর্যশুল্কত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। রামভদ্র দীক্ষিত রামায়ণের এই কাহিনী দুটিকে নিজ নাটকীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করে নিয়েছেন মাত্র। অতঃপর কৈকেয়ীর বর গ্রহণ হতে আরম্ভ করে রামাদির বন গমন, পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ, রাম-সুগ্রীব সখ্য, সপ্ততালভেদ, সীতার আভরণাদি লাভ, জটায়ু-সংবাদ, বালীবধ, সুগ্রীবের রাজ্যে ও অঙ্গদের যৌবরাজ্যে অভিষেক, রাবণাদির রাক্ষস নিধন, বিভীষণের লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক, সীতার অগ্নিশুদ্ধি ও রামের সংবাদ দানের জন্য হনুমানের অযোধ্যা গমন ইত্যাদি নানা ঘটনা সংস্থাপনে নাট্যকার রামায়ণ-কাহিনীকেই অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই ঘটনাগুলিকে তিনি নাটকীয় প্রয়োজনে স্থানে স্থানে নূতনভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মনোরথ সিদ্ধির চরম মুহূর্তে আশাভঙ্গ—বস্তুপরিকল্পনার এই মুখ্য সূত্রটিও রামায়ণ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

পরিশেষে 'জানকী পরিণয়' নাটকের নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। আমরা দেখেছি শুধু মাত্র জানকীর পরিণয় নাটকের অবলম্বনীয় বিষয় নয়। জানকী-পরিণয়কে অবলম্বন করে এর পূর্বে ও পরে রাবণাদির নানা প্রচেষ্টাই আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। এখানে সমস্ত রামায়ণ-কাহিনী এক নূতন পরি-প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়েছে। রামায়ণে জানকী-পরিণয়ের সঙ্গে রাবণের কোন সংযোগ নেই। রামের বনগমন ও জানকী বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কহীন। রামের বনগমন, শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ এবং তার ফলে রাম-রাবণের যুদ্ধ—রামায়ণে এই ঘটনাগুলি নিতান্তই আকস্মিক। মানব কর্তৃক সংঘটিত হলেও এখানে নিদারুণ দৈবের আকস্মিক অথচ অলংঘ্য প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সেই কারণেই মানব ক্রিয়া ও দৈব প্রভাবের সংযোগের ফলে পার্থিব জীবনের বেদনাবিধুর বিচিত্র সুন্দর রূপটি রামায়ণে শোভন ভাবে ফুটে উঠেছে। জানকী-পরিণয়কে ঘটনাবলীর

কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করায় ও নাটকের সমস্ত কার্যকে পূর্বাপর নিয়ন্ত্রিতভাবে উপস্থাপিত করায় প্রস্তুত নাটকে সেই জীবনরহস্যটি রূপলাভ করেনি।

১৩। দূতাঙ্গদ — সুভট। (সম্পাদনা — দুর্গাপ্রসাদ এবং ভি. এল. পন্‌সিখর, নির্ণয় সাগর প্রেস, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯২২)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি সুভট রচিত 'দূতাঙ্গদে' অঙ্গদের দৌত্য বর্ণিত হয়েছে। নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, নাটকটি বসন্তকালে রাজা ত্রিভুবন পালের রাজসভায় অভিনীত হয়েছিল এবং নাটকটিকে 'ছায়ানাটক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

'যদগ্য বসন্তোৎসবে দেবশ্রীকুমারপালদেবস্য যাত্রায়াং পদবাক্য প্রমাণ পারঙ্গতেন মহাকবিনা শ্রীসুভটেন বিনির্মিতং দূতাঙ্গদং নাম ছায়ানাটকম্ অভিনেতব্যম্।'

প্রস্তাবনা ছাড়া নাটকে চারটি দৃশ্য আছে। প্রথম দৃশ্যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রস্তাবে অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করে সীতাকে প্রত্যর্পণ করতে বা সবংশে নিধন বরণ করতে সংবাদ প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে মাল্যবান মন্দোদরী ও বিভীষণ কর্তৃক সীতা গ্রহণে রাবণকে নিষেধ ও রাবণ কর্তৃক তাদের ভর্ৎসনা ও বিভীষণকে বিদূরীকরণের ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে, অঙ্গদ-রাবণ সংবাদ, রাবণ কর্তৃক বহুরাবণ রূপ ধারণ ও অঙ্গদের ভর্ৎসনায় পুনরায় একরূপ গ্রহণ ও পরে উভয়ের বাক্যবিনিময়। এই দৃশ্যে রাবণ কর্তৃক মায়াসীতার রাবণের প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন দৃশ্যের দ্বারা অঙ্গদকে প্রতারিত করার চেষ্টা ও তার বিফলতা বর্ণিত হয়েছে। এই দৃশ্যে অঙ্গদ রাবণকে ভয় দেখিয়ে চলে গেলে ও বানরসৈন্য কর্তৃক আহত রাক্ষসসৈন্যগণ রাবণের নিকট এসে দুঃখ প্রকাশ করলে রাবণ প্রহস্তকে সৈন্য সজ্জা করতে আদেশ দেয়। চতুর্থ দৃশ্যে, গন্ধর্ব যুগ্মের বর্ণনার মাধ্যমে রাবণের নিধন বর্ণিত হয়েছে এবং পরিশেষে রামসীতা প্রভৃতির অযোধ্যা যাত্রা বর্ণনান্তে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

স্পষ্টতঃই নাটকীয় বস্তুবিন্যাসে ভবভূতির 'মহাবীরচরিত', বাল্মীকির 'রামায়ণ', মুরারি ও রাজশেখরের রচনার প্রভাব বিদ্যমান। 'মহাবীরচরিত'-এ ভবভূতি প্রথমে এই পরিকল্পনা করেন। রামায়ণে হনুমানের দৌত্যের প্রসঙ্গ আছে। তার পরিবর্তিত রূপ 'মহাবীরচরিতে' দেখা যায়। সুভট 'মহাবীরচরিতের' অনুসরণ করেছেন।

সীতাকে প্রত্যর্পণ করার জন্য মাল্যবান ও বিভীষণের অনুরোধের কথা রামায়ণে

আছে। মন্দোদরীর অনুরোধ অবশ্য রামায়ণে নেই। এ-বিষয়ে কবি ভবভূতির মুরারি ও জয়দেবের নিকট ঋণী।

মায়াসীতার পরিকল্পনা রামায়ণে আছে। তবে প্রস্তুত নাটকে মায়াসীতাকে যে মূর্তিতে প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে কবির উপর রাজশেখরেই প্রভাব বেশি মনে হয়। 'বালরামায়ণে'র যন্ত্র-জানকী কর্তৃক রাবণকে প্রেম নিবেদনের পরিকল্পনা আলোচ্য নাটকের মায়াসীতা কর্তৃক রাবণকে প্রেম নিবেদনের মূলে আছে মনে হয়।

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে বহুরূপধারী রাবণকে অঙ্গদ যা বলেছিলেন ও শেষ দৃশ্যে রাম সীতাকে যা বলেছিলেন তাতে নাট্যকারের উপর রামায়ণ-কাহিনীর প্রভাব দেখা যায়।

কার্তবীর্যার্জুন ও বলী কর্তৃক রাবণের দুর্দশা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে এবং নাগপাশ বন্ধন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, গন্ধমাদন আনয়ন, ইন্দ্রজিৎ নিধন ও রাবণ বধ লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত আছে।

নাট্যকার নিজেই নাটকের শেষে অন্যান্য কবি ও নাট্যকারদের নিকট থেকে ঋণ স্বীকার করেছেন—

> "স্বনির্মিতং কিংচন গদ্যপদ্য বন্ধং কিয়ৎ প্রাক্তন সৎকবীন্দ্রৈঃ।
> প্রোক্তং গৃহীত্বা প্রতিরচ্য তে স্মরমাদ্যমেতৎ সুভটেন নাট্যম॥"
>
> —দূতাঙ্গদ। ৫৬

নাটকের প্রথম দৃশ্যে রামচন্দ্র অঙ্গদ-মাধ্যমে রাবণের নিকট নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করেন—

> "অজ্ঞানা দথ বাধিপত্যরভসাদস্মৎ পরোক্ষে হৃতা
> সীতেয়ং প্রতিমুচ্যতা মিতি বচোগত্বা দশাস্যং বদ।
> নো চেল্লাক্ষ্মণমুক্ত মার্গন গণচ্ছেদোচ্ছলচ্ছোণিত—
> চ্ছত্রচ্ছন্নদিগন্তমন্তকপুরং পুত্রৈ বৃতো যাস্যসি॥" —দূতাঙ্গদ। ৯

দ্বিতীয় দৃশ্যের রাবণের সঙ্গে মন্দোদরী ও বিভীষণের কথোপকথনের মাধ্যমে এই বাণীর কী পরিণতি হবে নাট্যকার তার আভাস দিয়েছেন এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। তৃতীয় দৃশ্যে সেই আভাস পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে এবং চতুর্থ দৃশ্যে তা ফলপ্রসূ হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র পরিসরে নাটকীয় দৃশ্যাবলীর এরূপ সংহত মূর্তি দান নাট্যকারের শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

নাট্যকার এখানে রামায়ণ-কাহিনীতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন

মায়াসীতার দ্বারা অঙ্গদকে প্রতারিত করার চেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু নাট্যকারের এই চেষ্টা সফল হয়নি। তাঁর এই প্রচেষ্টা শিশুমনোচিত ও হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া নাট্যকার প্রস্তাবনায় এই নাটকে যে 'ছায়ানাটক' বলে অভিহিত করেছেন তাও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ নাটকে ছায়া-নাটকের কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না।

১৪। উন্মত্তরাঘব—ভাস্করকবি। (সম্পাদক—দুর্গাপ্রসাদ এবং কে. পি. পরব, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯২৫)

ভাস্করকবি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 'উন্মত্তরাঘব' রচনা করেন। 'উন্মত্তরাঘবে'র বিষয়বস্তু এইরূপ · সীতা সখী মধুকরিকাসহ পুষ্পচয়নকালে আশ্রমান্তরে গমন করেন। সেখানে পূর্বে দুর্বাসা হরিণী নাম্নী অপ্সরাকে শাপ দিয়ে মৃগীরূপে পরিণত করেন। অগস্ত্যমুনির অনুগ্রহে তার শাপমুক্তি ঘটলেও মুনিশাপ তখনও বিদ্যমান থাকে। সেই শাপ হেতু সেই আশ্রমে পুষ্পচয়নকালে সীতাও হরিণীরূপে রূপান্তরিত হন। এদিকে রামচন্দ্র সীতার অনুরোধে কনক হরিণ বধ করে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে বিরহোন্মত্ত হয়ে ওঠেন। কিয়ৎকাল এই উন্মত্তদশা চলতে থাকে। অবশেষে অগস্ত্যমুনির কৃপায় সীতার মুক্তিলাভ ঘটে। নাটকীয় বিষয়ের স্থান দণ্ডকারণ্য ও অগস্ত্যাশ্রমের নিকটবর্তী আশ্রম।

কবি তাঁর রচনাকে 'প্রেক্ষণক' বলেছেন। সাধারণত একে একাঙ্কিকা বলা হয়। 'বালরামায়ণে' যে গর্ভনাটক আছে তাকেও প্রেক্ষণক বলা হয়েছে। একাঙ্কিকায় স্বল্প সময়ে জীবনের একটি বিশেষ দৃশ্য ও নায়ক চরিত্রের একটি বিশেষ দিক চিত্রিত হয়। আলোচ্য নাটকেও তাই হয়েছে।

নাটকের বিষয়বস্তুর মূল রূপটি যে কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' হতে গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেখানে সহজন্যা ও চিত্রলেখার কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, উর্বশী মহারাজ পুরুরবাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাস শিখরে গন্ধমাদন বনে বিহারার্থ গমন করেছিলেন। সেখানে রাজা নাট্যাচার্য ভরতের পূর্বপ্রদত্ত অভিশাপ বলে মোহিতচিত্ত হয়ে রমণীগণের পরিহারযোগ্য কুমারবনে প্রবেশ করেন ও উর্বশী লতারূপে পরিণত হন। পরে রাজা সঙ্গমণীয় মণি লাভ করে তাঁকে পুনরায় ফিরে পান। অতএব দেখা যায় যে, নাটকের মূল কাঠামো কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র অনুকরণে হয়েছে। রামচন্দ্রের বাক্য ও ব্যবহারও পুরুরবার বাক্য ও ব্যবহারের সঙ্গে তুলনীয়।

'উন্মত্তরাঘবে'র নাট্যবস্তুর উপর কালিদাসের প্রভাব সুস্পষ্ট হলেও নাটকের বাল্মীকি ও ভবভূতির প্রভাব যে যথেষ্ট আছে তা বোঝা যায়।

নাটকের নায়ক চরিত্রের মূল ভাবটির উপর ভবভূতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এতাবৎ আলোচিত রাম-নাটকের প্রত্যেকটিতে রামকে অবতার রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। একমাত্র ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে অবতার রাম অপেক্ষা মানুষ রামের পরিচয়ই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এখানেও প্রিয়া-বিরহে কাতর রামচন্দ্রের মূর্তিটিই নাটকের মুখ্য চিত্র। এ ছাড়া পূর্বস্মৃতির অনুধ্যানেও ভবভূতির রামের প্রত্যভিজ্ঞার প্রভাব নির্দেশ করেছে। নিম্নোক্ত শ্লোকে ভবভূতির প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান :—

"ত্বদালাপাঃ কর্ণে মম নবসুধাশীকরময়া
স্তব স্পর্শোঽপ্যঙ্গে শিশির—শিশিরশ্চন্দনরসঃ।
শরজ্জ্যোৎস্নাপুর স্তববপুরিদং সে নয়নয়োঃ
কথংতে কল্যাণি ক্ষণমপি সহে হন্ত বিরহম্ ॥"

—উ. রা.—৩২

এই শ্লোকের সঙ্গে 'উত্তররামচরিতে'র নিম্নোক্ত শ্লোক তুলনীয় :—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিমমৃত বর্তিনয়নয়োঃ
রসাবস্থাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং বাহুঃ কণ্ঠে শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্থাঃ ন প্রেয়ো যদি পরমসহ্যস্তু বিরহঃ ॥"

এছাড়া 'উন্মত্তরাঘবে'র "বৎস, দৃষ্টা জানকী" এর সঙ্গে 'উত্তররামচরিতে'র বাসন্তীর প্রতি রামের উক্তি "সখী, কিমন্যৎ পুনঃ প্রাপ্তা জানকী"—এই উক্তির সাদৃশ্য বিষয়-বিন্যাসে ভবভূতির প্রভাব নির্দেশ করে।

আলোচ্য নাটকে মূল মানবীয় ভাবটিতেও রামের উন্মত্তদশা কল্পনায় বাল্মীকির প্রভাব মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। রামায়ণে রামচন্দ্র কনক হরিণ বধ করে ফিরে এসে জানকীকে কুটীরে না পেয়ে শোকার্ত এবং বিরহব্যথায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন ও দণ্ডকারণ্যের বিবিধ প্রাণী ও বস্তুনিচয়ের নিকট সীতার সন্ধানবার্তা জিজ্ঞাসা করে ঘুরে বেড়ান।

রামকাহিনী হতে নাটকের মুখ্য পরিবর্তন হল কনকমৃগ বধের পর রাম ও সীতার সাক্ষাৎকার। নাট্যকার এই কল্পনা কেন করলেন তা বোঝা গেল না। যে কারণেই এ ব্যাপার ঘটে থাক্-না কেন এটি যে শিল্পীজনোচিত পরিবর্তন হয়নি তা স্বীকার করতে হবে। কারণ স্বর্ণমৃগ বধ ব্যাপার রামায়ণে একটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই একটি ঘটনাই রামায়ণের সমস্ত পরবর্তী

ঘটনার উৎস। এ থেকে সীতাহরণ, বালীবধ, সেতুবন্ধ, রাক্ষসকুল বিনাশ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার নির্বাসন এবং শেষ পর্যন্ত পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনার উদ্ভব হয়েছে। অতএব অতি অকিঞ্চিৎ কারণে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর পরিবর্তন সঙ্গত হয়নি বলে মনে হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'উন্মত্তরাঘবে'র পরিকল্পনায় নানা কবির প্রভাব বর্তমান। কালিদাস ভাস্করকবির মূল আদর্শ হলেও বাল্মীকি, ভবভূতির প্রভাব হতে কবি মুক্ত নন। কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবে হোক-না কেন রামায়ণের অনুরূপ ঘটনার সহিত নাটকীয় বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। তবে নাট্য-বস্তুর উপস্থাপনে ও চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার সাফল্য অর্জন করিতে পারেননি।

১৫। উন্মত্তরাঘব—বিরূপাক্ষদেব। (সম্পাদনা—ভি. কৃষ্ণমাচার্য, অ্যাডেয়ার লাইব্রেরি সিরিজ, ৫৭, ১৯৪৬)

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত বিরূপাক্ষদেবের একাঙ্কিকা 'উন্মত্তরাঘব'কে 'প্রেক্ষণক' বলে অভিহিত করা হয়। নাটকের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে বিরূপাক্ষদেব রাজা বুক্কর পৌত্র এবং হরিহরের পুত্র। তিনি কর্ণাট, চোল ও পাণ্ড্যর রাজা ছিলেন। তাঁর বিজয়স্তম্ভ সিংহলেও পাওয়া যায়।

> 'তস্যরাজ্ঞঃ কর্ণাটতুণ্ডীরচোল পাণ্ড্য মণ্ডলাধিপতেঃ সিংহলদ্বীপ
> বিন্যস্ত বিজয়স্তম্ভস্য ষোড়শ মহাদানদীক্ষিতস্য সকল কলা-
> বিলাসিনী স্বয়ংবর পতেঃ কৃতিম উন্মত্তরাঘবং নাম
> প্রেক্ষণকং প্রয়োগতো দর্শয়েতি।'
>
> —উন্মত্তরাঘব : প্রস্তাবনা

নাটকের আরম্ভ সীতার স্বর্ণমৃগের কামনা নিয়ে। সীতার স্বর্ণমৃগের অদম্য-কামনা পূরণের জন্য রাম স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মণও রামের সাহায্যার্থে, সীতাকে কুটীরে একাকী রেখে গমন করেন। কিছুক্ষণ পরে রাম-লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে সীতার কোনও বিপদের আশঙ্কায় শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। রাম সীতার দুঃখে উন্মত্তবৎ হয়ে বনের গাছপালা পশুপক্ষীকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন। কিছুক্ষণের পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আত্ম-সমীক্ষা করতে থাকেন। পূর্বজন্মের কোনও পাপ সীতার নিরুদ্দেশের কারণ বলে তিনি মনে করেন—

> "রচিতঃ সুখান্তরাঃ কস্য কদা ভামম্লান বিজ্ঞতম্।
> তস্য ইত্যাং হি বিপাকঃ কথং হি ভুয়ম তং ইব কুর্ভীয় ॥"

নাটকের শেষে নাট্যকার রামায়ণ-বহির্ভূত একটি ঘটনা সংযোজন করেন। সীতা-হারা রাম যখন উন্মত্তবৎ আচরণ করছেন সেই সময় রাম একটি দৈববাণী শুনলেন। দৈববাণী হল : লক্ষ্মণ জটায়ুর নিকট থেকে সীতাহরণের ঘটনা অবগত হয়েছেন এবং লক্ষ্মণ রাক্ষসদের এবং তাদের প্রভুকে ধ্বংস করে শীঘ্রই সীতাকে নিয়ে ফিরবেন। তারপর রাবণের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা একটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে :—

"বালিন্যুন্মূলিতে দ্রাক্ প্রমুদিত মনসঃ সূর্য্যপুত্রস্য সাহ্বাদ্
বদ্ধে সেতৌ কপীন্দ্রৈর্লবণজলনিধিং লক্ষ্মণো লংঘয়িত্বা।
হত্বা পৌলস্ত্যম্ আজৌ সহ রজনিচরৈঃ সেন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণং
দেবীম্ আদায় ভূয়স্তব সবিধমসাবাগতঃ পুষ্পকেন ॥"

'লক্ষ্মণ বালী বধ করে এবং যুদ্ধে রাবণ ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণ এবং অন্যান্য রাক্ষসদের নিহত করে পুষ্পকরথে চড়ে সীতা সহ ফিরে এলেন এবং বানরসৈন্যরা সমুদ্রের উপরে নির্মিত সেতু দিয়ে পার হয়ে ফিরে এল।'

রামের দ্বারা রাবণ ও রাক্ষসকুল ধ্বংসের কথা এখানে উল্লিখিত হয়নি। লক্ষ্মণের সীতা সহ ফিরে আসা ও সবার সঙ্গে মিলনের ঘটনা দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি হয়েছে।

নাটকটির সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে নাট্যকার নাটকটির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে কাহিনী বিন্যাস করেছেন এবং তাঁর রচনাশৈলীর মাধুর্য প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু তাঁর রামায়ণ-কাহিনীতে তিনি যে পরিবর্তন করেছেন, সেই পরি-বর্তন আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা রামকে রামায়ণের নায়ক হিসাবে জানি এবং রামের বীরত্বপূর্ণ কার্যের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এখানে লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণ বধ ইত্যাদি কার্য করিয়ে নাট্যকার নাটকে যে পরিবর্তন এনেছেন তা আমাদের কাছে সংগত মনে হয় না।

গৌণ নাটক : (মানিক চন্দ্র, জৈন গ্রন্থমালা —(৫ ও ৪৩)

১) জৈন কবি হস্তমল্ল ১২৯০ খৃষ্টাব্দে সীতার বিবাহ অবলম্বনে 'মৈথিলী কল্যাণ' রচনা করেন। এটি একটি শৃঙ্গাররসাত্মক নাটক। প্রথম চার অঙ্কে সীতার পূর্বানুরাগ বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ংবরের পূর্বে মিথিলায় কামদেব মন্দিরে (১ম অঙ্ক) ও মাধব বনে (২য় অঙ্ক) পূর্বানুরাগবর্ণিত, এরপর বিরহ বর্ণন। এরপর চন্দ্রকান্ত ধরের গৃহে অভিসারিকা সীতার বর্ণনা (৩-৪ অঙ্ক), পঞ্চম বা শেষ অঙ্কে ধনুর্ভঙ্গ এবং রাম-সীতা বিবাহ বর্ণনা করা আছে।

২) হস্তমল্ল-লিখিত দ্বিতীয় নাটক 'অঞ্জনা-পবনঞ্জয়'। এটি বিমলস্থরির রাম-কথার উপর নির্ভরশীল। নাটকের কাহিনী এইভাবে বর্ণিত :—

প্রথম অঙ্ক — অঞ্জনার স্বয়ংবরের প্রস্তুতি।

দ্বিতীয় অঙ্ক — স্বয়ংবরে পবনঞ্জয়-অঞ্জনা বিবাহ এবং পবনঞ্জয়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক — পবনঞ্জয় রাত্রিকালে অঞ্জনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং প্রাতঃকালে যুদ্ধোদ্যম।

চতুর্থ অঙ্ক — গর্ভবতী অঞ্জনাকে মায়ের কাছে মহেন্দ্রপুরে রেখে আসা।

পঞ্চম অঙ্ক — পবনঞ্জয় বরুণকে যুদ্ধে পরাজিত করে গৃহে ফেরার পথে অঞ্জনার কথা শোনে এবং মহেন্দ্রপুরের পথে এগিয়ে যায়। এদিকে অঞ্জনা মায়ের সঙ্গে যেতে যেতে মাতঙ্গ মালিনী বনে প্রবেশ করে। পবনঞ্জয় তার খোঁজ করতে থাকে।

ষষ্ঠ অঙ্ক — গন্ধর্বরাজ ননিচূড আপন রাজ্যে অঞ্জনাকে আশ্রয় দেন এবং সেখানে হনুমানের জন্ম হয়। এরপর অঞ্জনা ও পবনঞ্জয়ের মিলন হয়।

সপ্তম অঙ্ক — পবনঞ্জয়ের যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং তাকে বিজয়ার্ধপর্বত রাজ্য দান।

বিমলস্থরি 'পউমচরিঅ'তে অঞ্জনা-পবনঞ্জয় কথা আছে। কিন্তু তা অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'পউমচরিঅ' অনুসারে আদিত্যপুরের রাজকুমার পবনঞ্জয় বা বায়ু কুমারের সঙ্গে মহেন্দ্রপুরের রাজকুমারী অঞ্জনাকুমারীর বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বে পবনঞ্জয় অঞ্জনাকুমারীর সখীর মুখে নিজের নিন্দা শুনে ২২ বৎসর পত্নীর প্রতি উদাসীন ছিলেন। পবনঞ্জয় বারণ ও বরুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তার অঞ্জনাকুমারীর প্রতি অনুরাগ উপস্থিত হয় এবং সে তখন আদিত্যপুরে এসে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয় এবং সেই রাত্রেই সে যুদ্ধের জন্য চলে যায়। গুপ্ত মিলনের ফলস্বরূপ অঞ্জনাকুমারী গর্ভবতী হয়। পতির অনুপস্থিতিতে গর্ভবতী হয়েছে এই মনে করে অঞ্জনাকুমারী তার সখী বসন্তমালার সঙ্গে নির্বাসিত হয়। নির্বাসনের কারণস্বরূপ বলা হয়, পূর্বজন্মে তার সপত্নীকে সে বিতাড়িত করেছিল সেই জন্য তার নির্বাসন। অঞ্জনাকুমারী এক গুহার মধ্যে তার পুত্রের জন্ম দেয়। কিছুদিন পরে অঞ্জনাকুমারীর মামা প্রতিস্থর্যক পুত্রসহ অঞ্জনাকুমারীকে নিয়ে হনুরুহপুর যাওয়ার পথে অঞ্জনাকুমারীর পুত্র তার মায়ের কোল থেকে এক পর্বতশিলায় পড়ে যায়। অঞ্জনাকুমারী দেখে যে তার পুত্র যে পর্বতশিলায় পড়েছে সেই পর্বতশিলাটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তা দেখে সে পুত্রের নাম রাখে শ্রীশৈল।

যুদ্ধশেষে পবনঞ্জয় পত্নীর সতীত্বের সাক্ষ্য দিয়ে পত্নীপুত্রসহ নিজরাজ্যে ফিরে আসে। হনুরুহপুরে থাকার জন্য বালকের নাম রাখা হয় হনুমান।

হস্তমল্ল 'পউমচরিঅ'র এই অস্বাভাবিক প্রসঙ্গ ছেড়ে অঞ্জনাকুমারীর স্বয়ংবরের বর্ণনা করেছেন।

অ প্র কা শি ত না ট ক :—

১। রামাভ্যুদয়—যশোবর্মন।

ড. রাঘবন রাম-বিষয়ক অপ্রাপ্য নাটকগুলির উল্লেখ করেন্ তাঁর *Some Old West Rama Plays* গ্রন্থে (অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত) এই অপ্রাপ্য নাটকগুলি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন রচনায় নাটকগুলির বিভিন্ন অংশের বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও নাটকগুলি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায় তবু বিভিন্ন অংশ একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ গড়ে তোলা যেতে পারে।

অষ্টম শতাব্দীতে যশোবর্মন কৃত 'রামাভ্যুদয়' নাটক অপ্রাপ্য নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। অভিনবগুপ্তের 'অভিনব ভারতী', ভোজদেবের 'শৃঙ্গার প্রকাশ', সারদাতনয়ের 'ভাব প্রকাশ', রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণ' প্রভৃতি রচনাগুলিতে এই নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাটকের কাহিনী অরণ্যকাণ্ড থেকে যুদ্ধকাণ্ডের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। নাটকের আরম্ভ পঞ্চবটী বনে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসজীবন থেকে এবং রামের অভিষেকে নাটকের সমাপ্তি।

নাটকের সমাপ্তি যে সুগ্রীব, বিভীষণ, বানরসেনা ও রাক্ষসদের উপস্থিতিতে অযোধ্যায় রামের অভিষেকে শেষ হয়েছে তা 'ভাব প্রকাশ' থেকে জানা যায়।

·········তন্নির্বহণমুচ্যতে।
যথাহি রামাভ্যুদয়ে সুগ্রীবশ্চ বিভীষণঃ।
কপয়ো রাক্ষসা রামাভিষেকাভ্যুদয়ং যযুঃ॥"

—'ভাবপ্রকাশ', পৃ. ২১২

'রামাভ্যুদয়ে' উত্তরকাণ্ডের কাহিনী যেমন সীতার বনবাস, অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি নেই তা অভিনবগুপ্তের 'অভিনব ভারতী' থেকে জানা যায়।

'রামাভ্যুদয়ে সীতা প্রত্যানয়নাদেরিব। নহিতত্র অশ্বমেধ যাগাদেঃ নায়কোচিতস্য কবি বিবক্ষিতত্বমাস্তি।'

—'ম্যাড্রাস ম্যানুসক্রিপ্ট', পৃ. ৪৯১

নাটকের আরম্ভের বিবরণ অভিনবগুপ্তের 'অভিনব ভারতী'তে পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্ত নাটকের 'উপক্ষেপকে' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম অঙ্গের সন্ধি বলে উল্লেখ করেছেন। অভিনবগুপ্ত 'ভয়'কে রামাভ্যুদয়ের 'উপক্ষেপ' বলে অভিহিত করেছেন।

'যথা রামাভ্যুদয়ে ভয়াত্মা উপক্ষেপ'

—'অভিনব ভারতী' ২, পৃ. ৫৩১

এখানে 'ভয়' দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথম অর্থে, ঋষিদের, রাক্ষস, শূর্পণখা, খর ও দূষণকে ভয় এবং দ্বিতীয় অর্থে রামের শূর্পণখাকে অপমান ও খর-দূষণকে বধ করার জন্য রাবণের ভয়।

প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু শূর্পণখার বিরূপীকরণ ও খর-দূষণ বধ। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় রাবণ সভাস্থলে আসীন আছেন। এমন সময় শূর্পণখা তার নাসাকর্ণ-কর্তিত অবস্থায় সভায় এসে তার এই অবস্থার জন্য রামকে দায়ী করে এবং সে আরও বলে যে রাম খর-দূষণকে বধ করেছেন। রাবণ এই কথা শুনে স্থির করে যে সে সীতাহরণ করবে এবং এই কার্যে মারীচের সাহায্য চায়। মারীচ প্রথমে রাবণকে সাহায্য করতে এই বলে অস্বীকার করে যে রাম মহামানব, তাঁর সঙ্গে বিরোধ করা উচিত নয়। 'নাট্যদর্পণে' উল্লিখিত রাবণ ও মারীচের কথোপকথন এইরূপ :—

তত্র অবিবেচকং প্রতিযথা রামাভ্যুদয়ে দ্বিতীয়াঙ্কে—
রাবণঃ—প্রায়শঃ শ্রুতমের ভবদ্‌ভিঃ যথা কলত্রমাত্র সাধনঃ অসৌতাপস :
তদপহার এব তাবন্নিরূপ্যতাম্। ন চ কলত্রাপহরণাদৃতে
পুরুষস্য অপরং পরিভবহানমস্তি। তত্র মারীচেন
সাহায়কং ক্রিয়মাণমিচ্ছামি।
মারীচ :—স্বামিন্! জীবতো রামস্য পরিভব ইত্যশক্যমেতৎ। ন খলু তাপস ইতি
তমবজ্ঞাতুমর্হতি দেবঃ। অন্যদেব বস্ত্বন্তরং কিমপিতৎ।
রাবণ :—(সক্রোধম্) আঃ কিংনাম বস্ত্বন্তরং তৎ? মূঢ়! যুক্ত্যেব ক্ষত্রবন্ধোঃ
পরিভবমসমং জীবতঃ কর্তুমিচ্ছন্
মায়াসাহায়কেত্বং নিপুণতর ইতি প্রার্থয়ে নাসমর্থঃ।
যাচ্চাস্তৎ তত্র বজ্রপ্রহতি মসৃণিত স্ফারকেয়ূরভাজঃ
সজ্জাস্ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী হঠহরণসহা বাহবো রাবণস্য॥
তত্র মারীচবচনং পরমার্থতো হিতমপি রাবণেন নাবগতম্॥

তৃতীয় অঙ্কে সীতাহরণের পর রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, বালীবধ ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত। সুগ্রীব তার অনুচরদের সীতার খোঁজে পাঠিয়েছে। রামের মিত্র হিসাবে সুগ্রীব সীতার কাছে আশ্বাসবাণী পাঠাচ্ছে। অভিনবগুপ্ত ও ভোজ সুগ্রীবের এই বাণী উদ্ধৃত করেছেন :—

"যথা রামাভ্যুদয়ে তৃতীয়েঽঙ্কে সীতাং প্রতি সুগ্রীবস্য সন্দেশোক্তি :—

'বহুনাত্র কিমুক্তেন পারেঽপি জলধেস্ স্থিতাম।
অচিরাদেব দেবি ত্বাম আহরিষ্যতি রাঘবঃ!'

—'অভিনব ভারতী' ২, পৃ. ৫০৪

ভোজ তাঁর দ্বিতীয় পতাকাস্থানে বলছেন :—

বচঃ সাতিশয়শ্লিষ্টং কাব্যবন্ধ সমাশ্রয়ম্।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্॥

যথা রামাভ্যুদয়ে তৃতীয়েঽঙ্কে সুগ্রীবঃ সন্দিশতি—

বহুনাত্র কিমুক্তেন পারেঽপি জলধেস্স্থিতাম।
অচিরাদেব দেবি ত্বাম্ আহরিষ্যতি রাঘবঃ॥
অত্রজলধেঃ পারস্য দুর্গত্বাৎ দুষ্করং প্রশ্বাসং মন্যমানঃ
রামপরাক্রমস্যতত্র অপ্রতিঘাতাৎ অতিশয়ম্ উপর্চনয়ন্
চিন্ত্যমানেষু দেশান্তরেষু সুকরতাং প্রশ্বাসনে ভাবিনীং
খ্যাপয়তি, নতু জলধেঃ পারে স্থিতাং জ্ঞাত্বৈব।

—'শৃঙ্গার প্রকাশ' ২, পৃ. ৪৮৮

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় রাম বানরসেনাসহ সমুদ্র পার হয়ে শিবিরস্থাপন করেছেন। রাবণ কুম্ভকর্ণের সাহায্যের জন্য তাকে জাগানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ রাবণকে বলছে যে সে যখন আছে তখন কুম্ভকর্ণকে জাগানোর কোন প্রয়োজন নেই।

এই অঙ্কের বিবরণ কেবলমাত্র 'নাট্যদর্পণে' পাওয়া যায়।

'পঞ্চম অঙ্কে যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। যুদ্ধচলাকালীন রাবণ মায়াসীতার মুণ্ড রামের নিকট নিক্ষেপ করে। রাম তা দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাবণবধের ঘটনা বর্ণিত। রাম সীতার সতীত্বে সন্দেহ করায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়। অতঃপর সীতাসহ অন্যান্যদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রামের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হয়েছে।

বিভিন্ন রচনা থেকে এই নাটকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে নাটকটির

জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। বিভিন্ন রচনা থেকে নাট্যকারের নাট্যপরিকল্পনার উৎকর্ষেও রচনার মাধুর্য উপলব্ধি করা যায়। নাটকের কাহিনীবিন্যাস যেহেতু কষ্টকল্পিত নয়, সেইজন্য রচনাটি সহজ, সরল, মার্জিত ও রস-সুষমামণ্ডিত। যশোবর্মনের নাট্যকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন আনন্দবর্ধনের উক্তি থেকে জানা যায় :—

'এতদ্ধি বাকং পরস্পরানুরাগং পরিপোষপ্রাপ্তং প্রদর্শয়াৎ
সর্বত এবপরং রসতত্ত্বং প্রকাশয়তি'।—('ধ্বন্যালোক-লোচন')

২। কৃত্যা রাবণ—

'রামাভ্যুদয়ে'র পর অপ্রাপ্য নাটকগুলির মধ্যে 'কৃত্যারাবণ' উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের বিবরণ 'অভিনব ভারতী', 'শৃঙ্গার প্রকাশ', 'ভাব প্রকাশ' ও 'নাট্যদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। নাটকের কাহিনী 'রামাভ্যুদয়ে'র মতো রামায়ণের অনুরূপ নয়। 'ছলিত রাম' নাটকের মতো এই নাটকের কাহিনী নবরূপে উপস্থাপিত। 'কৃত্যারাবণের' নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিনায়ক রাবণের নানাবিধ মায়ার প্রদর্শন এই নাটকে পাওয়া যায়। ফলে এই নাটক প্রতিনায়কের দিক থেকে অদ্ভুত ও রুদ্ররসাত্মক নাটক এবং নায়ক রামের দিক থেকে করুণরসাত্মক নাটক। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এখানে রামের শোকবিহ্বল চিত্র পাওয়া যায়। রুদ্ররসের পরিণতি যে করুণ রসে পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে সর্বত্রই মায়ার খেলা। রাবণ প্রথমে মায়ামৃগের সাহায্য গ্রহণ করেছে। পরে শূর্পণখা মায়া-গৌতমী ও মায়াসীতাব রূপ ধারণ করেছে এবং শেষে যুদ্ধের সময় রামের মায়া-ছিন্নমুণ্ড দেখে সীতা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।

নাটকের কাহিনী সীতাহরণ থেকে রাবণবধ পর্যন্ত বিস্তৃত। নাটকের আরম্ভ পঞ্চবটী বনে সীতা লক্ষ্মণসহ রামের.বনবাস জীবন যাপন থেকে এবং নাটকের শেষ হচ্ছে সীতার অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিদেবের উপস্থিতি ও আশীর্বাদ এবং রামের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও আনন্দের প্রার্থনায়। শেষ অঙ্কের প্রথম দিকে রাম রাবণকে বধ করেন।

'কৃত্যারাবণে' সাতটি অঙ্ক আছে। প্রথম অঙ্কে দেখি শূর্পণখার বিরূপী-করণের পর শূর্পণখা রামের বিরুদ্ধে রাবণের কাছে অভিযোগ করলে রাবণ সীতা-হরণের উদ্দেশ্যে মারীচের সঙ্গে পঞ্চবটী বনে এসেছে। মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রামের আশ্রমের নিকট এসেছে। ভোজ স্বর্ণমৃগের এইভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন—

'কৃত্যারাবণাদিষু কনকমৃগাদিরচনাত্মিকা তু অমানুষী'

—'শৃঙ্গার প্রকাশ' ২, পৃ. ৪৮৩

এখানে সীতাহরণের পূর্বের ঘটনাবলী অভিনব ভাবে বর্ণিত।. প্রথমে শূর্পণখা গৌতমীর রূপ ধারণ করে সীতাকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। পরে সীতার রূপ ধারণ করে আশ্রমে আসে। রাম স্বর্ণমৃগের সন্ধানে গেলে, দূর থেকে মারীচ রামের স্বর নকল করে সাহায্য প্রার্থনা জানালে সীতা প্রথমে লক্ষ্মণের সামনে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং পরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করে রামের সাহায্যের জন্য পাঠান। নাট্যকার এখানে সীতার চরিত্র নিষ্কলুষ করার উদ্দেশ্যে সীতাকে দিয়ে নয়, মায়াসীতাকে দিয়ে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিয়েছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের বর্ণিত বিষয় সীতাহরণ। রাবণ পুষ্পকে চড়ে সীতাহরণের জন্য আসে। বনের ঋষিরা রাবণের ভয়ে ভীত হন এবং তারা সীতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। রাবণ প্রথমে সীতার কাছে এসে তাকে গ্রহণ করতে এবং পুষ্পকে চড়তে বলে। সীতা রাবণের এই কথায় তাকে কটূক্তি করেন এবং অভিশাপ দেন এবং পুষ্পকে উঠতে অস্বীকার করেন। রাবণ তখন সমস্ত ঋষিদের হত্যা করবে বলে ভয় দেখায়। এখানে নাট্যকার সীতার চরিত্রের মহত্ত্ব ও মমতাবোধের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সীতা তাঁর দুঃখের বিনিময়ে ঋষিদের প্রাণ ভিক্ষা চান এবং পুষ্পকে আরোহণ করেন। শক্তিহীন ঋষিদের রাবণকে অভিশাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, রাম মায়ামৃগ বধ করে আশ্রমে ফিরে এসে সীতাকে দেখতে না পেয়ে শোক প্রকাশ করছেন। তখন ঋষিরা সব ঘটনা রামের কাছে বর্ণনা করেন। ইতিমধ্যে দেখা যায় জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঋষিরা রামসহ জটায়ুকে তুলে ধরে তার সেবা করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে রাম-সুগ্রীব মিতালী, বালীবধ, সুগ্রীবের সীতার খোঁজে তার বানরসেনাদের প্রেরণ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, রাম সমুদ্র পার হয়ে অনুচরসহ লঙ্কায় শিবির স্থাপন করেছেন এবং অঙ্গদকে দূত হিসাবে রাবণের কাছে পাঠিয়েছেন। রাবণ সেই সময় শান্তিগৃহে 'অভিচার যজ্ঞ' করার জন্য ব্যস্ত ছিল। অঙ্গদ রাবণকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে রাবণের মহলে প্রবেশ করে রাবণের রানী মন্দোদরীকে উত্ত্যক্ত করতে আরম্ভ করলে মন্দোদরী সাহায্যের জন্য ভয়ার্ত চিৎকার করে ওঠে। সেই চিৎকার রাবণ শুনতে পায়। প্রতিহারীর কাছ থেকে রাবণ জানতে পারে যে এক বানর তার মহলে ঢুকে তার রানীকে উত্ত্যক্ত করছে। রাবণ তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়। রাবণের সঙ্গে অঙ্গদের তখন কথোপকথন আরম্ভ হয়। অঙ্গদ তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে। রাবণের প্রতি অঙ্গদের অবজ্ঞা ও অপমান-

জনক উক্তি নাট্যকার এখানে প্রশংসনীয়ভাবে বর্ণনা করেছেন। নাট্যকারের বর্ণনাশৈলীও মনোমুগ্ধকর। মন্দোদরীর ভয় ও ব্যাকুলতা, অঙ্গদের পরিহাস ও রাবণের প্রতি ঘৃণা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে নাট্যকারের শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

'নাট্যদর্পণে' ঘটনাটি এই ভাবে বর্ণিত—

"বিচিত্র ভাবং কার্যান্তরং কৃত্যারাবণে। তথাহি অঙ্গদেন অভিভূয়মানায়া মন্দোদর্যা ভয়ম্, অঙ্গদস্য উৎসাহঃ, অস্যৈ ্ব রাবণদর্শনেন" "এতে নাপি সুরা জিতাঃ" "ইত্যাদি বদতো হাসঃ 'যস্তাতেন নিগৃহ্য বালকইব প্রক্ষিপ্য কক্ষান্তরে' ইতিচ জল্পতো জুগুপ্সা-বিস্ময় হাসাঃ ; রাবণস্য রতিক্রোধৌ।"

আমরা এখানে 'নাট্যদর্পণে' বর্ণিত সীতাবিপত্তি ঘটনাটিও জানতে পারি। রাবণ দারুণিকা নামে এক রাক্ষসীকে সীতার প্রাণ নাশের জন্য পাঠিয়েছিল। রাক্ষসী এই আদেশে মর্মাহত হয়ে খবরটি সীতার সুহৃদ ত্রিজটাকে জানায়। দারুণিকা সীতাকে বধ না করে এমন একটি উপায় অবলম্বন করে যাতে সীতা নিজেই আত্মহত্যা করেন। দারুণিকার নির্দেশক্রমে মায়ারামের হত্যার ঘটনাটি সীতার নিকটে অভিনীত হয়। রাম নিহত হয়েছে মনে করে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করবেন স্থির করেন। রামের কাছে সীতার আত্মহত্যার খবর পাঠানো হয়।

শেষ অঙ্কে রাবণবধ ঘটনা বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বিভীষণের রাজ্যাভিষেকের ঘটনা নাটকে দেখতে পাওয়া যায় না। সেই কারণে এটা বোঝা গেল না, নাট্যকার কিভাবে বিভীষণের চরিত্র রূপায়ণ করলেন। সপ্তম অঙ্কের শেষে রামের সীতা-চরিত্র সন্দেহের জন্য অগ্নিপরীক্ষার কথা আছে। সীতা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তখন অগ্নিদেব উপস্থিত হয়ে সীতার সতীত্বের কথা ঘোষণা করেন। নাটকের শেষ পর্বে আমরা 'নাট্যদর্পণে' উল্লিখিত দুটি উদ্ধৃতি পাই।

১) কাব্য সংহারঃ—যথা কৃত্যারাবণে সীতা রক্ষণে রামস্য প্রিয়ে হিতে চ মহতি কর্মণি কৃতেঽপ্য সন্তষ্যন্ অগ্নিরাহ—

বৎস। উচ্যতাং কিংতে ভূয়ঃ প্রিয়মনুকরোমি ?

রামঃ—ভগবন্। অতঃ পরমপি প্রিয়মস্তি ?

২) প্রশস্তিঃ—যথা কৃত্যারাবণে রামঃ

তথাপী—দমস্ত—

যথায়ং মমসম্পূর্ণঃ চিন্তিতার্থো মনোরথঃ।

এবমভ্যাগতো রক্ষ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতাম॥

অপিচ—

নিরীয়তঃ প্রজাঃ সন্তু সন্তঃ সন্তু চিরায়ুষঃ।
প্রযন্তাং কবয়ঃ কাব্যৈঃ সম্যঙ্ নন্দন্তু মাতরঃ॥

৩। ছলিত রাম—

'ছলিত রামে'র নামকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর রাম-নাটক দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর রাম-নাটকগুলি আরম্ভ হয় রামের অভিষেকের উদ্যোগ থেকে এবং শেষ হয় রামের যুদ্ধজয়ের পর রাজ্যাভিষেকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাটকগুলি আরম্ভ হয় রামের পঞ্চবটী বনে বাস থেকে এবং শেষ হয় রামের রাজ্যাভিষেকে। তৃতীয় শ্রেণীর নাটকগুলি রচিত হয় রামায়ণের উত্তরকাণ্ড নিয়ে, যেমন 'উত্তররামচরিত', 'কুন্দমালা' প্রভৃতি। এই নাটকটি তৃতীয় শ্রেণীর রাম-নাটকগুলির অন্তর্ভুক্ত। নাটকটির আরম্ভ হচ্ছে রাবণ-বিজয়ের পর রামের পুষ্পক রথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন থেকে। পুষ্পক রথে ফেরার পথে রাম লক্ষ্মণকে বললেন যে সরাসরি অযোধ্যায় ফেরা উচিত হবে না, সহসা রাম ভরতের মতো একজন তপস্বীকে নন্দীগ্রামে দেখতে পেলেন। এইখানে নাটকের আরম্ভ। ভরতের অযোধ্যায় ফেরার পর এবং রামের রাজ্যাভিষেকের পর অত্যাচারী লবণকে বধ করার দায়িত্ব শত্রুঘ্নর উপর ন্যস্ত হয়। এরপর গর্ভবতী সীতাকে রামায়ণের মতো বনবাসে প্রেরণের কথা আছে। রামায়ণে আছে, রাম সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করেছিলেন অযোধ্যাবাসীদের সীতার পবিত্রতার বিরুদ্ধে জনরব শুনে কিন্তু এই নাটকে সীতার বনবাস হয় লবণদ্বারা রামের মনকে সীতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। লবণ তার দুজন অনুচরকে ছদ্মবেশে রামের কাছে পাঠায়। তারা রামের সঙ্গে মিশে রামের মনকে বিষিয়ে দেয়। তখন তাদের কথা শুনে প্রতারিত হয়ে রাম অত্যন্ত নির্দয় কাজ করেন, সীতাকে বনবাসে পাঠান, তাই নাটকের নাম প্রতারিত রাম বা 'ছলিত রাম'।

সীতাকে পরিত্যাগ করে রাম বুঝতে পারেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এই নাটকে একটি অঙ্ক আছে সেই অঙ্কে রামের অনুশোচনা বর্ণিত হয়েছে। অঙ্কটির নাম 'অনুতাপাঙ্ক'।

সীতা বনবাসে গিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করেন। তাঁর লব ও কুশ নামে দুই পুত্র জন্মে। বাল্মীকি তাদের রামায়ণ গান শেখান এবং বালকদ্বয়কে নিয়ে অযোধ্যায় রামের অশ্বমেধযজ্ঞে যেতে মনস্থ করেন। তাঁর আশা যে সেখানে

রামকে এই রামায়ণ গান শুনিয়ে তিনি রামসীতার পুনর্মিলন ঘটাতে পারবেন। এই সময় সীতা লবকে বলেন যে সে যেন রামকে দেখে প্রণাম করে কারণ তিনি তার পিতা। সহসা অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব আশ্রমের নিকটে এলে লব সেই অশ্বকে বেঁধে রাখে, ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়। 'যুদ্ধে লক্ষ্মণ লবকে পরাজিত করে তাকে বন্দী করে রাজসভায় নিয়ে যায়। লব রাজসভায় সীতার মর্মর মূর্তি দেখতে পায়। রাম লবের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারে যে সীতা এখনও জীবিত আছেন। নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে এগুলি বর্ণিত হয়েছে। এই অঙ্কের বিবরণ আমরা ভোজের 'শৃঙ্গার প্রকাশ' রচনা থেকে পাই। ঘটনাটি নিশ্চয়ই শেষ অঙ্কের ঘটনা। এর আগের যে পাঁচটি অঙ্ক ছিল তার দুটি অঙ্কের ঘটনা আমরা জানি। রামের রাজ্যাভিষেক ও সীতার বনবাস। দুটি ঘটনাই হয়তো একটি অঙ্কের বিষয়বস্তু। লবণের কূটনীতি, লবণপ্রেরিত অনুচব দ্বারা রামকে প্রতাবণা এবং যার ফলে সীতার বনবাস প্রভৃতি ঘটনাগুলি অন্যান্য অঙ্কের বিষয়বস্তু। বনবাস-জীবনের ঘটনা যে কোন্ অঙ্কের বিষয়বস্তু তা আমরা ঠিকভাবে অবগত নই। যখন রাম লবকে তার মাতার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তার উত্তরে লব বলেছিল যে তার মাতৃ-সম্পর্কীয় 'মাতামহ মাতাকে সীতা নামে অভিহিত করেন'।—

'তাং খলু মাতামহোঽস্মা অভিধত্তে সীতেতি।'

লবের উত্তর শুনে বোঝা যায়, ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র মতো জনক ও অন্যান্যদের মধ্যে অরুন্ধতী বাল্মীকির আশ্রমে এসেছিলেন কিংবা হয়তো বাল্মীকিকে তার মায়ের পিতার ভূমিকায় দেখে লব বাল্মীকিকে মাতামহ বলে অভিহিত করেছে। লবণের ঘটনা এখানে নাট্যপরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অশ্বমেধযজ্ঞকেই নাটকের প্রধান ঘটনা বলে অভিহিত করতে হয়।

'ছলিত রামের' কাহিনীবিন্যাস নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। নাট্যকারের সুনির্বাচিত শব্দচয়ন, নাটকের গতি ও আবেগমণ্ডিত বর্ণনাভঙ্গি প্রশংসনীয়। নাট্যকারের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দুটি অংশ উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে। সীতা যখন রামকে দেখে প্রণাম করতে বললেন, লব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? আমরা কি তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী? আবার দেখি, যখন লব রাজসভায় সীতার মূর্তি দেখছে, তখন রাম জিজ্ঞাসা করলেন 'ইনি কি তোমার মা?' লব আবেগাপ্লুত কণ্ঠে উত্তর দিল 'হ্যাঁ, কিন্তু এই মায়ের অনেক অলংকার আছে।' 'ছলিত রামে' আমরা আর একটি 'উত্তররামচরিত' হারিয়ে ফেলেছি।

৪। জানকী রাঘব—

পরবর্তী অপ্রকাশিত নাটক 'জানকী রাঘব'। 'জানকী রাঘবে' বর্ণিত ঘটনাগুলি হল সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতাউদ্ধার ও অযোধ্যায় রামের রাজ্যাভিষেক। এই নাটকের উল্লেখ কমপক্ষে ২০টি স্থানে সাগরনন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' পাওয়া যায়। এতে মনে হয় এই লেখকের সঙ্গে এই নাটকের কোন-না-কোন সম্পর্ক আছে। এই রচনাটি যে নাটক এবং নাটকের নামকরণ যে রাম ও সীতার প্রধান চরিত্র চিত্রণের জন্য হয়েছে তা এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় :—

'প্রধানস্য (অর্থাৎ নায়কস্য) নির্দেশাদ্ বস্তুনির্দেশো দ্বা নাটকাদীনাং নাম কর্তব্যম্। যথা জানকীরাঘবং নাম নাটকম্।'

নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখি সীতা তাঁর প্রিয়সখী প্রিয়ংবদার সঙ্গে কথা বলছেন। সীতা তাঁর প্রিয়সখীকে বলছেন, 'আমার ভয় হচ্ছে রাবণ আমাকে হরণ করবে এবং তাই রামের কাছে আমার বিশেষ আবেদন তিনি যেন আমাকে মুক্ত করেন।' সখী প্রিয়ংবদা সীতাকে এই বলে আশ্বস্ত করছে যে সেই রকম বিপদ যদি সত্যই আসে তাহলে রাম নিশ্চয়ই সমুদ্র পার হয়ে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। প্রশ্ন হল, সীতার এই ভীতির কারণ কি? নাট্যকার তাঁর কারণ বর্ণনায় বলেছেন যে স্বয়ংবরসভায় সীতা রাবণকে দেখেছিলেন এবং রাবণ যে চরিত্রের তার পক্ষে সীতাহরণ অসম্ভব নয়। ভবভূতি, মায়ুরাজের নাটকেও স্বয়ংবরসভায় রাবণের উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। রাজশেখরের 'বালরামায়ণে'ও দেখি, রাবণ অন্যান্য তীরন্দাজদের সঙ্গে মিথিলায় এসেছিল। প্রথম অঙ্কে কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকের মতো এখানে নায়িকা ও তাঁর সখীকে কথোপকথনরত দেখি। নাট্যকার এখানে রামসীতার পূর্বানুরাগ বর্ণনা করেছেন। স্বয়ংবরসভায় ধনুর্ভঙ্গ পরীক্ষার জন্য সবাই প্রস্তুত। অন্যান্যদের মতো সীতাও উদ্বিগ্ন। এমন সময় সীতা একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সেই কণ্ঠস্বর রাবণের। রাবণ উপস্থিত ক্ষত্রিয়দের সতর্ক করে দিয়ে বলছে, যে কেউ ধনুর্ভঙ্গ করুক-না কেন, এবং যে-কেউ সীতাকে লাভ করুক-না কেন, সে সীতাকে জোর করে লঙ্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। এখন আমরা সীতা ও তাঁর সখীর কথোপকথনের তাৎপর্য বুঝতে পারছি এবং সীতার ভীতি এবং সখীর আশ্বাসের মর্ম উপলব্ধি করছি।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে রামসীতার প্রেম ভালোবাসা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রেমলীলার বাধা সৃষ্টি হল পরশুরামের আগমনে। পরশুরাম রামের অগ্রগতিতে বাধাদান করে দাঁড়ালেন। সীতা পরশুরামের সঙ্গে রামের পূর্ববর্তী শত্রুতা

স্মরণ করে তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা সখী প্রিয়ংবদাকে জানালেন। তারপর লোক-মুখে রাম পরশুরামকে পরাস্ত করেছেন শুনে আশ্বস্ত হলেন।

তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় যে, রাবণ সীতাকে হরণ করেছে এবং রামের সঙ্গে সুগ্রীবের মৈত্রী হয়েছে। নাট্যকার এখানে রাবণ পূর্বশপথের জন্য সীতাহরণ করেছে দেখিয়েছেন। তাই তিনি কৈকেয়ীর উপাখ্যানের উল্লেখ করেননি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না কেমন করে রামসীতার বনগমন হল এবং কেমন করে রাবণ সীতাহরণ করল।

এখানে একটি মায়ালক্ষ্মণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম না মায়ালক্ষ্মণ সীতাকে লাভ করতে এবং রামের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে রাবণকে কিভাবে সাহায্য করলে। যেসব রচনায় মায়ালক্ষ্মণ অঙ্ক বিবৃত আছে, সেখানেও এই বিষয়ে কিছুই আলোকপাত করা হয়নি।

এরপর চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কের বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। যদি মনে করা যায় মায়ালক্ষ্মণ অঙ্কই পঞ্চম অঙ্ক, তবে চতুর্থ অঙ্কের বিষয়বস্তু হবে রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, বালীবধ, সীতার খোঁজে বানরকুলের যাত্রা, হনুমানের লঙ্কায় গমন এবং সীতার সংবাদ নিয়ে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনাবলী।

ষষ্ঠ অঙ্কে রাম ও রাবণের সেনাদের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি যোদ্ধারা যখন নিহত হয়েছে তখন রামের চিন্তার কোন কারণ নেই।

সপ্তম অঙ্কের বিষয়বস্তু রাবণবধ ও বিভীষণের রাজ্যাভিষেক। নাট্যকার সীতার অগ্নিপরীক্ষা ঘটিয়েছেন। কিন্তু ঠিক কিভাবে এই ঘটনা বর্ণিত তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নাটকে যে সীতার অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ আছে তা এই উদ্ধৃতিতে জানা যায় :—

"যুক্ত কার্যান্বেষণ মনুযোগঃ। জানকী রাঘবে সংহারে রামঃ (সহর্ষম) বৎস বিভীষণ। আনন্দ বাষ্পাকুলিত লোচনঃ ত্বাং ন পশ্যামি। সত্যং কথয়সি ন দগ্ধা জানকী।"

পরিশেষে এই নাটক সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে নাট্যকার এখানে সীতারামের প্রেমভালবাসা বর্ণনায় যেভাবে মনোপযোগী হয়েছেন তাতে মনে হয় নাটকের মূল অবলম্বন হল সীতা-রামের প্রণয় কাহিনী।

৫। রাঘবাভ্যুদয়—

আমরা এই নাটকের পরিচয় বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য দর্পণ' এবং সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' থেকে জানতে পারি। নাটকের আলোচিত বিষয়বস্তু হল

রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ এবং সীতাউদ্ধার। সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' 'রাঘবাভ্যুদয়' নাটকে রাম-কাহিনীতে পাঁচটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন যথা প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তি সম্ভব, নিয়ত ফলসংপ্রাপ্তি, এবং ফলযোগ।

'প্রারম্ভো রাবণবধে স্বরপ্রভৃতি বৈশসম্।
প্রযত্নঃ শূর্পণখয়া কৃতঃ সীতাপহারতঃ॥
সুগ্রীবস্য তু সখ্যেন সঞ্জাতঃ প্রাপ্তি সম্ভবঃ।
নিয়তা ফলসপ্রাপ্তিঃ কুম্ভকর্ণাদিসংক্ষয়ে॥
যো দেবৈ রাক্ষসপতেঃ কার্য্যোদ্দিষ্টমতের্বধঃ।
ফলযোগঃ স রামস্য ধর্মকামার্থ সিদ্ধয়ে॥
এতত্তু রাঘবাভ্যুদয়ে সুব্যক্তমেব।'

নাটকে আলোচিত বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে নাটকের আরম্ভ অরণ্য-কাণ্ডের ঘটনাবলী থেকে। নাটকের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে নাট্যকার সমস্ত নাটকীয় পরিকল্পনার মূলে কৈকেয়ী চরিত্রকে কাজে লাগিয়েছেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাল্মীকির রামায়ণেও বনবাসের যখনই কোন বিপদ এসেছে তখনই রাম লক্ষ্মণ কিংবা সীতা তার জন্য কৈকেয়ীকে দায়ী করেছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে রামের প্রত্যাবর্তনের পর রাম কৈকেয়ীকে বলছেন—

"তাতস্নেহো ভারতমহিমা পৌরুষং বায়ুসূনোঃ
সখ্যং চাপি প্লবগপতিনা কাপি সৌমিত্রিভক্তিঃ।
সীতা সত্যং নিজভুজবলং বৈরিণাং বৈরিভাবঃ
জ্ঞাতং সর্বং তব চরণয়োরেষ মাতঃ প্রসাদঃ॥"

অন্যান্য রামনাটকের মতো 'রাঘবাভ্যুদয়ে'ও রামকাহিনী বর্ণনায় অভিনবত্ব দেখতে পাই। নাটকের প্রারম্ভেই একটি রহস্যপূর্ণ অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বরের উল্লেখ দেখতে পাই। সেই কণ্ঠস্বরটি বায়ু দেবতার। সেই স্বরে একটি অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হচ্ছে এবং সেই স্বরটি রাবণবধ পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়।

সীতাহরণের ঘটনাটি আমরা জানতে পারি জটায়ুর একটি সংলাপের মাধ্যমে, যেখানে জটায়ু ক্রুদ্ধস্বরে রাবণকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দিচ্ছে। সাগরনন্দিন্ 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' জটায়ুর সংলাপ এইভাবে উদ্ধৃত করেছেন—

"রাঘবাভ্যুদয়ে রাবণং প্রতি—
জটায়ু:— অবনিরবিরথান্তঃ প্রস্থিতৈ কৈকচঞ্চূ
পুটকুহরবিলোলব্যাল কল্পাগ্রজিহ্বঃ।

অরুণরুচিরতির্যগ্‌বর্তিদৃগ্‌ভৈরবাস্যঃ।
কবলয়তু ভবন্তং ক্রোধদীপ্তো জটায়ুঃ।

পরের ঘটনা সেতুবন্ধনের ঘটনা। যে অঙ্কে এই ঘটনাটি বর্ণিত সেই অঙ্কের নাম দেওয়া হয়েছে 'সেতুঅঙ্ক'। ঘটনাটির উল্লেখ আমরা 'সাহিত্য দর্পণে' ও 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' দেখতে পাই। সাগরতীরে গিয়ে বাল্মীকির রামায়ণের মতো এখানেও রামের দুঃখশোকের বর্ণনা আছে। এবং লক্ষ্মণের রামের প্রতি সান্ত্বনা-বাক্যও এখানে উল্লিখিত।

'রাঘবাভ্যুদয়ে' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব দেখা যায় যুদ্ধের প্রাথমিক স্তরে রামের কাছে রাবণের মিথ্যা সন্ধিপ্রস্তাবের মধ্যে। রাবণ-নিযুক্ত জালিনী নামে এক রাক্ষসী সীতার ছদ্মবেশে রামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে রাম উভয় সংকটে পড়েন। হয় তাঁকে সীতাকে গ্রহণ করতে হয় এবং রাবণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, নতুবা রাবণের বন্ধুত্ব অস্বীকার করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাতে হয়। এমন সময় ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে রামকে সীতাগ্রহণ এবং রাবণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে বললেন। রাম তখন সানুনয়ে ইন্দ্রকে বললেন যে, তিনি বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসন দেবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি ফিরিয়ে নিতে পারবেন না। এখানে কিন্তু আসল ইন্দ্র নয়, রাবণই ইন্দ্রের ছদ্মবেশে রামকে এই কথা বলেছিলেন। ঠিক এই সময়ে লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে সংকটময় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান হল। লক্ষ্মণ স্বর্ণমৃগের ছলনার পর সব পরিস্থিতি সন্দেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনাটি রাবণের ছলনা মনে করে লক্ষ্মণ কিছুতেই রাবণের বন্ধুত্ব স্বীকার করতে রাজী হলেন না। ছলনায় রামকে বশীভূত করতে না পেরে রাবণ স্বমূর্তি ধারণ করে লক্ষ্মণকে ক্রোধদীপ্তস্বরে ভীতি প্রদর্শন করে চলে গেল।

নাটকীয় পরিকল্পনায় নাট্যকারের অভিনবত্ব উপস্থাপন কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। নাট্যকারের সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দনির্বাচন কৌশল প্রশংসার দাবি রাখে। নাট্যকার তাঁর নাটকে মাঝে মাঝে যে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁর নাটকের সাবলীল গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি।

৬। রামানন্দ।

'রামানন্দ' অন্য একটি অপ্রাপ্ত রামনাটক। ভোজ তাঁর রচনাতে যদিও এই নাটকের কোনও উল্লেখ করেননি, তথাপি তাঁর উদ্ধৃত দুটি শ্লোক থেকে বোঝা যায় যে শ্লোক দুটি নিশ্চয়ই 'রামানন্দ' থেকে নেওয়া। শ্লোক দুটির একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

কারণ শ্লোকটি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' থেকে নেওয়া কিনা এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভীষণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সিংহভূপালের 'রসার্ণবসুধাকর' থেকে আমরা জানতে পারি যে শ্লোক দুটি 'রামানন্দ' থেকে নেওয়া। সিংহভূপাল আরও একটি শ্লোক 'রামানন্দে'র প্রস্তাবনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

যে শ্লোকটি সিংহভূপাল 'রামানন্দের' শ্লোক বলে অভিহিত করেছেন, সেই শ্লোকটি ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' তৃতীয় অঙ্কে ৪৫ নং শ্লোকে পাওয়া যায়। শ্লোকটি এইরূপ—

"যথা রামানন্দে—

ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে ব্যর্থং কপীনামপি
প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।
মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্মতনয়ঃ কর্তুং নলোঽপি ক্ষমঃ
সৌমিত্রেরপি পত্রিণাম বিষয়ে তত্র প্রিয়া কাপি মে॥"

কিন্তু আমরা যদি ঠিকভাবে 'উত্তররামচরিত' বিচার করি তাহলে দেখব যে 'ব্যর্থং যত্র' শ্লোকটি 'উত্তররামচরিতে' নেই, যদিও 'উত্তররামচরিতে' একই প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই কারণে মনে হয়, কিছু আগ্রহী এবং রসজ্ঞব্যক্তি উক্ত শ্লোকটি যে 'উত্তররামচরিতে' পাওয়া যায় এই মত প্রকাশ করেছেন। 'উত্তররামচরিতে' প্রসঙ্গটি এইরূপ—রামের দ্বিতীয় বার সীতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে। সীতার সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিচ্ছেদের তুলনা করে রাম বলছেন যে তাঁর দ্বিতীয় বিচ্ছেদটি প্রথমটির তুলনায় বেশি দুঃখদায়ক। তিনি রাবণদ্বারা সীতাহরণজনিত প্রথম বিচ্ছেদটি দ্বিতীয়টির তুলনায় কেন বেশি অসহনীয় নয় তার কারণ বর্ণনা করে বলছেন—

রাম :— অন্য এবায়মধুনা বিপর্যয়ো বর্ততে।
উপায়ানাং ভাবাদবিরলবিনোদব্যতিকরৈ-
র্বিমর্দৈর্বীরাণাং জনিতজগদত্যদ্ভুতরসঃ।
বিযোগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধির ভূৎ
কটুস্তূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং তু প্রবিরলঃ॥

সীতা :— বহুমানিতাস্মি পূর্ববিরহে। নিরবধিরিতি হা হতাস্মি (ছায়া)

রাম :— কষ্টং ভোঃ।
ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্র সখ্যমপি মে বীর্যং হরীণাং বৃথা
সৌমিত্রেরপি পত্রিণামাবিষয়ে তত্র প্রিয়ে কাসিমে॥

সীতা :— বহুমানিতাস্মি পূর্ববিরহে।.

রাম :— সখি বাসন্তি। দুঃখায়ৈব সুহৃদামিদানীং
রামদর্শনম। কিয়চ্চিরংত্বা রোদয়িষ্যামি।
তদনুজানীহি মাং গমনায়।

এখানে দ্বিতীয় শ্লোক 'ব্যর্থং যত্র' প্রথম শ্লোক 'উপায়ানাং ভাবাৎ'-এর পুনরুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। সীতার প্রথম শ্লোকের মন্তব্য অর্থপূর্ণ কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রথম শ্লোকের মন্তব্য ছাড়া নূতন কিছু নয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্লোকটি 'উত্তররামচরিতে'র অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নয়। শ্লোকটি প্রাথমিক অবস্থায় 'রামানন্দ' নাটকেই ছিল।

সিংহভূপাল তৃতীয় শ্লোকটি 'রামানন্দের' প্রস্তাবনা থেকে উদ্ধৃত করছেন—

"যথা রামানন্দে—
গুণো ন কশ্চিন্মম বাঙ্‌নিবন্ধে
লভ্যতে যত্নেন গবেষিতোঽপি।
তথাপ্যমুং রামকথাপ্রবন্ধং
সন্তোঽনুরাগেণ সমাদ্রিয়ন্তে॥"

শারদাতনয় 'রামানন্দে' নাটকের কথা দুবার 'ভাব প্রকাশে' উল্লেখ করেছেন। শারদাতনয়ের উদ্ধৃতি এই নাটকের অভিনবত্ব দেখানোর জন্য। তিনি বলেছেন যে সীতাহরণের পূর্বে বিভীষণের কথা এই নাটকে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :—

'পূর্ববৃত্তাশ্রয়মপি কিঞ্চিদুৎপাদ্য বস্তু চ।
বিধেয়ং নাটকমিতি মাতৃগুপ্তেন ভাষিতম্॥
প্রাগেব সীতা হরণাদ্ যদ্ বিভীষণবর্ণনম্।
তদ্‌বস্তুৎপাদ্যমেতত্তু রামানন্দে প্রদৃশ্যতে॥'

৭। মায়াপুষ্পক।

'মায়াপুষ্পক' নাটকের উল্লেখ অভিনবগুপ্তের 'অভিনব ভারতী'তে পাওয়া যায়। অভিনবগুপ্ত 'ব্রহ্মশাপকে' মায়াপুষ্পকের বিশেষত্ব বলে উল্লেখ করেছেন।

'যথা মায়াপুষ্পকে ততঃ প্রবিশতি ব্রহ্মশাপঃ' ইতি।

নাটকের প্রারম্ভের ব্রহ্মশাপের উল্লেখ আছে একথা জানতে পারি রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণে'।

'ক্বচিদ্‌ব্যসনানিবৃত্তিফলে রূপকে ব্যসনোপক্ষেপ রূপম্। যথা মায়াপুষ্পকে
শাপঃ প্রবিশ্য বচনক্রমেণাহ—
কৈকেয়ী ক্ব পতিব্রতা ভগবতী কৈবং বিধং বাগ্‌বিষং
ধর্মাত্মা ক্ব রঘূদ্বহঃ ক্ব গামিতোঽরণ্যং সজায়ানুজঃ।
ক্ব স্বচ্ছো ভরতঃ ক্ব বা পিতৃবধান্মাত্রাধিকং দহ্যতে
কিং ক্বত্বেতি কৃতো ময়া দশরথে বধ্যে কুলস্য ক্ষয়ঃ॥"

বোঝা যায় যে, রাজা দশরথ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন যৌবনে শিকার করতে গিয়ে। শিকারে গিয়ে যখন মুনিপুত্র ঘড়াতে জল ভরছিল, রাজা দশরথ সেই শব্দকে হাতি জলপানরত মনে করে শরনিক্ষেপ করেন। তাতে মুনিপুত্র প্রাণত্যাগ করে এবং মুনি রাজা দশরথকে অভিশাপ দেন। নাটকের পরবর্তী ঘটনাগুলি, যেমন, রামের অভিষেক বন্ধ হওয়া, রামের বনগমন, পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু প্রভৃতি দশরথের মুনিপুত্র বধের জন্য ঘটেছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে এই ঘটনাগুলি মুনিপুত্র বধের জন্য ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা হয়নি।

অভিনবগুপ্ত অন্য একটি প্রসঙ্গে 'মায়াপুষ্পকে'র কথা উল্লেখ করেছেন। সুগ্রীব সেতুবন্ধের আগে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে বিলাপ করছে। বলেছে যে সে তার মিত্র রামের কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছে, তাঁর দ্বারা অনেক সুখ পেয়েছে কিন্তু এমন সহৃদয় মিত্রের জন্য সে সেতুবন্ধন করতে পারছে না যদিও সেতুবন্ধনের উপযোগী পাথর এখানে-ওখানে ছড়ানো আছে।

অন্য একটি প্রসঙ্গেও অভিনবগুপ্ত 'মায়াপুষ্পকে'র উল্লেখ করেছেন। যেমন—
'যথা মায়াপুষ্পকে··· .
বালী যথা বিনিহতঃ প্রথিতপ্রভাবো
দগ্ধা যথৈক কপিনা প্রসভং চ লঙ্কা।
তীর্ণো যথা জলনিধির্গিরিসেতুনা চ
মন্যে তথা বিলসিতং চপলস্য ধাতুঃ॥'

রাজা কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থে দুবার 'মায়াপুষ্পকের' উল্লেখ করেছেন। প্রথম উল্লেখে তিনি নাটকের নামকরণের সার্থকতা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় তাঁর শিল্প-উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়—

"প্রধানং প্রবন্ধপ্রাণগতপ্রায়ং যৎসংবিধানং কথা যোজনং
,তদঙ্কঃ চিহ্নমুপলক্ষণং যস্য তৎ তথোক্তং তচ্চ তন্নাম···
যথা অভিজ্ঞানশাকুন্তল-মুদ্রারাক্ষস-প্রতিমানিরুদ্ধ-মায়াপুষ্পক
-কৃত্যা রাবণ-ছলিত রাম-পুষ্পদূষিতকাদীনি।"

আমরা এখানে জানতে পারি যে মায়াপুষ্পকবিমান এই নাটকে চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও জানতে পারি যে রাবণ এই বিমান ব্যবহার করেছে। কিন্তু কিভাবে রাবণ পুষ্পকবিমান ব্যবহার করেছিল এবং তার দ্বারা নাটকের গতিপ্রকৃতি কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তার সবিশেষ বর্ণনা এই সামান্য বিবরণে জানা যায়নি।

কুন্তক তাঁর দ্বিতীয় বিবরণে 'মায়াপুষ্পক' নাটকে অভিনবত্ব উপস্থাপনে একটি সার্থক নাটক বলে অভিহিত করেছেন। নাটকের অভিনবত্ব যে মৌলিক এবং চিত্তাকর্ষক তা আমরা কুন্তকের বিবরণ থেকে কিছুটা আন্দাজ করতে পারি।

৮। রাঘবানন্দ।

এই অপ্রকাশিত এবং বিলুপ্ত নাটকটির পরিচয় আমরা ভোজের 'শৃঙ্গার প্রকাশে'র দুটি উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারি। নাটকটির নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক মূল্য আছে। নাটকটির নামকরণ অনুসারে নাটকটি রামের রাবণ-বিজয়ে সমাপ্তি।

ভোজের দুটি উদ্ধৃতি এইরূপ—

(১) 'যথা রাঘবানন্দে—

অঙ্কে ন্যস্তোত্তমাঙ্গং প্লবগবলপতেঃ পাদমক্ষস্য হন্তুঃ
কৃত্বোৎসঙ্গে সলীলং ত্বচি কনকমৃগস্যাঙ্গশেষং নিধায়।
বাণং রক্ষঃকুলঘ্নং প্রগুণিতমনুজেনাদরাৎ তীক্ষ্ণমক্ষ্ণাঃ
কোণেনাবেক্ষমাণঃ ত্বদনুজবচনে দত্তকর্ণোঽয়মাস্তে॥'

(২) 'যথা রাঘবানন্দে কুম্ভকর্ণো রাবণমুদ্দিশ্য—

রামোঽসৌ জগতীহ বিক্রমগুণৈঃ যাতঃ প্রসিদ্ধিং পরা—
মস্মদ্ভাগ্যবিপর্যয়াদ্ যদি পরং দেবো ন জানাতি তম্।
বন্দীবৈষ যশাংসি গায়তি মরুদ যস্যৈকবাণাহতি—
শ্রেণীভূত বিশালসালবিবরোদ্গীর্ণৈঃ স্বরৈস্সপ্তভিঃ॥'

'রাঘবানন্দ' নাটকটিকে কিন্তু রাজশেখরের 'বালরামায়ণ' যা রাঘবানন্দ নামেও পরিচিত তার সঙ্গে এককরে দেখা যাবে না।

অন্যান্য অপ্রাপ্ত এবং অপ্রকাশিত নাটক:—

ক) স্বপ্নদশানন:

'সুক্তিমুক্তাবলী'তে রাজশেখর একটি শ্লোকে ভীমটের নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজশেখর তাঁর শ্লোকে ভীমটের যে পাঁচটি নাটকের উল্লেখ করেন তার

মধ্যে 'স্বপ্নদশানন' নাটক সর্বোৎকৃষ্ট। নাট্যকার প্রশংসনীয় ভাবে তাঁর নাট্য-পরিকল্পনা করেছেন এবং তাঁর নাটকের নামকরণ-এর সার্থকতা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

"কালঞ্জরপতিশ্চক্রে ভীমটঃ পঞ্চনাটকীম্।
প্রাপ প্রবন্ধ রাজত্বং তেষু স্বপ্নদশাননম্॥"

খ) অভিজাত জানকী :

'অভিজাত জানকী' নাটকের নামকরণ নায়িকার নামে করা হয়েছে। কুন্তকের রচনায় নাটকটির উল্লেখ অনেক জায়গায় দেখা যায়। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সেতুবন্ধনের প্রস্তুতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির অস্পষ্টতার জন্য নাটকের অনেক অংশ অবোধ্য এবং নাটকে কুন্তকের মন্তব্যও পরিষ্কার নয়। তবে একথা ঠিক যে নাটকের মূলকথা হল সেতুবন্ধন সম্বন্ধে মতামতের পূর্বে নীল এবং অন্যান্য বানর অনুচরেরা সমুদ্রতীরে এসে সমুদ্র দেখে সহর্ষে বলে উঠেছিল যে চারিদিকে যে পাথর পড়ে আছে তা দিয়ে সেতুবন্ধন করা কঠিন কাজ নয়। এই পরিস্থিতিতে রামের একটি মন্তব্য এবং জাম্ববানের একটি শ্লোকও পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

'যথাভিজাত জানকী' নাম্নি নাটকে তৃতীয়ঽঙ্কে সেতুপ্রবন্ধে অনাকলিততল বিধাখলানাম্ অবিদিতি বৈদেহী দয়িত (স্যা)স্ত্রপ্রভাবসম্প্রদাম্ অবান্তর (বানর) প্রবীরাণাং প্রথমমেব মকরাকরমালেকয়তাং বন্ধাধ্যবসায় প্রকরণম্ তিথাহিতত্র নীলস্য সেনাপতে বচনম্—

শৈলাঃ সন্তি সহস্রশঃ প্রতিদিশং বল্মীক কল্পাইমে
দোর্দণ্ডাশ্চ কঠোর বিক্রয়রসক্রীড়াসমুৎকণ্ঠকাঃ।
কর্ণাস্বাদিত জন্তু সম্ভবকথা কিন্নাম কি কল্লোলিনী
প্রায়ো গোষ্পদপূরণেঽপি কপয়ঃ কৌতূহলং নাস্তিবঃ।

বানরাণামুত্তরবাক্যং নেপথ্যে কলকলানন্তরম্—

আন্দোল্যন্তে কতিন গিরয়ঃ কন্দুকানন্দমুদ্রাং
ব্যাতন্বানাং করপরিসরে কৌতুকোৎকর্ষহর্ষে।
লোপমুদ্রাপরিবৃঢ়কথাভিজ্ঞতাপ্যস্তি কিন্তু
ব্রীড়াবেশঃ পবনতনয়োচ্ছিষ্ট সংস্পর্শনেন॥

বদ্ধাধ্যবসায় ইতি রামেণ পর্যনুযুক্ত জাম্বরতোঽপি বাক্যম্ :—

অনঙ্কুরিতনিঃ সীমমনোরথরুহেষ্বপি।

কৃতিনস্তুল্য সংরম্ভমারভন্তে জয়ন্তি চ॥

—'ম্যাড্রাস ম্যানুসক্রিপট', ৩৩৩২

গ) অভিনব রাঘব :

রামচন্দ্রের 'নাট্যদর্পণে' এই নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কেবল নাট্যকারের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নাট্যকার কিভাবে নাট্যপরিকল্পনা করেছেন এবং কিভাবে কাহিনীবিন্যাস করেছেন তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্ররোচনা। যথা ক্ষীর স্বামী বিরচিতেঽভিনব রাঘবে—

স্থাপকঃ—(সহর্ষম) আর্যে চিরস্যস্মৃতম্।

অস্ত্যেব রাঘবমহীন কথা পবিত্রং

কাব্যং প্রবন্ধঘটনা প্রথিত প্রথিম্নঃ।

ভট্টেন্দুরাজচরণাব্জমধুব্রতস্য

ক্ষীরস্য নাটক মনন্য সমান সারম্॥

ক্ষীরস্বামিন এই নাটকেব রচয়িতা। তিনি নিজেকে ভট্টেন্দুরাজের শিষ্য বলে প্রচার করেছেন যিনি দশম শতাব্দীর শেষে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথমে অভিনব-গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু নাট্যকারকে ঐ একই নামে যে বৈয়াকরণ ছিলেন তাঁর সমগোত্র করে দেখা যাবে না।

ঘ) মারীচ বঞ্চিত :

নাটকের নামকরণ অনুসারে নাটকের বিষয়বস্তু হল স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে মারীচের বঞ্চনা যার ফলে রাবণ সীতাহরণ করতে পেরেছিল। শারদাতনয় তাঁর 'ভাষা প্রকাশে' দুবার এই নাটকের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় উল্লেখে বলা হয়েছে যে নাটকটি পাঁচ অঙ্কে রচিত—

'অঙ্কাঃ স্যুপ্তত্র পঞ্চাঙ্কমেতন্মারীচ বঞ্চিতম্'

প্রাথমিক উল্লেখ থেকে আমরা জানতে পারি যে নাটকটির ব্যাপ্তি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত। শারদাতনয় বিভীষণ চরিত্র ও একটি প্রবেশকের উল্লেখ করেছেন যাতে উল্কামুখ ও দীর্ঘজিহ্ব নামে দুটি রাক্ষস-এর কথা আছে এবং প্রতিকূল অবস্থার শেষে নাটকের সুষ্ঠু সমাপ্তির বর্ণনা করেছেন :—

'প্রবেশকেন ন বধো নায়কস্য কদাচন।

বিধেয়ঃ কার্যমন্তেঽত্র সন্ধির্বাপ্যপসারণম্॥

যথা বিভীষণেনাত্র সন্ধিরুল্কামুখস্য চ।
দীর্ঘজিহ্বস্য মারীচ বঞ্চিতে নাটকে কৃতঃ ॥'

৬) রামবিক্রম :

'রামবিক্রম' নাটকে রামায়ণের প্রারম্ভিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের কোনও ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়নি। নাট্যকার এখানে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন জনককে আমাদের সামনে হাজির ক'রে এবং তাঁকে রামসীতার বিভিন্ন রাক্ষস-রাক্ষসীদের সান্নিধ্যে বনবাসের দুঃখজনক জীবন অবহিত করিয়ে। 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে জনক ও বনের এক ব্রহ্মচারীর কথোপকথন এইভাবে উদ্ধৃত করছেন :—

যথা রামবিক্রমে দ্বিতীয়েঽঙ্ক—

জনক :— ভদ্র কুত আগম্যতে।
বটু :— আর্য। অরণ্যতঃ (ছায়া)।
জনক :— কিং তত্র শ্রোতুমধ্যেতুং বান প্রাপ্যতে,
যেন দূরতরাধ্বক্লেশোঽনুভূয়তে।
বটু :— কুতোঽপি হি (?) রাক্ষসৈর্বিরোধো ভূত আর্যাণাম।
অথবা বৈ তপস্বিজনোচিতো ব্যাপারঃ।" (ছায়া)

নাটকের সুপরিকল্পনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ব্রহ্মচারী একজন ছদ্মবেশী রাক্ষস ছাড়া আর কেউ নয়। দ্বিতীয় অঙ্কের উদ্ধৃত অংশবিশেষ থেকে এটাও প্রতিভাত হয় যে নাটকের প্রারম্ভিক অঙ্কে অভিষেক বন্ধ হওয়ার কথা ও বনবাসের কথা বর্ণিত আছে।

বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত রামায়ণ নাটকের অঙ্ক :—

১) 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' বিভিন্ন রামায়ণ নাটকের অঙ্ক পাওয়া যায়। সাগর নন্দিন 'অযোধ্যা ভরত' নামে একটি অঙ্কের দুবার উল্লেখ করেছেন।

ক) লক্ষণগুণকীর্তনের উদাহরণ :—

যথাযোধ্যাভরতে—ভগ্নং যেন ধনুঃ ইত্যাদি। এখানে রামের গুণকীর্তন করা হয়েছে।

খ) ছল বা চাতুরীর উদাহরণ :—

যথাযোধ্যাভরতে—

লক্ষ্মণ :—সকল রাক্ষসকুল ক্ষয়কারিণি যুষ্মদভুজদ্বয়েসতি কিমেসৌ করিষ্যতি।
প্রবিশ্য ত্রিজটা—সীতা বিয়োগম্ (ছায়া)

দুটি উল্লেখনীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে ঠিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। 'অযোধ্যা ভরত' নামকরণ দেখে আমাদের মনে হয় এটি যেন কোন নাটকের প্রারম্ভিক অঙ্ক। কিন্তু নাট্যকার কিভাবে ত্রিজটাকে নাটকের প্রাথমিক অবস্থায় আনলেন সেটা ঠিক বোঝা গেল না। দ্বিতীয় উদ্ধৃতি রামের প্রতি লক্ষ্মণের ভাষণ। উদ্ধৃতিটি দেখে নাটকের শেষ পর্যায়ের অংশ বলে মনে হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে 'অযোধ্যাভরত' কোনও এক নাটকের অঙ্ক, কোনও নাটকের নাম নয়।

২) কেকেয়ী ভরত :—'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' 'কেকেয়ী ভরতের' দুবার উল্লেখ পাওয়া সায়। কিন্তু দুটি বিবরণই এত সংক্ষিপ্ত যে তা থেকে নাটকের বিষয়বস্তুর কোনও নির্দিষ্ট পরিচয় মেলে না।

(ক) সারূপ্যের উদাহরণ :—

যথা কেকেয়ী-ভরতে—

উৎসর্পতি স্থিরতড়িজ্জলদঃ কিমেষঃ।

(খ) 'অর্থ বিশেষণে'র উদাহরণ—

যথা কেকেয়ী ভরতে হনুমান—

"কেকয়ী জননী ন যস্য স কথং বিঘ্নং

সমাধাস্যতি ইতি।"

৩) দশরথাঙ্ক :—নামকরণ দেখে এটি একটি অঙ্ক বোঝা যায় এবং অঙ্কের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তাছাড়া এটি যে কোনও নাটকের প্রারম্ভিক অংশবিশেষ তাও বোঝা যায়। এই অঙ্কের উল্লেখ 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' পাওয়া যায়।

(ক) প্রথম পতাকাস্থানকের উদাহরণ :—

যথা দশরথাঙ্কে দশরথঃ রামস্য রাজ্যে চিন্ত্যমানে

ভরতস্য রাজ্যং তল্লিঙ্গ জাতমিতি বিষাদেনাগন্তকভাবেন গৃহীতঃ

পঠতি—'রামোঽপিগচ্ছতুবনম্' ইত্যাদি

(খ) একটি হঠকারী বাক্যের উদাহরণ যা একটি কল্পনাতীত বিপদের সংকেত দেয়—"যথা দশরথাঙ্কে কঞ্চুকী—

সামান্যেন বরং (রো) দত্তং (ত্তঃ) কিং বিশেষে মাতঃ স্থিতা।

সর্বথা নৃপতেরেব ঘোরঃ শাপো বিজৃম্ভতে॥"

সুতরাং 'দশরথাঙ্ক' একটি অঙ্ক যেখানে কৈকেয়ী বর প্রার্থনা করেন এবং যার ফলস্বরূপ রামের বনগমন হয়।

৪) প্রাবৃডঙ্ক :—নামকরণ অনুসারে অঙ্কের বিষয়বস্তু এইরূপ—বর্ষাকালে রাম মাল্যবান পর্বতে সুগ্রীবের জন্য অপেক্ষা করেছেন এবং চিন্তা করছেন কিভাবে সুগ্রীবকে সাহায্য করা যায়। 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' তিনস্থানে এই অঙ্কের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় :—

(ক) 'প্রাবৃডঙ্কে কঙ্কাল কেন বালি মরণং চ'

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় অঙ্কের কঙ্কাল বা অপ্রসিদ্ধ চরিত্র দ্বারা আমরা বালীবধের কথা জানতে পারি। এবং মূল অঙ্কে বর্ষাকালে রামের নিঃসহায় অবস্থায় মাল্যবান পর্বতে অবস্থানের কথা জানতে পারি।

(খ) দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রামের মুখে গীতিকবিতার ছন্দে বর্ণনা পাই—

"প্রযত্নঃ। যথা প্রবৃডঙ্কে—
অয়ে অন্বিষ্টেয়ং (অনন্বিষ্টেয়ং ?) ময়া বনরাজী—
যাবদেনাং বিচিনোমি। (পরিক্রম্যাবলোক্য) কথামত্রাপি নাস্তি।
কষ্টং ভোঃ কষ্টম—
সর্বত্রাম্বুমুচো ধ্বনিন্তি কুটজামোদোঽপি সর্বত্রগঃ
সর্বত্রৈবচতাণ্ডবব্যসনিনাং কেকাঃ কলাবর্হিণাম।
আর্যাপ্রাপ্তিনিরাশমেব কলিতং চার্যস্য মে মানসং
যেনাস্মিংস্তদবস্থিতেঃ সমুচিতোনোদ্দেশ এব ক্ষতঃ ইতি॥"

(গ) শোকাহত রামের অবস্থা তৃতীয় উদ্ধৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। রাম লক্ষ্মণকে বলেছেন :—

শূন্যত্বম! যথা প্রাবৃডঙ্কে—
বৎস ইয়তীং বেলাং ক্বগতোভবানাসীৎ।

৫) বিভীষণ নির্ভর্ৎসনাঙ্ক :—এই নাটকাঙ্কে বিভীষণের সম্মানীয় পক্ষে যোগদানের কথা বিবৃত আছে। সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' আছে—

আশ্রয়ঃ গুণবদগ্রহণম্। যথা বিভীষণ নির্ভর্ৎসনাঙ্কে
বিভীষণঃ রামমেবাশ্রয়িষ্যামী তি।

৬) শক্ত্যঙ্ক :—এই অঙ্কে লঙ্কাযুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তি অস্ত্রে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। সাগর নন্দিন্ চার জায়গায় এই অঙ্কের উল্লেখ করেছেন।

ক) 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' প্রবেশকে দুটি বানরের উল্লেখ পাই।

'প্রবেশকে নীচ এব কর্ত্তব্যঃ। যথা শক্ত্যঙ্কে বানর দ্বয়ম্'

খ) দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে নাটকের অঙ্কের নামের সার্থকতা বর্ণিত আছে :—

"বস্তু নির্দেশাৎ মৃচ্ছকটিকা নাম প্রকরণম্। অঙ্কেঽপি সুগ্রীবাঙ্কঃ। শক্তির্নামাঙ্কঃ।"

গ) তৃতীয় উদ্ধৃতিতে অঙ্কের বিষয়বস্তু অর্থাৎ লক্ষ্মণের শক্তিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কথা বিবৃত আছে।

'রুজঃ প্রহারাদি প্রভবা বেদনাঃ। যথা শক্ত্যঙ্কে লক্ষ্মণঃ।'

ঘ) চতুর্থ বিবৃতিতে শোকাহত রামের লক্ষ্মণের প্রতি আবেগপূর্ণ উক্তি বিবৃত করা হয়েছে :—

"আক্রন্দঃ শোকসমুথ(ম্) মুৎত্ কধৈর্যম···যথা
বৎস (স)। তিষ্ঠইতি শক্তৌ রামঃ।"

এই পরিস্থিতিতে রামের দুঃখ বর্ণনায় আরও দুটি উক্তি 'রসরত্নপ্রদীপে' পাওয়া যায়।—

ক) শক্ত্যঙ্কে শক্তি ভিন্নং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রামঃ—

গতপ্রায়া রাত্রিঃ হিমবতি গিরৌ দ্রোণ শিখরং
গতা বৎসস্ত্বেতে গলকনলকে কিঞ্চিদসবঃ।
হনূমানপ্যার্যঃ ক্ষিতিনিহিতগাত্রঃ কিমপরং
বিধির্ধামারম্ভঃ তদপি চ মনোবাঞ্ছতি সুখম্॥

খ) পুনরঞ্জলিংবদ্ধা রামঃ—

মাতর্যামিনি সন্নিধেহি করুণং দীর্ঘীর্ভবাভ্যর্যয়ে
ভ্রাতঃ সন্তমস স্থিরীভব চিরং জ্যোতীংষিখ নন্দত
মা যাসীরুদয়ং দয়াং কুরু রবে ভ্রাতা ত্বমস্মৎকুলে
বৎসো জীবতু লক্ষ্মণোঽরুণ মনাঙ্ মন্দং নয়স্যন্দনম্॥

৭) সম্পাত্যিঙ্ক :—এই অঙ্কের বিষয়বস্তু হল সীতার খোঁজে নিয়োজিত জাম্ববান, অঙ্গদ এবং হনুমান জটায়ুর ভাই সম্পাতির নিকট থেকে সীতার খোঁজ পায়। মূল নাটকের এই অঙ্কে নাট্যকার নাট্যপরিকল্পনায় কয়েকটি অভিনবত্ব উপস্থাপন করেছেন। যেমন বানর অনুচরেরা রাক্ষসীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। মায়াবতী নামে এক প্রতারক রাক্ষসী তার বুদ্ধি দিয়ে অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতিকে প্রতারণা করার চেষ্টা করছে। 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষে' চার স্থানে এই অঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক) প্রার্থনা। যথা সম্পাত্যঙ্কে—

মায়াবতী-ধূর্ত! কুতোমাং প্রতারয়সি অন্বনুদিবসম্অনুরাত্রম্।

খ) কপটস্যান্যথাকরণ মধিবলম্। যথা সম্পাত্যঙ্কে—
হনূমান—রাবণ প্রযুক্তযানয়া ভবিতব্যম্।
অঙ্গদঃ— ন তাবদস্যাঃ কপটাতি সন্ধানে দূরমধিমগ্রাঃ স্মঃ।

(গ) তৃতীয় উদ্ধৃতিতে অঙ্গদ মনে মনে চিন্তা করছে সীতার খোঁজে অসমর্থ হয়ে সে কেমন করে রাম ও সুগ্রীবের সম্মুখীন হবে।

"নৃপতিজনিত ভয়মুদ্বেগঃ। সম্পাত্যঙ্কেঅঙ্গদেঃ সোদ্বেগম্—
কিং দৃষ্ট্বা যুবরাজইত্যভিহিতঃ পাপেহিমিক্ষাকুণা
কিং সঞ্চিন্ত্য ময়াপি বানরপতেরাজ্ঞেয় মালম্বিতা।
ভ্রান্ত্বা শৈলপরম্পরাস্বপি ময়া দৃষ্টা ন সা মৈথিলী
কিং বক্ষ্যামি বন্নানিবৃত্য জড়ধীরাজ্ঞাস্থিতে রাঘবে॥"

(ঘ) শেষ উদ্ধৃতিতে দেখতে পাই মাল্যবান রাবণকে উপদেশ দিচ্ছে তার সমস্ত দুর্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু এই অঙ্কের কাহিনীর কোনও সামঞ্জস্য আমরা দেখতে পাই না।

যথা সম্মাত্যঙ্কে মাল্যবান—
জাতো মুনে র্বিশ্রবসঃ সমস্ত
বিদ্যাস্বধীতী পরমো বিবিক্তঃ।
নিপাত্যসে বৎস কিমোভিরুগ্রৈঃ
তটদ্রুমঃ সিন্ধুজলৈরিবাদৈঃ॥

মনে হয়, নাট্যকার অঙ্কের কাহিনী ও উদ্ধৃতির কাহিনীর এইভাবে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছেন। সীতার খোঁজে বানর অনুচরেরা সমুদ্রতীরে এলে রাবণ মায়া-সীতাকে তাদের সামনে বধ করার পরিকল্পনা করে, যাতে বানর অনুচরেরা রামের কাছে গিয়ে সীতা-বধের কথা বলে। মাল্যবান রাবণকে এই কার্য করতে নিষেধ করছে এবং বলছে যে এই কাজ তার উপযুক্ত নয়।

বৌদ্ধ রামকথা

প্রাচীনকালে বৌদ্ধরামকথা জাতক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। জাতক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে বুদ্ধ অসংখ্যবার পূর্বজন্মে মনুষ্য অথবা পশুরূপ গ্রহণ করেছিলেন, এই পূর্বজন্মকাহিনীগুলির আকর্ষণে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত কথায় এবং লোকপ্রিয় আখ্যানে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন বৌদ্ধরামকথাশ্রয়ী অনেকগুলি জাতক পাওয়া যায়। যেমন :—

১। দশরথ জাতক[১]

এই জাতকের কাহিনীটি এরূপ— বারাণসীর রাজা দশরথের প্রধানা মহিষীর গর্ভে রামপণ্ডিত, লক্ষ্মণকুমার ও সীতাদেবীর জন্ম হয়েছিল। এই মহিষীর মৃত্যু হলে রাজা অন্য একজন মহিষীকে প্রধানা মহিষী করেন। তাঁর গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। রাজা দশরথ একবার এই মহিষীকে বর দিতে চেয়েছিলেন ; এর জোরে ভরতের বয়স যখন ৭ বছর, তখন রানী তাঁর পুত্রকে রাজা করতে হবে বলে রাজার কাছে দাবি করেন। কিন্তু রাজা তা দিতে অস্বীকার করেন। রানী বারবার তাঁর পুত্রকে রাজ্য দিতে অনুরোধ করলে রাজা রানীর ষড়যন্ত্রের ভয়ে দুই পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, "তোমরা এখানে থাকলে অনর্থের সম্ভাবনা। তোমরা অন্য রাজ্যের বনে গিয়ে বাস করো। আমার মৃত্যুর পর এই রাজ্যে ফিরে এসে রাজ্য অধিকার করবে।" রাজা তখন জ্যোতিষীকে ডেকে তিনি কতদিন বাঁচবেন জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতিষী বললেন যে রাজা বারো বৎসর বাঁচবেন। তখন রাজা রাম-লক্ষ্মণকে বলেন, ১২ বৎসর পর এসে রাজ্য অধিকার করবে।" দুই ভাই, বোন সীতার সঙ্গে পিতার কাছে বিদায় নিয়ে হিমালয়ের অরণ্যে চলে যান। এই ঘটনার নয় বৎসর পর রাজা দশরথের মৃত্যু হয়। তখন ভরত চতুরঙ্গ সেনা নিয়ে রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে যান। আশ্রমের কিছু দূরে সৈন্যসামন্তদের ছেড়ে দিয়ে কিছু অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে ভরত রামের কাছে যান। সেই সময় রাম একলা ছিলেন। ভরত রামকে পিতার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে কাঁদতে থাকেন। কিন্তু ভরত আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, রাম শোক প্রকাশ করলেন না। ("রাম পণ্ডিত পন ন স্নোচতিন পরিদেবতি", পৃ. ১২৬)। সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মণ ও সীতা ফিরে এলেন। পিতার মৃত্যু-

১ জাতক-সংখ্যা ৪৬১। পালি টেক্সট সোসাইটির পক্ষে লুজোক অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত, লণ্ডন, ১৯৬৩।

সংবাদ শুনে দুজনেই কাঁদতে লাগলেন। রাম পণ্ডিত তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। রাম বললেন, "যেমন পাকা ফল নীচে পড়া স্বাভাবিক তেমনি মানুষের মৃত্যুও স্বাভাবিক, অতএব মরণকে ভয় করা উচিত নয়।"

"ফলানাং ইব পক্কানাং নিচ্চং পপতান ভয়—
এবং জাতন মচ্চানং নিচ্চং মরণ তো ভয়ং।" —পৃ. ১২৭

রামের এই উপদেশ শুনে সবাই শোক ভুলে গেলেন। তারপর ভরত রামকে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করলেন। রাম ফিরে যেতে অস্বীকার করে বললেন, "পিতা আমাকে ১২ বৎসর বনে বাস করতে আদেশ করেছেন। তিন বৎসর পরে আমি ফিরব।" ভরত তখন শাসনাধিকার অস্বীকার করলে রাম তাঁর তৃণ-নির্মিত পাদুকা দিয়ে ভরতকে বললেন, "আমি না ফেরা পর্যন্ত এই পাদুকাই রাজ্য শাসন করবে।" পাদুকা নিয়ে ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গসহ বারাণসীতে ফিরে এলেন। অমাত্যরা ঐ পাদুকাকে সামনে রেখে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তিন বৎসর পর রাম বারাণসীতে ফিরে পৈতৃক সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং সীতাকে বিবাহ করে তাঁর মহিষী করেন। রাম ষোলো হাজার বৎসর (দস বস্‌স সহস্‌সানি সট্‌ঠি বস্‌স সতানি চ) রাজত্ব করেছিলেন। (পৃ. ১৩০)

২। অনামক জাতক।

তৃতীয় শতাব্দীতে 'অনামক জাতক' চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এর ইংরাজী অনুবাদ সরস্বতী বিহার গ্রন্থমালা-৮, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। জাতকটির মূল ভারতীয় পাঠ অপ্রাপ্য। এই জাতকে কোনও পাত্রপাত্রীর নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু, রামসীতার বনবাস, সীতাহরণ, জটায়ু বৃত্তান্ত, বালী-সুগ্রীব যুদ্ধ, সেতুবন্ধ, সীতার সতীত্ব পরীক্ষা—এই সব ঘটনার সংকেত পাওয়া যায়। এই রামকথার একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে রাম বিমাতার কারণে পিতার আদেশে বনে যান নি, নিজের মামা রাজ্য আক্রমণ করবে শুনে স্বেচ্ছায় রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বালীবধের বৃত্তান্তও এখানে বদলে গেছে। রামের ধনু সন্ধান দেখে বালী ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়েছিল; বালীবধের ঘটনা এখানে নেই।

অনামক জাতকের কাহিনী এইরকম—

এক সময় বোধিসত্ত্ব এক মহান রাজা ছিলেন। তাঁর চারটি মহৎ গুণ ছিল, যথা, দান, প্রিয়বচন, ন্যায় ও সমদর্শিতা। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি এগুলি প্রদর্শন করতেন। বোধিসত্ত্বের মামাও অন্য এক দেশের রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি

লোভী, নির্লজ্জ, নির্দয় ও দুষ্ট ছিলেন। বোধিসত্ত্বের রাজ্য কেড়ে নেওয়ার জন্য তিনি এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন এবং বোধিসত্ত্বও রাজ্যরক্ষার জন্য সৈন্য-সমাবেশ করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন চিন্তা করলেন যে, তিনি কেবল নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য বহু জীবন নাশ করতে চলেছেন; যদি তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যান তবে সব-কিছু রক্ষা পাবে। এই চিন্তা করে তিনি মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে রানীকে সঙ্গে নিয়ে বনে চলে গেলেন। তাঁর মামা বিনা বাধায় রাজ্যে প্রবেশ করে রাজ্য দখল করলেন। কিন্তু তাঁর শাসনে জনসাধারণ অশেষ কষ্টে পড়ল। এদিকে বোধিসত্ত্ব স্ত্রীসহ পাহাড়ী বনে বাস করছেন। সমুদ্রে এক দুষ্ট নাগ বাস করত। একদিন সে ঋষির ছদ্মবেশে তাঁদের কাছে আসে। সেই সময় রাজা বনে ফল আনতে গিয়েছিলেন। এই অবসরে নাগ রানীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পাহাড়ে এক বিরাট পাখি নাগের পথ আটকায়। কিন্তু নাগের সঙ্গে যুদ্ধে পক্ষীর দক্ষিণ পক্ষ ভেঙে যায় এবং সে আহত হয়ে পড়ে যায়। এরপর নাগ সমুদ্রের মধ্যস্থিত দ্বীপে রানীকে নিয়ে চলে যায়। এদিকে রাজা ফল নিয়ে ফিরে রানীকে না-দেখতে পেয়ে অত্যন্ত শোকাভিভূত হন এবং ধনুর্বাণ নিয়ে রানীর খোঁজে বার হন। এক নদীর ধারে গিয়ে রাজা এক উদাসী ও শীর্ণকায় বানর দেখতে পান। জিজ্ঞাসা করতে বানর বলে, 'আমি রাজা ছিলাম। আমার কাকা আমার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। আমার এখন সঙ্গীসাথী কেউ নেই।' রাজা তাঁর নিজের কথা তার কাছে বললেন। তাঁরা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। তারপর সেই বানর তার কাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বোধিসত্ত্বের ধনু সন্ধান দেখে ভয় পেয়ে সেই বানরের কাকা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেই বানর রাজা হয় এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের রানীকে খোঁজার জন্য আদেশ দেয়। বানরেরা রানীর খোঁজ করতে বেরিয়ে পথে এক আহত পক্ষীকে দেখে। পক্ষী তাদের বলে যে এক নাগ রানীকে নিয়ে তার সমুদ্ররাজ্যে চলে গেছে। বানররাজ তার সৈন্যদের সমুদ্র পার করতে অসমর্থ হল। তখন ইন্দ্রদেব ছোট বানরের রূপ ধারণ করে বললেন, 'প্রত্যেকে পর্বতের এক-একটি টুকরো নিয়ে এসো। এর ফলে সমুদ্রে এক রাস্তা হবে এবং দ্বীপে পৌঁছানো যাবে।' বানরেরা তাই করে সমুদ্র পার হয়ে গেল এবং সেই নাগ দ্বীপকে ঘিরে ফেলল। নাগ এক বিষের ঘন কুয়াশা সৃষ্টি করল যাতে সব বানরেরা মূর্ছা গেল। তখন ইন্দ্র বা ছোট বানর ওষধি এনে সবার নাকে লাগিয়ে দিল, যার ফলে সবাই সুস্থ হয়ে জেগে উঠল। তারপর নাগ আঁধি ও বাদল দ্বারা সূর্যকে ঢেকে দিল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। তখন ছোট বানর বললে, ঐগুলি বিদ্যুৎরূপী নাগ।

রাজা তখন বাণ দিয়ে নাগগুলিকে মেরে ফেললেন। তারপর ছোট বানর রানীকে মুক্ত করে নিয়ে এল। রাজা আপন মামার মৃত্যুসংবাদ শুনে দেশে ফিরে গেলেন। দেশে ফিরে রাজা রানীকে বললেন, পতি ছাড়া হয়ে অন্যত্র বাস করার জন্য জনসাধারণ তোমার সতীত্বে সন্দেহ করছে। তোমার সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়া উচিত। রানী তার উত্তরে বললেন, 'আমি এক গুহায় থাকতাম, সেখানে আমি নির্মল পদ্ম ফুলের মতো ছিলাম। যদি আমি সতী হই তবে পৃথিবী দ্বিধা হোক।' ধরণী দ্বিধা হল। রানী বলিলেন, 'আমার সতীত্ব প্রমাণিত হল।'

৩। দশরথ কথা—

চীনা তিপিটক (ত্রিপিটক)-এর অন্তর্গত 'ৎসা-পৌ-ৎসং-কিং (Tsa-Pow-Tsang King) নামে ১২১টি অবদান বা কাহিনীর একটি সংগ্রহ আছে। ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে এটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। এর অপ্রাপ্য মূল ভারতীয় গ্রন্থ সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হয়, কারণ কাহিনীতে রাজা কণিষ্ক অনেকগুলি অবদানের মুখ্য পাত্র। এখানে এক দশরথের কথা পাওয়া যায়, যার বিশেষত্ব এই যে এখানে সীতার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর কথাবস্তু এইরূপ :—

প্রাচীনকালে যখন মানুষের দশ হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল তখন জম্বুদ্বীপে দশরথ নামে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর প্রধানা মহিষীর রামনামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজার দ্বিতীয় পত্নীর এক পুত্র ছিল যার নাম রামন বা লক্ষ্মণ। রাজার তৃতীয় পত্নীর গর্ভে ভরত এবং চতুর্থ পত্নীর গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে। রাজা তৃতীয় পত্নীকে খুব ভালোবাসতেন ; একদিন রাজা তাকে বলেন, 'তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি সব-কিছু দিতে পারি !' রানী বলেন, 'আমার এখন কোনও কিছুই প্রয়োজন নেই।' তারপর রাজা অসুস্থ হলেন এবং রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হতে লাগল। রাম রাজা হবেন দেখে তৃতীয় রানী ঈর্ষান্বিতা হয়ে রাজাকে বললেন, 'আপনি আমাকে যে বর দেবেন বলেছিলেন, তা আমি এখন চাচ্ছি। রামকে রাজ্যচ্যুত করে আমার পুত্রকে সিংহাসনে বসানো হোক—এই আমার ইচ্ছা।' শুনে রাজা দুঃখিত হলেন, কিন্তু রাজধর্ম অনুসারে নিজের কথা লঙ্ঘন করতে পারলেন না। এই সময় লক্ষ্মণ রামকে শক্তি ও সাহস দেখাতে বললেন। কিন্তু রাম বললেন, 'কোন পুত্র পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পিতৃভক্ত হতে পারে না।' রাজা তখন দুই পুত্রকে বনবাসে দিলেন এবং বারো বৎসর পরে ফিরে আসতে বললেন। ভরত এই সময় বিদেশে ছিলেন। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রাজ্যে ফিরে এলেন এবং সব কথা শুনে মাতাকে অনেক নিন্দাবাদ করলেন। তারপর

ভরত সৈন্যসহ রাম যেখানে বাস করছিলেন সেখানে গেলেন এবং রামকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি রাজ্যে ফিরে চলুন এবং রাজ্যভার গ্রহণ করুন।' কিন্তু রাম বললেন, 'আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে রাজ্যে ফিরে যাব না।' তখন ভরত রামের চর্মপাদুকা নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং ঐ পাদুকাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। ভরত প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পাদুকাকে পূজা করে তার কাছে আজ্ঞা নিতেন। ধীরে ধীরে বনবাসের কাল শেষ হল। রাম দেশে ফিরে এলেন। ভরত রামকে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। প্রথমে রাম তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে ভরত-এর অনুনয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। সমস্ত প্রজারা আপন আপন ধর্ম পালন করতে লাগলেন এবং সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতে লাগল।

৪। সাম জাতক[১]

সামজাতকে একটি কাহিনী আছে। এক অন্ধ দম্পতির একমাত্র পুত্র সাম যখন মিগসম্মতি নদীতে কলসী জলপূর্ণ করে সেই সময় বারাণসী রাজ পিলিয়ক্ষ বন্যপ্রাণী জলপান করছে মনে করে তার প্রতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেন। এই কাহিনীর সঙ্গে রামায়ণের অন্ধমুনির পুত্র বধের কাহিনীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সাম অন্ধ দম্পতির একমাত্র পুত্র ছিল! রামায়ণ-কাহিনীতেও অন্ধমুনির একমাত্র পুত্রের কথা বলা হয়েছে। দুই কাহিনীতেই তীরবিদ্ধ বালক অব্রাহ্মণ ছিল। সেই হতভাগ্য বালক দুই কাহিনীতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল রাজার ভুলের মাশুল গুণে। বারাণসীর রাজা অন্ধ দম্পতির নিকট তাদের পুত্রহত্যার কথা বলেছিলেন, অনুরূপভাবে অযোধ্যার রাজাও অন্ধমুনির নিকট পুত্রহত্যার কথা বলেছিলেন। দুই কাহিনীতেই দুঃখ ও অনুশোচনার কথা একই ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সামের পিতা এইভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন—

বন থেকে ফল মূল আহরণ করি
করাবে ভোজন কেবা অন্ধ দুইজনে
সাম যে অন্ধের যষ্টি ছিল আমাদের
মরিল সে, এবে রক্ষা কে করিবে আর।

"কো দানি ভুঞ্জয়িস্সতি বনমূলফলানি চ।
সামো অয়ং কালকতো অন্ধানং পরিচারক॥"

—'ইতি', ৩৭৫, পৃ. ৯১

১. জাতক-সংখ্যা ৫৪০।

বাল্মীকি-রামায়ণে অন্ধমুনির দুঃখ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"কন্দমূল ফলং হৃত্বা কো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্।
ভোজয়িষ্যত্য কর্মণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্ ॥"

—অযোধ্যাকাণ্ড ৬৪ সর্গ, শ্লোক ৩৮

৫। (বিশ্বন্তর) জাতক[১]

এই জাতকে একটি কাহিনীর বর্ণনা পাই যেটির সঙ্গে রামায়ণের একটি কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। রামায়ণে আছে রাম বনগমনে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে অসম্মত হলে সীতা সজল নয়নে রামকে অনুনয় করেন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে তা না হলে সীতা বলেন যে তিনি অগ্নি প্রজ্জলিত করে প্রাণত্যাগ করবেন। "বিশ্বন্তর জাতকেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই যখন মাড্ডি বা মাদ্রি তাঁর স্বামী বেসন্তরাকে বলেন যে তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে না গেলে তিনি অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করবেন।" মাড্ডি বলছেন—

অগ্‌গিং নিজ্জালয়িত্বান একজালসমাহিতম্।
তত্থ মে মরণং সেয্যো যং চে জীবে তয়া বিনা ॥ (১৭৫৭), পৃ. ৪৯৫

বাল্মীকি-রামায়ণে একইভাবে সীতা বলছেন—

যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং নচেচ্ছসি
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণম্ ॥

—অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ৩০, শ্লোক ২১

রামের বনগমনে মাতা কৌশল্যার দুঃখ এবং বেসন্তরার বনগমনে মাতা ফুসতির দুঃখ একইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৬। শম্বুলা জাতক[২]

এই জাতকে আছে জনৈক দানব কাশীর রাজকুমার স্বতিসেনের পত্নী শম্বুলাকে প্রেম নিবেদন করে বিফল হয়ে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলার কথা বলে।

নো চে তুবং মহেসেয্যং সম্বুলে কারয়িস্‌সসি।
অলং ত্বং পাতরাসায় মঞ্ঞে ভক্‌খা ভবিস্‌সসি ॥ (২৭৯), পৃ. ৯১

এই কাহিনী অশোকবনে প্রেমপ্রত্যাখ্যাত রাবণের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাবণও সীতাকে কেটে খেয়ে ফেলার কথা বলেছিল।

১. জাতক-সংখ্যা ৫৪৭। ২. তদেব, ৫১৯।

৭। জগদ্দিস জাতক[১]

এই জাতকে রামের দণ্ডকারণ্যে যাওয়ার কথা উল্লিখিত আছে। রাক্ষস ভোজনের জন্য জগদ্দিস কুমারকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তার মাতা তার মঙ্গল কামনা করে বলেছে, 'দণ্ডকারণ্য যাওয়ার সময়ে রাম-মাতা যেমন তার পুত্রের মঙ্গল কামনা করেছিল আমিও সেইরকম তোমার মঙ্গল কামনা করছি।'

'যং দণ্ডকারঞ্ঞগতস্স মাতা।
রামস্স'কা সোত্থানং যুগত্তা
তং তে অহং সোত্থানং করোমি
এতেন সচ্চেন সরন্তু দেবা—
অনুঞ্ঞাতো সোথি পচ্চেহি পুত্ত॥' (৮০)

৮। দেব-ধম্মজাতক[২]

'দেব-ধম্মজাতকে' রামকথার দুটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক, রামের বনবাস, দুই, সেতুবন্ধের সময় সাগরের উপর রামের ক্রোধ।

রাজা ব্রহ্মদত্তের সূর্যকুমার নামে এক পুত্র হলে, রাজা রানীকে এক বর দিতে চাইলেন। রানী 'পরে ইচ্ছা হলে নেবো' এই কথা বলে সেই বর রাজার কাছেই গচ্ছিত রাখলেন। কুমারের বয়োবৃদ্ধি হলে রানী তার জন্য রাজার কাছে সিংহাসন চাইলেন। প্রথম রানীর মহিংসাসকুমার ও চন্দ্রকুমার নামে দুই পুত্র ছিল। রাজা "তাঁর এই দুই পুত্রকে ডেকে তাঁদের অনিষ্ট আশঙ্কা নিবারণের জন্য বনে যেতে বললেন এবং আরও বলে দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তারা এসে যেন কুলসন্তক নগরে রাজ্য ভোগ করে।" সূর্যকুমার এই কথা শুনে দুই ভ্রাতার সঙ্গে বনে চললেন।

'তুম্হাকং পাপকম্ পি চিন্তেয্য তুম্হে অরাঞ্ঞং
পবিসিত্বা মম অচ্চয়েন কুলসন্তকে নগরে রজ্জম্ কেরেয্যাথা।' পৃ. ১২৮

বোধিসত্ত্ব আপন ভ্রাতাদের সরোবর থেকে জল আনতে বললেন। সরোবরের অধিবাসী এক ব্রহ্মরাক্ষস দুই ভাইকে ধরে রাখে। 'ভায়েদের উদ্ধারের জন্য বোধিসত্ত্ব ক্রোধে বাণ সন্ধান করতে থাকেন। তখন ব্রহ্মরাক্ষস মনুষ্যবেশে এসে দেবধর্ম বর্ণনা করে এবং দুইভাইকে মুক্তি দেয়।'

বিভিন্ন জাতক কাহিনী আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে জাতক-কাহিনীগুলি রামকাহিনী বর্ণনার জন্য রচিত হয়নি। একটি বিশেষ

১. জাতক-সংখ্যা ৫১৩। ২. তদেব, ৬।

উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি রচিত। সেই উদ্দেশ্যটি হল বোধিসত্ত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ করা। জাতক কাহিনীগুলিতে দু-একটি রামায়ণী ঘটনা ছাড়া কোনও কাহিনীতেই পূর্ণাঙ্গ রামায়ণকথা পাই না। এবং সেইসব কাহিনীতে বোধিসত্ত্বের মাহাত্ম্যই প্রকাশিত হয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে রামায়ণ-কাহিনী বর্ণনায় জাতক কাহিনী-গুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কিছুমাত্র নেই। কিন্তু তথাপি জাতকগুলির মধ্যে 'দশরথ জাতকে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কারণ এই জাতকের কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য যত না উল্লেখযোগ্য এই জাতকটি নিয়ে পরবর্তী পণ্ডিতগণের আলোচনা তার চেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বেঙ্গলি রামায়ণে' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত, ১৯২০) এবং হেবের তাঁর 'হিস্টরি অফ ইনডিয়ান লিটারেচার' গ্রন্থে 'দশরথ জাতক'কে বাল্মীকি-রামায়ণের আদি উৎস বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই মতবাদ দেশে এবং বিদেশে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে খণ্ডিত হয়েছে। হ্বিন্তরনিস তাঁর 'হিস্টরি অফ ইনডিয়ান লিটারেচার' (ভাগ-১, পৃ ৫০৮) গ্রন্থে এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন জাতকের গাথাগুলি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত কিন্তু গল্পগুলি প্রধানতঃ সিংহলদেশীয় ভিক্ষুগণ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাল্মীকি-রামায়ণ রচনার পরে লিখেছেন। সুতরাং ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। ড. সুকুমার সেন তাঁর 'রাম-কথার প্রাক্ ইতিহাস' পুস্তিকায় একই মত প্রকাশ করে বলেছেন যে তৃতীয় শতাব্দীতে জাতকের গাথাগুলি রচিত হলেও সেগুলি কাহিনী আকারে রচিত হয় পঞ্চম শতাব্দীর পর। কাজেই এঁদের মতানুসারে 'দশরথ জাতক'কে বাল্মীকি-রামায়ণের উৎস বলা যায় না। আধুনিক যুগে ড. দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর প্রবন্ধ "রামায়ণ প্রসঙ্গে" এবং ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধ "বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণ"-এ উল্লেখ করেছেন যে 'দশরথ জাতক' বাল্মীকি-রামায়ণের পরে রচিত; কখনও বাল্মীকি-রামায়ণের আদি উৎস নয়। (দুটি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয় 'জীবানন্দ' পত্রিকায়, সংখ্যা ২৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৩) ড সরকার এবং ড. ভট্টাচার্য কিন্তু তাঁদের প্রবন্ধে 'দশরথ জাতক'কে কেন বাল্মীকি-রামায়ণের আদি উৎস বলা যাবে না তার নূতন কোনও কারণ উপস্থাপিত করেন নি। ড. সরকার কেবল হ্বিন্তরনিসের যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন, যার উল্লেখ আগেই করেছি। ড. ভট্টাচার্য মাকডোনেলের দুটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন। ম্যাকডোনেলের যুক্তি-দুটি আলোচনা করা যেতে পারে। ম্যাকডোনেল তাঁর 'হিসট্রি অফ স্যাংস্কৃট লিটারেচর' (লণ্ডন, ১৯২৫, পৃ. ৩০০) গ্রন্থে বলেছেন "জাতকে এবং রামায়ণ-কাহিনীতে যে রূপকথার মিলনাত্মক উপসংহার করা

হয়েছে তা উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন এবং এগুলি যে পূর্ব থেকেই প্রবাহিত তা বুঝতে পারা যায়। যদি তাই হয় তবে বাল্মীকি-রামায়ণই যে 'দশরথ জাতকে'র কাহিনীর ভিত্তি তা বলতে হয়।" প্রশ্ন হল: এই যুক্তি দিয়ে বাল্মীকি-রামায়ণই যে দশরথ জাতকের মূল ভিত্তি একথাটা প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি? কখনোই তা মনে হয় না। কারণ বরং যদি এখানে বলি 'দশরথ জাতক'ই বাল্মীকি রামায়ণের ভিত্তি তাতে কিছুই অসুবিধা হচ্ছে না। ম্যাকডোনেলের দ্বিতীয় যুক্তি হল বাল্মীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ১২৮ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের পালি গদ্য অনুবাদের উপর ভিত্তি করে দশরথ জাতকের শেষদিককার অংশ বিশেষ আনুপূর্বিক রচিত হয়েছে (Vol. VI, পৃ. ১২৮)। কথাটি যুক্তিযুক্ত কিনা আলোচনা করা যেতে পারে। যুক্তিটি মেনে নিয়েও আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি কি যে দশরথ জাতকের ভিত্তি বাল্মীকি-রামায়ণ? যদি বলি রামায়ণের ঐ শ্লোকটি প্রকৃতপক্ষে 'দশরথ জাতক' থেকে নেওয়া হয়েছে, তাহলে তো এটাই প্রমাণিত হয় যে 'দশরথ জাতক'টি বাল্মীকি-রামায়ণের ভিত্তি। তাই মনে হয় এই দুটি হাস্যকর যুক্তি দিয়ে কখনোই প্রমাণিত হয় না যে বাল্মীকি-রামায়ণ 'দশরথ জাতকে'র ভিত্তি।

ড. দীনেশচন্দ্র সরকার এবং ড আশুতোষ ভট্টাচার্য দুজনেই তাঁদের প্রবন্ধে আরও একটি কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে 'দশরথ জাতক' বাল্মীকি-রামায়ণ কাহিনীর একটি ইচ্ছাকৃত বিকৃত বৌদ্ধরূপ। কিন্তু 'দশরথ জাতক' রামায়ণের একটি পরবর্তীকালের বিকৃতরূপ কেন? সীতা রামচন্দ্রের ভগ্নী হয়েও পত্নী হলেন এই কারণে কি? কিন্তু ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহের কথা ঋক্-বেদের দশমমণ্ডলে উল্লিখিত যম-যমীর আখ্যানে লিপিবদ্ধ আছে। ক্লিওপেট্রা তাঁর ভাই টলেমিকে বিবাহ করেছিলেন। মালয়ের 'হিকায়ৎসেরীরাম', হিকায়ৎ মহারাজ রাবণ' এবং জাভার 'রাম কেলিঙ্গ'তে সীতাকে দশরথ-কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে যাঁর সঙ্গে দশরথ-পুত্র রামের বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ড. ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হলেও 'দশরথ জাতকে'র প্রভাব রাম-কাহিনীর উপর বিন্দুমাত্র পড়েনি। আরও একটি কথা, বাল্মীকি-পরবর্তী যুগে ভারতে যে রামায়ণমালা রচিত হয়েছে, যেগুলির সংখ্যা ছয় হাজারের কম নয়, সেগুলিতে দেখা যায় যে বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেগুলিকে কি রামায়ণের বিকৃত রূপ বলব? সে ঘটনাগুলি অধিকাংশই ভক্তিবাদী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই সেগুলিকে রামায়ণের বিকৃতরূপ বলতে পারি কি? তাই মনে হয় ড. সরকার এবং ড. ভট্টাচার্য যুক্তিসংগতভাবে তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

পরিশেষে আমরা 'দশরথ জাতক'কে বাল্মীকি-রামায়ণের ভিত্তি বলে অভিহিত করতে পারি কিনা সে কথাই অলোচনা করব। কিন্তু এ আলোচনার আগে পণ্ডিত-প্রবর দীনেশচন্দ্র সেন এবং হ্বেবর কেন 'দশরথ জাতক'কে বাল্মীকি-রামায়ণের ভিত্তি বলেছিলেন, সে কথাটি আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরা কেউই কোনও যুক্তিরই উল্লেখ করেন নি। কেবল ড. সেন তাঁর গ্রন্থে ('বেঙ্গলি রামায়ণ') বলছেন 'দশরথ জাতক' সম্ভবতঃ রামায়ণের প্রাচীনতম রূপ। কিন্তু 'দশরথ জাতক' রামায়ণের প্রাচীনতর রূপ হতে পারে না। কারণ 'দশরথ জাতক' যদি রচিত হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাচীন তামিল সাহিত্যে তারও আগে রামকথার উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সন্ধান পাওয়া যায় সঙ্ঘম সাহিত্যে। প্রথম শতকে রচিত তৃতীয় সংঘের 'এট্টুত্-তোকৈ'র অন্তর্গত অক-না-নূরু (প্রেমচতুঃশতক) ও পুর-না-নূরু (যুদ্ধচতুঃশতক) গ্রন্থের রামকথার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অক-না-নূরুতে আছে, এক বিরাট বটবৃক্ষের নিচে রামচন্দ্র তাঁর যুদ্ধপরিষদের সভা আহ্বান করেন। পুর-না-নূরু-তে আছে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতা কর্তৃক অলংকার নিক্ষেপ, সুগ্রীব প্রভৃতির অলংকার প্রাপ্তি ও অলংকার পরিধানের পদ্ধতি জানা না থাকায় বিস্ময়বিমূঢ় বানরদের দেহের যত্রতত্র অলংকার পরিধানের চেষ্টা। সঙ্ঘোত্তর সাহিত্য 'চিলপ্পধিকারম' ও 'মণিমখলৈ' প্রভৃতি গ্রন্থে রামকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শতকে রচিত 'চিলপ্পধিকারম্' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে গ্রন্থের নায়ক কোবলন্ সর্বস্বান্ত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে কউন্তি অডিকল তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দুঃখার্ত রামের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন। 'মণি মেখলৈ' গ্রন্থে সেতু-বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ সব বর্ণনার দ্বারা রাম-কাহিনী 'দশরথ জাতকে'র রচনার আগেও যে প্রচলিত ছিল তা বোঝা যায়। তাই 'দশরথ জাতক'কে রামকথার প্রাচীনতর রূপ বলা যায় না।

'দশরথ জাতক'কে বাল্মীকি-রামায়ণের ভিত্তি কিনা এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হলে আমরা হ্বিন্তরনিস্ ও ড. সুকুমার সেনের মতটি উপস্থাপিত করতে চাই। কারণ আমি মনে করি এঁদের মতই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণযোগ্য মত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে এঁদের মতে জাতকটি মিথের বা সংক্ষিপ্ত পুরাকাহিনীর আকারে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল কিন্তু কাহিনী আকারে রচিত হয় পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তাই মনে হয় 'দশরথ জাতক'কে কখনোই বাল্মীকি-রামায়ণের ভিত্তি বলা যাবে না কারণ তৃতীয় শতাব্দীতে 'দশরথ জাতক' কাহিনীর আকারে রচিত হয়নি।

জৈন রামকথা

জৈন্য সাহিত্যে বিস্তৃত রামকথা পাওয়া যায়। জৈনরা রাম, লক্ষ্মণ ও রাবণকে জৈন ধর্মাবলম্বী এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষ বলে অভিহিত করেন। জৈনদের ৬৩ জন মহাপুরুষদের বিভাগ এই রকম—২৪ জন তীর্থংকর (জৈন ধর্মোপদেশক), ১২ জন চক্রবর্তী (ভারতের ছয় খণ্ডের সম্রাট), ৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব এবং ৯জন প্রতিবাসুদেব। এই সব মহাপুরুষদের জীবনী জৈন রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে স্থান পেয়েছে।

প্রত্যেক কল্পে ৬৩ জন মহাপুরুষদের মধ্যে ৯জন বলদেব, ৯জন বাসুদেব এবং ৯জন প্রতিবাসুদেব আছে। জৈন রামায়ণে রাম, লক্ষ্মণ ও রাবণ যথাক্রমে অষ্টম বলদেব, অষ্টম বাসুদেব এবং অষ্টম প্রতিবাসুদেব বলা হয়। বলদেব ও বাসুদেব কোন রাজার ভিন্ন ভিন্ন রানীর পুত্র। বাসুদেব এবং বড় ভাই বলদেবের সঙ্গে প্রতি বাসুদেব-এর যুদ্ধ হয়েছিল এবং শেষে প্রতিবাসুদেব নিহত হয়েছিল। এরপর বাসুদেব দিগ্বিজয় করে ভারতের তিন খণ্ড অধিকার করেন এবং অর্ধ চক্রবর্তী হন। মৃত্যুর পর বাসুদেব প্রতিবাসুদেবকে বধ করার জন্য নরকে যান। বলদেব আপন ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য শোকাকুল হয়ে জৈন ধর্মে দীক্ষা নেন এবং মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

জৈন রামকথার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে বানর ও রাক্ষস বিদ্যাধর বংশের ভিন্ন শাখার বংশধর। প্রাচীন বৌদ্ধ গাথায় (জাতক নং ৫১০ এবং ৪৩৬) এবং মহাভারতের কোন কোন স্থলে বিদ্যাধরের অর্থ ঐন্দ্রজালিক। বিদ্যাধরেরা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিল কারণ 'কথাসরিৎসাগরে', রামায়ণে (১ : ১৭ : ৫) এবং মহাভারতে (১ : ৫১ : ৯) বর্ণিত আছে যে তারা দেবযোণি থেকে উৎপন্ন। বিদ্যাধরদের উৎপত্তি জৈন গ্রন্থে এই রকম : শ্রীঋষভ তপস্যা করার উদ্দেশ্যে আপন পুত্রদের মধ্যে ভরতকে রাজ্য দিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলেম। তারপর নমি ও বিনমি ঋষভের কাছে গিয়ে রাজলক্ষ্মী ভিক্ষা চায়। ঋষভ তাদের বিন্ধ্যপ্রদেশে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করতে বললেন। এই দুই রাজকুমার বিদ্যাধরের পূর্বজ ('পউম চরিঅ,' পর্বত)। জৈন ধর্ম অনুসারে বিদ্যাধর মনুষ্যজাতি। তারা কামরূপত্ব, আকাশ-গামিনী প্রভৃতি অনেক বিদ্যায় সিদ্ধ ছিল। এইজন্য তাদের নাম বিদ্যাধর।

জৈন রামায়ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে উল্লিখিত আছে, রাম শিকার করতেন, রাবণ মাংসাশী ছিল, কুম্ভকর্ণ ছ'মাস নিদ্রা যেত, রাবণ রাক্ষস নামে এবং সুগ্রীব বানর নামে অভিহিত ছিল।

জৈন রামায়ণের দুটি ভিন্নরূপ আছে। একটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের রূপ যার প্রচারক বিমলসূরি এবং অপরটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের রূপ যার প্রবর্তক গুণভদ্র।

এই দুই রামকথায় বিভিন্ন জৈন রামকথার পরিচয় এইভাবে দেওয়া যেতে পারে :—

১। বিমলসূরি-কৃত 'পউমচরিঅ'। (পউমচরিত, এইচ, জেকবী সংস্করণ, ভবনগর, ১৯১৬)

জৈন রামায়ণের প্রাচীনতম কবি বিমলসূরি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে 'পউমচরিঅ' কাব্য রচনা করেন। এই পউম বা পদ্ম হলেন রাম। কাব্যটি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লিপিবদ্ধ। এখানে ১১৮টি সর্গ আছে। কাব্যটি সেনিয় (শ্রেণিক) বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর শিষ্য 'গোয়ম' (গোতম)-এর বিবৃতি। সমস্ত রচনা ছয়ভাগে বিভক্ত, যেমন :—

ক) রাবণচরিত (পর্ব ১-২০)।

রাক্ষসরাজ রত্নশ্রবা এবং কেকসীর চারপুত্র। দশমুখ (রাবণ) ভানুকর্ণ (কুম্ভকর্ণ), চন্দ্রনখা (শূর্পণখা) ও বিভীষণ। রত্নশ্রবা যখন তার জ্যেষ্ঠ শিশুপুত্রকে প্রথমে দেখে, তখন শিশু মালা পরেছিল। এই মালায় শিশুর দশমুখ প্রতিবিম্বিত দেখে রাক্ষসরাজ শিশুর নাম রাখে দশমুখ (৭ : ৯৬)। আপন বৈমাত্রেয় ভাই বৈশ্রমণের ঐশ্বর্য ও সম্মান দেখে দশমুখ অন্যান্য ভায়েদের সঙ্গে তপস্যা করতে যায় এবং অনেক বিদ্যা অধিগত করে। এরপর মন্দোদরীর ও অন্য ছয় হাজার বিদ্যাধর কন্যাদের সঙ্গে রাবণের বিবাহ হয়। তারপর রাবণ বৈশ্রমণ তথা যমকে পরাস্ত করে পুষ্পক হস্তগত করে এবং লঙ্কা অধিকার করে (পর্ব ৮)।

বালী-রাবণ সংঘর্ষ বৃত্তান্ত এই রকম :—রাবণ বালীর কাছে দূত পাঠিয়ে তার ভগিনী শ্রীপ্রভাকে পত্নী রূপে কামনা করে এবং বালীকে তাকে প্রণাম করতে বলে। বালী জিন বরেন্দ্র ছাড়া কাউকে প্রণাম করবে না বলে এবং সুগ্রীবকে রাজ্য দিয়ে জৈন ধর্মে দীক্ষা নেওয়ায় জন্য চলে যায় (পর্ব ৯)। সুগ্রীব রাবণকে প্রণাম করে এবং রাবণের সঙ্গে শ্রীপ্রভার বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর বালীর হাতে রাবণের পরাজয়ের বৃত্তান্তের এক নূতন রূপ পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে, রাবণ যখন কৈলাসে শিবস্থানে গিয়ে সমস্ত পর্বত ওঠাতে চেষ্টা করেছিল, সেই সময় শিব তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পর্বতকে চেপে রাবণকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এখানে বর্ণিত আছে যে শিব নয়—বালী রাবণকে অনুরূপ শাস্তি দিয়েছিল।

এরপর রাবণের দিগ্বিজয় যাত্রার কথা বর্ণিত আছে। দিগ্বিজয়ের পথে রাবণ

সহস্রকিরণ, নলকূবের, ইন্দ্র, বরুণকে পরাজিত করেছিল। এখানে যম, ইন্দ্র, বরুণকে সাধারণ রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবতা বলে নয়। খর-দূষণ কোনও এক বিদ্যাধর বংশের রাজকুমার। রাবণের ভগিনী চন্দ্রনখার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল এবং তাদের অনঙ্গকুসুমা নামে এক কন্যা ও শম্বুক নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এখানে রাবণ-চরিত্র বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাবণ এখানে এক ধর্মভীরু জৈন। সে জিন মন্দিরে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিল (পর্ব ১১)। সে নলকুবেরের পত্নী উপরম্ভার প্রেমপ্রস্তাব অস্বীকার করেছিল (পর্ব ১২) এবং অনন্তবীর্যের ধর্মোপদেশ শুনে ব্রত নিয়েছিল যে সে কোনও পরনারীকে ধর্ষণ করবে না।

এখানে হনুমান চরিত্র বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে আদিত্যপুরের রাজকুমার পবঞ্জয় বা বায়ুকুমার ও মহেন্দ্রপুরের রাজকুমারী অঞ্জনাকুমারীর পুত্র। বরুণের বিরুদ্ধে রাবণকে সহায়তা করার জন্য চন্দ্রনখার কন্যা অনঙ্গকুসুমাকে সে পত্নীরূপে পায়। এছাড়া হনুমানের ১ সহস্র পত্নীর কথা উল্লেখ আছে। তার মধ্যে বরুণ-কন্যা সত্যবতী, চন্দ্রনখা-কন্যা অনঙ্গকুসুমা, নলনন্দিনী, হরিমালিনী এবং সুগ্রীব-কন্যা পদ্মরাগা প্রধান ছিল।

খ) রামসীতার জন্ম ও বিবাহ (পর্ব ২১-৩২)।

রামকথার প্রারম্ভ জনক ও দশরথের বংশাবলী দিয়ে (পর্ব ২১-২২)। দশরথের সঙ্গে অপরাজিতা ও সুমিত্রার বিবাহের উল্লেখ আছে। এরপর নিম্নবর্ণিত কথা পাওয়া যায়—

একদিন নারদ দশরথের কাছে এসে বললেন, সাগরপার থেকে রাবণের আদেশ পেয়ে বিভীষণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে এবং তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। কারণ, রাবণ দৈবজ্ঞর কাছে শুনেছে যে দশরথ-পুত্র রাম ও জনক-কন্যা সীতার কারণে তাকে যুদ্ধে নিহত হতে হবে। এরপর নারদ জনককেও সাবধান করে দেন। দুই রাজা দশরথ ও জনক নিজ নিজ রাজ্য ছেড়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মন্ত্রীরা জনক ও দশরথের মূর্তি নির্মাণ করে নিজ নিজ মহলে রেখে দেয়। বিভীষণ দশরথের রাজ্য আক্রমণ ক'রে তাঁর মূর্তির মুণ্ড কেটে দিয়ে চলে যায়। এদিকে পরদেশে গিয়ে দশরথ ও জনক কৈকেয়ীর স্বয়ংবরসভায় পৌঁছন। স্বয়ংবর-সভায় কৈকেয়ী দশরথের গলায় মাল্যদান করেন। ফলে স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কৈকেয়ীর রথ চালনার

কৌশলে দশরথ জয়লাভ করেন। দশরথ-কৈকেয়ীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দশরথ ও জনক নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যান। রাজ্যে ফিরে দশরথ কৈকেয়ীকে বর দিতে চাইলে কৈকেয়ী 'সময় মতো চেয়ে নেব' এই কথা বলেন। দশরথের সন্তান-সন্ততি এই রকম — রাম অথবা পদ্ম অপরাজিতার (কৌশল্যার) পুত্র, লক্ষ্মণ সুমিত্রার এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন কৈকেয়ীর পুত্র।

জনকের বিদেহা নামধারী মহারানীর এক কন্যা সীতা ও এক পুত্র ভামণ্ডল জন্মে। ম্লেচ্ছদের বা ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে জনকের যুদ্ধের সময় রাম তাঁকে সহায়তা করার জন্য জনক সীতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়ার জন্য বাক্‌দান করেন। এরপর সীতার স্বয়ংবরসভায় রাম ধনুর্ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করেন। এরপর দশরথের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এই সময় কৈকেয়ী ভরতের জন্য দশরথের কাছে রাজ্য প্রার্থনা করেন। এই কথা শুনে রাম, লক্ষ্মণ সীতাসহ দক্ষিণ দেশে চলে যান। পরে অনুতপ্ত কৈকেয়ীর অনুরোধে ভরত বনে গিয়ে রামকে রাজ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে, রাম ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। ভরত ফিরে এসে নিজে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরে ভরত এক মুনির কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে রাম ফিরে এলে তিনি জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

গ) বনভ্রমণ (পর্ব ৩৩-৪২)।

এখানে রামলক্ষ্মণ দ্বারা বিভিন্ন রাজাদের পরাজয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, বজ্রকর্ণের বিরোধী সিংহোদর (পর্ব ৩৩), জনৈক ম্লেচ্ছ রাজা যিনি কল্যাণমালিনীর পিতাকে কারাগারে বন্দী করেছিলেন, (পর্ব ৩৪), ভরত-বিরোধী অতিবীর্য (পর্ব ৩৭)। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন রাজারা লক্ষ্মণকে কন্যা সম্প্রদান করতে চাইলে লক্ষ্মণ বলেছিলেন যে তিনি ফেরার পথে সবাইকে বিবাহ করবেন। এইভাবে লক্ষ্মণ বজ্রকর্ণের ৮ কন্যা এবং সিংহোদর আদি রাজাদের ৩০০ কন্যা বিবাহ করেছিলেন। এছাড়া লক্ষ্মণ বনমালা, রতিমাতা ও জিতপদ্মাকে বিবাহ করেছিলেন।

কপিল নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে (পর্ব ৩৫) দেবভূষণ ও পদ্মভূষণ মুনির সাক্ষাৎকার বর্ণনা করা হয়েছে। রামের আজ্ঞায় রাজা সুরপ্রভ বংশপর্বতে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যার জন্য এই পর্বতের নামকরণ হয় রামগিরি (পর্ব ৪০)। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশের পর এক মুনিবর জটায়ুকে বলেন সীতাকে রক্ষা করতে (পর্ব ৪১)।

ঘ) সীতাহরণ ও সন্ধান (পর্ব ৪৩-৫৩)।

সীতাহরণের কারণ বিমলসূরির মতে এই রকম :— শম্বুক (চন্দ্রনখা ও খর-দূষণের পুত্র) সূর্যহাস খড়্গের জন্য বারো বৎসর কাল তপস্যা করে। তপস্যায় সে সিদ্ধিলাভ

করেছিল এবং খড়্গ প্রকট হয়েছিল। লক্ষ্মণ খড়্গটি দেখে তার ধার পরীক্ষার জন্য পাশের জঙ্গলে বাঁশ গাছ কাটেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তপস্যারত শম্বুকের শির কাটা যায়। চন্দ্রনখা আপন পুত্রের মৃত্যু দেখে কাঁদতে কাঁদতে বনে ঘুরতে থাকে। সেই বনে রামলক্ষ্মণের সঙ্গে তার দেখা হয়। তখন সে তাঁদের কাছে তাকে পত্নী করার প্রস্তাব করে। কিন্তু তার প্রস্তাব রামলক্ষ্মণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলে সে ফিরে এসে স্বামীর কাছে তার পুত্রের মৃত্যুর কারণ বলে। সে রাবণকেও এ সংবাদ দেয়। লক্ষ্মণের সঙ্গে খর-দূষণের যুদ্ধ বাধে। এদিকে রাবণ এসে সীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তারপর রাবণ অবলোকনীবিদ্যার দ্বারা জানতে পারে যে লক্ষ্মণ সিংহনাদের সংকেতে রামকে আহ্বান করেন। তখন রাবণ নিজেই সিংহনাদ করায় রামচন্দ্র সংকেত ধ্বনি শুনে লক্ষ্মণের কাছে চলে যান। এইভাবে রামকে কৌশলে লক্ষ্মণের কাছে পাঠিয়ে চক্রী রাবণ সীতাহরণ করে।

সীতাহরণে রাম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। লক্ষ্মণ তখন তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বলেছেন—"অজ্জণারিহসি সোইউং ইত্থি-নিমিত্তং। জহ বা মরি উমিচ্ছসি তো কিংসত্তু পরাজয়এ পয়ত্তং করোসি" অর্থাৎ "আর্য স্ত্রীলোকের কারণে শোক করা আপনার উচিত নয়। আর যদি মরতে চান তবে কেন শত্রুকে পরাজিত করতে প্রযত্ন করেছেন না?"

সীতাহরণের পর রাম-সুগ্রীব সখ্য বর্ণিত আছে। এখানে সুগ্রীবের বিপদ বাল্মীকি-রামায়ণের বর্ণনা থেকে ভিন্ন। সাহসগতি সুগ্রীবের রূপ ধারণ করে সুগ্রীবের রাজ্য এবং পত্নীকে নিয়ে নেয়। রাম সাহসগতিকে বধ করে সুগ্রীবের রাজ্য উদ্ধার করে দেন। সুগ্রীব রামকে তার ১৩ জন কন্যাকে সমর্পণ করে। কিন্তু সীতার বিরহে তাদের সঙ্গ তাঁকে সুখ দিল না। সুগ্রীবের আদেশে বিদ্যাধরেরা সীতার খোঁজ করতে যায়। খুঁজতে খুঁজতে সুগ্রীব রত্নজটার কাছে জানতে পারে যে, রাবণ সীতাকে হরণ করেছে। এই কথা শুনে বিদ্যাধরেরা ভয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। এরপর তাদের স্মরণে আসে যে অনন্তবীর্য রাবণকে বলেছিলেন যে, যে কোটি শিলা ওঠাতে পারবে সে রাবণকে বধ করতে সমর্থ হবে। তখন সবাই মিলে বিমানে চড়ে সেখানে যায় এবং লক্ষ্মণ কোটি শিলা ওঠাতে সমর্থ হন। তথাপি বিদ্যাধরেরা রাবণের ভয়ে ভীত হয় এবং হনুমানকে রাবণের কাছে পাঠানোর পরামর্শ দেয় এবং হনুমানকে বিভীষণের সহায়তায় রাবণকে বোঝানোর চেষ্টা করতে বলে। এরপর হনুমান লঙ্কায় গিয়ে বিভীষণ দ্বারা নির্মিত প্রাচীর পেরিয়ে প্রথমে বজ্রমুখকে বধ করে। তারপর তার কন্যা লঙ্কা-সুন্দরীকে পরাস্ত ক'রে তার সঙ্গে রাত্রিবাস করে। অতঃপর হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ

ক'রে বিভীষণ ও সীতার সঙ্গে মিলিত হয়। হনুমান তার পর লঙ্কায় উদ্যান ও মহল ধ্বংস করতে আরম্ভ করলে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বন্দী করে রাবণের কাছে নিয়ে আসে। তারপর হনুমান রাবণকে তিরস্কার করে নিজের বন্ধন ছিন্ন করে রাবণের মহল ধ্বংস করে সীতার খবর নিয়ে রামের কাছে ফিরে যায়। এরপর রাবণের বিরুদ্ধে রামের যুদ্ধের উদ্যোগে চলতে থাকে। এই উদ্যোগে 'রামের একখানা চিঠি সুগ্রীব বিদ্যাধরকে দিয়ে ভরতের কাছে পাঠিয়ে দেয়। চিঠি পেয়ে ভরত এক চতুরঙ্গ সৈন্য পাঠিয়ে দেন।' – "তেতো রামসন্দেশেন সুগ্গীবেন পেসিয়া বিজ্জাহরা ভরহ সমীবং। তেন চ চউরংগবলং পেসিয়ং।"

৬) যুদ্ধপর্ব (পর্ব-৫৪-৫৭)।

এই পর্বে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। যেমন :—(১) সেতুবন্ধের স্থানে সমুদ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বানর সৈন্যের সেতুবন্ধনে বাধা দেন। কিন্তু নলদ্বারা পরাজিত হয়ে লক্ষ্মণকে ৪ কন্যা দান করেন (পর্ব ৫৪)।

(২) বিভীষণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলে রাবণ তাকে নগর থেকে বিতাড়িত করে। তখন বিভীষণ সমস্ত সৈন্য নিয়ে হংসদ্বীপে রামের শরণ নেয়। সেই সময় সীতার ভাই ভামণ্ডল যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রামের কাছে আসে (পর্ব ৫৫)।

(৩) সুগ্রীব ও ভামণ্ডল ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ হলে, গরুড়কেতু লক্ষ্মণ তাদের মুক্ত করে (পর্ব ৬০)।

(৪) লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে আহত হলে দ্রোণমেঘের কন্যা বিশল্যা তাঁর চিকিৎসা করে এবং শেষে বিশল্যার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিবাহ হয় (পর্ব ৬২-৬৪)।

(৫) রাবণ 'সামন্ত' নামে এক দূতকে রামের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পাঠিয়েছিল। রাবণ এই প্রস্তাবে বলে পাঠিয়েছিল যে সে তার রাজ্যের এক অংশ সহ ৩০০০ কন্যা রামকে দান করতে প্রস্তুত আছে। বিনিময়ে তাঁকে সীতাকে ত্যাগ করতে হবে এবং কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ তথা মেঘবাহনকে মুক্তি দিতে হবে (পর্ব ৬৫)।

(৬) রাবণ 'বহুরূপা' নামক বিদ্যা আয়ত্ত করতে শান্তিনাথের মন্দিরে সাধনা করতে গিয়েছিল। বানরসৈন্যদের দ্বারা তার ধ্যানভঙ্গের প্রয়াস নিষ্ফল হলে রাবণ তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে (পর্ব ৬৬-৬৮)।

(৭) রাবণ 'বহুরূপা' বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করে সীতার কাছে গিয়েছিল এবং তাকে বলেছিল, রামকে বধ করে সে সীতার সঙ্গে মিলিতে হবে। এই কথা শুনে সীতা বলেন যে, তাঁর জীবন রামের জীবনের সঙ্গে চিরকাল জড়িয়ে আছে। এই

কথা বলে সীতা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। রামের প্রতি সীতার এই অটল প্রেমের নিদর্শন দেখে রাবণ অনুতাপ করতে থাকে এবং যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণকে পরাজিত করে সীতাকে ফিরিয়ে দেবার সংকল্প করে (পর্ব ৬৯)।

(৮) লক্ষ্মণ (নারায়ণ) রাবণ (প্রতিনারায়ণ)-কে বধ করেছিলেন।

(৯) কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ বা মেঘবাহন যুদ্ধে বন্দী হয়েছিল। রাবণবধের পর তারা মুক্ত হয়। মুক্তি পেয়ে তারা তপস্যা করতে চলে যায়। মন্দোদরী এবং চন্দ্রনখা প্রভৃতি ৮০০০ রক্ষ যুবতী রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সাধনায় জীবনপাত করে (পর্ব ৭৫)।

(১০) লঙ্কাযুদ্ধে জয়লাভ করে রাম সর্বপ্রথম সীতার সঙ্গে মিলিত হতে যান। দেবতারা তাঁদের মিলনে পুষ্পবৃষ্টি করেন এবং সীতার নির্মল চরিত্রের সাক্ষ্য দেন। রামের সীতার প্রতি সন্দেহ বা অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখ নেই (পর্ব ৭৬)।

(১১) রাম-লক্ষ্মণ রাবণের মহলে গিয়ে রাবণের কন্যাদের দেখেন। তাদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের বিবাহ হয়। বিবাহের পর রাম-লক্ষ্মণ ৬ বৎসর কাল লঙ্কায় অতিবাহিত করেন।

চ) উত্তরচরিত (পর্ব ৭৮-১১৮)।

নারদ লঙ্কায় গিয়ে রামের কাছে অপরাজিতার (কৌশল্যার) পুত্রের বিরহব্যথা বর্ণনা করলে রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে আসতে মনস্থ করেন (পর্ব ৭৮)। রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরতের বৈরাগ্য হয় এবং তিনি দীক্ষা নিয়ে নির্বাণলাভ করেন (পর্ব ৮০-৮৪)। এর পর লক্ষ্মণের রাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যাধর রাজাদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্মণের ১৬০০ পত্নীর মধ্যে বিশল্যাদি ৮জন পাটরানী ছিল এবং রামের ৮০০০ পত্নীর মধ্যে সীতা, প্রভাবতী, রতিনিভা, শ্রীদামা প্রধানা ছিলেন (পর্ব ৮৫-৯১)। সীতা ত্যাগের কথা এখানে বাল্মীকি থেকে বিশেষ ভিন্ন নয়। এরপর সীতার পুত্রদ্বয়ের নাম লবণ অথবা অঙ্গদ, লবণ এবং অঙ্কুশ অথবা মদনাঙ্কুশ বলে বর্ণিত হয়েছে (পর্ব ৯৭)। পুত্রেরা নারদের কাছে রাম কর্তৃক তাদের মাতাকে পরিত্যাগের কথা শুনে অযোধ্যায় রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে (পর্ব ৯৭-১০০)। যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত হলে নারদ রাম-লক্ষ্মণের কাছে বালকদ্বয়ের পরিচয় বর্ণনা করেন। এরপর সুগ্রীব হনুমান ও বিভীষণের অনুরোধে রাম সীতাকে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন কিন্তু রাম সীতার সতীত্বের প্রমাণ চান। সীতার অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন হয়। সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলে, অগ্নিকুণ্ড জলে ভরে যায় এবং ক্রমে ক্রমে জলরাশি বাড়তে থাকে। অযোধ্যাবাসীদের প্রার্থনায় সীতার হাতের স্পর্শে জল

কমতে থাকে। রাম সীতাকে তাঁর সঙ্গে অযোধ্যায় বাস করার অনুরোধ জানান। কিন্তু সীতা সে অনুরোধ উপেক্ষা করে দীক্ষা নিতে চলে যান (পর্ব ১০১-১০২)।

রামকথার শেষ ভাগ এই প্রকারের—একদিন বলভদ্র (রাম) লক্ষ্মণের (নারায়ণের) ভ্রাতৃভক্তি পরীক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে এই খবর দেন যে, রামের মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ্মণ শোকাতুর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নরকে যান। লক্ষ্মণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর রাম শোকাতুর হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৭,০০০ বৎসর সাধনা করে নির্বাণ লাভ করেন। শেষে এই কথা বলা হয় যে লক্ষ্মণ, রাবণ ও সীতা বহুবার জন্মগ্রহণ করে মুক্তিলাভ করেন (পর্ব ১১০-১৮)।

বিমলসূরির 'পউমচরিঅ' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে 'পউমচরিঅ'র ভাবগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। যেমন :—

১) মরণান্তানি বৈরাণি—বাল্মীকি-রামায়ণ ,৬.১০৯ ২৫
মরণং ঝাইং হবন্তি বেরাণি—পউমচরিঅ, ৭৫।১

২) পুত্রকামশ্চ পুত্রান্বৈ ধনকামী ধনানিচ—বা.-রা , ৬।১২৮।১০৬
পুত্তত্থী···পুত্তং লহই ধনাত্থী মহাদণং—পউমচরিঅ, ১১৮।৯৪-৯৪

৩) সমাগম্য প্রবাসান্তে রমন্তে সহ বান্ধবৈঃ—বা -রা , ৬।১২৮।১১১
লহই পরদেস গমনে সমানামং চেব বন্ধুনং—পউমচরিঅ, ১২৮।৯৬

কিন্তু 'পউমচরিঅ'র সঙ্গে বাল্মীকি-রামায়ণের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি দেখা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিমলসূরি সরাসরি বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাবলীর সমালোচনা করছেন। যেমন, বিমলসূরি মহান পদ্ম (রাম) চরিত পরিস্ফুট করার বাসনায় কুসত্য-বিবরণ-পূর্ণ গ্রন্থের বর্ণনা পরিহার করতে চাইছেন। 'পউমচরিয়ং মহায়স অহয়ং ইচ্ছামি পুরিফুডং সোডং উপ্পাইয়া প্রসিদ্ধী কুসত্য-বাদীহি বিবরীয়া' (পউমচরিঅ ৩।৮) বিমলসূরি বাল্মীকির বর্ণনার প্রতিবাদ করে বলছেন 'দশানন প্রভৃতিকে যে রাক্ষস এবং আমিষহারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে তা সর্বৈব অলীক এবং মূঢ় কবিরাই এমন বর্ণনা করেছেন। 'ন য রক্খসোত্তিভণ্ণাই দশাণণোণেয় আমি সাহারোং অলিয়ং তি সব্বমেয়ং ভণং তিজং কুক ইনো মূঢ়া'। ('পউমচরিঅ ৩।১৫)। 'পউমচরিঅ'তে বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি পাওয়া যায়। যেমন :—

১) রাবণের একটি মাথা। কিন্তু তার গলার রত্নমালার প্রতিবিম্বের জন্য তার পিতা তাকে দশগ্রীব বলে অভিহিত করে।

২) ইন্দ্র, যম, বরুণ ইত্যাদি দেবতা নয়—মানুষ এবং রাজা।

৩) বালী তার ভাই সুগ্রীবকে রাজ্য দান করে জৈনধর্ম গ্রহণ করে চলে যায়।

৪) হনুমান রাবণের ভগিনী চন্দ্রণখার কন্যা অনঙ্গকুসুমাকে বিবাহ করে।

৫) খর-দূষণ রাবণের ভাই নয়। তার ভগিনী চন্দ্রনখার স্বামী। তার শম্বুক নামে এক পুত্র ছিল।

৬) দশরথের চার রানী, শত্রুঘ্ন চতুর্থ রানী সুপ্রভার পুত্র।

৭) রাবণ নারদের কাছে জানতে পারে যে জনকের কন্যা এবং দশরথের পুত্র দ্বারা সে নিহত হবে। রাবণ বিভীষণকে জনক ও দশরথের মাথা কেটে আনতে পাঠায়। বিভীষণের আগমন-বার্তা আগে থেকে জানতে পেরে জনক ও দশরথ তাঁদের প্রতিকৃতি প্রাসাদে রেখে পালিয়ে যান। বিভীষণ এসে তাঁদের প্রতিকৃতি কেটে সমুদ্রে ফেলে দেয়।

৮) সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাসে আসার পর রাম আরও তিনজনকে বিবাহ করেন এবং লক্ষ্মণ ১১ জনকে বিবাহ করেন।

৯) লক্ষ্মণ একটি বাঁশ কাটার সময় অজান্তে চন্দ্রনখার পুত্র শম্বুকের মস্তক ছিন্ন করে। চন্দ্রনখা রামের কাছে এসে বিলাপ করতে থাকে এবং পরে তাকে বিবাহ করতে বলে।

১০) লক্ষ্মণ একাই খর-দূষণের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

১১) মারীচের উল্লেখ নেই। রাবণ নিজেই সিংহের গর্জন করে। এই শব্দ শুনে রাম কুটীর ছেড়ে যুদ্ধরত লক্ষ্মণের সাহায্যে যায়। লক্ষ্মণ আগেই বনে গিয়েছিলেন। এই অবসরে রাবণ সীতাহরণ করে।

১২) সাহসগতি সুগ্রীবের রাজ্য কেড়ে নেয় এবং তার পত্নীকে হরণ করে। রাম সাহসগতিকে বধ করে সুগ্রীবকে তার রাজ্য ও পত্নী ফিরিয়ে দেন। পরে রাম সুগ্রীবের ১৩টি কন্যাকে বিবাহ করেন।

১৩) হনুমান রাবণের বন্ধু ছিল। সে বজ্রমুখের কন্যা লঙ্কাসুন্দরীকে বিবাহ করে।

১৪) ইন্দ্রজিতের শক্তিশেল-বিদ্ধ লক্ষ্মণ মুক্তির পর সমুদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন এবং দ্রোণমেঘকন্যা বিশল্যাকে বিবাহ করেন।

১৫) লক্ষ্মণ (নারায়ণ) রাবণকে (প্রতিনারায়ণ) বধ করেন।

১৬) অযোধ্যায় ফেরার সময় রামের সর্বসমেত ৮০০০ পত্নী এবং লক্ষ্মণের ১৬০০ পত্নী ছিল।

১৭) সীতার বনবাসের পর দুটি পুত্রের জন্ম হয়। শেষে পুত্রদ্বয় তাদের পিতা রামের সঙ্গে মিলিত হয় কিন্তু সীতা জৈনধর্ম গ্রহণ করে স্বর্গে যান।

১৮) লক্ষ্মণ মৃত্যুর পর নরকে যান, রাম প্রায়শ্চিত্তের পর স্বর্গে যান এবং রাবণ বহু জন্মের পর অর্হৎ বা জৈন সন্ন্যাসী হয়।

২। সংঘদাস-কৃত বসুদেব হিণ্ডি [৬০০ খৃঃ]

এই রামকথার বিবরণ এই গ্রন্থের 'সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব' শীর্ষক অনুচ্ছেদে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

৩। রবিষেণ-কৃত 'পদ্মপুরাণ' — [৬৭৮ খৃঃ]

গ্রন্থটি বিমলসূরি-কৃত 'পউমচরিঅ'র সংস্কৃত অনুবাদ। যদিও রবিষেণ বিমলসূরির গ্রন্থটি অনুবাদ করেন তথাপি তিনি দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিমলসূরি ছিলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। রবিষেণের রচনায় নিম্নবর্ণিত বিশেষত্বগুলি লক্ষণীয়। যেমন :—

১) সুপ্রভা দশরথের চতুর্থ রানী এবং শত্রুঘ্ন তাঁর পুত্র ছিলেন।

২) সীতাস্বয়ংবরে রাম-লক্ষ্মণ দুটি ধনুকে ছিলা পরিয়েছিলেন, সেগুলির নাম বিজরাবর্ত এবং সগরাবর্ত।

৩) ভরতের স্ত্রীর নাম ছিল লোকসুন্দরী।

৪) অতিবীর্য ঘটনা বর্ণনার সময় রামচন্দ্র নৃত্যরতা সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করেছিলেন।

৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময় যে দেবতা সীতার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম মেষ-কেতন।

৪। হরিভদ্রসূরি-কৃত 'উপদেশপদ' [৭০০-৭৭০ খৃঃ]

হরিভদ্রসূরি তাঁর উপদেশপদ'র একটি সংগ্রহ গাথায় রাম-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই কাহিনীতে নূতনত্ব কিছুই নেই। কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে বিমলসূরির অনুকরণে রচিত।

৫। স্বয়ংভূদেব-কৃত 'পউমচরিঅ' [অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগ] এবং

৬। পুষ্পদন্ত-কৃত 'মহাপুরাণ' [৯৬৫ খৃঃ]

অপভ্রংশ সাহিত্যে জৈন রামকথার দুটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রথমটি স্বয়ংভূ-কৃত 'পউমচরিঅ'। এবং দ্বিতীয়টি পুষ্পদন্তকৃত 'মহাপুরাণ'।

এই দ্বিতীয় 'পউমচরিঅ'তে ১২ হাজার গ্রন্থাগ্র, ৯০টি সন্ধি এবং ৫টি কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডগুলির নাম যথাক্রমে বিদ্যাধরকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড,

যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। জৈন রামকথাগুলির মধ্যে এখানে সর্বপ্রথম আমরা দেখি রাম-কাহিনী বিভিন্ন কাণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। কাব্যের প্রারম্ভে ৮২ সন্ধিতে প্রতি পঙ্‌ক্তির অন্তে কবি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। শেষ ৮টি সন্ধি কবিপুত্র ত্রিভুবন শেষ করেন। কারও কারও মতে কবি নিজেই রামকথা সমাপ্ত করেন। তবে বর্তমানে গবেষকদের অসংশয় সিদ্ধান্ত এই যে, কাব্য স্বয়ংভূ এবং ত্রিভুবন দুজনেই রচনা করেন।

পুষ্পদন্তের মহাপুরাণে ২১৪টি কাণ্ড এবং ১১টি সন্ধি আছে।

অপভ্রংশ রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, এটি জৈনপরম্পরা অনুসারে লিখিত এবং এটি ব্রাহ্মণপরম্পরা থেকে ভিন্ন। যেমন জৈনপরম্পরায় রাম গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণপরম্পরায় রাম শ্যামবর্ণ, জৈনপরম্পরায় লক্ষ্মণ শ্যামবর্ণ।

স্বয়ংভূ এবং পুষ্পদন্ত উভয়েই ব্রাহ্মণপরম্পরার পাত্রপাত্রীর রূপের বিরোধিতা করেছেন এবং সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে রাবণের দশ মুণ্ড এবং বিশ হাত হয় কি করে? কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রা যেত এবং জেগে মহিষাদি পশু ভক্ষণ করত কেমন করে? স্বয়ংভূ প্রশ্ন করেছেন, যদি কুম্ভকর্ণ পৃথিবীকে পিঠে ধারণ করে তবে সে কোথায় থাকবে? যদি রাম ত্রিভুবনের চেয়ে বড় হন, তবে রাবণ সীতাকে নিয়ে কোথায় গেল? স্ত্রীর কারণে বালী আপন সহোদরের হাতে মারা গেল কি করে? রাবণ-পত্নী মন্দোদরী কি প্রকারে বিভীষণের পত্নী হলো?

পুষ্পদন্তের আপত্তি হল, যদি রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ রাবণ অপেক্ষা বয়সে বড় হয়, তবে কি সে রাবণের আগে জন্মেছিল? রাবণ কি রাক্ষস, মনুষ্য নয়? রাবণ কি শিবের উপাসনায় নিজের শির উপহার দিয়েছিল? রাবণ কি রামের শরে নিহত হয়েছিল? সুগ্রীব ইত্যাদি কি মনুষ্য নয়, বানর ছিল? বিভীষণ কি আজও জীবিত?

এইভাবে কবিদ্বয় পূর্ববর্তী রামায়ণ-কথায় বিবিধ সংশয় প্রকাশ করেছেন। পুষ্পদন্ত এইসব ভুলের জন্য ব্যাস ও বাল্মীকিকে দায়ী করেছেন। স্বয়ংভূ সরাসরি এঁদের নামোল্লেখ না করে বলেছেন মিথ্যাভাষীরাই জগৎকে ভুল কথা শুনিয়েছেন। স্বয়ংভূর এই শালীনতাবোধ ও সংযম তাঁর স্বভাবের অংশই হোক বা তাঁর সম্প্রদায়ের ধার্মিক সহিষ্ণুতার পরিচায়কেই হোক এই প্রকার সংযম ও সৌজন্য তাঁর রচনার বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণদের তিনি সরাসরি কিছু বলেন নি।

জৈন কবির পূর্ববর্তী কবিদের এই ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য চেষ্টা করেছেন। রাবণ যে দশানন স্বয়ংভূ তার কাব্যাত্মক যুক্তি দেখিয়েছেন। বাল্যকালে খেলতে খেলতে রাবণ রত্নভাণ্ডারে যায় এবং সেখানে একটি হার পায়। ওই হারে ৯টি মণি ছিল। রাবণ যখন ওই হারটি পরে তখন হারের ৯টি মণিতে তার ৯টি মুখ

প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই কারণে লোকে তাকে দশানন বলত। রাবণাদির রাক্ষসত্ব এবং সুগ্রীবাদির বানরত্ব জৈনধর্মের কঠোর কর্মফলবাদ ও পুনর্জন্ম-বাদ-এর ফলস্বরূপ বলে কবিদ্বয় বর্ণনা করেছেন। স্বয়ংভূ রাক্ষসও বানরদের উৎপত্তির এক যুক্তিসংগত কারণ দেখিয়েছেন। পূর্বজন্মে এরা মানুষ ছিল ও কর্মের ফলে তারা এই জন্মে এই রূপধারণ করেছে। এইভাবে স্বয়ংভূ রাম-লক্ষ্মণের পূর্বজন্মের কথা বলেছেন। এঁরা পূর্বজন্মে অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের মানবিক দুর্বলতাও ছিল। এ বিষয়ে পুষ্পদন্ত, স্বয়ংভূকে অনুসরণ করেছেন। বিমলসূরি রবিষেণ, জিনসেন, গুণভদ্র, হরিভদ্র প্রভৃতি সব জৈনকবিরা পুনর্জন্ম ও জন্মচক্রের বর্ণনা করেছেন। স্বয়ংভূ তাঁর 'পউম চরিঅ'তে বিদ্যাধরকাণ্ডে পাত্রপাত্রীদের পুনর্জন্মের কথা বলেছেন এবং অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথমে জনক ও দশরথের পুনর্জন্ম ও পরে রাম-লক্ষ্মণের পুনর্জন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। পুষ্পদন্তও তাঁর রামকথার ছোট পরিধির মধ্যে পুনর্জন্মের উল্লেখ করেছেন।

স্বয়ংভূ ও পুষ্পদন্তের রামকথার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্য বেশি চোখে পড়ে। তার প্রথম কারণ হল স্বয়ংভূর রামকথায় রামকথা ছাড়া অনেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কথা পাওয়া যায়। এটি তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কারণে হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, পুষ্পদন্ত দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বয়ংভূ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত। সেইজন্য পুষ্পদন্ত গুণভদ্রকে এবং স্বয়ংভূ বিমলসূরিকে অনুসরণ করেছেন। স্বয়ংভূর রাম-কথায় পুষ্পদন্তের চেয়ে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব বেশি দেখা যায়। তার কারণ হল স্বয়ংভূর সময় বাল্মীকির-রামায়ণ অধিক প্রচলিত ছিল। স্বয়ংভূর ব্রাহ্মণত্ব-বিরোধী প্রবৃত্তি পুষ্পদন্তের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে। যেমন :—

(১) বাল্মীকির মতো স্বয়ংভু লক্ষ্মণকে সুমিত্রার পুত্র এবং ভরতকে কৈকেয়ীর পুত্র বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পুষ্পদন্তের মতে, লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর পুত্র। রামের মা যে কৌশল্যা তা দুই কাব্যেই পাওয়া যায় না। স্বয়ংভূর মতে রামের মায়ের নাম অপরাজিতা এবং পুষ্পদন্তের মতে সুবলা।

(২) বাল্মীকির মতে, সীতা জনকের পালিতা কন্যা। কিন্তু পুষ্পদন্তের মতে সীতা মন্দোদরীর গর্ভজাত কন্যা। স্বয়ংভু বাল্মীকির চেয়ে এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে সীতা জনকের পরিণীতা ভার্যার কন্যা, ভূমিজাত নয়।

(৩) বাল্মীকির মতে রামের এক বিবাহ, পুষ্পদন্তের মতে রামের শত বিবাহ। রাম-লক্ষ্মণের অনেক বিবাহের কথা স্বয়ংভূর কাব্যে পাওয়া যায়।

(৪) রামের রাজ্যাভিষেকে কৈকেয়ীর বাধাদান এবং রামের বনগমন স্বয়ংভু

বাল্মীকির মতো বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পুষ্পদন্তের কাব্যে তা অনুপস্থিত। স্বয়ংভূর কাব্যে বাল্মীকির মতো ভরত রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন।

(৫) পুষ্পদন্তের কাব্যে নারদ সীতাহরণের জন্য রাবণকে উত্তেজিত করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ংভূর কাব্যে পরমাসুন্দরী সীতার কথা শুনে রাবণ বিমানে চড়ে সীতাকে দেখতে যায় এবং পরে সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করে।

(৬) সীতা-উদ্ধারের পর পুষ্পদন্ত সীতার অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি, কিন্তু স্বয়ংভূ-পুত্র ত্রিভুবন অগ্নিপরীক্ষার সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন।

স্বয়ংভূর কাব্যে এমন অনেকগুলি ঘটনা আছে যা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। যেমন :—

(১) সীতার ভামণ্ডল নামে এক ভাই ছিল। জন্মের পর থেকে সে অন্যত্র পালিত হয়েছিল। সে সীতাকে বিবাহ করতে এসেছিল কিন্তু সফল হয়নি। তারপর যখন রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয় এবং তাঁরা অযোধ্যায় চলে যান, তখন ভামণ্ডল সীতাকে হরণ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর সীতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ সে যখন জানতে পারে তখন সে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

(২) একবার ম্লেচ্ছদের দ্বারা মিথিলা আক্রান্ত হলে রাম-লক্ষ্মণ তা প্রতিহত করেন। এর ফলস্বরূপ রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ দেওয়ার কথা জনক আগেই ঠিক করে ফেলেছিলেন। নারদের উত্তেজনায় ভামণ্ডল যখন রাম-সীতার বিবাহ পণ্ড করার চেষ্টা করেছিল তখন জনক ধনুর্যজ্ঞ ও স্বয়ংবরসভার আয়োজন করেন। এই যজ্ঞে আর্যাবর্ত ও সমুদ্রবর্ত নামে দুটি ধনু রাখা হয়েছিল। এইজন্য জনক রাম-লক্ষ্মণ দুজনের বিবাহ দিয়েছিলেন। সঙ্গী অপর দুইভায়েরও বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৩) রামের বনবাস ১৪ বৎসর নয়, ১৬ বৎসর হয়েছিল।

(৪) রামের বনগমনের পর দশরথের মৃত্যু হয়নি। দশরথ জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

(৫) রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরত রামের আগেই চিত্রকূটে গিয়েছিলেন। রাম ভরতকে সন্তুষ্ট করার পর চিত্রকূটে প্রবেশ করেন।

(৬) রাম বনগমন প্রসঙ্গে বজ্রকরণ, সিংহোদর, কল্যাণমাল, রুদ্রভূতি, কপিল, বনমালা, অনন্তবীর্য, জিতপদ্মা, কুলভূষণ, দেশভূষণ প্রভৃতি উপাখ্যান এবং লক্ষ্মণ দ্বারা সুরহাস ও চন্দ্রহাস প্রাপ্তি প্রভৃতি অনেক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ স্বয়ংভূর কাব্যে পাই যা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।

(৭) জৈন্য কবিরা শূর্পণখাকে চন্দ্রনখা বলেছেন। চন্দ্রনখা খর-দূষণের পত্নী,

চন্দ্রনখার নাক, কান কাটার কথা স্বয়ংভূ বা পুষ্পদন্তের কাব্যে নেই। কাজেই ভগিনীর অপমানের জন্য রাবণের সীতাহরণের কথা এখানে ওঠে না।

(৮) মারীচকে স্বর্ণমৃগ করে সীতাহরণের কল্পনা জৈনকাব্যে পাওয়া যায় না। রাম নকল সিংহের গর্জনে আকৃষ্ট হয়ে কুটীর ছেড়ে গিয়েছিলেন।

(৯) খর ও সুগ্রীব দুজনেই হনুমানের বন্ধু ছিল। হনুমান যখন শুনলে যে রাম খরকে বধ করছে, স্বভাবতঃই সে রামের উপর রুষ্ট হয়েছিল। আবার যখন বালীকে মেরে রাম সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসালেন, তখন সে রামের প্রতি সন্তুষ্ট হল। সীতার খোঁজে রামকে সহায়তা করার জন্য হনুমানকে বলা হলে তার পত্নীর জন্য সে অসুবিধায় পড়েছিল। কিন্তু শেষে সুগ্রীবের অনুরোধে সে রামের সহায়তায় এগিয়ে গেল।

(১০) সীতাবিয়োগের পর দধিমুখের অনুরোধে রাম তাঁর তিনকন্যাকে বিবাহ করেন।

(১১) লঙ্কায় প্রবেশের পথে হনুমান দ্বাররক্ষক আশালীকে বধ করে, পরে বজ্রায়ুধকে বধ করে। শেষে বজ্রায়ুধের কন্যা লঙ্কাসুন্দরী হনুমানের শৌর্যে বীর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহ করে। সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে হনুমান পরের দিন বিভীষণের কাছে যায়।

(১২) ত্রিজটার স্বপ্ন, হনুমান কর্তৃক অক্ষয়কুমার বধ, রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন—এইসব ঘটনা বাল্মীকির মতো স্বয়ংভূর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হনুমানের লঙ্কাদহন প্রসঙ্গ জৈন রামায়ণে নেই।

স্বয়ংভূর রামায়ণের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে অযোধ্যাকাণ্ডে অরণ্য ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অনেক ঘটনা যেমন বালী-সুগ্রীবযুদ্ধ, বালীবধ, হনুমান, রামমিতালি প্রভৃতি সুন্দরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

স্বয়ংভূ রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডের নামকরণ সম্পর্কে একটি মনোরঞ্জক ব্যাখ্যা আছে। এই নামকরণ সম্পর্কে প্রথমেই কবি বলেছেন যে যেহেতু অন্যান্য কাণ্ড অপেক্ষা এই কাণ্ডটি সুন্দর সেইজন্য নাম সুন্দরাকাণ্ড। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে, হনুমানের অনেক নামের মধ্যে এক নাম সুন্দর এবং যেহেতু এখানে সুন্দরের শৌর্যবীর্যের বর্ণনা আছে, সেইজন্য সুন্দরকাণ্ড নামকরণ হয়েছে।

স্বয়ংভূর কাব্যে এমন সব ঘটনা বর্ণিত আছে যার সঙ্গে রামায়ণের সরাসরি সম্পর্ক কিছুই নেই। উদাহরণস্বরূপ রামের বনযাত্রার সময় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, বজ্রকর্ণ-সিংহোদর উপাখ্যান, কল্যাণমাল উপাখ্যান বজ্রভূতি ও কপিল উপাখ্যান, বনমালা উপাখ্যান, অনন্তবীর্য উপাখ্যান, জিতপদ্ম

উপাখ্যান ও লক্ষ্মণ দ্বারা সুরহাস তরবারি প্রাপ্তি উপাখ্যান। এইসব উপাখ্যান-গুলির সঙ্গে রামের সম্বন্ধ নেই কিন্তু লক্ষ্মণের আছে। সবগুলিই লক্ষ্মণের শৌর্য ও প্রেম প্রকাশ করছে; উপাখ্যান লক্ষ্মণের রানীর সংখ্যা এক হাজার। ফলে এই কথাই প্রতিভাত হয় যে জৈন রামায়ণে লক্ষ্মণের জীবন রাম অপেক্ষা বেশি কর্মবহুল। যেমন রাবণ-বধ লক্ষ্মণের হাতেই হয়েছিল, রামের হাতে নয়। এইসব উপাখ্যানে কবির কল্পনাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করা যায়। আবার এক কবির কল্পনায় যা আছে অন্য কবির কল্পনায় তা নাও থাকতে পারে। যেমন পুষ্পদন্তের রামায়ণে রামের অযোধ্যা ত্যাগ ও বনগমন, রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের চিত্রকূটে গমন এবং রাম-ভরত মিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি উল্লিখিত হয়নি। সীতা বিবাহ-বর্ণন স্বয়ংভূ অতি সংক্ষেপে করেছেন কিন্তু পুষ্পদন্তের কাব্যে এই বর্ণনা অতি বিস্তারিতভাবে পাই যেমন ভাবে পাওয়া যায় তুলসী-রামায়ণে। বিবাহের পর বারাণসী উপবনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্যান-ক্রীড়া পুষ্পদন্ত যেমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন তা স্বয়ংভূ বা বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। এরপর বারাণসী থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে পুরনারীদের রামদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পুষ্পদন্ত যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অন্য জৈন রামকাব্যে নেই। রাম আসছেন শুনে পুরনারীরা "কাঞ্চী কলাপ ফেলে দৌড়াচ্ছে কেউ কেউ কুণ্ডলের ফুল্লদাম, কঙ্কণ ও হার ফেলেছে। কারও কারও দৌড়াতে দৌড়াতে বস্ত্র অসংবৃত হয়ে পড়ছে।"—

"জাণু বোল্লই দসরহজেট্‌ঠসুউ ইহু স-সহোয়ক আবই।
কাঞ্চীকলাপ গুপ্পংত পহি পুরণারীয়ণু ধাবই॥
কবি মেল্লই কোন্তল-ফুল্ল-দামু নীসসই, কবি জোয়ন্তি রামু।
কাই বি থণজুয়লং বিহলু গণিউং হা, এউণ লক্‌খণ ণংহতে বণিউং।"

—৭০।১৮-১৯

পুষ্পদন্তের এই বর্ণনা রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্যে রঘু ও শিবকে দেখার জন্য উৎসুক পুরনারীদের বিহ্বল অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্বয়ংভূর কাব্যে 'রামের অযোধ্যা ত্যাগ' প্রসঙ্গ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রাজ্যাভি-ষেকের প্রভাতে যখন রাম সামান্য বেশে মাতা কৌশল্যার পাশে গেছেন তখন জননী বিলাপ করতে করতে বলছেন, হে পুত্র। অন্যদিন তুমি হাতিতে চড়ে আসতে আজ কেন পায়ে হেঁটে এসেছ? অন্যদিন বন্দীরা তোমার স্তুতি গান করতে থাকে, আজ কেউ নেই কেন? অন্যদিন অনেকে তোমার মাথায় চামর দোলাতে থাকে, আজ তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন? মায়ের এই স্নেহের প্রতিধ্বনি আজও

লোকগীতিতে শোনা যায়। মাতা বলছেন 'তুমি ছাড়া পালঙ্কে কে শয়ন করিবে? তুমি বিনা সিংহাসনে কে বসবে? তুমি ছাড়া হাতিঘোড়াতে কে চড়বে? তুমি ছাড়া রাজলক্ষ্মীকে কে মানবে? তুমি ছাড়া শত্রুসৈন্যের সঙ্গে কে যুদ্ধ করবে? তুমি ছাড়া কে আমাকে আনন্দ দেবে?'—পইং বিণু কো পল্লংকে সুয়েসহ, পইং বিণু কো অত্থাণে অইসহ। / 'পইং বিণু কো হয়-গয়হুং চড়ে সই, পইং বিণু কো বিন্দু এণর মেসহ॥ / পইং বিণু রায়লচ্ছি কো মাণই, পইং বিণু কো তম্বোল সমাণই। / পইং বিণু কো পর—ওলুভংজে সই, পইং বিণু কোমইং সাহারে সহ॥ (২।২৩।৪)

এইসব কথায় মার যে অন্তরের ব্যথা তার মর্মস্পর্শী চিত্র স্বয়ংভূ বর্ণনা করেছেন। পুত্রের জন্য এই ব্যথা থেকে অনুমান করতে পারি কন্যাস্বরূপা' পুত্রবধূর প্রতি তাঁর ব্যথা কতখানি নিবিড় হতে পারে। রাজভবন থেকে সীতার নিষ্ক্রমণ স্বয়ংভূর দৃষ্টিতে হিমগিরি থেকে গঙ্গা, ছন্দ থেকে গায়ত্রী, শব্দ থেকে বিভক্তির প্রবাহের মতো। রামের বনগমনের সময় স্বয়ংভূ যে প্রকৃতি ও অরণ্যের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তা অতি মনোহর।

রামবনবাসের সবচেয়ে করুণ প্রসঙ্গ সীতাহরণ। সীতা হরণের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও স্বয়ংভূ ও পুষ্পদন্ত এই ঘটনা অতি মর্মস্পর্শী রূপে উপস্থিত করেছেন। পুষ্পদন্ত বলছেন, কামমোহিত রাবণ যখন মারীচের সঙ্গে রাম-সীতার আবাসস্থলে পৌঁছল, তখন সীতার বন্য প্রকৃতির পটভূমিতে তাঁর বিশ্ববিমোহন মূর্তি দেখে রাবণ মুগ্ধ হয়েছিল। স্বয়ংভূ সীতাহরণের পর সীতার করুণ বিলাপ ও রামের বিরহদশা অপূর্বভাবে বর্ণনা করেছেন। ত্রিলোকবিজয়ী রাবণের সম্মুখে কম্পমান দীপশিখার মতো সীতার করুণ বিলাপ বর্ণিত। স্বয়ংভূর রাম 'হা সীতা' 'হা সীতা' বলে সারা বনভূমি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং পাগলের মতো সমস্ত বনরাজী, পশুপক্ষী, জীবজন্তুকে দেখে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। পুষ্পদন্তের রামও এরূপ পশুপক্ষী বৃক্ষলতাকে দেখে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কালিদাস-বিরচিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ ছন্দে এরূপ বিরহগাথা আছে। কালিদাসের মতো পুষ্পদন্তও মেঘদূতকে বিরহী সীতার নিকট প্রেরণ করছেন।

রাবণের নন্দনবনে বন্দী সীতাকে হনুমানের প্রথম দর্শন এবং হনুমানের সঙ্গে সীতার যে সংলাপ হয়েছিল এই দুই রামায়ণে তার একটি মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায়। সুন্দরকাণ্ডের ৪৯ নং সংধিয়েঁতে স্বয়ংভূ এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হনুমান সীতার বিরহী রূপ দেখে অভিভূত হয়েছিল এবং এখানে ভ্রমর-তাড়িত সীতার অবস্থিতি তাকে বেশি প্রভাবিত করে। ভ্রমর-তাড়িত সীতার রূপ কালিদাসের শকুন্তলার রূপ স্মরণ করিয়ে দেয়। সীতার মুখমণ্ডলের চারপাশে

যে-সব রূপলোভী ভ্রমরের গুঞ্জন তা রাবণের প্রতীক। এই সময় মন্দোদরী আসে এবং সীতাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে সীতা ওজস্বিনী ভাষায় যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সীতা-চরিত্রে দৃঢ়তার মানদণ্ডের স্বরূপ।

পুষ্পদন্তও সীতা-মন্দোদরীর মিলনের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। মন্দোদরী সীতাকে বোঝাতে এসে বুঝতে পারে যে, সীতা তারই কন্যা। মাতৃস্নেহ উদ্‌বেলিত হ'ল। মন্দোদরী পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে কটূক্তি করে। পুরুষের প্রতি নারীর এরূপ কটূক্তি এ যুগে অনেক কাব্যেও দেখা যায়। কিন্তু স্বয়ংভূ 'পউমচরিঅ'তে এই প্রসঙ্গে বাল্মীকির মতোই পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বর্ণনা করেছেন। রামের প্রতি সীতার কটূক্তিতে সীতা শান্তস্বরে বলেছিলেন, পুরুষ কখনোই স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করে না।

সর্বশেষে বলা যায় যে অপভ্রংশ রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে এখানে যথার্থ মানবিক চিত্রণ, হৃদয়স্পর্শী কোনো প্রসঙ্গে অনুভূতিপূর্ণ অভিব্যক্তিব্যঞ্জক দৃশ্য বর্ণনা, প্রভাবশালী সংবাদ যোজনা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

৭। শোলাচার্য-কৃত 'চউপন্নমহাপুরিসচরিত'-এর অন্তর্গত 'রাম-লক্ষ্মণ চরিয়ম' :-

শোলাচার্যের রচনার নূতনত্ব কিছুই নেই। রচনাটি সম্পূর্ণভাবে বিমলস্থরির 'পউমচরিঅ'র অনুকরণে রচিত (৮৬৮ খৃঃ)। এই রচনার কেবলমাত্র একটি বিশেষত্ব হল এই যে এখানে রাবণ-চরিত্র বাল্মীকি-রামায়ণের আধারে রচিত, বিমলস্থরির অনুকরণে নয়।

৮। গুণভদ্র-কৃত 'উত্তরপুরাণ' [নবম শতক]। (ভারতীয় জ্ঞানপীঠ সংস্করণ, ১৯৫৬।)

দিগম্বর সম্প্রদায়ের জিনসেন গুণভদ্র-বিরচিত 'উত্তরপুরাণ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই রামকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই রকম :—

বারাণসীর রাজা দশরথের চার পুত্র ছিল। রাম সুবালার গর্ভে এবং লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। দশরথ যখন সাকেতপুরে রাজধানী স্থাপন করেন সেই সময় ভরত ও শত্রুঘ্ন অন্য কোনও রানীর গর্ভজাত হয়। রানীর নাম এখানে উল্লিখিত নয়। দশানন বিনমি বিদ্যাধর বংশের পুলস্ত্যের পুত্র। একদিন রাবণ অমিতবেগের কন্যা মণিমতীকে তপস্যা করতে দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটায়। মণিমতী তখন রাবণকে বলেন, 'আমি তোমার কন্যা হয়ে তোমাকে বধ করব।' মৃত্যুর পর মণিমতী মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

কন্যার জন্মের পর জ্যোতিষী রাবণকে বলে, 'এই কন্যা তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।' এই কথা শুনে রাবণ ভয়ে ভীত হয় এবং মারীচকে বলে যে সে যেন কন্যাটিকে অন্যত্র কোথায় ছেড়ে দিয়ে আসে। কন্যাটিকে এক পাত্রে রেখে মারীচ সেটিকে মিথিলায় প্রোথিত করে দিয়ে আসে। হলকর্ষণের সময় জনক সেই পাত্রটি পান এবং পাত্রটি খুলে একটি কন্যা দেখে তাকে নিজের কন্যার মতো পালন করতে থাকেন। অনেক দিন পরে জনক নিজের যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে আসেন। যজ্ঞ শেষে রাম-সীতার বিবাহ হয়। এ ছাড়া রাম আরো সাত জন কুমারীকে এবং লক্ষ্মণ পৃথীদেবী আদি ষোলো জন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। দশরথের আজ্ঞায়ই দুজনে বারাণসীতে বাস করতে থাকেন।

নারদের নিকট সীতার সৌন্দর্যের কথা শুনে রাবণ তাঁকে হরণ করার সংকল্প করে। সীতার মন জানার জন্য রাবণ শূর্পণখাকে সীতার কাছে পাঠায়। শূর্পণখা সীতার সতীত্ব দেখে রাবণকে বলে যে সীতার মন টলানো সম্ভব নয়। তারপর যখন রাম-সীতা বারাণসীর নিকট চিত্রকূট পর্বতের উদ্যানে বিহার করেন, তখন মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রামকে অন্যত্র নিয়ে যায়। অতঃপর রাবণ রামের রূপ ধরে সীতাকে বলে, 'আমি মৃগকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি এই পাল্কীতে চড়ো।' এই পাল্কী আসলে পুষ্পক রথ। রথ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে যায়। রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেনি কাবণ পতিব্রতা নারীকে স্পর্শ করলে তার আকাশগামিনীবিদ্যা নষ্ট হয়ে যাবে।

এদিকে দশরথ স্বপ্ন দেখেন যে, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এই সংবাদ তিনি রামকে দেন। এরপর সুগ্রীব ও হনুমান বালীর বিরুদ্ধে সহায়তা করার জন্য রামের কাছে যায়। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরে আসে। এরপর লক্ষ্মণ দ্বারা বালীবধ হয় এবং সুগ্রীব নিজ রাজ্য ফিরে পায়। সেতুবন্ধের উল্লেখ এখানে নেই। বানর ও রাম-সেনা বিমানে করে লঙ্কায় যায়। তারপর যুদ্ধের বর্ণনা এবং শেষে লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণবধ বর্ণিত আছে। রাম বিনা পরীক্ষায় সীতাকে গ্রহণ করেন। এরপর রাম-লক্ষ্মণ বিয়াল্লিশ বৎসর কাল দিগ্বিজয় সেরে অর্ধ চক্রবর্তী হয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। তারপর দুজনের সম্মিলিত অভিষেক সম্পন্ন হয়। লক্ষ্মণের ১৬ হাজার এবং রামের ৮ হাজার রানীর উল্লেখ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে রাম-লক্ষ্মণ, ভরত-শত্রুঘ্নকে রাজ্য দিয়ে বারাণসী ফিরে আসেন। এখানে সীতাবর্জনের উল্লেখ নেই। সীতার বিজয়-রাজ আদি ৮ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এরপর লক্ষ্মণ এক অসাধ্য রোগে মারা যান এবং রাবণবধের জন্য নরকে যান। লক্ষ্মণের পুত্র পৃথীচন্দ্রকে রাজা এবং

সীতার কনিষ্ঠ পুত্র অজিতঞ্জয়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ আদি ৫০০ রাজা ও ১৮০ পুত্রের সঙ্গে রাম সাধনা করতে যান। ৩৯৫ বর্ষ পরে রাম কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হন। শেষে রাম ও হনুমানের মোক্ষপ্রাপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সীতা স্বর্গে যান এবং লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলেন যে তিনি যদি নরক থেকে বেরিয়ে সংযম প্রদর্শন করেন তবে তিনি মোক্ষলাভ করবেন।

গুণভদ্রের 'উত্তরপুরাণ' পর্যালোচনা করলে নিম্নবর্ণিত বাল্মীকি-বহির্ভূত ঘটনাগুলি পাওয়া যায়। যেমন :

১) রাম সুবালার এবং লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর পুত্র, ভরত এবং শত্রুঘ্ন দশরথের অন্য কোনও রানীদের পুত্র, যাঁদের নাম উল্লিখিত নয়।

২) পুলস্ত্যর পুত্র রাবণ অমিতবেগের কন্যা মণিমতীকে বিরক্ত করলে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি তাব কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে তার মৃত্যুর কারণ হবেন। সীতা রাবণ ও মন্দোদরীব কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রাবণ জ্যোতিষীর কাছে কন্যার জন্মের কারণ জানতে পেরে এই কন্যাকে দূর দেশে নিয়ে যেতে মারীচকে আদেশ করে। মারীচ কন্যাটিকে এক পাত্রে বন্ধ করে মিথিলায় প্রোথিত করে। হলকর্ষণকালে জনক কন্যাটিকে পেয়ে নিজ কন্যার মতো পালন করতে থাকেন।

৩) জনক রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর যজ্ঞে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। যজ্ঞশেষে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। এরপর রাম আরও ৭টি এবং লক্ষ্মণ আরও ১৬টি বিবাহ করেন।

৪) নারদের কাছে সীতার সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে রাবণ শূর্পণখাকে সীতার কাছে পাঠায়। শূর্পণখা এসে সীতাকে রাবণের ভজনা করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হয়। তারপর মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করে রামকে দূরে নিয়ে যায়। রাবণ রামের ছদ্মবেশে এসে সীতাকে হরণ করে।

৫) রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেনি কারণ কোনও রমণীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ করলে তার আকাশগামিনীবিদ্যা বা আকাশভ্রমণের শক্তি নষ্ট হবে এই ভয়ে।

৬) দশরথ রাবণের কার্যবিধি স্বপ্নে জেনে, রামকে তা প্রকাশ করেন।

৭) লক্ষ্মণ বালী ও রাবণকে বধ করেন।

৮) রামের ৮০০০ এবং লক্ষ্মণের ১৬০০০ পত্নী ছিল।

৯) সীতার ৮ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাঁর বনবাস-কথা উল্লিখিত নয়।

১০) লক্ষ্মণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নরকে যান।

১১) রাম জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুক্তি লাভ করেন।

১২) সীতা এবং অন্যান্য রানীরা জৈনধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বর্গে যান।

৯। হরিষেণের 'বৃহৎ-কথা-কোষ'। (৯৩১-৩২ খৃঃ)

এই কথা-কোষে দুটি রামায়ণী কথা পাওয়া যায়। যদিও হরিষেণ দিগম্বর সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, তথাপি তাঁর রামকথা গুণভদ্রের দিগম্বর বিবরণ থেকে ভিন্ন। বরং এটিকে বাল্মীকি-রামায়ণের সংক্ষিপ্তকরণ বলা যায়। প্রথম রামকথাটি রাবণবধ বিবরণে শেষ হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণ থেকে ভিন্ন কয়েকটি ঘটনা এখানে পাওয়া যায়। এখানে শত্রুঘ্নকে দশরথের চতুর্থরানী সুপ্রভার পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং খর-দূষণকে শূর্পণখার স্বামী বলে অভিহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় রামকথায় সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার পর ব্রহ্মচারিণী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

১০। ভদ্রেশ্বরের 'কহাবলী'র অন্তর্গত রামায়ণ। (১১শ শতাব্দী)

'কহাবলী' প্রাকৃত গদ্যে রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। সমস্ত রচনাটি ৩০২টি তালপাতার পুঁথিতে পাওয়া যায়। ভদ্রেশ্বর-কৃত রামকথার বিবরণ এই রকম –

সীতা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। রামের অন্যান্য রানীরা সীতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে দিয়ে রাবণের চিত্র আঁকান এবং রামের নিকটে গিয়ে বলেন যে সীতা এখনও রাবণকে ভজনা করেন। এবং তাঁরা প্রকাশ্যে সীতার দ্বারা অঙ্কিত রাবণ-চিত্রের কথা সবাইকে বলেন। গর্ভবতী সীতার ইচ্ছাপূরণ করার জন্য রাম বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা করেন। একদিন যখন রাম-সীতা বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব উপভোগ করছিলেন, সীতার দক্ষিণ চক্ষু কম্পিত হতে থাকে। সীতা রামকে সেকথা বলেন এবং রাম সীতার কোনও বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কা করেন। রাম সীতাকে বলেন যে ভাগ্যকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না এবং নানা ধর্মীয় কার্যকলাপ করতে বলেন। সীতা তাই করতে থাকেন।

একদিন রাম সীতার অপবাদ শোনেন। তিনি লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমানের সামনে গুপ্তচরকে ডেকে সীতার অপবাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। গুপ্তচর বলে যে, সে প্রজাদের কাছে এই অপবাদ শুনেছে। রামও বলেন যে তিনি নিজেও একথা শুনেছেন। এই কথা শুনে লক্ষ্মণ ক্রোধান্বিত হন। কিন্তু রাম সীতাকে বিসর্জন দেওয়ার মনস্থ করেন। তিনি সেনাপতিকে ডেকে সীতাকে কোনও এক বনে নির্বাসন দিয়ে আসতে বলেন। কৃতান্তবদনকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়। সে কাজ শেষ করে রামকে খবর দেয়। রাম মূর্ছিত হন। লক্ষ্মণ রামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে তাঁর বনে গিয়ে সীতার খোঁজ করা উচিত। রাম, লক্ষ্মণ এবং কৃতান্তবদন বিমানে করে যে বনে সীতাকে নির্বাসন দেওয়া

হয়েছিল সেই বনে যান। তাঁরা কিন্তু সীতার সন্ধান না পেয়ে মনে করেন যে নিশ্চয় সীতাকে বাঘ কিংবা সিংহ খেয়ে ফেলেছে।

১১। হেমচন্দ্র-কৃত 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ'-এর অন্তর্গত 'জৈন রামায়ণ'।
(দ্বাদশ শতাব্দী)

হেমচন্দ্র আমেদাবাদে ১০৮৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুমারপালদেবের বন্ধু ও সমসামিয়িক ছিলেন।

তাঁর রচিত 'জৈন রামায়ণে'র বিশেষত্ব এই যে তিনি রাক্ষস ও বানর বংশের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। রামকাহিনী এখানে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এ থেকেই বোঝা যায় যে দ্রাবিড় সংস্কৃতিতে রাক্ষস ও বানরকুল রাম অপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল।

হেমচন্দ্র রাবণ ও তার ভ্রাতাদের তপস্যার কথা এইভাবে বর্ণনা করেছেন :— যক্ষদের কাছ থেকে লঙ্কা পুনরুদ্ধারের জন্য রাবণ ও তার দুই ভাই কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ মায়ের আদেশে তপস্যা করতে যায়। যক্ষরা সুন্দরীদের রূপ ধরে তাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করে। সুন্দরীরা তাদের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে, কিন্তু তারা তপস্যা করা থেকে বিরত হয় না। 'তারা ধীর, শান্ত নির্বিকার হয়ে তাদের তপস্যায় লীন ছিল'।

'নির্বিকারাস্থিরাকারাংস্তুষ্ণিকান্' —জৈন রামায়ণ।

যক্ষরা প্রাথমিক চেষ্টা সফল না হওয়ায় সিংহ, শৃগাল, সর্প, বলদ ও বিড়ালের রূপ ধরে তাদের ঘিরে চিৎকার করে, তাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ চেষ্টাও যক্ষদের সফল হল না। তখন যক্ষরা তাদের পিতা, মাতা ও ভগ্নীদের রূপ ধারণ করে এসে বলে যে, তারা পশু-জন্তুর দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, রাবণ এবং তার ভায়েরা যেন তাদের রক্ষা করে। তথাপি তাদের তপস্যা ভঙ্গ হল না, পশুরা তাদের সামনে এসে তাদের পিতা মাতা ও ভগ্নীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে দিল। যদিও এ দৃশ্য মর্মান্তিক কিন্তু তবুও তারা বিচলিত হল না। সহসা কুম্ভকর্ণের সামনে বিভীষণ ও রাবণের কাটা মুণ্ড পড়ল, কুম্ভকর্ণের মধ্যে সহসা শিহরণ জাগল, কিন্তু ধীরে ধীরে সে সংযত হ'ল। বিভীষণও অনুরূপ আচরণ করল যখন তার সামনে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মুণ্ড পড়ল। যখন রাবণের সামনে কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের মুণ্ড পড়ল, রাবণ কিন্তু একচুলও নড়ল না, তার মনে কোনো বিকার উপস্থিত হল না। 'পরমার্থ জ্ঞানী রাবণ বিপদ গ্রাহ্য করল না। পর্বতশিখরের মতো অবিচল থেকে তার তপস্যায় মগ্ন থাকল'—

'রাবণঃ পরমার্থজ্ঞঃ স্তমনর্থমচিন্তয়ন্
নিবিষ্টো-ধ্যান নিষ্ঠোংভূৎ গিরীন্দ্রইব নিশ্চল।'

তারপর রাবণ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হল। প্রজ্ঞা, অণিমা, লঘিমা তার করায়ত্ত হ'ল। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে অল্প সময়ে রাবণ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হ'ল।

১১ ও ১২ শতাব্দীর তান্ত্রিক প্রভাব যে এই রামায়ণে পড়েছিল তা উপরোক্ত বর্ণনায় বোঝা যায়। এবং দক্ষিণ ভারতে রাবণ যে জনপ্রিয় ছিল তাও এই বিবরণে পাওয়া যায়।

১২। হেমচন্দ্র-কৃত 'যোগশাস্ত্র'র টীকার অন্তর্গত 'সীতারাবণ কথানক্'।

২৭৮টি শ্লোক-সমন্বিত এই কাব্যের কাহিনী এইরূপ :—

শ্লোক : ১-১১

একবার রাবণ তার প্রাসাদে ৯টি রত্নখচিত হার দেখে, সেই হারটি পরলে ৯টি রত্নে তার মুখ প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই থেকে সে 'দশশির' নামে খ্যাত হয়।

শ্লোক : ১২-৪২

একবার রাবণ ইন্দ্রের নিকট দূত পাঠিয়ে হয় যুদ্ধ নয়তো বশ্যতা স্বীকার—এই প্রস্তাব দেয়। ইন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকৃত হওয়ায় যুদ্ধ হয়। মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করে নিয়ে আসে। সোম, যম, বরুণ, ও কুবের রাবণকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁরা পরাজিত হয়ে বন্দীত্ব স্বীকার করেন।

শ্লোক : ৪২-৪৬

রাবণ পাতাল-লঙ্কা অভিযান করে চন্দ্রধরকে বধ করে তার ভগিনীর সঙ্গে খরের বিবাহ দেয় এবং খরকে রাজ্য প্রদান করে। খর চন্দ্রধরের রাজ্য গ্রহণ করে। রাবণ আনন্দে লঙ্কায় ফিরে আসে।

শ্লোক : ৪৭-৫২

রাবণ রাজা মরুতকে বৈদিক যাগযজ্ঞ বন্ধ করতে বাধ্য করে।

শ্লোক : ৫৩-৫৪

রাবণের বিভিন্ন তীর্থভ্রমণের কথা এখানে বিবৃত আছে।

শ্লোক : ৫৫-৫৯

অযোধ্যার রাজা দশরথ-এর চার রানী—কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং সুপ্রভার গর্ভে যথাক্রমে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। রামের সঙ্গে জনকের কন্যা এবং ভামণ্ডলের ভগিনী সীতার বিবাহ হয়।

শ্লোক : ৬০-৬৮

মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী দশরথের কাছে পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে দুটি বর চাইলেন। এবং দশরথ তা দিতে বাধ্য হন।

শ্লোক ; ৬৯-৭২

রামের দণ্ডকারণ্যে বাস ও জটায়ু-উপাখ্যান এখানে বর্ণিত।

শ্লোক : ৭৩-৮৫

চন্দ্রনখা-পুত্র শম্বুক বধ এবং চন্দ্রনখার রাম-লক্ষ্মণ সকাশে গমন।

শ্লোক : ৮৬-১১৭

এই অংশের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় — সীতাহরণ।

শ্লোক : ১১৮-১৩২

শত্রুবধে লক্ষ্মণের সাহায্যার্থে রামের গমন। কিন্তু রাম বুঝতে পারেন কেউ তাঁকে প্রতারণা করেছে। তিনি কুটীরে ফিরে আসেন। কিন্তু সীতাকে না দেখতে পেয়ে মূর্ছা যান। লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দেন। বিরাধ রাম-লক্ষ্মণের কাছে পাতাল-লঙ্কা উদ্ধারের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করেন। রাম-লক্ষ্মণ তাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁরা পাতাল-লঙ্কা অভিযান করেন। তাঁদের যাত্রা-পথে এক বিদ্যাধর তাঁদের জানায় যে রাবণ সীতাহরণ করেছে। তাঁরা পাতাল-লঙ্কা জয় করে বিরাধকে সেই রাজ্যের রাজা করেন।

শ্লোক : ১৩৩-১৯৪

সাহসগতি, সুগ্রীব ও তারার উপাখ্যান এখানে বিবৃত আছে।

শ্লোক : ১৯৫-২২২

হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ নিয়ে আসে।

শ্লোক : ২২৩-২৩১

রাবণের কয়েদখানায় দুই প্রহরী সমুদ্র এবং সেতুকে নিয়ে রাম হংসদ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করেন এবং লঙ্কা অবরোধ করেন। রাবণ দ্বারা নির্বাসিত বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দেয়।

শ্লোক : ২২৩-২৭৬

রাম-রাবণ যুদ্ধ এবং রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিবাণ নিক্ষেপের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। শক্তিবাণে আহত লক্ষ্মণকে দেখে এক বিদ্যাধর বললে, 'বিশল্যার স্নানের জল আনতে হবে।' হনুমান সেই জল আনতে গেল। হনুমান জলের সঙ্গে বিশল্যা ও তার ১০০০ সখীকে নিয়ে এল। লক্ষ্মণ সুস্থ হল এবং

তিনি বিশল্যা-সহ তার সখীদের বিবাহ করলেন। তারপর লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণবধ এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক : ২৭৭-২৭৮

রামের সীতাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রাবণের পাতাল গমন এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১৩। ধনেশ্বরসূরি-কৃত 'শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য'। (চতুর্দশ শতাব্দী)

ধনেশ্বর এখানে অনরণ্য ও পার্শ্বনাথের মূর্তির উপাখ্যান যোগ করেন। এই কাব্যের বিশেষত্ব এইগুলি : এখানে কৈকেয়ী রাম ও লক্ষ্মণ দুজনেরই বনবাস চেয়েছিলেন, রাবণের বহুরূপা বিদ্যা অর্জনে বানরেরা বাধাদান করেনি, বাল্মীকির মতো এখানে অপরাজিতা কৌশল্যা এবং ভানুকর্ণ কুম্ভকর্ণ বলে অভিহিত হয়েছে।

১৪। মেঘবিজয় গণিবর-কৃত 'লঘু ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত'।
(সপ্তদশ শতাব্দী)

এই কাব্যে নূতনত্ব কিছুই নেই। এটি হেমচন্দ্র-কৃত 'ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে'র সংক্ষিপ্তসার মাত্র।

এ ছাড়া কন্নড ভাষায় এই জৈন রামকথাগুলি পাওয়া যায় :—

১) নাগচন্দ্র-কৃত পম্পরামায়ণ,

২) কুমুদেন্দু-কৃত রামায়ণ,

৩) দেবপ্প-কৃত রামবিজয়চরিত,

৪) দেবচন্দ্র-কৃত রামকথাবতার, এবং

৫) চামুণ্ডারায়-কৃত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষ পুরাণ ॥

এই রামায়ণগুলি পরবর্তী পর্বে "কন্নড ভাষায় রামকথা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে।

জৈন রামায়ণগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণের শেষে রামায়ণগুলির মধ্যে কেবলমাত্র চারটি রামায়ণের বিশদভাবে আলোচনা কবা যেতে পারে। কারণ ঐ চারটি রামায়ণই পূর্ণাঙ্গ রামায়ণ এবং অন্য রামায়ণগুলির বিশেষত্ব তেমন কিছুই নেই, হয় সেগুলি বিমলসূরির অনুকরণে রচিত নয়তো সেগুলিতে রামকাহিনীর দু-একটা ঘটনা বর্ণিত। যে চারটি রামায়ণ এখানে আলোচনা করা হবে সেগুলি হল (১) বিমলসূরির 'পউমচরিঅ', (২) গুণভদ্রের 'উত্তরপুরাণ', (৩) অপভ্রংশ সাহিত্যের অন্তর্গত স্বয়ংভূর 'পউমচরিঅ' এবং (৪) পুষ্পদন্তের 'মহাপুরাণ'।

১) বিমলস্থরির 'পউমচরিঅ' পর্যালোচনা করলে প্রথমেই দেখা যায় যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিমলস্থরির কাব্যে বাল্মীকি-রামায়ণের ভাবগত অনুকরণ আছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বিমলস্থরি সরাসরি বাল্মীকি-রামায়ণের কয়েকটি ঘটনাকে সমালোচনা করেছেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কেমন করে শক্তিশালী রাক্ষসেরা বানর দ্বারা নিহত হ'ল। কেমন করেই বা রাক্ষসপ্রধান নগণ্য জীব বানরদের দ্বারা পরাজিত হ'ল। এই সমালোচনা করে তিনি তাঁর কাব্যে রাম-কাহিনীকে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাহিনীতে পর্যবসিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই চেষ্টা কতখানি ফলবতী হয়েছে সেটা দেখা যেতে পারে।

বিমলস্থরি তাঁর রামকাহিনীতে প্রথমেই রাবণ চরিত্র আলোচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে রাবণ একজন ধর্মভীরু জৈন। সে জৈন-মন্দিরে এক বিরাট যজ্ঞ করেছিল এবং অনন্তবীর্যের উপদেশ শুনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কোন নারীকে সে ধর্ষণ করবে না। তাই যদি হয় তবে দশরথ ও জনককে বধ করার জন্য সে বিভীষণকে পাঠাবে কেন? কেনই বা সে বালীর কাছে এই প্রস্তাব করে পাঠাবে যে তাকে তার ভগিনীকে সমর্পণ করতে হবে এবং তাকে প্রণাম করতে হবে? সে যদি অনন্তবীর্যের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে কোনও নারীকে ধর্ষণ করবে না তবে সে সীতাকে হরণ করেছিল কেন? কেনই বা সীতাকে দিয়ে তার কামনা চরিতার্থ করার জন্য সে নানাভাবে চেষ্টা করেছিল? এগুলি কি একজন ধর্মভীরু জৈনের লক্ষণ না এক অত্যাচারী, অধর্মাচারী, নারীলোলুপের লক্ষণ? তাই মনে হয় বিমলস্থরি রাবণ চরিত্রকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বর্ণিত করতে পারেননি।

কবির হনুমান চরিত্রও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে বলা হয়েছে যে হনুমান রাবণের বন্ধু ছিল। হনুমানের কেবলমাত্র একটি কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে। সে সীতার খোঁজে লঙ্কায় যায়। সেখানে গিয়ে সে রাবণের উদ্যান ও প্রাসাদ ধ্বংস করে। তারপর ইন্দ্রজিৎ তাকে বন্দী করে রাবণের কাছে নিয়ে এলে হনুমান রাবণকে তিরস্কার ক'রে বন্ধনমুক্ত হয়ে চলে আসে। হনুমান যদি রাবণের বন্ধু হয় তবে হনুমানের এই লঙ্কাপুরীর প্রতি বৈর আচরণ স্বাভাবিক হতে পারে কি?

বিভীষণের দুটি কাজের কথা এখানে বলা হয়েছে। এক, সে রাবণের আদেশে দশরথ ও জনককে বধ করতে যায় এবং দুই, রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণ করতে বললে, সে রাবণ কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং সৈন্যসামন্ত নিয়ে রামের সঙ্গে যোগদান করে। বিভীষণের দ্বিতীয় কাজের দ্বারা বোঝা যায় যে সে ধর্মপ্রাণ ছিল। কারণ সে বুঝেছিল পরনারী হরণ করা অন্যায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, সে যদি ধর্মপ্রাণ হবে

তবে রাবণের অন্যায় আদেশ পালন করার জন্য দশরথ ও জনককে সে বধ করতে যাবে কেন ? যদি বলা যায় সে ভ্রাতৃভক্ত ছিল, তাই ভ্রাতৃ আদেশ পালন করতে সে গিয়েছিল, তাহলে একথা বলা যাবে যে, সেই ভায়ের শত্রুর সঙ্গে যোগদান করা কি তার ভ্রাতৃভক্তির লক্ষণ ? তাছাড়া আর একটি অদ্ভুত ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভীষণ তাঁদের বধ করতে আসছে শুনে দশরথ এবং জনক তাঁদের প্রতিকৃতি প্রাসাদে স্থাপন করে রাজ্য থেকে পালিয়ে যান। বিভীষণ এসে সেই প্রতিমূর্তি কেটে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে চলে যায়। বিভীষণ কি এতই অজ্ঞান ছিল যে সে জানত না কোনটি আসল মানুষ, কোনটি তার প্রতিমূর্তি ? আর এই প্রতিমূর্তি কেটে সত্যই কি সে ঠিকভাবে তার ভ্রাতৃ আজ্ঞা পালন করল ?

বালী-সুগ্রীব সংঘর্ষ এখানে বর্ণিত হয়নি। এখানে বর্ণিত আছে যে রাবণ যখন তাকে প্রণাম করতে বালীকে নির্দেশ দেয় সে তখন রাবণকে প্রণাম না করে সুগ্রীবকে রাজ্য দান করে জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে চলে যায়। এখানে বালীর আরএকটি অভূতপূর্ব কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্মীকি-রামায়ণে আছে রাবণ যখন কৈলাসে গিয়ে সমস্ত কৈলাস পর্বত ওঠাতে চেষ্টা করে তখন শিব পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পর্বত চেপে ধরে রাবণকে শাস্তি দেন। এখানে বলা হয়েছে যে অনুরূপ কাজ করেছিল শিব নয় বালী। ঘটনাটিকে অস্বাভাবিক বললেও কম করে বলা হবে।

পরিশেষে রাম-লক্ষ্মণের বিভিন্ন কার্যের বিবরণ আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে রাম-রাবণ যুদ্ধের বর্ণনা নেই। রামের কেবলমাত্র একটি কাজের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। সেটি হ'ল রাম সাহসগতিকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্যদান করেছিলেন। সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন লক্ষ্মণ। যদিও ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হওয়া ছাড়া যুদ্ধের অন্য বিবরণ নেই। লক্ষ্মণ শেষে রাবণবধ করেছিলেন একথা বর্ণিত আছে।

যে ঘটনাগুলি বর্ণিত হ'ল তার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ রচিত হতে পারে কিনা সে প্রশ্ন করতে পারি। রাবণ যদি অমিতশক্তিধর, অত্যাচারী এবং নারীলোলুপ না হয়, বিভীষণ যদি সক্রিয় ভাবে রামকে সাহায্য না করে, হনুমান যদি শক্তি বুদ্ধি এবং ভক্তি দিয়ে রামকে অনুসরণ না করে, রামের বনবাসের পর থেকে সীতাহরণ, বালীবধ, সেতুবন্ধ প্রভৃতি ঘটনার বিবরণ না থাকে, রাম-রাবণ যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের অংশ প্রভৃতি যদি না থাকে, তবে রাবণবধও হবে না এবং পূর্ণাঙ্গ রামায়ণও রচিত হবে না। তাহলে রামকাহিনী কতকগুলি বিকৃত ঘটনার সমন্বয় হবে। তাছাড়া আরও একটি ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে রামের ৮০০০ বিবাহ, লক্ষ্মণের ১৬০০০ এবং হনুমানের কয়েক হাজার বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা রামকাহিনী প্রভাবান্বিত হল কি? না এর দ্বারা জৈনধর্মের জয়গান করা হল? তাই মনে হয় এটিকে রামকাহিনী না বলে রামকাহিনীর বিকৃত রূপ বলা যায়। আর একথা বলা যায় যে এই কাহিনীর দ্বারা জৈনধর্মের সুন্দর এবং শান্ত রূপও ব্যাহত হয়েছে।

২) গুণভদ্রের 'উত্তরপুরাণ' পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রামায়ণ-কাহিনীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখানে উল্লিখিত হয়নি। যেমন প্রথমতঃ এখানে রামবনবাসের ঘটনার উল্লেখ নেই। আমাদের মনে পড়ে রামবনবাসকে কেন্দ্র করে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে সেই করুণ দৃশ্য, যার স্মৃতি যুগ যুগ ধরে জন-মানসে জাজ্জ্বল্যমান। সীতাহরণ রামায়ণের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাল্মীকি-রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে সীতাহরণ ঘটেছিল মূলতঃ রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার বিরূপীকরণের জন্য। এখানে সে-ঘটনার উল্লেখ নেই। তাহলে এখানে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ হয়েছিল কেন? এখানে বলা হয়েছে যে নারদ-কর্তৃক রাবণ সকাশে সীতার সৌন্দর্যকথা বিবৃত হলে রাবণ সীতাহরণ করতে মনস্থ করে। প্রশ্ন হল, ভক্তপ্রাণ নারদ রাবণের কাছে সীতার সৌন্দর্য বর্ণনা করে তাকে সীতাহরণে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহ দেবেন কেন? এতে নারদের কী স্বার্থ সিদ্ধ হল? কোনও উত্তর নেই। তাই এই যুক্তিহীন কারণ আমাদের কাছে অশোভন মনে হয়। রামায়ণে সীতাহরণের পর সীতার করুণ বিলাপ এবং সীতাহারা হয়ে রামের করুণ ক্রন্দন অরণ্যের বৃক্ষরাজীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের অভিভূত করেছিল। কিন্তু এসবের কোনও উল্লেখ এখানে নেই। তারপর সীতার অন্বেষণে রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, রামের সুগ্রীবকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি এবং বালীবধ রামায়ণে বর্ণিত আছে, এখানে এসবের কোনও উল্লেখ নেই। এখানে কেবল বর্ণিত হয়েছে যে সুগ্রীব ও হনুমান রামের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে যায়। এবং লক্ষ্মণদ্বারা বালী-বধ হয়। বানরদ্বারা সীতার সন্ধান ও সেতুবন্ধের কথা রামায়ণে বর্ণিত আছে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, বানরসেনা ও রামসেনা বিমানে লঙ্কায় যায়। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? বিমানে কত সেনা গিয়েছিল? রাম বিমান কোথায় পেয়ে-ছিলেন এ সবের কোনও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা নেই। হনুমানের একটিমাত্র কাজের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতার খোঁজ এনেছিল। এরপর লঙ্কা-যুদ্ধের বর্ণনা। কিন্তু এখানে বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ এবং মন্দোদরীর কাজের কোনও উল্লেখ নেই। এখানে বর্ণিত আছে, শেষে লক্ষ্মণ-কর্তৃক রাবণবধ হয়েছিল।

প্রশ্ন হল : রামকাহিনীতে যদি রামবনবাসের উল্লেখ না থাকে, সীতাহরণের যদি যুক্তিসংগত কারণ না থাকে, সীতা-সন্ধান, রাম-সুগ্রীব মৈত্রী, সেতুবন্ধ, লঙ্কা-যুদ্ধে বিভীষণের সক্রিয় সাহায্য, হনুমানের রাম-সুগ্রীব মৈত্রীর সময় থেকে রাম-কাহিনীর শেষ অধ্যায় পর্যন্ত হনুমানের সুখে দুঃখে রামের অনুসরণ যদি না থাকত—তবে রামকাহিনী হত কি ? শুধু তাই নয়, এখানে বলা হয়েছে বালী ও রাবণবধ লক্ষ্মণ দ্বারা হয়েছে এবং রামকে সম্পূর্ণভাবে একজন কর্মবিমুখ জড় পদার্থ, নিষ্ক্রিয় সাক্ষীগোপালরূপে দেখানো হয়েছে। কেবল বলা হয়েছে, রামের ৮০০০ পত্নী ছিল এবং কর্মবীর লক্ষ্মণের ১৬০০০ পত্নী ছিল। এইসব ঘটনা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রামকাহিনী রচিত হতে পারে কি ? অনেক সময় দেখা যায় ধর্মের কারণে রাম-কাহিনী পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জৈন রামকথার এই যে পরিবর্তন, সে কি জৈনধর্মের অনুশাসন অনুসারে বিবৃত ? তাই যদি হয় তবে জৈনধর্ম মসীলিপ্ত হবে, তার সম্মানের আসন থাকবে না। এবং এই ধর্মের অনুশাসনে রচিত রামকথাকে কতকগুলি অসংলগ্ন অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকৃত ঘটনার সমাবেশ ছাড়া কিছুই মনে করতে পারি না।

৩) অপভ্রংশ সাহিত্যে দুই বিখ্যাত কবি স্বয়ংভূ ও পুষ্পদন্ত-রচিত 'পউম-চরিঅ' এবং 'মহাপুরাণ' পর্যালোচনা করলে প্রথমেই যে কথাটি মনে পড়ে তা হ'ল এঁদের বাল্মীকি ও ব্যাসের সমালোচনা। স্বয়ংভূ ও পুষ্পদন্ত অনেকগুলি ঘটনা যেমন রাবণের দশ মুণ্ড, কুম্ভকর্ণের ছয় মাস নিদ্রা যাওয়া, রাক্ষস রাবণ, শিবের উপাসনার সময় রাবণের নিজের শির উপহার, উপস্থাপন করে সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করে কবিদ্বয়কে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছেন। এবং জগৎকে ভুলকথা শোনানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন। আমাদের দেশে কাব্য, নাটক, শাস্ত্রে অনেক অতিপ্রাকৃত সত্তার কথা আছে, দেশবিদেশের রূপকথার গল্পে অনেক দৈত্য-দানবের কথা আছে, শেক্সপীয়ারের নাটকে ডাইনীর কথা আছে, সেইজন্য এইসব কবি, নাট্যকার ও শাস্ত্রকারদের যদি মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করি, তবে আমাকে বিদ্বৎসমাজের কাছে অবশ্যই হাস্যাস্পদ হতে হবে। তাছাড়া এক কবির পক্ষে অন্য কবিকে সমালোচনা করার নিশ্চয়ই অধিকার আছে কিন্তু তা শালীনতার সীমালঙ্ঘন ক'রে নয়। কবি বা সমালোচক তাঁর লেখার মধ্যে মার্জিত রুচির পরিচয় দেবেন এটাই কাম্য। এইসব অশালীন মন্তব্য প্রাতঃস্মরণীয় কবিদের প্রতি কখনোই আশা করা যেতে পারে না।

এখন দেখা যাক কবিদ্বয় ন্যায়, নীতি এবং যুক্তির পথ ধরে কতটা এগিয়ে-ছেন। প্রথমেই দেখা যায় স্বয়ংভূ যে কবিবর বাল্মীকিকে মিথ্যাবাদী বলে-

অভিহিত করেছেন, তাঁরই প্রদর্শিত পথে তিনি অনেকখানি এগিয়েছেন। স্বয়ংভূর কাব্যে বাল্মীকির মতো লক্ষ্মণ সুমিত্রার পুত্র এবং ভরত কৈকেয়ীর পুত্র, রামের রাজ্যাভিষেকে কৈকেয়ী বাধা দান করেছিলেন এবং রামকে বনে পাঠিয়েছিলেন, ভরত রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন। রামের বনগমনে কৌশল্যার শোক, সীতাহরণের পর সীতার করুণ বিলাপ এবং সীতাহারা রামের করুণ ক্রন্দন, অশোকবনে সীতা-হনুমান সংলাপ এবং রাম-লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন, অগ্নিপরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই। অনেক কবি এইভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বাল্মীকির ঋণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। অথচ এই কবি সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরে থাক, সেই স্মরণীয় কবিকে কটূক্তি করেছেন।

স্বয়ংভূর কাব্যে বর্ণিত বাল্মীকি-রামায়ণ-বহির্ভূত কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা যেতে পারে। স্বয়ংভূর মতে সীতা জনকের কন্যা, তাঁর ভামণ্ডল নামে এক পুত্র ছিল। জন্মের পর সে অন্যত্র পালিত হয়। সে সীতাকে বিবাহ করার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় না। নারদের উত্তেজনায় সে রাম-সীতার বিবাহ পণ্ড করার এবং সীতাকে হরণ করার চেষ্টা করে। পরে সীতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বুঝতে পেরে সে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ করে চলে যায়। ঘটনাটি কি বিশ্বাসযোগ্য? কবির এটি কি সত্যভাষণ? ভামণ্ডল নাহয় সীতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ না জেনে সীতাকে বিবাহ করার চেষ্টা করে। কিন্তু নারদ তাকে সীতাহরণ করার প্ররোচনা দিলেন কি করে? এবং কেন? নারদের পক্ষে ভামণ্ডলের সঙ্গে সীতার সম্পর্ক জানা অসম্ভব ছিল না। তাহলে এই অবিশ্বাস্য অস্বাভাবিক চেষ্টা নারদ কেন করলেন? তাছাড়া প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে ভামণ্ডলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সন্ন্যাসগ্রহণ কি তার পাপের সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত হল? প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাম-সীতার কাছে গিয়ে তার পরিচয় দিয়ে তাঁদের ক্ষমা ভিক্ষা করাই ছিল তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সন্ন্যাসগ্রহণ নয়।

রামের বনগমনের সময় এমন কয়েকটি উপাখ্যান বর্ণিত আছে যার সঙ্গে রামের সম্পর্ক নেই কিন্তু লক্ষ্মণের আছে। এগুলির দ্বারা লক্ষ্মণের প্রেম এবং তাঁর হাজার বিবাহের কথা বর্ণিত আছে। রামকাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই এইসব সামঞ্জস্যহীন অবিশ্বাস্য উপাখ্যানগুলি বর্ণনা করে কবি কি তাঁর কাব্য-সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন? মনে হয় না, কারণ কাব্যের পক্ষে এগুলি ছিল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়।

রামায়ণের মূল ঘটনা রাবণবধ। কিন্তু এটা করার জন্য রামকে অনেক আয়োজন উদ্যোগ করতে হয়েছিল, সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করতে হয়েছে; বিভীষণের সক্রিয় সাহায্য নিতে হয়েছে; হনুমান রামকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

তারপর তাঁরা সেতুবন্ধ করে লঙ্কায় গিয়ে ধীরে ধীরে রাবণের সৈন্যসামন্ত এবং পুত্রদের বধ করেছিলেন। কিন্তু এখানে এসবের কোনও কিছু বর্ণনা নেই। লক্ষ্মণ যেন হঠাৎ লঙ্কায় গিয়ে রাবণবধ করে চলে এলেন। এটিকে কি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা বলে অভিহিত করব ?

তাই মনে হয় ব্যাস ও বাল্মীকিকে স্বয়ংভু যে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেই অভিযোগ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে করতে পারি। তাঁর কাহিনী বর্ণনা শুধুমাত্র অবিশ্বাস্য নয়, রূপকথার কাহিনীতেও এরূপ বর্ণনার নজির নেই।

পুষ্পদন্তের কাব্যে দেখি, তিনি সীতাকে মন্দোদরীর কন্যা বলে অভিহিত করেছেন। সেই সীতা রাবণের প্রাসাদ থেকে অন্যত্র গেল কি করে, তাঁর সঙ্গে রামের বিবাহ হল কি করে তার কোনও উল্লেখ নেই। তাছাড়া অশোকবনে মন্দোদরী যখন সীতাকে নিজের কন্যা বলে চিনতে পেরেছিল তখন সেকথা সে রাবণকে জানাল না কেন ? এটাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মন্দোদরীর সে রকম কোন প্রচেষ্টা এখানে দেখি না।

ভক্তপ্রাণ নারদের পক্ষে সীতাহরণে রাবণকে উত্তেজিত করা স্বাভাবিক কি ? এতে তাঁর কী উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল বোঝা গেল না। অনেক রামায়ণে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে নারদ তা করেছিলেন দেবতাদের নির্দেশে যাতে রাবণ সীতাহরণ করে এবং পরিণামে রাম-কর্তৃক নিহত হয়।

এখানে বালী-সুগ্রীব-প্রসঙ্গ, রাম-রাবণ যুদ্ধ বর্ণিত হয়নি, লক্ষ্মণের কর্মবহুল জীবনের বর্ণনা আছে। এবং তাঁর দ্বারা রাবণবধের কথাও উল্লিখিত আছে। কিন্তু লক্ষ্মণ কেমন করে রাবণবধ করলেন, তার বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হয়েছে। এখানে রাম সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। রাবণ-বিজয় কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণবিহীন এই কাহিনীকে রামকাহিনী না বলে, অন্য কিছু বলা যেতে পারে।

সুতরাং আমরা দেখলাম যে পুষ্পদন্তের কাব্য কতকগুলি সম্পর্কহীন, অবিশ্বাস্য ঘটনার সমন্বয় মাত্র। তাই যদি হয়, তাঁর পক্ষে ব্যাস, বাল্মীকিকে সমালোচনা করা যেমনই অনুচিত ও অন্যায় তেমনিই হাস্যকর বলে মনে হয়।

—